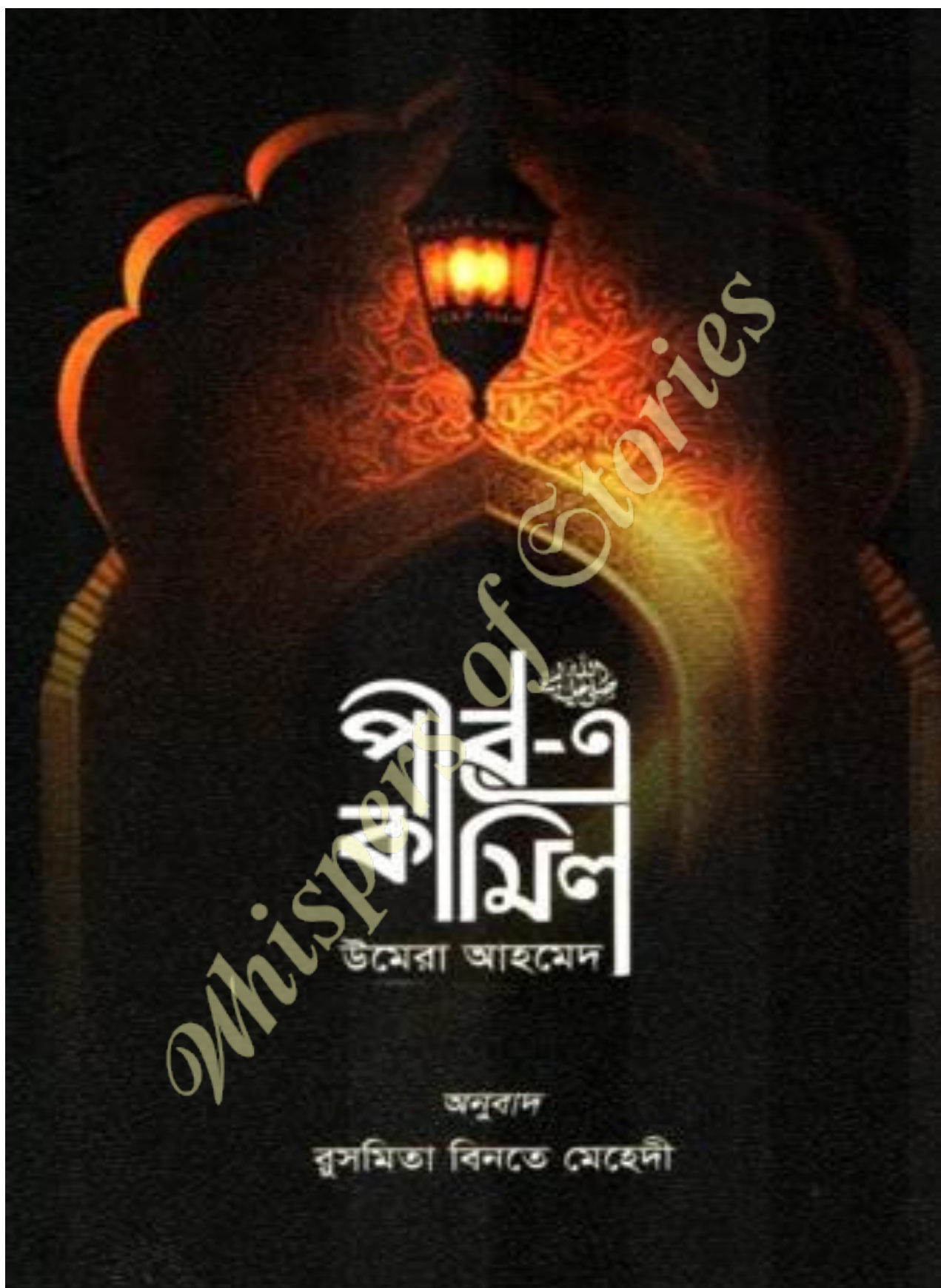




To join our telegram group click here



Whispers of Stories

پیر کامل

পীর-এ কামিল

উমেরা আহমেদ

অনুবাদ

রুশমিতা বিনতে মেহেদী

১ এক ১

'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে...?' বলপয়েন্ট দুই
ঠোঁটের মাঝে রেখে ইমামা ভাবনায় হারিয়ে যায়। এরপর লম্বা
একটা শ্বাস টেনে খানিক অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হেসে বলল। 'খুব
কঠিন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।'

'কঠিন কেন হতে যাবে?' জাভেরিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কারণ আমার জীবনে অজস্র ইচ্ছে রয়েছে, প্রতিটি ইচ্ছেই
আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।' ইমামা মাথা নেড়ে নেড়ে বলল।

ওরা অডিটোরিয়ামের পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে
আছে। এফ.এস.সি ক্লাসে আজ ওদের অষ্টম দিন। এই সময়
ফ্রি পিরিয়ড চলায় অডিটোরিয়ামের পেছনে এসে বসেছে

ওরা। তখন লবণ মেশানো বাদাম খেতে খেতে জাভেরিয়া প্রশ্ন করে, 'তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে কী ইমামা?'

কিছুটা অবাক হয়ে বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে যায় ও। 'আগে তুমি বলো, তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে কী?' ইমামা পাল্টা প্রশ্ন করল। 'প্রশ্নটা যেহেতু আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি, সেহেতু তোমার আগে উত্তর দেওয়া উচিত।' জাভেরিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে বলল।

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দাও।' ইমামা হার মেনে নেয়। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে...?' বিড়বিড় করে ও। 'একটা ইচ্ছে হলো আমার জীবন যেন অনেক লম্বা হয়।'

'কেন?' জাভেরিয়া হেসে জিজ্ঞেস করে।

'মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবন আমার কাছে খুব ছোট বলে মনে হয়। মানুষকে অন্তত একশ বছর বাঁচতে দেওয়া উচিত

পৃথিবীতে। অন্যদিকে আমি তো কত কী করতে চাই...তাই যদি তাড়াতাড়ি মরে যাই আমার জীবনের সব ইচ্ছেরা অপূর্ণ রয়ে যাবে।' বাদামের একটি দানা মুখে দিয়ে বলল ইমামা।

'আচ্ছা, আর কী?' জাভেরিয়া আবার জিজ্ঞেস করে।

'আর হচ্ছে, আমি আমার দেশের সবচেয়ে বড় ডাক্তার হতে চাই... সেরা আই স্পেশালিষ্ট। যখন পাকিস্তানে আই সার্জারির ইতিহাস লেখা হবে, তখন যেন আমার নাম টপ অফ দ্য লিস্ট হয়।' ইমামা হেসে আকাশের দিকে তাকায়।

'যদি কখনো এমন হয় তুমি ডাক্তার হতে পারলে না, তখন?' জাভেরিয়া বলল। 'কারণ সবশেষে এটা যোগ্যতা ও ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল, আমাদের হাতে না।'

‘সম্ভবই না! আমি এত চেষ্টা করছি যে, মেরিট লিস্টে আমার নাম আসবেই। তাছাড়া আমাদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা যা, তাতে এখানের কোনো মেডিকেল কলেজে চান্স না পেলেও বাবা-মা আমাকে বাহিরে পাঠিয়ে দেবে।’

'তারপরও যদি কখনো এমন হয় তুমি ডাক্তার হতে পারলে না, তাহলে?'

'হতেই পারে না, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে। এই প্রফেশনের জন্য আমি সব ছাড়তে পারি। এটা আমার স্বপ্ন। মানুষ কীভাবে তার স্বপ্ন ছেড়ে দিতে পারে? impossible!' ইমামা অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে হাতের তালুতে থাকা আরেকটি বাদামের দানা তুলে মুখে দেয়।

'জীবনে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। যেকোনো সময়, যেকোনো কিছু হয়ে যেতে পারে। ধরো, তুমি ডাক্তার হতে পারোনি, তখন কী করবে? মানে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে?' ইমামা ভাবে। 'প্রথমত, আমি অনেক কাঁদব... অনেকবেশি... অনেকদিন যাবৎ...। তারপর মরে যাব।'

জাভেরিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল। 'কিছুক্ষণ আগেই বললে লম্বা জীবন চাই, এখনই বলছ...?'

'বেঁচে থেকে কী করব? আমার সব প্ল্যানই মেডিকেলের নিজের ক্যারিয়ার ঘিরে। এটা জীবন থেকে হারিয়ে গেলে বাকি থাকবে কী?'

'এর মানে তোমার একটা বড় ইচ্ছে আরেকটা বড় ইচ্ছেকে শেষ করে দেবে?'

'হ্যাঁ, তুমি এটাই ধরে নিতে পারো।'

'মানে দাঁড়ায়- তোমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছে ডাক্তার হওয়া, লম্বা জীবন পাওয়া নয়। তাই না?'

'হুমম, বলা যেতে পারে।'

'আচ্ছা বলো, ডাক্তার হতে না পারলে মরবে কীভাবে? আত্মহত্যা করবে নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু?' জাভেরিয়া বেশ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'স্বাভাবিক মৃত্যুই, আত্মহত্যা করা তো অসম্ভব।' ইমামা ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে উত্তর দেয়।

'যদি স্বাভাবিক মৃত্যু না আসে, তাহলে? মানে বলতে চাইছি তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী স্বাভাবিক মৃত্যু যদি তাড়াতাড়ি না আসে, তাহলে কি তুমি ডাক্তার না হতে পেরেও লম্বা জীবন কাটাবে?'

'না। আমি জানি, ডাক্তার হতে না পারলে খুব তাড়াতাড়ি মরে যাব। কারণ এত কষ্ট পাবো যে, আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হবে না।' ইমামা বিশ্বাসের সাথে বলল।

'তুমি যে পরিমাণ হাসিখুশী মেজাজের মানুষ, তাতে আমার বিশ্বাস হয় না কখনো তুমি এত দুঃখী হতে পারো যে, কাঁদতে কাঁদতে মরেই যাবে। তাও শুধু ডাক্তার হতে পারোনি বলে, sounds funny!' জাভেরিয়া ইয়ার্কির সুরে বলল।

'তুমি এখন আমার কথা ছাড়া, নিজের কথা বলো। তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে কী?' ইমামা প্রসঙ্গ পাল্টে বলল।

'আরে, থাকুক।'

'থাকবে কেন? বলো আমায়।'

'তোমার খারাপ লাগবে।' জাভেরিয়া সংকোচ নিয়ে বলল।

ইমামা ঘুরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আমার কেন খারাপ লাগবে?'

জাভেরিয়া চুপ থাকে।

'এমন কী বিষয়, যা আমার খারাপ লাগবে?' ইমামা আবার জিজ্ঞেস করে।

'খারাপ লাগবে তোমার।' জাভেরিয়া আবার মধ্যম আওয়াজে বলল।

'তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছের সাথে আমার কী সম্পর্ক যে, তা শুনলে খারাপ লাগতে পারে?' ইমামা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। 'কোনোভাবে তোমার ইচ্ছে এই না তো, আমি যেন ডাক্তার হতে না পারি?' হঠাৎ ওর মনে পড়ে।

জাভেরিয়া হাসে। 'আরে না, জীবন শুধু একজন ডাক্তার হওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ না। জীবনে এরচেয়ে বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে।' কিছুটা দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল।

'ধাঁধায় ফেলা বন্ধ করে বলো আমায়।' ইমামা বলল। 'কথা দিচ্ছি, আমি খারাপ লাগাব না।' নিজের হাত জাভেরিয়ার দিকে বাড়িয়ে দেয় ও।

'কথা দেওয়ার পরও আমার ইচ্ছে শুনে তুমি রেগে যাবে। এরচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা অন্যকিছু নিয়ে কথা বলি।' জাভেরিয়া বলল।

'আচ্ছা, আন্দাজ করি দাঁড়াও। তোমার এই ইচ্ছের সম্পর্ক আমার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছুর সাথে জড়িত, right?' ইমামা ভেবে ভেবে বলে।

জাভেরিয়া মাথা নেড়ে সায় জানায়।

'এখন প্রশ্ন আসে আমার জীবনে কী এমন গুরুত্বপূর্ণ যে...?' কথার মাঝে থেমে যায় ইমামা। 'কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ইচ্ছের ধরন কী তা জানতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আন্দাজও করতে পারব না। বলো না জাভেরিয়া, please! আমার ভেতর এখন অনেক উশখুশ করছে।' অনুরোধ করে ও।

জাভেরিয়া কিছুক্ষণ ভাবল। ইমামা মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণের নীরবতার পর জাভেরিয়া মাথা তুলে তাকায়।

'প্রফেশনের বাইরে এই মুহূর্তে আমার জীবনে শুধু একটা বিষয়ের গুরুত্ব আছে। তুমি যদি এই প্রসঙ্গেও কিছু বলতে চাও, বলতে পারো। খারাপ লাগবে না আমার।' ইমামা গম্ভীর হয়ে বলল।

জাভেরিয়া চমকে গিয়ে ওর দিকে তাকায়। ইমামা আঙুলে থাকা একটা আংটির দিকে তাকিয়ে আছে। হালকা হাসে। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে এই যে, তুমি...' নিজের ইচ্ছের কথা বলল।

ইমামার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। ও অবাক হয়েছে না ধাক্কা খেয়েছে, জাভেরিয়া আন্দাজ করতে পারল না। কিন্তু চেহারার অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে জাভেরিয়ার মুখ থেকে বের হওয়া কথা অনুমানের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলেছে ওর উপর।

'আমি বলেছিলাম তোমার খারাপ লাগবে।' জাভেরিয়া সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু ইমামা কিছু না বলে শুধু জাভেরিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুয়িজ ব্যথায় দুই হাতে পেট চেপে ধরে গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বারো বছরের ছেলেটা ছেঁড়া টি-শার্টের হাতায় নাকের গড়িয়ে পড়া রক্ত পরিষ্কার করে হাতে থাকা টেনিস র‍্যাকেটটা আবারও পুরো শক্তি লাগিয়ে মুয়িজের পায়ে মারে। মুয়িজের গলা দিয়ে আবার চিৎকার বের হয়। এবার ব্যথায় পুরো সোজা হয়ে যায় ও। কিছুটা অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে নিজের চেয়ে বয়সে দুই বছরের ছোট সেই ভাইটার দিকে তাকায়, যে কোনোরকম জড়তা বা ভয় ছাড়া ওকে সেই র‍্যাকেট দিয়ে মারছে যা কিছুক্ষণ আগে ও ছোট ভাইকে মারতে এনেছিল।

এই সপ্তাহে এটা ওদের মাঝে হওয়া তৃতীয় ঝগড়া। তিনবারই ঝগড়া শুরু করেছে ওর ছোট ভাই। মুয়িজ আর ওর ছোট ভাইয়ের সম্পর্ক কখনো ভালো ছিল না। ছোটবেলা থেকে হওয়া ওদের এই ঝগড়া কিছুদিন আগ পর্যন্ত শুধু মৌখিক কথাবার্তা আর হুমকিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইদানীং হাতাহাতিতে নেমে এসেছে। আজকেও একই ঘটনা ঘটে। দুই ভাই একসাথে স্কুল থেকে ফিরল। গাড়ি থেকে নেমে ওর ছোট ভাই খুব গুমরের সাথে ডিকি থেকে ব্যাগ টানছিল, যখন মুয়িজ নিজের ব্যাগ বের করছিল। ব্যাগ বের করার সময় ছোট ভাই ইচ্ছে করেই ওর হাতে জোরে ঘষা দেয়। যার দরুন মুয়িজ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। 'তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ?'

ছোট ভাই নিঃশব্দে নিজের ব্যাগ তুলে শান্তভাবে ভেতরে যাচ্ছিল। মুয়িজের চিৎকারে একবার ঘুরে তাকিয়ে যথারীতি লাউঞ্জের দরজা খুলে ভেতরে পা বাড়ায়। যা দেখে মুয়িজের শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে। মুয়িজ পেছন পেছন জোর কদমে ভেতরে আসে। 'তুমি আমার সঙ্গে আবার এই ধরনের কাজ

করলে আমি তোমার হাত ভেঙে দেবো।" ছোট ভাইয়ের কাছে এসে গর্জে উঠল।

ছেলেটা কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে দুই হাত কোমরে দিয়ে বলল। 'আমি এমনই করব, তুমি কী করবে? হাত ভাঙবে...এত সাহস আছে তোমার?'

'এটা আমি তোমাকে তখন বোঝাব, যখন তুমি একই কাজ আমার সঙ্গে আবার করবে।' বলে মুয়িজ নিজের রুমের দিকে পা বাড়ায়।

কিন্তু ওর ছোট ভাই পেছন থেকে ব্যাগ টেনে মুয়িজকে থামতে বাধ্য করে। 'না, তুমি এখনই বোঝাও আমায়।'

মুয়িজের ব্যাগ তুলে দূরে ছুঁড়ে মারে ওর ছোট ভাই। যা দেখে মুয়িজের চেহারা লাল হয়ে ওঠে। নিচে পড়ে থাকা ছোট ভাইয়ের ব্যাগ তুলে ও নিজেও অন্যদিকে ছোঁড়ে। ছোট ভাই এক মুহূর্তও দেরি না করে মুয়িজের পায়ে লাথি

দেয়। জবাবে মুয়িজও পুরো শক্তি দিয়ে ছোট ভাইয়ের মুখে ঘুষি মারে। যা গিয়ে ছেলেটার নাকে লাগে। পরের মুহূর্তেই নাক থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে। কিন্তু এত ভয়াবহ আক্রমণের পরও গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হয়নি ছেলেটার। বরং মুয়িজের টাই টেনে গলা চেপে ধরার চেষ্টা করে। জবাবে মুয়িজও ছোট ভাইয়ের শাটের কলার ধরে টান দেয়। যার ফলে ছেলেটার শাট ছিড়ে যাওয়ার শব্দ আসে। এই ফাঁকে পুরো শক্তি দিয়ে পেটে ঘুষি মারলে ছেলেটার হাত থেকে মুয়িজের টাই ছুটে যায়।

'দাঁড়াও! এখন আমি তোমাকে হাত ভেঙে দেখাচ্ছি তোমার।' বকবক করতে করতে লাউঞ্জের এক কোণায় পড়ে থাকা একটা র্যাকেট নিয়ে আসে। ওটা দিয়ে ছোট ভাইকে মারার চেষ্টা করলেও পরক্ষণে র্যাকেটটা ওর ছোট ভাইয়ের হাতে চলে যায়। ছেলেটা এত দ্রুত হাত ঘুরিয়ে র্যাকেটটা ওর পেটে মারে যে, মুয়িজ নিজেকে সামলানোর বা বাঁচানোর সুযোগও পায়নি। আর এখন এক এক করে ওর কোমরে,

পায়ে সেই র‍্যাকেট দিয়ে মারছিল। এসব কোলাহল শুনে ভেতর থেকে ওদের বড় ভাই রেগে লাউঞ্জে বেরিয়ে আসে।

'কী সমস্যা তোমাদের? বাড়িতে এসেই হাঙ্গামা শুরু করে দাও....!'

বড় ভাইকে দেখে ছেলেটা মারা বন্ধ করে র‍্যাকেট নিচে নামিয়ে ফেলে।

'আর তুমি? লজ্জা করে না তোমার বড় ভাইকে মারতে?'
চোখ ছেলেটার হাতের র‍্যাকেটের দিকে।

'না, করে না।' ভীষণ গোঁয়ারতুমি সঙ্গে উত্তর দেয় ছেলেটা।
এরপর হাতে থাকা র‍্যাকেটটা একপাশে ছুঁড়ে খুব নিশ্চিত
ভঙ্গিতে দূরে পড়ে থাকা নিজের স্কুল ব্যাগ তুলে ভেতরের
দিকে পা বাড়ায়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকা ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুয়িজ উঁচু আওয়াজে বলল। 'তোমায় এর ফল ভোগ করতে হবে।' ব্যথায় এখনো পা ঘষছে ও।

'Sure, why not!' এক অদ্ভুত হাসি দিয়ে ছেলেটা শেষের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলল। 'এক কাজ করবে, পরেরবার ব্যাট নিয়ে আসবো। টেনিস র‍্যাকেট দিয়ে মেরে তেমন মজা পাইনি। তোমার একটা হাড়ও ভাঙেনি।'

মুয়িজ আবার জ্বলে উঠে বলল। 'নিজের নাক সামলাও তুমি। ওটা নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে।'

ছেলেটা চলে যায়। মুয়িজ জ্বলন্ত চোখে সিঁড়ির সেই অংশের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে একটু আগে ওর ছোট ভাই দাঁড়িয়ে ছিল।

দ্বিতীয় সারির প্রথম চেয়ারে জানালার পাশে বসে থাকা ছেলেটাকে মিসেস সামান্থা রিচার্ডস এই নিয়ে চতুর্থবার লক্ষ্য করলেন। যে তখনো খুব উদাসীন ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। মাঝেমধ্যে ছেলেটা চোখ ফিরিয়ে একনজর মিসেস সামান্থাকে দেখে, এরপর আবার একইভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইসলামাবাদের একটা আন্তর্জাতিক স্কুলে মিসেস সামান্থা আজ প্রথমদিন এই ক্লাসের বায়োলজি পড়াতে এসেছেন। তিনি একজন ডিপ্লোম্যাটের স্ত্রী। কিছুদিন আগে স্বামীর সঙ্গে ইসলামাবাদ এসেছেন। টিচিং তার প্রফেশন। যেসব দেশে তার স্বামীর পোস্টিং হয়, সেখানকার দূতাবাসের সাথে সংযুক্ত স্কুলগুলোয় পড়ান তিনি।

এর আগের বায়োলজি পড়ানো শিক্ষিকা মিসেস মেরিনের স্কিম অফ ওয়ার্ক অব্যাহত রেখে ক্লাসের সাথে প্রাথমিক পরিচয় শেষ করে তিনি রাইটিং বোর্ডে হৃৎপিণ্ডের কাজ ও সঞ্চালন ব্যবস্থার ডায়াগ্রাম এঁকে তা বোঝানো শুরু করেন। ডায়াগ্রাম ব্যাখ্যা করার সময় তিনি ছেলেটাকে বাইরে

তাকিয়ে থাকতে দেখলেন। ফলে পুরনো টেকনিক অবলম্বন করে ওর দিকে চাহনি স্থির করে বলা বন্ধ করে দেন। ক্লাসজুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। টের পেয়ে ছেলেটা মাথা ঘুরিয়ে ভেতরে তাকায়। মিসেস সামান্ধার সাথে ওর চোখাচোখি হয়। একটু হেসে তিনি আবার লেকচার শুরু করেন। কিছুক্ষণ পড়ানোর ফাঁকেও ছেলেটার ওপর চোখ রাখলেন তিনি। ছেলেটা এখন সামনে থাকা নোটবুকে কিছু লেখায় ব্যস্ত। মিসেস সামান্ধা ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে পুরো ক্লাসের ওপর মনোযোগ দেন। ভেবেছিলেন যথেষ্ট বিরত হয়েছে ও আর বাইরে তাকাবে না। কিন্তু মাত্র দুই মিনিট পরই আবার ওকে জানালার বাইরে মনোযোগী পান তিনি। বলতে বলতে থেমে যান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকায়। এবার মিসেস সামান্ধা হাসলেন না, বরং গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর আবার রাইটিং বোর্ড থেকে চোখ সরিয়ে দেখলেন ছেলেটা একইভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। এবার না চাইতেও তার চেহারায় কিছুটা রাগ ফুটে উঠল। বিরক্ত হয়ে চুপ করে যান তিনি। তার চুপ হয়ে যাওয়া

টের পেয়ে ছেলেটা জানালা থেকে চোখ সরিয়ে ভেতরে
তাকায়। ওর কপালেও এবার কিছু বিরক্তির ভাঁজ ছিল।
একনজর আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিজস্ব গতিতে
আবার বাইরে তাকায়। ওর আচরণ এত অসম্মানজনক ছিল
যে, মিসেস সামান্সার চেহারা লাল হয়ে ওঠে।
'সালার! কী দেখছ তুমি?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'Nothing...' এক শব্দের উত্তর। ছেলেটাও তীক্ষ্ণ চোখে
তাকায়।

'তুমি জানো আমি কী পড়াচ্ছি?'

'Hope so...' ভীষণ রূঢ়ভাবে বলল।

মিসেস সামান্সা হাতে থাকা মার্কারের ক্যাপ বন্ধ করে টেবিলে
ছুঁড়ে মারলেন। 'যদি তাই হয়, এখানে এসে ডায়াগ্রাম এঁকে
লেভেল করো।' স্পঞ্জ দিয়ে রাইটিং বোর্ড পরিষ্কার করতে
করতে বললেন তিনি।

ছেলেটার মুখ দেখে ভেতরের মনোভাব বোঝা যাচ্ছিল না। মিসেস সামান্সা ক্লাসে থাকা স্টুডেন্টদেরকে নিজেদের মাঝে দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখেন। ও শীতল চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। যখন তিনি রাইটিং বোর্ডে থাকা শেষ অংশটুকু মুছে ফেললেন, এক ঝটকায় নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ও। দ্রুত গিয়ে টেবিলে পড়ে থাকা মার্কার তুলে বিদ্যুৎ গতিতে ডায়াগ্রাম আঁকা শুরু করে। পুরো দুই মিনিট সাতান্ন সেকেন্ড পর ক্যাপ বন্ধ করে ও মার্কারটা ঠিক সেভাবে টেবিলের উপর ছোঁড়ে, যেমনটা মিসেস সামান্সা করেছিলেন এবং তার দিকে না তাকিয়েই নিজের চেয়ারে এসে বসে। মিসেস রিচার্ডস ওর মার্কার ছোঁড়া বা চেয়ারের দিকে চলে যাওয়ার কিছুই দেখলেন না। তিনি শুধু অবিশ্বাস্য চোখে রাইটিং বোর্ডে তিন মিনিটের চেয়েও কম সময়ে আঁকা সেই লেভেল ডায়াগ্রামটি দেখছিলেন, যা আঁকতে তার দশ মিনিট লেগেছিল। অথচ এটা তার ডায়াগ্রামের তুলনায় অনেক ভালো। কোথাও ছোট কোনো ভুলও খুঁজে বের করতে পারলেন না তিনি। তাই কিছুটা বিব্রত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে

ছেলেটার দিকে তাকান, ঠিক আবারও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল ও।

ওয়াসিম এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো দরজায় নক করে। এবার ভেতর থেমে ইমামার গলা শোনা যায়। 'কে?'

'ইমামা আমি, দরজা খোলো।' ওয়াসিম দরজা থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

ভেতরে নীরবতা নেমে আসে। এর কিছুক্ষণ পর দরজার লক খোলার শব্দ হয়। ওয়াসিম হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খোলে। ইমামা ভাইয়ের দিকে পিঠ করে বিছানার দিকে আগায়। 'এই সময়ে আমার কাছে কী তোমার?'

'এত তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করলে যে? মাত্র দশটা বাজছে এখন।' ওয়াসিম রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে।

'ঘুম পাচ্ছিল আমার, ব্যস।' ইমামা বিছানায় বসল।

বোনের চেহারা দেখে চমকে ওঠে ওয়াসিম। 'তুমি কাঁদছিলে?' ওর মুখ থেকে ছুট করেই বেরিয়ে আসে।

ইমামার চোখ লাল ও ফোলা। ভাইয়ের কাছ থেকে এটাই লুকানোর চেষ্টায় ছিল। 'কাঁদিনি, একটু মাথাব্যথা করছে।' হাসতে চেষ্টা করল ও।

ওয়াসিম পাশে বসে হাত ধরে টেম্পারেচার চেক করে। 'দেখি জ্বর আসেনি তো আবার...?' কিন্তু একটু পর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল। 'না জ্বর আসেনি। ট্যাবলেট নিয়ে দেখতে।'

'নিয়েছি।'

'আচ্ছা, ঘুমাও তাহলে। আমি কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু এই অবস্থায় তোমার সাথে কী বলব...?' ওয়াসিম বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

ভাইকে আটকানোর চেষ্টা করল না ও। বরং পেছন পেছন এসে ওয়াসিম বাইরে বের হতেই দরজা লক করে নিলো। এরপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আবারও বালিশে মুখ গুঁজে হেঁচকি তুলে কাঁদতে থাকে।

তেরো বছরের ছেলেটা তখন টিভিতে মিউজিক শো দেখায় মগ্ন ছিল। তায়িবা সিকান্দার ভেতরে উঁকি দিয়ে অবিশ্বাস্য চোখে ছেলেকে দেখে কিছুটা রাগ নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। 'এখানে কী হচ্ছে?' ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'টিভি দেখছি।' ছেলেটার চোখ টিভি থেকে সরেনি।

'টিভি দেখছ, ফর গড সেক! কোনো খেয়াল আছে তোমার যে পরীক্ষা চলছে?' ছেলের সামনে এসে বললেন তিনি।

'So, what?' ছেলেটা বিরক্ত হয়ে বলল।

'So, what!' এখন রুমে বইয়ের মাঝে থাকার কথা তোমার, এই বেহুদা টিভি শো-এর সামনে না।' তিনি ধমকে উঠলেন।

'আমার যতটুকু পড়ার আমি তা পড়েছি, আপনি এখন সামনে থেকে সরুন।' ছেলেটার কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

'তারপরও উঠে ভেতরে গিয়ে পড়তে বসো।' তিনি টিভির সামনে থেকে নড়লেন না।

'না আমি এখান থেকে উঠব, না ভেতরে গিয়ে পড়ব। আমার ষ্টাডি-এক্সাম আমার মাথাব্যথা, আপনার না।'

'যদি পড়াশোনা নিয়ে তোমার এতই মাথাব্যথা থাকত, তাহলে এখন তুমি এখানে বসে থাকতে?'

'Step aside.' ছেলেটা মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে ভীষণ অভদ্রভাবে হাতের ইশারায় বলল।

'তোমার বাবা এলে তার সাথে কথা বলব আমি।' তিনি হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'এখনই কথা বলুন, কী হবে? পাপা কী করবে? যখন বলছি যে, যতটুকু প্রস্তুতি নেওয়ার আমি তা নিয়েছি, তাহলে আপনার সমস্যাটা কোথায়?'

'এটা তোমার বার্ষিক পরীক্ষা, খেয়াল রাখা উচিত এই বিষয়ে।' তিনি হঠাৎ গলার সুর নরম করে বললেন।

'আমি দু-চার বছরের কোনো বাচ্চা নই যে, আমার আগে-পিছে দৌড়াতে হবে আপনাকে। নিজের বিষয়ে আপনার চেয়ে ভালো বুঝি আমি। তাই এসব থার্ড ক্লাস টাইপের কথা আমার সাথে বলবেন না। এক্সাম চলছে... স্টাডিতে মন দাও... এখন তোমার রুমে থাকা উচিত।'

'আমি তোমার বাবার সাথেই কথা বলব আজকে।'

"What rubbish!" ছেলেটা সোফা ছেড়ে দাঁড়াল। ওর হাতে থাকা রিমোটটা সামনের দেয়ালে ছুঁড়ে মেরে সশব্দে পা ফেলে রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

তায়িবা সিকান্দার কিছুটা অসহায়বোধ, কিছুটা আতঙ্ক নিয়ে ছেলেকে রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়া দেখলেন।

ফ্লোমিনা ফ্রান্স হাতে থাকা প্যাকেটটা টেবিলের উপর রেখে হলের চারদিকে নজর দেন। পরীক্ষা শুরু হতে দশ মিনিট বাকি। হলে উপস্থিত স্টুডেন্ট'স বই ও নোটবুকের পাতাগুলো তাড়াহুড়ো করে শেষবার দেখে নিচ্ছে। বাচ্চাদের এমন আচরণে ওদের ভেতরের অস্থিরতা স্পষ্ট জানান দেয়। তার জন্য এটা তো অতি পরিচিত দৃশ্য। এরপর

তার চোখ যায় হলের মাঝখানে বসে থাকা সালারের দিকে। পাঁচিশজন স্টুডেন্টের মধ্যে ও সেই একমাত্র স্টুডেন্ট, যে কিনা নিজের সিটে পায়ের উপর পা রেখে আরাম করে বসে আছে। ওর এক হাতে থাকা স্কেল দিয়ে আঙুড়ে আঙুড়ে জুতার উপর বাড়ি মেরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ফ্লোমিনা ফ্রান্সের জন্য এই দৃশ্যও নতুন না। নিজের সাত বছরের ক্যারিয়ারে পরীক্ষার হলে তিনি সবসময় সালারকে ঠিক এমন গা-ছাড়া ও অমনযোগী ভাব প্রকাশ করতে দেখে আসছেন।

নয়টা দুই মিনিটে তিনি সালারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওকে এমসিকিউ পেপার দিয়ে যান। তিরিশ মিনিট পর এই পেপার জমা নেওয়া হবে। কিন্তু নয়টা দশে ওকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখলেন তিনি। কারো দাঁড়ানো টের পেয়ে সব স্টুডেন্ট মাথা তুলে তাকায়। পেপার হাতে নিয়ে সালার এগিয়ে আসে। তার জন্য এই দৃশ্যও অতি পরিচিত। শুরু থেকেই এমনটা দেখে আসছেন। তিরিশ মিনিটে সলভ করা পেপার সালার আট মিনিটে সলভ করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'পেপার আরেকবার দেখে নাও।' অন্য সবার

ক্ষেত্রে বলা এই বাক্য তিনি ওকে বললেন না। কারণ উত্তর কী আসবে জানা তার। 'আমি দেখেছি।' এরপরও জোর করা হলে পেপার নিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলে রেখে দুই হাত বুকে ভাঁজ করে বসে থাকবে। তিনি মনে করতে পারলেন না সালার কখনো তার কথায় দ্বিতীয়বার পেপার চেক করেছে কিনা। তাছাড়া তিনি স্বীকার করেন এর প্রয়োজনও নেই। ওর পেপারে অল্পসল্প ভুল খুঁজে বের করাও কঠিন কাজ। তাই মুচকি হেসে পেপার জমা নিয়ে নিলেন। 'তুমি জানো সালার! আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া কী?' পেপারের দিকে তাকিয়ে বললেন। 'তিরিশ মিনিটের এই পেপার তোমাকে ঠিক তিরিশ মিনিট পর সাবমিট করতে দেখা।'

তার কথায় সালার হালকা হাসে। 'আপনার এই আশা তখন পূরণ হতে পারে ম্যাম, যদি আমি একশ পঞ্চাশ বছর বয়সে এই পেপার সলভ করতে বসি।'

'না, আমার মনে হয় একশ পঞ্চাশ বছর বয়সে তোমার খুব বেশি হলে এই পেপার সলভ করতে দশ মিনিট লাগতে পারে।'

এবার গাঢ় হেসে সালার নিজের সিটে ফিরে যায়। ফ্লোমিনা ফ্রান্স ওর পেপার উল্টে-পাল্টে দেখলেন। যদিও এই পেপারে কত নম্বর পাবে ও তা বোঝার জন্য তার একনজরই যথেষ্ট ছিল... 'জিরো।'

সালমা মুবীন মেয়ের হাতের গিফট পেপারে মোড়ানো প্যাকেটের দিকে অবাক হয়ে তাকান। 'এটা কী ইমামা? তুমি তো মার্কেটে গেলে কিছু বই কেনার জন্য।'

'হ্যাঁ আমি, বই কিনতেই গেছি কিন্তু উপহার দেওয়ার জন্য।'

'কার জন্য উপহার?'

'লাহোরে আমার এক ফ্রেন্ড আছে, ওর জন্মদিন। ওকে দেওয়ার জন্য কিনেছি। কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো। আমি তো এখন কিছুদিন এখানেই থাকব।'

'তাহলে প্যাকেট আমাকে দাও, ওয়াসিমকে দিলে পাঠিয়ে দেবো।'

'না আম্মি! এখনই পাঠাব না। ওর জন্মদিনের তারিখ এখনো আসেনি।'

সালমা মুবীনের মনে হলো তার মেয়ে কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। অবাক হয়ে ভাবলেন এটা কি ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কিছু ছিল? তিন বছর আগে এই মেয়ে নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল তাকে এবং তার স্বামীকে। মেয়েকে নিয়ে তখন দিন-রাত দুশ্চিন্তায় থাকতেন তারা। বিশেষ করে হাশিম মুবীন তার চেয়েও বেশি। কিন্তু গত তিন বছরে সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন মেয়েকে নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত তারা। বিশেষ করে

আসজাদের সাথে ওর সম্বন্ধ ঠিক করে রাখার পর থেকে। জানতেন ইমামা আসজাদকে পছন্দ করে। শুধু ইমামা না, আসজাদকে সবাই পছন্দ করে। সবদিক থেকে ভালো একটা ছেলে। এটাও জানতেন যে, আসজাদের সাথে সম্বন্ধ পাকা হওয়ায় মেয়ে অনেক খুশি হয়েছে। কারণ আসজাদ ও ইমামার মাঝে আগে থেকেই ভালো একটা বন্ধুত্ব ছিল।

কিন্তু ইদানীং তার মনে হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে ইমামা খুব চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। আগে এমন ছিল না ও। 'কিন্তু এখন তো আর স্কুলে যাওয়া বাচ্চা নেই, মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট। সময়ই-বা কই ওর হাতে?' এইসব বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখেন তিনি। ইমামা তার ছোট মেয়ে। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক ছেলেকেও বিয়ে করিয়ে ফেলেছেন। এখন শুধু তার দুই ছেলে আর ইমামা অবিবাহিত। 'ভালোই হয়েছে মেয়েটা দিন দিন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের জন্য গাম্ভীর্য সুন্দর ব্যাপার। যত তাড়াতাড়ি নিজের দায়িত্ব বুঝে নেয় ততই ভালো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়ের উপর থেকে

চোখ সরিয়ে নিলেন। ইমামা ছুটিতে বাড়ি এসেছে। আর যতদিন এখানে থাকবে, তার নজর ওর উপরই স্থির থাকবে।

'এই সাজিদটা কই গেল? ওকে কোনো কাজ দেওয়া মানে ধরে নাও তা আর হচ্ছে না।' কাজের ছেলের কথা মনে পড়ে তার। যার খোঁজেই এখানে এসেছিল। বিড়বিড় করতে করতে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেলেন সালমা মুবীন।

এটা নিউ ইয়ার নাইট ছিল। নতুন বছর শুরু হতে তিরিশ মিনিটের মতো বাকি। গত দুই ঘন্টা ধরে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সী দশজন ছেলের একটা গ্রুপ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মোটর সাইকেলে চড়ে চড়ে নিজেদের কর্তব্য পালনে ব্যস্ত। ওদের কাজনার কপালে চকচকে ব্যান্ড বাঁধা। যার উপরে নতুন বছরকে ঘিরে লেখা নানান বার্তা। ঘন্টাখানেক আগে পশ এলাকার এক সুপার মার্কেটে ছিল। সেখানে যে যার মতো গলা ছেড়ে স্লোগান তুলেছে, বাইক স্টান্ট করেছে।

ওদের কাছে ফায়ার ক্র্যাকার'স আছে, যা সময়ে-অসময়ে ফাটাচ্ছিল। পৌনে বারোটোর দিকে ওরা জিমখানা ক্লাবের সামনে এসে পৌঁছায়। পার্কিং লট গাড়িতে ভরা। এগুলো সব তাদের গাড়ি, যারা জিমখানায় নতুন বছর উপলক্ষ্যে আয়োজন করা পাটিতে এসেছে। এই ছেলেগুলোর কাছেও আয়োজিত পাটির ইনভাইটেশন কার্ড ছিল। কারণ এদের প্রায় সবার বাবা-মায়েরাই এখানের সদস্য।

ওরা যখন ভেতরে ঢোকে তখন ঘড়িতে এগারোটা পঞ্চাশ বাজছে। কয়েক মিনিটে ডান্স ফ্লোরসহ বাকি সব জায়গার লাইট অফ করে দিয়ে বাইরের লনে আতশবাজি ফুটিয়ে নতুন বছরকে বরণ করা হবে। এরপর আবার লাইট অন করে তখন থেকে সারা রাতই এখানে নাচ-গান ও ড্রিংক'স চলবে। জিমখানা কর্তৃপক্ষ নতুন বছর উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে এই আয়োজনের বন্দোবস্ত করে। লাইট অফ হতেই বেহায়াপনার এক বিশাল তাণ্ডব চলে। উপস্থিত মানুষরা সেই বেহায়াপনার জন্যই এখানে আসে।

গ্রুপের সঙ্গে আসা পনেরো বছরের ছেলেটাও তখন ডান্স ফ্লোরে রক বিটে ডান্স করছিল। ডান্সে যার দক্ষতা চোখে পড়ার মতো ছিল। বারোটা বাজার দশ সেকেন্ড বাকি থাকতে লাইট অফ করে দেওয়া হয়। ঠিক বারোটায় আবার তা অন হয়। অন্ধকারে সেকেন্ড গুনতে থাকা মানুষজনের গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে চিৎকার, উচ্ছ্বাস আর হাসি। কয়েক সেকেন্ড আগে বন্ধ করে রাখা মিউজিক আবার চালু করা হয়। সেই ছেলেটা বন্ধুদের সাথে বাইরের পার্কিং লটে চলে আসে। যেখানে অন্য ছেলেরা নিজেদের গাড়ির হর্ন বাজিয়ে উল্লাস করছিল। সেসব ছেলেদের সাথে তাল মিলিয়ে ও বিয়ারের একটা ক্যান নিয়ে গাড়ির ছাদে ওঠে। উপরে উঠে জ্যাকেটের পকেট থেকে আরেকটা বিয়ারের ভরা ক্যান বের করে সেটা পুরো জোশের সাথে দূরে থাকা এক গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে ছুঁড়ে মারে। বিশাল এক আওয়াজের সাথে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। যা দেখতে দেখতে বেশ শান্ত ভঙ্গিতে বাঁ-হাতে থাকা ক্যানে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছিল ও।

সালার গত আধা ঘন্টা ধরে বড় ভাই কামরানকে ভিডিও গেইম খেলতে দেখছে। যদিও স্ক্রিনে দেখানো স্কোরের তেমন পরিবর্তন চোখে পড়ছিল না। এর কারণ হয়তো গেইমের সেই কঠিন ট্র্যাক, যার ওপর কামরান গাড়ি ব্যালেন্স করতে পারছে না। লাউঞ্জের সোফায় বসে নোটবুকে লেখায় মগ্ন ছিল ও। তবে মাঝেমধ্যে চোখ তুলে স্ক্রিনের দিকেও তাকায়। যেখানে কামরান নিজের সংগ্রামে ব্যস্ত। আধা ঘন্টা পর নোটবুক বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে মুখে হাত দিয়ে হাই আটকাল। দুই পা টেবিলে তুলে দুই হাতের আঙুলগুলো এক করে মাথার পেছনে নিয়ে ও কিছুক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল। কামরান ততক্ষণে আগের সব চান্স মিস করে নতুন গেইম শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'কী প্রবলেম কামরান?' বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করল সালার।

'কিছু না, নতুন গেইম এনেছি। কিন্তু স্কোর করা কঠিন লাগছে।' কামরান অখুশি নিয়ে বলে।

'আচ্ছা আমাকে দাও দেখি।' সোফা থেকে উঠে রিমোট কন্ট্রোল ভাইয়ের হাত থেকে টেনে নিজের হাতে নেয় সালার।

প্রথম বিশ সেকেন্ডেই সালার যে স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল, কামরান এখন পর্যন্ত এর ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। যে ট্রাক তার অনেক কঠিন লাগছিল, ওর সামনে তা বাচ্চাদের খেলা মনে হচ্ছে। এক মিনিট পর যে স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল ও, তাতে স্ক্রিনে চোখ রাখাও কামরানের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ সেই স্পিডেও গাড়িকে পুরো কন্ট্রোলে রেখেছিল ও। তিন মিনিট পর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক থেকে পড়ে ব্লাস্ট হয়। কামরান মুচকি হেসে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকায় গাড়ি ব্লাস্ট হওয়ার কারণ জানতে। রিমোট এখন সালারের হাতের বদলে টেবিলের উপর পড়া। নিজের নোটবুক হাতে নিয়ে দাঁড়াচ্ছে ও। কামরান মাথা তুলে ওর দিকে তাকায়।

'ভীষণ বোরিং একটা গেইম!' বলে বড় ভাইয়ের পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে যায় সালার। কামরান ঠোঁট কামড়ে সাত অঙ্কের সেই স্কোর দেখছিল, যা স্ক্রিনের এক কোণায় জ্বলজ্বল করছে। কিছুটা বিস্ময়ের ভঙ্গিতে ওর বেরিয়ে যাওয়া দরজার দিকে তাকায় কামরান।

দু'জন আবার নীরব হয়ে বসে ছিল। আসজাদের ভেতরে অস্থিরতা কাজ করছে। ইমামা এতটা চুপচাপ না, যতটা তার সামনে এলে হয়ে যায়। গত আধা ঘন্টায় ও যতটুকু কথা বলেছে, তা হাতে গোনা যাবে। ওকে সেই ছোটবেলা থেকে চেনে আসজাদ। ভীষণ হাসিখুশি স্বভাবের একটা মেয়ে। ওদের সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার প্রথম বছরগুলোয়ও কোনো পরিবর্তন ছিল না ওর মাঝে। ওর সাথে কথা বলতে ভালো লাগত আসজাদের। কারণ কথা বলায় বেশ চটপটে ছিল ইমামা। কিন্তু গত কয়েক বছরে হঠাৎ বদলে গেছে ও। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজে যাওয়ার পর এই পরিবর্তন আরও বেশি নজরে আসার মতো। আসজাদের কখনো কখনো মনে হয় ইমামা তার সঙ্গে কথা বলার সময় অতি সতর্ক থাকে।

কখনো ওকে বিমূঢ় লাগে। কখনো-বা ওর কণ্ঠে অদ্ভুত শীতলতা টের পাওয়া যায়। সে অনুভব করে ও যত দ্রুত সম্ভব তার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে উঠে চলে যেতে চায়। ঠিক আজকেও এটাই মনে হচ্ছিল। 'অনেকবার মনে হয় তোমার সাথে দেখা করার নিয়ে আমি অযথা তাড়াহুড়ো করি। আমার আসা, না-আসা নিয়ে তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেই ফেলল।

আসজাদের বিপরীত চেয়ারে বসা ইমামা বাউন্ডারির ওয়ালে বেয়ে ওঠা লতার দিকে তাকিয়ে ছিল। অভিযোগে ঘাড় না ঘুরিয়েই লতার উপর থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে চাহনি স্থির করে ও। আসজাদ প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু উত্তর না পেয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার একই প্রশ্ন করে। 'আমি না এলে তোমার কিছুই যায়-আসে না, ঠিক না ইমামা?'

'এর উত্তরে আমার কী বলা উচিত?'

‘অন্তত না বলতে পারো। আমার অভিযোগ মিথ্যে বলতে পারো। বলতে পারো এমন কিছু না, আমি ভুল ভাবছি...।’

‘এমন কিছু না, আপনি ভুল ভাবছেন।’ ইমামা তাকে থামিয়ে বলে। ওর কথার ধরন ভীষণ শীতল আর চেহারা ভাবলেশহীন।

আসজাদ একটা ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলে। ‘হ্যাঁ! আমারও দোয়া এমনকিছু যেন না হয় এবং আমি সত্যিই ভুল ভাবছি। কিন্তু তোমার সাথে কথা বলতে গেলে প্রতিবার এমনটাই অনুভব করি।’

‘কী কারণে আপনি এমন অনুভব করেন?’

ইমামার আওয়াজে এই প্রথম আসজাদ কিছুটা রাগের আভাস পায়। ‘অনেক কারণে। তুমি ঠিকমতো আমার কথার উত্তর দাও না।’

'যদিও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি আপনার কথার সেরা উত্তর দেওয়ার, তবু আমার উত্তর আপনার পছন্দ না হলে বলুন কী করা যেতে পারে'

আসজাদের এবার ওকে আরেকটু বেশি রাগী মনে হলো।
'কখন বললাম তোমার উত্তর আমার পছন্দ হয় না! শুধু বলছি যা-ই জিজ্ঞেস করি, সবকিছুর উত্তরে তোমার কাছে হ্যাঁ বা না ছাড়া কিছু থাকে না। প্রায় মনে হয় নিজের সঙ্গেই কথা বলছি আমি।'

'যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঠিক আছো? এর উত্তর আমি হ্যাঁ বা না দিয়েই দেবো। হ্যাঁ বা না-এর বাইরে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো কোনো বক্তৃতা থাকলে আমাকে তা শিখিয়ে দিয়ে যাবেন। এরপর থেকে সেটাই ব্যবহার করব।' ইমামা গম্ভীর ছিল।

'হ্যাঁ বা না-এর সাথেও তো কিছু বলা যায়। আর কিছু না হোক, আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করতে পারো।'

'আপনার কোন অবস্থা জিজ্ঞেস করব? যেহেতু আমার বাড়িতে এসে, আমার সামনে বসে, আমার সাথে কথা বলছেন; এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় আপনি ঠিক আছেন। নাহলে এই সময় আপনাকে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে হতো।'

'এগুলো ফরমালিটি, ইমামা!'

'আপনি জানেন না আমি ফরমালিটিতে বিশ্বাসী না? আমার অবস্থাও আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, আমি তাতে মোটেও মাইন্ড করব না।'

আসজাদ বোবা হয়ে গেল। 'আচ্ছা, এসব ফরমালিটি ছাডো। অন্যকিছুও তো বলা যায়। মানুষ একসাথে কতকিছু ডিসকাস করে। আর নাহলে নিজের ব্যস্ততা নিয়েই কিছু বলতে পারো।'

'আসজাদ, আপনার সাথে আমি কী নিয়ে ডিসকাস করব? আপনি বিজনেস করেন আর আমি মেডিকেল স্টুডেন্ট। আমি কি আপনাকে স্টক মার্কেটের position, bullish & bearish ট্রেন্ড কেমন বা ইনডেক্সে কত পয়েন্ট বেড়েছে বা পরবর্তী চালান কোথায় পাঠাচ্ছেন, এসব জিজ্ঞেস করব? এইবার সরকার আপনায় কত রিবেট দিয়েছে তা জানতে চাইব?' ইমামার কণ্ঠ শীতল। 'নাকি আপনার সঙ্গে আমি এনাটমি ডিসকাস করব? কী-কী মানুষের লিভারে প্রভাব ফেলে, বাইপাস সার্জারিতে এ বছর নতুন কোন টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো বলব? হার্টবিট সচল করার জন্য কত থেকে কত পর্যন্ত ইলেক্ট্রিক ভোল্টের শক দেওয়া হয়, তা জানাব? তো...এই হচ্ছে আমাদের দুজনের ব্যস্ততা। এসব নিয়ে ডিসকাস করে আপনি-আমি ভালোবাসা আর আন্তরিকতার নতুন কোন গন্তব্য তৈরি করে ফেলব, তা আমার বুকের বাইরে।'

আসজাদের চেহারা লাল হয়ে ওঠে। মনে মনে নিজেকে সেই মুহূর্তের জন্য দোষারোপ করে, যখন ইমামার কাছে

কথা না বলার জন্য অভিযোগ করেছিল। 'এছাড়াও তো মানুষের বহু ব্যস্ততা থাকে।' দুর্বল সুরে বলল সে।

'পড়াশোনার বাইরে আমার কোনো ব্যস্ততা নেই।'

'আগে তো আমরা দুজন একসাথে অনেক কথা বলতাম।'

'আগের কথা ভুলে যান, এখন সময় নষ্ট করা আমি এফোর্ট করতে পারি না। আমি অবাক হচ্ছি, একজন বিজনেসম্যান হয়েও আপনি কীভাবে এত ইমম্যাচিউর ও ইমোশনাল চিন্তা-ভাবনা নিয়ে চলেন? আপনার তো অনেক প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার কথা ছিল।'

আসজাদ কিছু বলতে পারে না।

'আমাদের মাঝে কী সম্পর্ক রয়েছে, সেটা আমরা ভালো করেই জানি। তারপরও যদি আপনি আমার প্র্যাকটিক্যাল এপ্রোচকে আগ্রহের অভাব, অসন্তুষ্টি বা রাগ মনে করেন,

তাহলে কী করা যায়? আপনার সাথে এখানে বসে আছি মানে আমি এই সম্পর্কটাকে গুরুত্ব দেই। নাহলে অপরিচিত কেউ এসে তো আমার সাথে এভাবে চা খেতে পারত না।" একটু থামে ও। 'যতদূর কথা রইল আপনার আসা, না-আসা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা আছে কিনা, তবে সত্যি বলতে আমরা দু'জন খুব ব্যস্ত মানুষ। তাছাড়া আমরা আধুনিক যুগের সৃষ্টি। না আমি হীর, না আপনার রাজার বংশের সাথে কোনো সংযোগ ছিল যে, আমার জন্য আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা বাঁশি বাজাবেন। সত্য এটাই যে, আমরা দেখা করি বা না-করি, কথা বলি বা না-বলি আমাদের সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনই থাকবে। নাকি আপনার মনে হয় এর মাঝে পরিবর্তন আসতে পারে?'

এরপরও আসজাদের কপালে ঘাম না এসে থাকলে এর একমাত্র কারণ ডিসেম্বর মাস চলছিল এখন। ওদের দু'জনের বয়সে আট বছরের ব্যবধান। তবে এই প্রথম আসজাদের কাছে সেই ব্যবধান আঠারো বছরের মনে হচ্ছে। ইমামাকে নিজের চেয়ে আঠারো বছরের বড় লাগছে তার কাছে। অথচ

দুই সপ্তাহ আগে ও মাত্র উনিশে পা রেখেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, ইমামা টিনএজ থেকে সরাসরি মিডেল এজে চলে গেছে, আর সে নিজের প্রি-টিনে ফিরে এসেছে। পায়ের উপর পা রাখা ইমামা স্থির চোখে ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছে। চেয়ারের হাতলের উপর থাকা ওর হাতের আঙুলের বাগদানের আংটিটার দিকে তাকিয়ে আসজাদ কেশে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। 'তুমি ঠিক বলছ। আমি শুধু ডিসকাশনের কথা বলছিলাম, যাতে আমাদের মাঝের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ হয়।'

'আসজাদ! আমি আপনাকে খুব ভালো করে চিনি ও বুঝি। আর এটা জেনে আমার ভীষণ আফসোস হচ্ছে আপনি এখনো ভাবছেন আমাদের মাঝে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের মাঝে বেশ ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং।'

এটা আসজাদের দিন না, তা সে মেনে নেয়।

'তবুও যদি আপনার মনে হয় এনাটমি ও বিজনেস ডিসকাস করলে আমাদের মাঝের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়বে, তাহলে ঠিক আছে এরপর থেকে এইসব নিয়েই কথা হবে।' ইমামার গলায় স্পষ্ট তাক্কিল্যভাব।

'আমার কথা তোমার খারাপ লেগেছে?'

'মোটোও না... আমার কেন খারাপ লাগবে?'

ইমামার কণ্ঠের বিস্ময় আসজাদকে আরও লজ্জায় ফেলে।

'আমি হয়তো ভুল কিছু বলে ফেলেছি।'

'হয়তো নয়... অবশ্যই।' তিন শব্দে একে-একে জোর দিয়ে বলে ইমামা।

'তুমি জানো, এই সম্পর্কটা আমার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ? আমার অনেক স্বপ্ন রয়েছে এই সম্পর্ককে ঘিরে, তোমাকে ঘিরে।' আসজাদ লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল।

ইমামা ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে আবারও সেই লতার দিকে তাকিয়ে আছে।

'হয়তো তাই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সেনসিটিভ হয়ে উঠি। সম্পর্ক নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সম্পর্কটা আমাদের দুজনের সম্মতিতে হয়েছে।' ওর দিকে তাকিয়ে খুব আবেগ নিয়ে বলছিল আসজাদ। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো ইমামা এখানে নেই, তার কথা শুনছে না। অনুভব করে, সে নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

একটি বিশাল বাড়ির পেছনের অ্যানেক্সি থেকে গানের আওয়াজ লনে ভেসে আসছে। বাইরের যে-কেউ অ্যানেক্সিতে থাকা মানুষগুলোর ধৈর্যে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কথা। তবে অ্যানেক্সির ভেতরে থাকা মানুষগুলোর অবস্থা দেখতে পেলে এই ধৈর্যের রহস্য উন্মোচন হয়ে যেত। অ্যানেক্সিতে থাকা ছয়টা ছেলে তখন যে অবস্থায় ছিল, তাতে এরচেয়ে স্পিডে চলা মিউজিকও এদের প্রভাবিত

করতে পারবে না। যতদূর কথা রইল সপ্তম ছেলেটার, তাহলে বলা যায় এমন কিছুতে তেমন প্রভাবিত হয় না ও।

অ্যানেক্সির রুমটা তখন ধোঁয়া আর উটকো গন্ধে ভরা ছিল। কার্পেটের উপর নামকরা এক রেস্টুরেন্ট থেকে আনানো খাবারের খোলা বক্স, ডিসপোজেবল প্লেট-চামচ পড়ে আছে। খাবারের উচ্ছিষ্ট ও হাড়ি এদিক-সেদিক ফালানো। সফট্ ড্রিংকসের প্লাষ্টিকের খালি বোতলগুলো চারপাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সবশেষে বোতল থেকে গড়িয়ে পড়া কেচাপ কার্পেটের দশা আরও করুণ করে তুলেছিল। ওই সাত ছেলে তখন সেই কার্পেটের উপরেই একে-অপরের থেকে অল্প দূরত্বে বসা। ওদের সামনে থাকা বিয়ারের খালি ক্যানগুলো ভূপে পরিণত হয়েছে। বিনোদনের ধারাবাহিকতা সেখানেই থেমে থাকেনি। কারণ ওরা এখন ড্রাগস নিচ্ছিল। যার ব্যবস্থা ওদের মধ্যে একজন করেছে।

গত দুই মাসে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ওরা এমন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য একত্রিত হয়েছে। তিন দফায় আলাদা

চার ধরনের ড্রাগস ট্রাই করেছে এই ছেলেগুলো। প্রথমবার যে ড্রাগস নিয়েছিল, তা ওদের একজনের বাবার ড্রয়ার থেকে পাওয়া। দ্বিতীয়বার এক ক্লাসমেটের মাধ্যমে ইসলামাবাদের এক ক্লাব থেকে কিনে আনানো। এবার রাওয়ালপিন্ডির ট্রিপে একজন আফগানের কাছ থেকে কেনা ড্রাগস নিচ্ছে। প্রতিবার ওরা ড্রাগসের সাথে অ্যালকোহল মিশিয়ে নেয়। যা জোগাড় ওদের বাঁ-হাতের কাজ। এই মুহূর্তে সেই সাত ছেলের ছয়জনই নেশায় ঝুঁদ। তবে ওদের একজন তখনো কাঁপা-কাঁপা হাতে ড্রাগসের গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করছিল। অন্যদের মধ্যে দুটো ছেলে সিগারেট টানতে টানতে বাকিদের সাথে ভাঙাচোরা আলাপে মশগুল।

কেবল সপ্তম ছেলেটা সম্পূর্ণ হুঁশে ছিল। ওর চেহারা পিম্পলে ভরা। গলার কালো আঁটসাঁট সুতোয় তিন-চারটা অদ্ভুত ধরনের তামার লকেট ঝুলছে। পরনে এলভিস প্রিন্সলি স্টাইলের কলারের চেক ডার্কব্লু শার্টের সাথে একটা ধূসর রঙের জিন্স। জিন্সের দুই হাঁটুতে ম্যাডোনার মুখ আঁকা। চোখ খুলে ডানে থাকা বন্ধুদের দিকে একনজর তাকাল। ওর

চোখও লাল। তবে বাকিদের মতো নেশায় বুঁদ মনে হয় না ওকে। কয়েক মিনিট বাকিদের দেখে সোজা হয়ে বসে বক্সে থাকা বাকি ড্রাগসটুকু একটা কোণে ঢেলে নিলো ও। এরপর ছোট একটা স্ট্রো দিয়ে শুঁকতে লাগে তা। কিছুক্ষণ পর স্ট্রো একদিকে ফেলে দিয়ে হাতের তালুতে একটু ড্রাগস নিয়ে কিছুটা উৎসাহী ও কৌতূহলী হয়ে, তবে পুরো সতর্ক থেকে তা টেষ্ট করল। কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্যুতের গতিতে বামদিকে থুতু ফেলে ও। সন্দেহ নেই ড্রাগস খুব ভালো কোয়ালিটির ছিল। কারণ ওর চোখ আগের চেয়ে বেশি লাল হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো নিয়ন্ত্রণ হারায়নি ও। চেহারার অভিব্যক্তি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, নিজের এই অ্যাডভেঞ্চারে খুব বেশি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। দুয়েক মিনিট পর কার্পেটের উপর পড়ে থাকা একটা বিয়ারের ক্যান তুলে চুমুক দিয়ে গলা থেকে ড্রাগসের স্বাদ পরিষ্কারের চেষ্টা করে ও। ক্যান পাশে রেখে আরও কয়েক মিনিট কোণে থাকা ড্রাগসের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাকিরা তখন নেশায় বুঁদ হয়ে কার্পেটের উপর উল্টে-পাল্টে পড়ে আছে।

কিন্তু তখনো আগের মতোই বসে বসে ক্যানে চুমুক দিচ্ছিল ও। চোখ ফোলা ওর। তবে চোখের উজ্জ্বলতা ইঙ্গিত করে নেশা এখনো পুরোপুরি কাবু করতে পারেনি ওকে। এই নিয়ে তিনবার ওর সঙ্গে একই ব্যাপার ঘটেছে। প্রথম দুইবারও ড্রাগস নেওয়ার পর ঠিক এভাবেই বসেছিল ও। অথচ ওর বন্ধুরা কত অল্পতে নেশায় কাবু হয়ে পড়ে। রাতের শেষ প্রহরে বাকিদের সেভাবে ফেলে রেখে প্রতিবার বাড়ি চলে যায় ও। আজকেও এটাই করার ইচ্ছে। রুমের ভেতরের গন্ধ এই প্রথম বিরক্ত করে ওকে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কোনোরকম সামলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। নিচে ঝুঁকে কাপেট থেকে চাবির রিং, ওয়ালেট আর ক্রেডিট কার্ড তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে স্টেরিও বন্ধ করে দেয়। ফোলা লাল চোখে রুমটাকে আরেকবার দেখে কিছু মনে করার চেষ্টা করে। কিছু মনে না পড়ায় দরজার দিকে আগায়। নিচে বসে জগার্স পরে, ফিতাগুলো গোড়ালিতে পেঁচিয়ে টাইট করে বেঁধে নেয়। এরপর দরজার লক খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

করিডোরের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে অ্যানেক্সির দরজা খুলে বাইরে লনে বের হয় ও। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অনুভব করে নাক থেকে কিছু গড়িয়ে পড়ছে। বাঁ-হাত তুলে উপরের ঠোঁটে রাখতেই আঙুল চিটচিটে হয়ে আসে। অ্যানেক্সির লাইটের আলোয় হাত উঠিয়ে দেখতে পায় আঙুলের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে একটা রুমাল বের করে আঙুল পরিষ্কার করে। নাক থেকে গড়িয়ে পড়া বাকি তাজা রক্তটুকুও মুছে নেয়। অনুভব করে গলায় কিছু আটকে গেছে, তাই কেশে গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এখন। কয়েকটা গভীর শ্বাস নিয়ে কষ্ট উপশমের চেষ্টা করল। ওখানে দাঁড়িয়ে খুতু ফেলল দুই-তিনবার। কিছুটা ধাতস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে আবার নিচে নামতে থাকে। কিন্তু নাকে অদ্ভুত শিহরণ টের পেয়ে থেমে যায়। কিছু একটা নাক থেকে জোরেশোরে বইতে শুরু করেছে। অসহায়ের মতো নিচে ঝুঁকে পড়ে। শ্রোতের গতিতে নাক দিয়ে বেরনো রক্ত সিঁড়িতে ছিটকে পড়ছে। মার্বেল পাথরের উপর গড়িয়ে পড়া তাজা লাল রক্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও।

গলফ ক্লাবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলছে। ষোলো বছরের সালার সিকান্দারও আন্ডার সিক্সটিন ক্যাটাগরিতে সেভেন আন্ডার পার (seven under par) স্কোর নিয়ে প্রথম পজিশনের ট্রফি গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিল। ছেলের নাম ডাকতে শুনে সিকান্দার উসমান তালি বাজাতে থাকেন এবং মনে মনে সেই ট্রফি ক্যাবিনেটের কথা ভাবেন যার মাঝে এই বছরও তাকে কিছু পরিবর্তন করাতে হবে। সালারের অর্জিত শিল্ড আর ট্রফির সংখ্যা এই বছরও আগের বছরগুলোর মতোই। তার সব ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনার দিক থেকে ভালো। কিন্তু সালার সিকান্দার... বাকিদের চেয়ে আলাদা। ট্রফি, শিল্ড আর সাটফিকেটের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ১৫০+ আইকিউ লেভেলসম্পন্ন এই ছেলের মোকাবেলা করা তার অন্য ছেলেমেয়েদের পক্ষে সম্ভবও না। গর্বের সাথে হাততালি দিতে দিতে সিকান্দার উসমান ডানে বসে থাকা স্ত্রীকে ফিসফিসিয়ে বললেন। 'গলফে এটা ওর তেরোতম এবং এই বছরের চতুর্থ ট্রফি।'

'সবকিছুর হিসাব রাখছেন নাকি আজকাল?' তায়িবা সিকান্দার হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

সিকান্দার উসমানের দৃষ্টি প্রধান অতিথির কাছ থেকে ট্রফি নেওয়া ছেলের দিকে। 'শুধু ওর গলফের, কারণ তুমিও জানো।'

তায়িবাও ছেলের দিকে তাকান। সালার নিজের সিটে এসে আশে-পাশের সিটে থাকা পুরস্কার-জয়ীদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।

'I bet! তখন যদি ও প্রফেশনাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলত, এখন ওর হাতে এই ট্রফিই থাকত।' সিকান্দার উসমান গর্বের সাথে দাবি করেন।

স্বামীর দাবিতে তায়িবা সিকান্দার মোটেও অবাক হননি। কারণ সালারকে নিয়ে এটা একজন বাবার বলা আবেগী কোনো কথা না। বরং তাদের ছেলে সত্যিই এত ব্যতিক্রম!

দুই সপ্তাহ আগের কথা, তায়িবা সিকান্দার তার ভাই জুবায়েরের সাথে এই গলফ ক্লাবে এসেছিলেন। ভাই ও ছেলের মাঝে হওয়া আঠারো হোলের সেই ম্যাচের কথা মনে পড়ে যায় তার।

প্রায় রাফে (rough) পড়ে যাওয়া একটা বলকে সালার যেই পরিচ্ছন্নতা ও দক্ষতার সাথে আবার গ্রিনে নিয়ে এসেছিল, তা ওর মামা জুবায়েরকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। তিনি এই প্রথম সালারের সঙ্গে গলফ খেলতে এসেছেন। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' আঠারো হোল শেষ হওয়া পর্যন্ত এই এক বাক্য তিনি কতবার বলেছিলেন, তা কেউ মনে করতে পারবে না। রাফে খেলা শট যদি তাকে বাকরুদ্ধ করে থাকে, তাহলে সালার সিকান্দারের পটার্স (putters) তাকে হতভম্ব করে দেয়। বল হোলের দিকে গড়াতে দেখে ক্লাবের সবার ওপর থেকে নজর সরিয়ে জুবায়ের মনে মনে বোনের ছেলে ও গর্তের মাঝের দূরত্ব মেপে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'সালার সাহেব আজ ভালো খেলছে না।'

জুবাযের পেছনে ফিরে ক্লাবের ক্যাডির দিকে তাকায়। যে গলফ কাট ধরে রেখে সালারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছিল। 'এখন ভালো খেলছে না?' টিটকারির সুরে ক্লাবের ক্যাডিকে বলেন তিনি।

'জি সাহেব! নাহলে বল কখনো রাফে যেত না।' ক্যাডি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দেয়। 'আপনি এখানে আজ প্রথম খেলতে এসেছেন, সালার সাহেব গত তিন বছর ধরে খেলছে। তাই আমি বলতে পারছি অন্যান্য দিনের তুলনায় সে আজ ভালো খেলছে না।' ক্যাডি সালারের ব্যাপারে জুবাযেরের ধারণাকে সমৃদ্ধ করে।

জুবাযের বোনের দিকে তাকান, যে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রসন্নভাবে হাসছিল। 'পরেরবার আমি পুরো প্রস্তুতি নিয়ে আসব। খেলার জায়গাও আমিই নির্বাচন করব।' বোনের সাথে সালারের কাছে যেতে যেতে বললেন তিনি।

'Any time, any place.' তায়িবা সিকান্দার পুরো আত্মবিশ্বাসের সাথে ছেলের হয়ে ভাইয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন।

'আমি এই উইকেন্ডে তোমাকে 'Ta ও da' এর সাথে করাচি ডাকতে চাই।' বোনের ছেলের কাছে এসে মৃদুভাবে বললেন।

সালার হেসে জিজ্ঞেস করে। 'কী জন্য...?'

'আমার বিহাফ (behalf) হয়ে তোমাকে করাচি চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতির সাথে একটা ম্যাচ খেলতে হবে। আমি এবার নির্বাচনে তার কাছে হেরেছি। ও যদি কারো কাছে গলফে হারে তাহলে নিশ্চিত হাটঅ্যাটাক করবে, সেটাও যদি হয় একটা বাচ্চার হাতে! So let's settle the scores.'

তায়িবা সিকান্দার ভাইয়ের কথা শুনে হাসছিলেন। কিন্তু সালারের কপাল কুঁচকে যায়। 'বাচ্চা...?' মামার বলা এই একটা শব্দে আপত্তি ওর। 'আফ্কেল! আমার মনে হয় আগে

আপনার সঙ্গে আমার কালকে আঠারো হালের আরেকটা
ম্যাচ খেলতে হবে।

আসজাদ দরজা খুলে মায়ের রুমে ঢোকে। 'আম্মি, আপনার
সাথে জরুরি কথা ছিল।'

'হ্যাঁ বলো, কী বলবে?' আসজাদের মা ছেলেকে জিজ্ঞেস
করলেন।

আসজাদ সোফায় বসে। 'হাশিম আফ্কেলদের ওদিকে
যাননি?'

'না, কেন বিশেষ কিছু?'

'হ্যাঁ, ইমামা এই উইকেন্ডে এসেছে।'

‘ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যায় যাব। তুমি গেছ?’ শাকিলা হেসে
জিঙেস করলেন।

‘হু, আমি গেছি একবার।’

‘কেমন আছে ইমামা? এবার অনেকদিন পর এলো।’

‘হ্যা... দুইমাস পর।’

শাকিলার কাছে ছেলেকে কিছুটা অস্থির লাগল। ‘কোনো
সমস্যা?’

‘আমি, অনেকদিন ধরে আমার মনে হয় ইমামা বদলে
গেছে।’

‘বদলে গেছে...মানে কী?’

'মানে হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারব না। কিন্তু আমার সাথে ওর ব্যবহার কেমন যেন অদ্ভুত!' আসজাদ কাঁধ উঁচিয়ে বলল।
'আজ সাধারণ একটা কথায় রেগে গেছে। আগের মতো কিছু নেই এখন ওর মাঝে... বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে!'

'এটা তোমার ভ্রম, আসজাদ! ওর আচরণ কেন বদলাতে যাবে? তুমি বেশি আবেগী হয়ে ভাবছ।' শাকিলা ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

'না আমি, প্রথমদিকে আমিও ভেবেছি এটা হয়তো ভ্রম। কিন্তু এখন, বিশেষ করে আজ নিজের অনুভূতিকে আমার ভ্রম মনে হচ্ছে না। ইমামা ভীষণ অভদ্রভাবে কথা বলেছে আমার সাথে।'

'তোমার কী মনে হয়, ওর আচরণ কেন বদলেছে?' শাকিলা টেবিলের উপর চিরুনি রেখে বললেন।

'এটা তো আমার জানা নেই।'

'জিঙেস করোনি ওকে?'

'একবার না, বহুবার।'

'তারপর...?'

'প্রতিবার আপনার মতো বলে ভুল ভাবছি। কখনো বলে পড়াশোনার কারণে, আবার কখনো বলে ম্যাচিউর হয়ে গেছে, তাই।'

'তাহলে এখানে ভুল কী বলেছে? হয়তো সত্যিই তাই।' শাকিলা বললেন।

'আম্মি! ব্যাপার চুপচাপ হয়ে যাওয়ার না। মনে হচ্ছে, ও আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।'

'তুমি অযথা চিন্তা করছ, আসজাদ! আমার মনে হয় না এমন কিছু হবে। তাছাড়া তোমরা ছোটবেলা থেকে একজন

অন্যজনকে চেনো, একজন আরেকজনের অভ্যাস সম্পর্কে জানো।" শাকিলার কাছে ছেলের উদ্বিগ্নতা সম্পূর্ণ অথহীন মনে হয়। 'বয়সের সাথে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। এখন তোমরা আর বাচ্চা না। তাই ছোটোছোটো বিষয় নিয়ে অস্থির হওয়ার অভ্যাস ছাড়া।' ছেলেকে বোঝালেন। 'তাছাড়া হাশিম ভাই পরের বছর বিয়ে সম্পূর্ণ করতে চায়। বলল, বিয়ের পর পড়াশোনা শেষ করবে ও। অন্তত সে নিজের দায়িত্ব থেকে অবসর চায়।' বড়দের সিদ্ধান্তের কথা খোলাসা করলেন।

'আফ্কেল এসব বলেছে?' আসজাদ কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে মাকে।

'একবার না, অনেকবার। আমার তো মনে হয় তারা প্রস্তুতিও নিচ্ছে।'

আসজাদ খানিক স্বস্তিবোধ করল।

'হতে পারে এই কারণে ইমামা কিছুটা চিন্তিত।'

'হ্যাঁ, হতে পারে। তা যাইহোক আগামী বছর বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভালো।' আসজাদ নিশ্চিত হয়।

ছেলেটার বয়স ষোলো বা সতেরো বছরের হবে। দেখতে হালকা-পাতলা লম্বা গড়নের। চেহারা বয়ঃসন্ধির স্পষ্ট ছাপ, যার উপর একবারও ক্ষুর চালানো হয়নি। সেই ছাপ ওর চেহারার নির্দোষ ভাবটা ধরে রেখেছিল। পরনে স্পোর্টস শার্টস আর একটা টিলেঢালা শার্ট। পায়ে কটনের মোজা, জগার্স। মুখে চুইংগাম। চোখে অদ্ভুত এক অস্থিরতা ও সংশয়ের মিশ্রণ। এই মুহূর্তে জনবহুল এক রাস্তা দিয়ে নিজের হেভি ডিউটি মোটর বাইকটা প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ও। তাও কোনোরকম হেলমেট ছাড়া। খুব রাশ ভঙ্গিতে চালিয়ে। দুইবার সিগন্যাল ভাঙল। তৃতীয়বার বিপজ্জনক গতিতে কিছু গাড়িকে ওভারটেক করল। চতুর্থবার বাইকের সামনের চাকা উপরে তুলে পেছনের চাকা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গেল।

দুইবার ডানে-বামে না দেখে নিজের মনমতো বিদ্যুতের গতিতে টার্ন নিলো। একবার জিগজ্যাগ স্টাইলেও চালান। ষষ্ঠ দফা বাইক পুরো স্পিডে রেখে দুই পা উঠিয়ে ফেলো। একই গতি বজায় রেখে এক লেন ভেঙে আরেক লেনে শৌঁ-শৌঁ শব্দে ঢুকে পড়ল ও। যার কারণে সামনের ট্রাফিক সিগন্যাল বেজে ওঠে। স্পিড ফুল রেখেই হ্যান্ডেল থেকে হাত সরিয়ে নেয় এবার। বাইক পুরো গতিতে সামনে থেকে আসা এক গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এক ঝটকায় উড়ে বাতাসের সাথে কিছুর উপর পড়ে ও। কিন্তু কীসের উপর আন্দাজ করতে পারল না। মস্তিষ্ক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে...

দুটো ছেলে স্টেজে একে-অপরের মুখোমুখি রোষ্ট্রামের পেছনে দাঁড়ানো। কিন্তু হলে উপস্থিত স্টুডেন্টদের নজর সবসময়ের মতো একজনের দিকে স্থির। ওরা দু'জন হেডবয় নির্বাচিত হওয়ার তদারকি করছে। যা স্কুলের প্রোগ্রামেরই একটি অংশ। ওদের রোষ্ট্রামে একটা একটা পোস্টার

লাগানো। যার একটায় 'Vote for Salar' এবং অপরটায় 'Vote for Faizan' লেখা ছিল।

ফাইজান হেডবয় হওয়ার পর যেসব সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেবে তা এলান করছে। সালার গম্ভীরভাবে প্রতিপক্ষকে দেখছে। ফাইজান স্কুলের সেরা বক্তা। এই মুহূর্তে নিজের দক্ষতার জ্বলন্ত প্রদর্শন করতে সেই ব্রিটিশ উচ্চারণে কথা বলছিল, যার জনা ওর সুখ্যাতি। চমৎকার সাউন্ড সিস্টেমের কারণে ফাইজানের আওয়াজ ও কথার স্টাইল দুটোই ভীষণভাবে প্রভাব ফেলার মতো। হলজুড়ে পিনপতন নীরবতা। এই নীরবতা তখন ভাঙে, যখন ফাইজানের সাপোর্টাররা ওর কোনো ভালো কথায় প্রশংসা করে, তাদের হাততালিতে পুরো হল মুখরিত হয়ে ওঠে।

আধা ঘন্টা পর ফাইজান যখন ভোটের আপিল শেষ করে চুপ হলো পরের কয়েক মিনিট পর্যন্তও হলজুড়ে তালি আর শিস বাজতে থাকে। এই তালির মধ্যে সালার সিকান্দারও সামিল ছিল। ফাইজান বিজয়ীর দৃষ্টিতে একবার পুরো হল

এবং সালারের দিকে তাকায়। প্রতিপক্ষকে নিজের জন্য তালি বাজাতে দেখে ঘাড়ের হালকা ইশারায় কৃতজ্ঞতা জানায়। সালার সিকান্দার যে সহজ প্রতিপক্ষ না, ফাইজান আকবার তা ভালো করেই জানে। স্টেজ সেক্রেটারি এবার সালার সিকান্দারের নাম এনাউন্স করলেন। সালার উঠে তালির গুঞ্জনের মাঝেই বলতে শুরু করে। 'Good morning friends... বলে একটু থামে।

'ফাইজান আকবার একজন বক্তা হিসেবে নিঃসন্দেহে আমাদের স্কুলের গর্ব। আমার বা অন্য কারো পক্ষেই তার মোকাবেলায় এক স্টেজে দাঁড়ানো সম্ভব না।' কিছুক্ষণের জন্য থেমে ফাইজানের দিকে তাকায়, যার মুখে গর্বের হাসি। কিন্তু বাক্যের পরবর্তী অংশ সেই হাসি অদৃশ্য করে দেয়। 'যদি বিষয় শুধু কথা বানানোর হয়, কিন্তু...'

হলজুড়ে সবার মাঝে হালকা হাসির রোল পড়ে।

সালার কণ্ঠের গান্ধীর্ষ বজায় রেখে বলতে থাকে। 'কিন্তু একজন হেডবয় এবং একজন বক্তার মাঝে অনেক ব্যবধান। বক্তাকে কথা বলতে হয়, কিন্তু হেডবয়কে কাজ করে দেখাতে হয়। দুজনের মাঝে 'Talker ও Doer' এর পার্থক্য এবং 'Great Talkers are not Great Doers.'

সালারের সাপোর্টারদের হাততালির আওয়াজে হল ভরে ওঠে।

'আমার কাছে ফাইজান আকবারের মতো সুন্দর কথার প্রবাহ নেই। রয়েছে শুধু নিজের নাম ও পড়াশোনার সক্রিয় রেকর্ড। তাছাড়া কনভেন্সিংয়ের জন্য শব্দের বন্যা তৈরি করার ইচ্ছে নেই আমার, আমি শুধু কিছু বাক্য বলতে চাই আপনাদের। Trust me and vote for me.' ধন্যবাদ জানিয়ে যখন মাইক অফ করল, তখন হল তালির আওয়াজে মুখরিত ছিল।

এক মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডে সালার সিকান্দার সেই পরিমিত ও ক্যালকুলেটেড স্টাইলে কথা বলেছে, যা তার বিশেষত্ব।

কিন্তু সেই দেড় মিনিটই ফাইজানের আশায় পানি ঢেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। প্রাথমিক পরিচয় শেষে উভয় ক্যান্ডিডেটের মাঝে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। সালার বক্তৃতার মতোই সংক্ষিপ্ত আকারে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। যেখানে ওর সবচেয়ে লম্বা উত্তরও চার বাক্যে সীমাবদ্ধ থাকত, সেখানে ফাইজানের সবচেয়ে ছোট উত্তরও চার বাক্যের বড় হতো। ফাইজানের কথা বলার যে সাবলীলতা ও দক্ষতাকে ওর গুণ ধরা হতো, সেই মুহূর্তে স্টেজে সালারের সংক্ষিপ্ত ও গম্ভীর উত্তরের সামনে তা মুখ খুবড়ে পড়ছিল। যা ফাইজান নিজেও টের পায়। যে প্রশ্নের উত্তর সালার এক শব্দে বা এক বাক্যে দেয়, অভ্যাসগত কারণে ফাইজানকে সেই উত্তর লম্বা টানতে হয়। সালারের বক্তৃতায় ফাইজানকে নিয়ে করা মন্তব্য উপস্থিত স্টুডেন্টদের কাছে সত্য মনে হতে থাকে, 'একজন বক্তা শুধু কথা বলতে জানে।'

'সালার সিকান্দারকে কেন হেডবয় বানানো উচিত?' প্রশ্ন করা হলো।

'কারণ আপনারা সেরা মানুষ বেছে নিতে চান।' উত্তর দেওয়া হয়।

'এই বাক্য আত্ম-অহংকার বোঝায় না?' আপত্তি জানানো হলো।

'না, এটা আত্মবিশ্বাস বোঝায়।' আপত্তি খণ্ডন করা হয়।

'আত্ম-অহংকার ও আত্মবিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য?' তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করা হলো।

'সেটাই, যা ফাইজান আকবার ও সালার সিকান্দারের মাঝে।' গম্ভীরভাবে বলা হয়।

'যদি আপনাকে হেডবয় না বানানো হয়, তবে আপনার উপর কি প্রভাব পড়বে?'

'না। প্রভাব আমার উপর না, পড়লে আপনাদের উপর পড়বে প্রভাব।'

'কীভাবে...?'

'সেরা মানুষকে দেশের লিডার নির্বাচন না করলে প্রভাব
জাতির ওপর পড়ে, সেরা মানুষের উপরে নয়।'

'আপনি নিজেকে সেরা দাবি করছেন?' আবারও আপত্তি
জানানো হলো।

'এই হলে এমন কেউ আছে, যে নিজেকে খারাপ মানুষের
সাথে equate করবে?'

'হতে পারে আছে...'

'তাহলে আমি তার সাথে দেখা করতে চাই।'

হলে হাসির দমকা বয়ে গেল।

'হেডবয় নির্বাচিত হওয়ার পর সালার সিকান্দার যেসব পরিবর্তন আনবে, সেই সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'পরিবর্তন বলা যায় না, করে দেখাতে হয়। যা হেডবয় হওয়ার আগে করে দেখানো সম্ভব না।'

আরও কিছু প্রশ্ন করা হয়। শেষ প্রশ্ন হিসেবে স্টেজ সেক্রেটারি একটা শীলঙ্কান ছেলের প্রশ্ন নিলেন। যে কিছুটা দুষ্ট হাসি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'আপনি যদি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহলে আমি ও আমার পুরো গ্রুপ আপনাকে ভোট দেবো।'

সালার ছেলেটার কথায় হাসে। 'উত্তর দেওয়ার আগে আমি জানতে চাই আপনারা গ্রুপে কয়জন আছেন?'

'ছয়জন।' শীলঙ্কান ছেলেটা বলল।

সালার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। 'ওকে, প্রশ্ন করুন।'

'আপনি একটু হিসেব করে বলুন, যদি আমরা ২৬৭৮৯৫ এর সাথে ৯৫২৮৫২ যোগ করি, তা থেকে ৩৯৯৯৯৯ বিয়োগ করি এবং তার সাথে ৯২৯২৯২ যোগ করি এবং তা...' শ্রীলঙ্কান ছেলেটা থেমে থেমে কাগজ দেখে জিজ্ঞেস করছে। 'ছয় দিয়ে গুণ করি, এরপর তা দুই দিয়ে ভাগ করি এবং ফলাফলের সাথে ৪৯২৩৫৯ যোগ করি, তাহলে উত্তর কত আসবে?' বলে শেষ করতে পারল না।

'৮১৪২৪৭৩।' বিদ্যুৎ গতিতে সালার উত্তর দেয়।

শ্রীলঙ্কান ছেলেটা কাগজে একনজর চোখ বুলিয়ে অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে হাততালি দিতে শুরু করে। ফাইজানের কাছে নিজেকে তখন একজন অভিনেতা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। পুরো হল সেই ছেলের সঙ্গে সালারের জন্য হাততালি দিচ্ছে। পুরো প্রোগ্রাম একধরনের রসিকতা মনে হলো ওর। এক ঘন্টা পর স্টেজ ছেড়ে নামার সময় বুঝে যায়, প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার আগেই হার নিশ্চিত। ১৫০+

আইকিউ লেভেলসম্পন্ন সালার সিকান্দারের প্রতি জীবনে
এর আগে কখনো এত ঈর্ষা অনুভব করেনি ফাইজান
আকবার।

'ইমামা আপা, আপনি লাহোর কবে যাবেন?'

মাথা তুলে তাকায় ইমামা। সাইকেলের গতি কমিয়ে ওর
চারপাশে চক্কর কাটছে সাদ। 'কালকে, কেন?' নোট বন্ধ করে
জিঙেস করে।

'আপনি চলে গেলে আমি আপনাকে অনেক মিস করি।' সাদ
বলল।

'কারণ কী?' ইমামা একগাল হেসে ভাইয়ের কাছে জানতে
চায়।

'কারণ আমার কাছে আপনাকে অনেক ভালো লাগে। আপনি অনেক খেলনা নিয়ে আসেন... ঘুরতে নিয়ে যান... আমার সাথে খেলেন, তাই।' সাদ বোনকে কারণ বলে। 'আপনার সঙ্গে আমাকে লাহোর নিয়ে যাবেন।'

ইমামা বুঝল না, এটা পরামর্শ ছিল নাকি প্রশ্ন। 'কীভাবে নেব? আমি নিজেই হোস্টেলে থাকি, তুমি গিয়ে কোথায় থাকবে?'

সাদ সাইকেলে চালাতে চালাতে কিছু একটা ভাবে। 'তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসার চেষ্টা করবেন।'

'আচ্ছা, করব।' ইমামা হেসে বলে। 'এক কাজ করা যায়, তুমি আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারো, আমি ফোন করব।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে।' বোনের পরামর্শ সাদের পছন্দ হয়।

এবার সাইকেলের গতি বাড়িয়ে লনের চারপাশে ঘুরতে থাকে। ইমামা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাচ্চা ছেলেটার

দিকে। সাদ ওর আপন ভাই না। দশ বছরের এই ছেলেটা পাঁচ বছর আগে ওদের বাড়িতে এসেছিল, কোথা থেকে তা জানে না। সেই বয়সে এই বিষয়ে কৌতূহল কাজ করেনি। কিন্তু এখন জানে। আনার কারণ কী, সেটাও জানে। সাদের বয়স এখন দশ। সময়ের সঙ্গে বাড়ির সবার সাথে মিশে গেছে। ইমামার প্রতি সবচেয়ে বেশি টান। ইমামার প্রায়ই ওকে নিয়ে চিন্তা হয়। যদিও এই চিন্তার কারণ সাদের এতিম হওয়া না বরং এই পরিবারে বেড়ে ওঠা। ইমামার বড় দুই চাচা এবং ছোট এক কাকার বাড়িতেও এমন দত্তক নেওয়া ছেলেরা বড় হচ্ছে। যাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা হয় ওর। নোট হাতে লেনে সাইকেল চালানো সাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর কিছু ভাবতে থাকে। সাদের দিকে তাকালে এমন বহু ভাবনায় হারিয়ে যায়। তবে এর কোনো সমাধান জানা নেই। কারণ ওর হাতে করার মতো কিছু ছিল না।

চারটা ছেলে তখন লাহোরের রেড লাইট এরিয়ায় ছিল। এদের বয়স আঠারো-উনিশের কাছাকাছি। বেশভূষা দেখে

আপার ক্লাসের মনে হয়। তবে এখানে না এদের বয়স বিবেচনা করার কিছু আছে, না আছে এদের আপার ক্লাসের সাথে থাকা সম্পর্কের খাতিরে আলাদা কোনো সুবিধা। কারণ এখানে ওদের চেয়ে অল্প বয়সী ছেলেরাও আসে এবং আপার ক্লাস তো এখানকার নিয়মিত কাষ্টমার। ওরা চারজন রেড লাইট এরিয়ার ভাঙা গলি দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল। তিনজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আর চতুর্থজন কৌতূহল নিয়ে চারপাশ দেখছে। মনে হচ্ছে এই প্রথম এখানে আসা। কিছুক্ষণ পর বাকি তিনজনের মাঝে হওয়া কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে যায় ছেলেটা প্রথমবার এসেছে। গলির দুই পাশে খোলা দরজাগুলোর সামনে খুব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে সব বয়সের, সব বর্ণের নারীরা। এদের কেউ ফর্সা, কেউ শ্যামলা, কেউ কালো। কেউ খুব সুন্দরী, কেউ মাঝামাঝি পর্যায়ের, কেউ-বা সাধারণ চেহারার। গলি দিয়ে সব চেহারা এবং সব বয়সের পুরুষরাও আনাগোনা করছে। হাঁটতে হাঁটতে ওখানকার সবকিছু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ও।

'তুমি এখানে কতবার এসেছ?' ছেলেটা ডানদিকে থাকা বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে।

ওর বন্ধু উত্তরে হাসে। 'কতবার... বলতে পারব না। এখন তো গোনা ভুলে গেছি, কারণ প্রায়ই আসি।' গর্ব করে বলল।

'আমি তো তেমন কোনো অ্যাট্রাকশন অনুভব করছি না এই নারীদের প্রতি। Nothing special about them.' কাঁধ উঁচিয়ে বলল। 'শুধু রাত কাটাতে হলেও অন্তত ভালো একটা পরিবেশ দরকার। এটা তো খুব নোংরা জায়গা।' গলির গর্ত আর আবর্জনার স্তুপের দিকে তাকিয়ে অরুচি নিয়ে বলল। 'তাছাড়া গার্লফ্রেন্ড থাকতে এখানে আসার দরকার কী?' এবার ভ্রু কুঁচকে যায় ওর।

'এই জায়গার নিজস্ব এক আকর্ষণ আছে। গার্লফ্রেন্ড আর এখানের নারীদের কোনো তুলনা নেই। গার্লফ্রেন্ড তো সেই নাচ দেখাতে পারবে না, যা একটু পর তুমি দেখতে যাচ্ছ।' তৃতীয় ছেলেটা হেসে বলল। 'তাছাড়া পাকিস্তানের যেই বড়

অ্যাক্ট্রিসের নাচ দেখাতে আজ তোমাকে নিয়ে এসেছি, তা দেখলে তো ব্যস...'

দ্বিতীয় ছেলেটার কথায় বাধা দিয়ে প্রথম ছেলেটা বলে।
'ওনার নাচ তো তুমি এর আগেও দেখেছ, তাই না?'

'আরেহ, ওটা কিছুই না। ভাইয়ের বিয়েতে শুধু একটা ঝলক ছিল, কিন্তু এখানে আলাদা কিছুই হয়...'

'সেই অ্যাক্ট্রিস তো পশ এলাকায় থাকে, তাহলে এখানে কেন আসে?' অন্য ছেলেটা অবোধ্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো। আমি এইসব জানতে এখানে আসি না।'

দ্বিতীয় ছেলেটার কথায় বাকি দুই ছেলে হেসে ওঠে। কিন্তু ও তখনো সুচালো চোখে আশপাশ দেখছিল। গলির শেষে এক বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামে। নিচ তলায় থাকা দোকান থেকে অনেকগুলো মুক্তোর মালা কিনে হাতের কবজিতে

পৌঁচিয়ে নেয়। একটা মালা সেই ছেলেটার হাতেও পৌঁচিয়ে দেয়, যে এখানে আসতে আপত্তি করছিল। দোকান থেকে পানও কিনল, জর্দা দেওয়া পান। ছেলেটার বন্ধু একটা পান ওর মুখে ঢুকিয়ে দেয়। যার হয়তো এটাই প্রথম পান খাওয়া। পান খেতে খেতে চারজন বিন্ডিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে। উপরে পৌঁছে দ্বিতীয় ছেলেটা আরেকবার চারপাশ সূক্ষ্ম চোখে দেখল। সব ঠিকঠাক দেখে চেহায়ায় তৃপ্তির ঝলক উদয় হয়। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখা। মেঝেতে সাদা চাদর বিছানো, পাশে হেলান দেওয়ার জন্য কুশন রাখা আর জানালায় ঝুলছে পাতলা পর্দা।

কিছু লোকজন আগে থেকেই ওখানে জড়ো হয়ে আছে। অধিবেশন এখনো শুরু হয়নি। ওদেরকে দেখে একজন মহিলা ছুটে আসে, চেহায়ায় তার মেকি হাসি। বন্ধুদের ইশারায় ও মহিলার দিকে তাকায়। মধ্যবয়সী সেই মহিলার চেহায়ায় গাঢ় মেক-আপের প্রলেপ, চুলে মুত্তো আর গোলাপের গাজরা এবং গায়ে জড়ানো শিফনের লাল শাড়ি। যার ব্লাউজ তার শরীর ঢাকতে ব্যর্থ। যদিও তা শরীর ঢাকার

জন্য পরাও হয়নি। ওদের চারজনকে মহিলা এক কোণায় এনে বসায়। ছেলেটা ওখানে বসে প্রথমেই মুখের পান পাশের পিকদানিতে ফেলে দেয়। পান মুখে নিয়ে কথা বলা কঠিন হচ্ছিল। তাছাড়া পানের স্বাদও তেমন ভালো লাগেনি ওর। বাকি তিনজন বসে নিচু আওয়াজে কথা বলে। ও কুশনের সাথে হেলান দিয়ে ওখানে উপস্থিত মানুষজন দেখতে থাকে। যাদের কেউ কেউ নিজের সামনে মদের বোতল ও টাকার বান্ডিল নিয়ে অধীর আগ্রহে বসে আছে। এখানে প্রায় সবার পরনেই সাদা সুতি কাপড়। ঈদগাহ ছাড়া এই প্রথম অন্য কোথাও সাদা কাপড় পর মানুষের এত ভিড় দেখছে। যদিও বন্ধুদের মতো ওর পরনে ছিল কালো জিন্স এবং সেই রঙের হাফহাতার টি-শার্ট। ওদের বয়সী কিছু ছেলেও সেখানে একইরকম জিন্স আর টি-শার্টে এসেছে।

কিছুক্ষণ পর ঝকমকে পোশাক পরিহিতা এক মহিলা এসে হলের মাঝে গজল গাইতে শুরু করে, তার সাথে কিছু অনুষ্ঙ্গীও ছিল। দুটি গজল শুনিয়ে ছুঁড়ে মারা নোটগুলো তুলে সে খুশিমনে ভেতরে চলে যায়। তার চলে যাওয়ায়

পরপরই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সেই অ্যাক্ট্রেস হলে ঢোকে। উপস্থিত সব পুরুষের চোখ তার দিকে আটকে যায়। হলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পর্যায়ক্রমে মাথার ইশারায় সবাইকে স্বাগত জানায় সে। অনুষ্ঠানের এবার কষ্ট করতে হলো না। ক্যাসেট প্লেয়ারে একের পর এক উত্তেজনাপূর্ণ গান বাজানো হয়, যার তালে অ্যাক্ট্রেস তার নাচ উপস্থাপন করে। কিছুক্ষণ আগের নীরবতা ভেঙে উপস্থিত পুরুষরা তার প্রশংসার পাশাপাশি মদ খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কিছু, যারা বেশি জোশে এসে পড়েছিল উঠে তার সাথে নাচতে শুরু করে। হলে একমাত্র সেই ছেলেটা নিজের জায়গায় কিছু না করে শান্ত চেহারা নিয়ে বসে ছিল। তা সত্ত্বেও এটা অনুমান করা কঠিন না, ও সেই নাচ উপভোগ করছে। প্রায় দুই ঘন্টা পর যখন অ্যাক্ট্রেস তার নাচ শেষ করে, তখন সেখানের অর্ধেকের বেশি পুরুষ নেশায় বুঁদ। বাড়ি ফেরা তাদের কাছে এই কারণে কঠিন ছিল যে কারো ফেরার ইচ্ছেই ছিল না। সবাই রাত কাটাতে এসেছে।

ছেলেগুলোও রাত কাটায় ওখানে। পরেরদিন ফেরার পথে
গাড়িতে হাই তুলতে তুলতে ছেলেটার বন্ধু ওকে জিজ্ঞেস
করল।

'তো... কেমন ছিল অভিজ্ঞতা?'

'ভালো।' ছেলেটা সাধারণ উত্তর দেয়।

'শুধু ভালো আর কিছু না? তুমিও না...' বিরক্ত হয়।

'মঝঝমঝে আসার জন্য ভালো জায়গা, তাছাড়া কী?
Something special এর মতো কিছু নেই। আমার
গার্লফ্রেন্ড সেই অ্যাক্ট্রেসের চেয়ে বেশি কোয়ালিটিফুল, যার
সাথে আমি রাত কাটিয়েছি।' ছেলেটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল।

ডাইনিং টেবিলজুড়ে হাশিম মুবীনের পুরো পরিবার উপস্থিত
ছিল। খাবার খেতে খেতে সবাই একে-অপরের সাথে

খোশগল্পে মগ্ন তারা। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তখন ইমামা, যে এই উইকেন্ডে ছুটি কাটাতে ইসলামাবাদে এসেছে।

'বাবা! আপনি কি খেয়াল করেছেন ইমামা দিন দিন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে?' ওয়াসিম জ্বালানোর উদ্দেশ্যেই বোনের দিকে তাকিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, আমিও গত কয়েক মাস ধরে নোট করছি।' ছেলের কথায় হাশিম মুবীন মেয়ের মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালেন।

ভাতের চামচ মুখে রেখে ইমামা ভাইয়ের দিকে সুচালো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

'কী ইমামা, কোনো সমস্যা আছো?'

'বাবা! ওয়াসিম অনেক বাজে কথা বলে, আপনি অযথা ওর কথায় কান দিচ্ছেন। আমি আমার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত

থাকি। সবাই তো ওর মতো না।" পাশে থাকা ভাইয়ের কাঁধে হালকা চাপড় মেরে বলল ইমামা।

'বাবা! একবার ভাবুন, মেডিকেলের প্রথম বছরে ওর এই অবস্থা হলে ডাক্তার হয়ে বের হওয়ার পর অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে?' ওয়াসিম বোনের সতর্ক সংকেত উপেক্ষা করে ইয়ার্কি করে বলতে থাকে। 'বছর লেগে যাবে মিস ইমামা হাশিমের একবার হাসতে।'

ডাইনিং টেবিলে সবার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। এদের খুনসুটি সবসময় লেগে থাকে। এমন সময় হয়তো খুব কম এসেছে যখন দু'জন এক হয়েছে কিন্তু কোনো ঝগড়া হয়নি। অনবরত হওয়া এইসব ঝগড়া সত্ত্বেও ইমামার সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ওয়াসিমের সাথেই। কারণ হয়তো ওদের পিঠাপিঠি জন্ম।

'আপনি শুধু অপেক্ষা করুন...'

এবার কথা শেষ করতে না দিয়ে ইমামা পুরো শক্তি লাগিয়ে ভাইয়ের কাঁধে ঘুষি মারে। কিন্তু তাতে ওয়াসিমের কিছু হয়েছে বলে মনে হলো না।

'আমাদের বাড়িতে একজন ডাক্তারের হাতে সুস্থতার বাইরে আর কী-বা হতে পারে আপনারা উদাহরণ দেখছেন? এটা থেকেই আন্দাজ করা যায়, আজকাল ডাক্তাররা ওয়ার্ডে থাকা রোগীদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করে। দেশে মৃত্যুর হার বাড়ার অন্যতম কারণ...'

'বাবা, ওকে মানা করুন।' ইমামা অবশেষে হার মেনে বাবাকে বলল।

'ওয়াসিম!' হাশিম মুবীন হাসি চাপিয়ে ছেলেকে ধমক দেন।

ভদ্র ছেলের মতো মুখ বন্ধ করে নেয় ওয়াসিম।

প্যাকেটে থাকা জিনিসটুকু ব্লেডারে ঢেলে সুইচ অন করে দেয় ছেলেটা। শব্দ পেয়ে বাবুটি ভেতরে ঢোকে।

'ছোটো সাহেব। দিন আমি করে দিচ্ছি।' সামনে এগিয়ে এসে বাবুটি বলল।

কিন্তু ছেলেটা হাতের ইশারায় থামতে বলে। 'না, আমি করে নিচ্ছি। তুমি আমাকে এক গ্লাস দুধ এনে দাও।'

বাবুটি দুধ নিয়ে আসে। আধা গ্লাস দুধ খেয়ে বাকিটায় ব্লেডার জারে থাকা সবটুকু গুঁড়ো ঢেলে একটা চামচ দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকে। নাড়া শেষ হলে এক নিশ্বাসে গ্লাস খালি করে ফেলে।

'রাতের জন্য আজ কী রান্না করেছ?' বাবুটিকে জিজ্ঞেস করে। বাবুটি কিছু ডিশের নাম বলে, যা শুনে ওর চেহারা অরুচি ফুটে ওঠে।

'আমি খাব না, ঘুমাতে যাচ্ছি। আমাকে ডিস্টার্ব করবে না।'
কড়া গলায় বলল।

পায়ের বাটার স্যান্ডেলগুলো মেঝের উপর দিয়ে একপ্রকার
টেনে নিয়ে যায়। মুখের দাড়ি বেড়ে গেছে ওর। চোখগুলো
লাল। শার্টের কয়েকটা বোতাম ছাড়া বাকি সবই খোলা। রুমে
টুকে দরজা লক করে নিলো। এরপর বিশাল আকারের
মিউজিক সিস্টেমের কাছে গিয়ে তা অন করে বিছানায় শুয়ে
পড়ে। রুমে এখন মাইকেল বোল্টেনের 'When a man
loves a women' উঁচু আওয়াজে বাজতে থাকে।

রিমোট ধরে রাখা বাঁহাত নিচে ঝুলছে, পা দুটো দুলছে
মিউজিকের তালে।

রুমে বিছানা এবং ওর নিজের অবস্থা ছাড়া বাকি সবকিছু
গোছানো। কোথাও কিছু এলোমেলো বা সামান্য ধুলোবালিও
নজরে আসছে না। মিউজিক সিস্টেমের পাশের শেলফে

অডিয়ো-ভিডিয়ো ক্যাসেটগুলো বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। অপর দেয়ালের শেলফ বইয়ে ভরা। কোণায় থাকায় কম্পিউটার টেবিল দাবি করছে তাকে ব্যবহার করা মানুষটা ভীষণ অর্গানাইজড। রুমের অন্যান্য দেয়ালে শোভা পাচ্ছে হলিউড অ্যাক্ট্রিসদের ছবিসহ বিভিন্ন ব্যান্ডের পোস্টার। বাথরুমের দরজা ও রুমের জানালার কাঁচে প্লেবয় ম্যাগাজিন থেকে কাটা কিছু মডেলের নগ্ন ছবি লাগানো। এই রুমে প্রথমবার প্রবেশ করা যেকোনো ব্যক্তি দরজা খুলে ভীষণভাবে চমকে যাবে। কারণ জানালার কাঁচে লাগানো ছবিগুলো কয়েক মুহূর্তের জন্য আগন্তুকের কাছে ছবি নয়; বরং সত্যিকার মেয়ে মনে হবে। ছবিগুলো লাগানোর সময় এজন্যই বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল।

যেই দেয়ালে মিউজিক সিস্টেম সেই দেয়ালের এক কোণায় ঝুলছে ইলেকট্রিক গিটার, পাশের স্ট্যান্ডে রয়েছে কীবোর্ড। গিটার থেকে একটু দূরে পিকোলো, বাঁশি, ওবোও ঝুলিয়ে রাখা। যা দেখে বোঝা যায় এই রুমে বসবাসরত মানুষটার মিউজিকের প্রতি গভীর প্রীতি রয়েছে। বিছানার ঠিক সামনের

দেয়ালের ক্যাবিনেটে টিভি। বাকিটা জুড়ে বিভিন্ন ট্রফি ও শিল্ড। রুমের চতুর্থ কোণাও খালি ছিল না। ওখানের দেয়ালে ভিন্ন ভিন্ন র্যাকেট ঝুলিয়ে রাখা। যার মধ্যে একটা টেনিসের বাকি দুটো স্কোয়াশের। র্যাকেটগুলোও দেয়ালে ঝোলানোর আগে নিচে কিছু পোষ্টার লাগানো হয়েছে। এরপর তা এমনভাবে ঝোলানো হয়েছে, যা দেখলে মনে হয় র্যাকেটগুলো খেলোয়াড়রা ধরে রেখেছেন। টেনিস র্যাকেটের নিচে গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনির পোষ্টার। একটা স্কোয়াশ র্যাকেটের নিচে জাহাঙ্গীর খান এবং অপরটির নিচে রডনি মাটিনের পোষ্টার।

রুমের একমাত্র জায়গা যা অগোছালো, তা হলো ডাবল বেডের বিছানা যার উপর ও শুয়ে আছে। সিল্কের বেডশিট বাজেভাবে ঝুঁচকে আছে। চারপাশে ছড়ানো ইন্টারন্যাশনাল পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিন, যার বেশিরভাগই প্লেবয় এর। একটা পেপার কাটারের সাথে কিছু কাগজের টুকরোও পড়ে আছে পাশে। যা দেখে বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগে এগুলো থেকে ছবি কাটছিল ও। চুইংগামের কিছু র্যাপারও বিছানায় দলামলা

হয়ে পড়ে আছে। ডানহিল সিগারেটের একটা প্যাকেট, লাইটার আর অ্যাশট্রে বিছানার আরেকপাশে। সিল্কের সাদা চকচকে বেডশিটের বিভিন্ন জায়গায় সিগারেটের ছাই। কফির খালি মগও বিছানায়। পাশে একটা টাই আর রিস্টওয়াচ। এই সবকিছু থেকে একটু দূরে একটা মোবাইল। যা হঠাৎ করে বেজে ওঠে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা ছেলেটা সম্ভবত এখন ঘুমের ঘোরে। রিংটোনের আওয়াজে মাথা না তুলে ডানহাত দিয়ে বিছানার এদিক-সেদিক হাতড়ে মোবাইল খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু মোবাইল হাতের নাগালের দূরে। কল এসেই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হাত স্থির হয়ে আসে। হয়তো পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়েছে। পা দুটোও এখন আর দুলছে না।

মোবাইল এখনো বাজছিল। বিছানার সাইডে ঝুলতে থাকা বাঁহাতের রিমোট নিচে কার্পেটে পড়ে যায়। মাইকেল বোল্টেনের কণ্ঠে, 'When a man loves a women' গানের আওয়াজ এখনো রুমজুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। হঠাৎ কেউ এসে দরজায় নক করে। সময়ের সাথে সাথে শব্দ

বাড়ছিল। কল থেমে গেছে। দরজায় ক্রমশ আরও জোরে জোরে শব্দ কর হয়। কিন্তু বিছানায় উপুড় হয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল ও।

'ডোন্ট টেল মি ইমামা! তুমি কি সত্যিই এনগেজড...?'
জাভেরিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্যে আনতেই জয়নব ধাক্কা খেল।

ইমামা অভিযুক্তের নজরে বান্ধবীর দিকে তাকায়, যে আগে থেকেই ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'ওর দিকে না আমার দিকে তাকিয়ে বলো, তুমি সত্যিই এনগেজড?' জয়নব ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, কিন্তু এটা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যের কিছু না; তুমি যেভাবে রিয়াক্ট করছ।' ইমামা শান্ত স্বরে বলে।

ওরা সবাই লাইব্রেরিতে ছিল। সেখানে বসে যে যার মতো একে-অপরের সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে।

'তবু আমাদের বলা উচিত ছিল তোমার। গোপন করার কী দরকার ছিল?' এবার রাবেয়া বলে ওঠে।

'গোপন করিনি। এটা তোমাদের জানানোর মতো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তাছাড়া আমাদের বন্ধুত্ব নতুন। কিন্তু এই এনগেজমেন্টের অনেক বছর হয়ে গেছে।' ইমামা কারণ দেখায়।

'অনেক বছর মানে কী বোঝাতে চাইছ?'

'মানে দুই-তিন বছর হয়ে গেছে।'

'তারপরও ইমামা, বলা উচিত ছিল তোমার।' জয়নবের অভিযোগ এখনো নিজের জায়গায়।

ইমামা জয়নবের দিকে তাকিয়ে হাসে। 'আচ্ছা, আবার করলে অন্য কাউকে না বললেও তোমাকে বলব।'

'ভেরি ফানি...!' জয়নব চোখ রাঙায়।

'আর কিছু না হোক অন্তত তার ছবি এনে দেখাও আমাদের।
কে সে? নাম কী? কী করে?' রাবেয়ার সবসময়ের মতো এক
শ্বাসে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে।

'ফার্স্ট কাজিন, আসজাদ নাম।' ইমামা থেমে থেমে বলে।
'এমবিএ শেষ করে বিজনেস করছে এখন।'

'দেখতে কেমন?' এবার জয়নব জিজ্ঞেস করে।

জয়নবের দিকে তাকায় ইমামা। 'ঠিকঠাক।'

'আরেহ্! আমি জিজ্ঞেস করছি লম্বা নাকি, সুদর্শন কতটা?'

ইমামা কিছু না বলে হাসে, নিজের পছন্দে এই আংটিবদল
হয়েছে ওর।

'দেখতে বেশ গুডলুকিং!' জাভেরিয়া এবার ইমামার হয়ে উত্তর দেয়।

'হ্যাঁ...এটা তো আমাদের অনুমান করা উচিত ছিল। কারণ ইমামার ফার্স্ট কাজিন বলে কথা। ইমামা, এখন তোমার পরবর্তী কাজ হলো তার কোনো ছবি এনে আমাদের দেখানো।' জয়নব বলল।

'না, এর আগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আমাদেরকে টিউ দেওয়া।' রাবেয়া কথার মাঝে বলল।

'আপাতত এখান থেকে চলো, হোস্টেলে যেতে হবে।' ইমামা উঠে দাঁড়ালে বাকিরাও উঠে পড়ে।

'কিন্তু জাভেরিয়া, এই কথা তুমি আগে কেন বলোনি?' একসাথে হাঁটার সময় জয়নব জিজ্ঞেস করে।

'ইমামা চাইত না, তাই আমিও কখনো এই ব্যাপারে মুখ খুলিনি।' জাভেরিয়া সাফাই দেয়।

ইমামা ঘুরে আবার জাভেরিয়ার দিকে তাকায়, চোখে তীক্ষ্ণতা।

'কেন চায়নি? আমার এনগেজমেন্ট হলে আমি তো চিৎকার করে সবাইকে বলতাম। সেটা যদি আবার নিজের পছন্দে হতো, উফ!' জয়নর জোরে জোরে বলে।

ইমামা এবার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

'আপনাদের ছেলে বিশ্ব-জনসংখ্যার সেই ২.৫ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ১৫০-এর চেয়ে বেশি আইকিউ আছে। এই স্তরের আইকিউ নিয়ে ও যা করছে তা অসাধারণ, কিন্তু অপ্রত্যাশিত না।'

ইন্টারন্যাশনাল এই স্কুলে সালারকে ভর্তি করানোর মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে। এর মধ্যেই সিকান্দার উসমান এবং তার স্ত্রীকে ডাকানো হয়। স্কুলের সাইকোলজিস্ট বিভিন্ন আইকিউ টেস্টে সালারের পারফরম্যান্সের কথা জানায় তাদের। যে স্কোর স্কুল টিচার্সসহ, সাইকোলজিস্টকেও অবাক করে দিয়েছে। সালার এই স্কুলের প্রথম ও একমাত্র বাচ্চা, যার আইকিউ লেভেল ১৫০+। এর কারণে কিছুদিনের মধ্যেই সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সিকান্দার উসমান এবং তার স্ত্রীর সাথে দেখা করে সাইকোলজিস্ট ওর শৈশবের ব্যাপারে আরও কিছু জানার সুযোগ খোঁজে। তিনি খুব আগ্রহের সাথে সালারের কেস স্টাডি করছিলেন। তার এই আগ্রহ পেশাগত কারণে নয়, ব্যক্তিগত কারণে। ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এই লেভেলের আইকিউসম্পন্ন কোনো বাচ্চার মুখোমুখি হচ্ছিলেন।

সিকান্দার উসমানের আজও সেই দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। সালার তখন মাত্র দুই বছরের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল, সেই বয়সে ওর বয়সী অন্যসব বাচ্চাদের তুলনায় ও

বেশ স্পষ্ট করে কথা বলত। ওর কথার ধরনও এমন হতো, যা তাকে এবং তার স্ত্রীকে প্রায়ই অবাক করে দিত। একদিন যখন তিনি কথা বলার জন্য তার ভাইকে কল করছিলেন, তখন সালার পাশে ছিল। লাউঞ্জের টিভির সামনে বসে কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে দেন। তিনি হাত থেকে রিসিভার রাখতেই সালার তা তুলে নেয়।

'হ্যালো আফ্কেল! আমি সালার।' ও বলছিল।

তিনি অবাক হয়ে তাকান। ছেলে তার নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে রিসিভার কানে লাগিয়ে কারো সাথে কথা বলছে।

'আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?'

সিকান্দার উসমান অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ছেলেকে দেখলেন। তার মনে হলো খেলার ছলে মিথ্যে মিথ্যে ফোনে কথা বলছে।

'পাপা আমার পাশে টিভি দেখছেন। না তিনি করেনি, আমি নিজেই করেছি।'

ছেলের পরের বাক্যে সিকান্দার উসমান যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'সালার কার সঙ্গে কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করলেন।

'শাহনাওয়াজ আফেলের সাথে।' সালার উত্তর দেয়।

হাত বাড়িয়ে তিনি ফোনের রিসিভার নিলেন। ভেবেছিলেন হয়তো ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছে নয়তো লাষ্ট নাম্বার রিডায়াল করে ফেলেছে। রিসিভার কানে ধরেন, অপরপাশে তার ভাই ছিল।

'সালার নাম্বার ডায়াল করে ফেলেছে।' ভাইয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী সুরে বললেন সিকান্দার উসমান।

'সালার কীভাবে ডায়াল করবে? ও তো খুব ছোটো!' তার ভাইও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে হয় নাম্বার রিডায়াল করে ফেলেছে, নয়তো ভুলে হাত লেগেছে। ফোন নিয়ে খেলছিল।'

সিকান্দার উসমান কল কেটে রিসিভার নামিয়ে রাখে। সালার এতক্ষণ নীরবে তাদের কথা শুনছিল। তিনি রিসিভার নিচে রাখতেই আবার তা উঠিয়ে নেয়। এবার ভালোভাবে ছেলেকে লক্ষ্য করলেন তিনি। ও একজন ম্যাচিউর মানুষের মতো আবার চাচা শাহনাওয়াজের নাম্বার ডায়াল করছে, তাও খুব দ্রুততার সাথে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিস্ময়ে ঝুঙ্ক হয়ে রইলেন। দুই বছর বয়সী বাচ্চার কাছ থেকে আর যাইহোক এমন কিছু আশা করা যায় না। হাত বাড়িয়ে তিনি কল কেটে দেন।

'সালার! তুমি শাহনাওয়াজ আফেলের নাম্বার জানো?'
বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ।' খুব শান্ত ভঙ্গিতে উত্তর দেয় ও।

'বলো তো নাম্বার?'

সালার নাম্বার বলে। তিনি ছেলের মুখের দিকে হা হয়ে তাকিয়ে থাকেন। খোঁজার চেষ্টা করেন কীভাবে সংখ্যার সাথে পরিচিত হয়েছে, আর এই নাম্বার...?

'তোমাকে এই নাম্বার কে শিখিয়েছে?'

'আমি নিজেই শিখেছি।'

'কীভাবে?'

'একটু আগে আপনি ডায়াল করেছেন।'

'তুমি গুনতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'কতদূর?'

'হাড্রেড পর্যন্ত।'

ও যন্ত্রের মতো শুরু হয়ে যায়। এক শ্বাসে ওয়ান থেকে হাড্রেড পর্যন্ত বলে শোনায। সিকান্দার উসমানের পেটে গিট পড়তে শুরু করে।

'আচ্ছা, আমি এখন আরেকটা নাম্বার ডায়াল করছি। আমার পর তুমি তা ডায়াল করবো।' ছেলের হাত থেকে রিসিভার নেন তিনি।

'আচ্ছা।' সালারের কাছে এটা মজার খেলা মনে হচ্ছিল।

সিকান্দার উসমান একটা নাম্বার ডায়াল করে রিসিভার নামিয়ে রাখে। সালার তার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে তার গতিতে নাম্বার ডায়াল করে। তার মাথা ঘুরতে লাগল। ও সেই

নাম্বারই ডায়াল করেছে, যা তিনি ডায়াল করেছিলেন। একের পর এক আরও বেশকিছু নাম্বার ডায়াল করে ছেলেকেও একই নাম্বার ডায়াল করতে বলেন। কোনোরকম ভুল ছাড়া সেসব নাম্বার ডায়াল করতে থাকে ও। তাই বুঝতে বাকি রইল না যে, ওর মাঝে ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে। স্ত্রীকে ডাকেন তিনি।

'আমি ওকে গুনতে শিখাইনি। কয়েকদিন আগে কিছু বই এনে দিয়েছিলাম শুধু। আর একবার হয়তো এমনিতেই ওর সামনে একশ পর্যন্ত বলেছি।' স্বামীর জিজ্ঞাসার উত্তরে তায়িবা সিকান্দার বললেন।

সিকান্দার উসমান ছেলেকে আবার একশ পর্যন্ত শোনাতে বলেন। ও শোনায়। ওর মা তায়িবাও অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনই বোঝেন মেধার দিক থেকে তাদের এই ছেলে অসাধারণ সক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। এজন্য নিজেদের বাকি সন্তানদের তুলনায় ওকে তাড়াতাড়ি

স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। স্কুলেও নিজের অসাধারণ মেধা দিয়ে শীঘ্রই সবার নজর চলে আসে ও।

'এই বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। সাধারণ বাচ্চাদের তুলনায় এ জাতীয় বাচ্চারা বেশি সংবেদনশীল ও জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে। যদি আপনারা যথাযথভাবে ওকে বড় করতে পারেন, তাহলে এই ছেলে আপনাদের জন্য এবং পুরো বংশের জন্য গর্বে পরিণত হবে। শুধু বংশের জন্যই না, বরং আপনাদের দেশের নামও ছড়াবে।'

সিকান্দার উসমান এবং তার স্ত্রী তায়িবা সগর্বে ভিনদেশী সাইকোলজিস্টের কথা শুনছিলেন। নিজেদের অন্য সন্তানদের তুলনায় তারা ওকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। সালার তাদের সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিল। ছেলের সব কৃতিত্বে ওকে নিয়ে বেশ গর্ববোধ করতেন।

প্রথমদিকে স্কুলে এক টার্মের পর সালারকে অন্য ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়া হতো, দ্বিতীয় টার্মের পর এর উপরের ক্লাসে। যার কারণে সিকান্দার উসমানের মাঝে কিছুটা উদ্বেগ দেখা দেয়। তিনি চাইতেন না ও আট-দশ বছর বয়সে জুনিয়র-সিনিয়র ক্যামব্রিজ শেষ করে ও-লেভেল আর এ-লেভেল এর অপেক্ষায় বসে থাকুক। কিন্তু যেই গতিতে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উঠছিল, তাতে এমন ঘটার সম্ভাবনাই বাড়ছিল।

‘আমি চাই আমার ছেলেকে বছর শেষ হলেই উপরের ক্লাসে প্রমোশন দিবেন আপনারা। এত দ্রুত, এমন অস্বাভাবিক গতিতে ও নিজের একাডেমিক ক্যারিয়ার শেষ করে ফেলুক আমি তা চাই না। ওর সাবজেক্টস, এক্টিভিটিস বাড়িয়ে দিন। তবে স্বাভাবিক নিয়মে রেখেই ওকে উপরের ক্লাসে প্রমোট করুন।’

সিকান্দার উসমানের পীড়াপীড়িতে সালারকে এক বছরে আর ডাবল বা ট্রিপল প্রমোশন দেওয়া হয় না। ওর ট্যালেন্ট

খেলাধুলা এবং অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করা হয়। দাবা, টেনিস, গলফ আর মিউজিক এই চার বিষয়ে ওর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ কাজ করত। কিন্তু এর মানে এই না যে, নিজেকে শুধু এই চারে সীমাবদ্ধ রাখত। স্কুলে হওয়া প্রায় সব খেলায় অংশ নিত ও। কোথাও অংশ না নেওয়ার পেছনে কারণ থাকত, তা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং মনে হয়নি ওর কাছে।

'জাভেরিয়া! প্রফেসর ইমতিনানের লেকচারের নোটগুলো দাও আমাকে।'

ইমামা বান্ধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল, যে টেবিলে বসে পড়ছিল। হাত বাড়িয়ে জাভেরিয়া একটা নোটবুক ওকে দেয়। ইমামা নোটবুক খুলে পৃষ্ঠা উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকে। জাভেরিয়া বইয়ে মন দেয়। কিন্তু একটু পর কিছু মনে করে ঘুরে বিছানায় থাকা ইমামার দিকে তাকায়।

'তুমি লেকচার নোট করা বন্ধ করেছ কেন?' জিজ্ঞেস করে ওকে।

ইমামা নোটবুক থেকে মুখ তোলে। 'কিছু বুঝলে তারপর না নোট করবা'

'মানে কী? প্রফেসর ইমতিনানের লেকচার বুঝে আসে না?' জাভেরিয়া অবাক হয়। 'কত ভালো পড়ায়!'

'কখন বললাম খারাপ পড়ায়? আমি শুধু...' ইমামা কথা থামিয়ে হাতে থাকা নোটবুকটা এপিঠ-ওপিঠ করে।

জাভেরিয়া ভালো করে ওর দিকে তাকায়। 'তুমি ইদানীং খুব অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ। কোনো কারণে ডিস্টার্ব?' বই বন্ধ করে ওর পাশে এসে সহানুভূতি নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'ডিস্টার্ব...' ইমামা বিড়বিড় করে। 'না, তেমন কিছু না।'

'চোখের নিচে কালি জমেছে। কাল রাতে, হয়তো সাড়ে তিনটা। আমার চোখ খুলে যায়, তুমি তখনো জেগে ছিলে।'
'আমি পড়ছিলাম।' ইমামা আত্মরক্ষামূলক উত্তর দেয়।

'না, শুধু বই সামনে নিয়ে বসেছিলে। বইয়ে চোখ ছিল না।'
জাভেরিয়া ওর অজুহাত নাকচ করে। 'কোনো সমস্যা?'

'আমার কী সমস্যা হতে যাবে?'

'তাহলে এত চুপচাপ কেন থাকতে শুরু করেছ?' জাভেরিয়া কথা এড়িয়ে যেতে দেয় না।

'না তো, কেন চুপচাপ হব?' ইমামা হাসতে চেষ্টা করে। 'আমি আগের মতোই কথা বলি।'

'শুধু আমি না, অন্য সবাইও তোমার এই অস্থিরতা নোট করছে।' জাভেরিয়া গম্ভীর হয়।

'কোনো সমস্যা নেই, আমি শুধু পড়াশোনা নিয়ে টেনশনে থাকি।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা সবাই একসাথে পড়ি, আমাদের চেয়ে বেশি টেনশন তোমার একা হওয়ার কথা না।'

ইমামা দীর্ঘশ্বাস ফেলো। কাবু হয়ে যাচ্ছে ভেবে।

'বাড়িতে সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।'

'আসজাদের সাথে ঝগড়া হয়নি তো?'

'ঝগড়া হতে যাবে কেন?'

'তারপরও, পার্থক্যটা অনেক...'

ইমামা বান্ধবীকে থামায়। 'যখন বলছি সমস্যা নেই, বিশ্বাস কেন করছ না তুমি? এত বছরে এমন কোন কথা আছে, যা আমি তোমার সাথে শেয়ার করিনি বা এখনো আমার ব্যাপারে অজানা তুমি? তারপরও এভাবে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছ?' রাগ করে ও।

জাভেরিয়া খতমত খেয়ে যায়। 'বিশ্বাস কেন করব না? শুধু এই ভেবে জোর দিচ্ছিলাম তুমি হয়তো সমস্যার কথা বলছ না, যাতে আমি চিন্তায় না পড়ি। আর কিছু না।' মনে মনে নিজেকে শাসায়। উঠে টেবিলে এসে বই খুলে পড়তে শুরু করে। অনেকক্ষণ পড়ার পর হাই তুলতে তুলতে জাভেরিয়া অনিচ্ছাকৃত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। ইমামা নোটবুক খুলে বসে আছে, কিন্তু চোখ নোটবুকে নেই। সামনের দেয়ালে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

খালের উপরের ব্রিজ থেকে একটু দূরে ছেলেটা গাড়ি থামায়। ডিকি থেকে একটা বস্তা আর দড়ি বের করে। দড়িসহ বস্তাটা

টানতে টানতে ব্রিজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।
আশপাশ দিয়ে চলাফেরা করা পথচারীরা ওকে দেখল। কিন্তু
ও কাউকে দেখে থামল না। ব্রিজের উপরে পৌঁছে প্রথমেই
নিজের শাট খুলে পানিতে ফেলে দেয়। কয়েক সেকেন্ডের
ব্যবধানে শাট শ্রোতের সাথে ভেসে অনেক দূর চলে যায়।
ডার্ক ব্লু কালারের টাইট জিন্সে ওর দীর্ঘ উচ্চতা আর
শারীরিক অবকাঠামো ছিল নজর কাড়ার মতো। তবে এই
মুহূর্তে ওর চোখেমুখে যে অভিব্যক্তি ছিল, তা পড়া অন্য
কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ছেলেটার বয়স উনিশ বা বিশ বছর হবে। কিন্তু উচ্চতা আর
চেহারার রূপরেখা বয়সকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সাথে করে
নিয়ে আসা দড়ির এক অংশ রেখে অন্য অংশ পানিতে
ফেলে দেয় ও। দড়ি পানির নিচে চলে গেলে হাতে থাকা
অংশ দিয়ে বস্তার মুখে গিঁট দিতে থাকে, দড়ি শেষ না হওয়া
পর্যন্ত। এরপর পানিতে থাকা অংশটা উপরে তুলে
আনুমানিক তিন ফুটের মতো রেখে বাকিটা আবার পানিতে
ছেড়ে দেয়। নিজের পা দুটো একসাথে করে দুই-তিনবার

ভালোভাবে দড়ি পেঁচিয়ে শক্তভাবে বাঁধে। বাকি থাকা তিন ফুটের সেই টুকরো দিয়ে খুব দক্ষতার সাথে দুইটি ফাঁস তৈরি করল। এরপর লাফিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ে উঠে বসে। ডান হাত কোমরের পেছনে নিয়ে প্রথম ফাঁসে ঢুকিয়ে বাঁহাত দিয়ে টেনে দড়ি টাইট করে নেয়। বাঁ-হাতও একইভাবে দ্বিতীয় ফাঁসে ঢুকিয়ে ডান হাতের সাহায্যে দড়ি টেনে টাইট করে। চেহারা অংশে তৃপ্তির হাসি ফোটে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ব্রিজের রেলিং থেকে নিচে লাফ দেয়। ধপ করে ওর মাথা পানিতে গিয়ে পড়ে। শরীর কোমর অবধি পানিতে ডুবে যায়, দড়ি শেষ হয়ে আসে।

ছেলেটা এখন উল্টো বুলছে। দুই হাত পেছনে পিঠের সাথে বাঁধা। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত পানির নিচে। বস্তার ওজন নিশ্চয়ই ওর ওজনের চেয়ে বেশি, যার কারণে বস্তু ওর সাথে নিচে চলে আসেনি। বরং সেটার সাথে আটকে উল্টো হয়ে বুলছিল। শ্বাস আটকে রেখেছে ও। মাথা পানিতে যাওয়ার পর চোখ খোলা রাখার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। পানি ঘোলা। কাদা চোখে যায়। তাই চোখ বন্ধ করে রাখে। ফুসফুস ফেটে

যাওয়ার উপক্রম হয় এবার। শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতেই নাক-মুখ দিয়ে পানি শরীরে ঢোকা শুরু করে। ভীষণভাবে কাতরায় ও। কিন্তু হাত খুলে নিজেকে উপরে তোলার কোনো সুযোগ নেই। ওর দেহের নড়াচড়া ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে। কিছু মানুষ ওকে ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছে। তারা চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে। দড়ি এখনো নড়ছে। লোকজন বুঝতে পারছিল না তাদের কী করা উচিত। পানির নিচের নড়াচড়া ক্রমশ নিস্তেজ হতে থাকে।

ছেলেটার পা দুটো এখন নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে। ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন আতঙ্কিত হয়ে প্রাণহীন সেই অস্তিত্বের দিকে তাকিয়ে ছিল। ব্রিজের উপরের ভিড় বাড়ছে। পানির নিচে থাকা অস্তিত্ব ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে। শুধু পানি দেহটাকে নাড়াচাড়া করছিল একটা পেডুলামের মতো সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে...

'ইমামা! তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও।' রাবেয়া আলমারি থেকে জামা বের করতে করতে বলে।

'রেডি হব কেন?' ইমামা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রাবেয়াকে।

'শপিংয়ে যাব, সাথে যাবো।' রাবেয়া তাড়াহুড়োয় ইস্ত্রি আনপ্লাগ করে।

'আমি কোথাও যাব না।' ইমামা বিছানায় শুয়ে ছিল। কথা শেষ করে চোখের উপর হাত রাখে।

'তুমি কোথাও যাবে না মানে কী, তোমাকে জিজ্ঞেস করল কে? জানানো হচ্ছে।' রাবেয়া ওর সুরেই বলে।

'আমিও বলে দিয়েছি কোথাও যাচ্ছি না।' ইমামা চোখের উপর হাত রেখেই বলল।

'জয়নবও যাবে, পুরো গ্রুপ যাচ্ছি। ফেরার সময় মুভি দেখবা'
রাবেয়া পুরো প্রোগ্রাম বলল।

ইমামা একবারের জন্য চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে
রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করে। 'জয়নবও যাবে?'

'হ্যাঁ, জয়নবকে আমরা রাস্তা থেকে পিক করবা'

ইমামা কিছু ভাবল।

'তুমি বড্ড পানসে হয়ে যাচ্ছ ইমামা!' রাবেয়া বিরক্তি প্রকাশ
করে। "আমাদের সাথে কোথাও আসা-যাওয়াই বন্ধ করে
দিয়েছ, কী হয়েছে?"

'কিছু হয়নি, আমি আজ একটু ক্লান্ত। তাই ঘুমাতে চাইছি।'
রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল ইমামা।

কিছুক্ষণ পর জাভেরিয়াও রুমে আসে। ওকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য জোরাজুরি শুরু করে। কিন্তু নিজের কথায় অনড় ও, 'না আমি ঘুমাব, অনেক ক্লান্ত।' বাধ্য হয়ে বিড়বিড় করতে করতে ওরা দু'জন বেরিয়ে যায়। রাস্তায় জয়নবকে বাসা থেকে পিক করার সময় জাভেরিয়া খেয়াল করে ব্যাগে ওর ওয়ালেট নেই, হোস্টেলে ভুলে রেখে গেছে। 'একটু হোস্টেলে চলো, ওয়ালেট নিয়ে তারপর মার্কেটে যাই।' ওর অনুরোধে সবাই হোস্টেলে ফিরে আসে। কিন্তু এসে বিস্ময়ের মুখে পড়তে হয়। কারণ রুমের দরজায় তালা ঝুলছে।

'ইমামা কোথায়?' রাবেয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'জানি না...এভাবে রুম লক করে কই যাবে? বলল ঘুমাবো।' জাভেরিয়া বলে।

'হোস্টেলে কারো রুমে যায়নি তো?' রাবেয়া নিজের অনুমান প্রকাশ করে।

পরের কয়েক মিনিট ওরা সেইসব মেয়ের রুমে যায়, যাদের সঙ্গে ওদের হাই-হ্যালো ছিল। কিন্তু কারো কাছে ইমামার কোনো খোঁজ পায় না।

'হোস্টেলের বাইরে যায়নি তো?' রাবেয়ার হঠাৎ মনে হলো।

'চলো ওয়ার্ডেনকে জিজ্ঞেস করি।' জাভেরিয়া সায় দেয়।

ওরা ওয়ার্ডেনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, ইমামা কিছুক্ষণ আগে বাইরে গেছে।' ওদের নিশ্চিত করে ওয়ার্ডেন। জাভেরিয়া আর রাবেয়া একজন অন্যজনের মুখ দেখতে থাকে।

'বলে গেছে সন্ধ্যায় ফিরবে।' ওয়ার্ডেন আরও পরিষ্কার করে।
ওরা ওয়ার্ডেনের রুম থেকে বেরিয়ে আসে।

'ইমামা যাবে কোথায়? আমাদের সাথে যাওয়ার সময় বেঁকে
বসল। ঘুম দরকার, ক্লান্ত, আর এখন গায়েব?' রাবেয়ার খটকা
লাগে।

রাতে ওরা দেরি করে ফিরল। যখন ওরা ফেরে, ইমামা তখন
রুমে। হাসিমুখে স্বাগত জানায় ওদের। 'মনে হচ্ছে আজ
ভালো কেনাকাটাই হয়েছে।' ওদের হাতে থাকা শপিং
ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বলে। ওরা কিছু বলল না, ব্যাগগুলো
একপাশে রেখে ইমামার দিকে তাকাল।

'তুমি কই ছিলে?' জাভেরিয়া জিজ্ঞেস করে।

ইমামা ভেতরে ধাক্কা অনুভব করে।

'ওয়ালেট নিতে এসে দেখি তুমি নেই, রুম লক।' জাভেরিয়া
খরখরে গলায় বলে।

'আমি তোমাদের পেছন পেছন গেছি।'

'মানে কী?' জাভেরিয়া অবোধ্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে।

'তোমরা চলে যাওয়ার পর আমার ইচ্ছে বদলে যায়। আমি এখান থেকে জয়নবের বাসায় গেছি। কারণ তোমাদের ওকে পিক করার কথা। কিন্তু দারোয়ান বলল সবাই চলে গেছে। তাই ওখান থেকে ফিরে আসি। ফেরার পথে কিছু বই কিনে নিয়ে এসেছি, ব্যস।

'দেখলে, আমি আগেই বলেছি আমাদের সাথে চলো। কিন্তু তখন না বললে, পরে বোকার মতো পিছু নিয়েছ। আমার তো সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে নিয়ে।' রাবেয়া নিশ্চিত হয়ে শপিং ব্যাগ খুলতে খুলতে বলে।

ইমামা উত্তর দেয় না। মুচকি হেসে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাবেয়া আর জাভেরিয়া শপিং ব্যাগ খুলে এক এক করে কেনাকাটা করা জিনিসপত্র দেখাচ্ছিল।

'নাম কী তোমার?'

'জানি না।'

'বাবা-মা কী রেখেছে?'

'বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করুন।'

নীরবতা...

'মানুষ কী নামে ডাকে তোমাকে?'

'ছেলেরা নাকি মেয়েরা?'

'ছেলেরা।'

"অনেক নামে ডাকে।"

'বেশি কোন নামে ডাকে?'

'Daredevil.'

আবার নীরবতা...

"আর মেয়েরা?"

'ওরাও অনেক নামে ডাকে।'

'অধিকাংশ সময় কোন নামে ডাকে?'

'এটা বলা যাবে না, It's too personal.'

লম্বা নীরবতা। গভীর নিশ্বাস। আবার নীরবতা....

'আপনাকে একটা পরামর্শ দেই?'

'আপনি আমার ব্যাপারে এমন কিছু জানার চেষ্টা করুন, যা আমি আগে থেকে জানি না। আপনার ডানদিকের টেবিলে একটা সাদা ফাইল রাখা আছে। ওটার মধ্যে আমার পাটিকুলার। অযথা এসব জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করবেন না।'

সাইকো-অন্যালিস্ট টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সামনের কাউচে শুয়ে থাকা যুবককে লক্ষ্য করলেন। যে ক্রমাগত পানাড়ছিল। যার চেহারা এক গভীর তৃপ্তিভাব এবং মনে হচ্ছে তার সাথে হওয়া এসব কথাবার্তাকে অহেতুক মনে করছে। রুমের শীতলতা, নীরবতা এবং মৃদু অন্ধকার... যার স্নায়ুর উপর বিন্দু পরিমাণও প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয় না। কথার ফাঁকে-ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে রুমের চারপাশ দেখছে। সাইকো-অন্যালিস্টের সামনে শুয়ে থাকা এই যুবক এক অদ্ভুত কেস। যে ফটোগ্রাফিক মেমোরির মালিক এবং যার আইকিউ লেভেল ১৫০ রেঞ্জের। যার রয়েছে গ্রু আউট আউটস্ট্যান্ডিং একাডেমিক রেকর্ড এবং গলফে তিনবার রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক বিজয়ের সুনাম। অথচ এতকিছুর পরও এই নিয়ে তৃতীয়বার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে তার

দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছে। ওর বাবা-মা নিয়ে এসেছে। যারা ছেলেকে নিয়ে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায়।

এই যুবক দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও ধনী এক পরিবারের অংশ। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ। দুই ভাই, এক বোন ওর বড়। বুদ্ধিমত্তা এবং মেধার কারণে বাবা-মায়ের ভীষণ আদরের সন্তান। তা সত্ত্বেও গত তিন বছরে আত্মহত্যার ভিন্ন তিন ধরনের চেষ্টা করেছে। প্রথমবার, রাস্তায় বাইক চালানোর সময় ওয়ান-ওয়ে ভেঙে অন্য রাস্তায় ঢুকে বাইক থেকে হাত সরিয়ে নেয়। পেছনে থাকা এক ট্রাফিক কনস্টেবল এই কাজ করতে দেখে। সামনে থেকে আসা গাড়ির ধাক্কায় বাতাসে উড়ে অন্য গাড়ির ছাদে পড়ে। সেখান থেকে পড়ে মাটিতে আছাড় খায়। পাঁজরের কিছু হাড়, এক হাতের বাহু এবং এক পা ফ্র্যাকচার হয়েছিল তখন ওর। সেইসময় কনস্টেবল পীড়াপীড়ি করলেও যুবকের বাবা-মা এটাকে দুর্ঘটনাই মনে করেছিলেন। কারণ ও বলেছিল, 'ভুল করে ওয়ান-ওয়ে থেকে সরে গেছি।'

দ্বিতীয়বার, পুরো এক বছর পর। নিজেকে বেঁধে লাহোরের এক ব্রিজের উপর থেকে পানিতে লাফ দেয়। আবার ওকে বাঁচিয়ে নেওয়া হয়। ব্রিজের উপরে থাকা লোকজন সেই দড়ি ধরে ওকে টেনে তোলে, যার সাথে নিজেকে বেঁধে নিচে লাফ দিয়েছিল। এবার সাক্ষী দেওয়া মানুষের সংখ্যাও বেশি ও নিজেই পানিতে লাফিয়ে পড়েছে। কিন্তু যুবকের বাবা-মায়ের বিশ্বাস হয়নি। ওর বক্তব্য ছিল, 'কিছু ছেলে গাড়ি আটকে ব্রিজের কাছে নিয়ে ওকে সেখান থেকে বেঁধে পানিতে ফেলেছে।' তাছাড়া যেভাবে বাঁধা ছিল তাতে এটাই মনে হওয়ার কথা। পরের কয়েক সপ্তাহ পুলিশ ওর বর্ণনা দেওয়া সেই ছেলেদের সারা শহর হন্যে হয়ে খোঁজে। নিরাপত্তার কথা ভেবে যুবকের বাবা একজন গার্ড নিয়োগ দেন চব্বিশ ঘন্টা সাথে থাকার জন্য।

কিন্তু তৃতীয়বার, বাবা-মায়ের চোখে ধুলো দিতে পারেনি যুবক। অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খেয়ে ফেলে। ট্যাবলেটের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, পেট ওয়াশ করার পরও বেশ কয়েকদিন অসুস্থ থাকতে হয়। এবার কারো

কোনো ভুল বোঝাবুঝি রইল না। কারণ বাড়ির বাবুটির সামনে ট্যাবলেটের গুঁড়ো দুধের সাথে মিশিয়ে খেয়েছিল ও। সিকান্দার উসমান আর তায়্যিবা সিকান্দার হতবাক হয়ে যান। বিগত বছরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একে-একে মনে পড়ে তাদের। ছেলের কথার ওপর এতদিন ভরসা করে বসে থাকার জন্য পস্তাতে শুরু করেন। পুরো পরিবার সালারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। স্কুল, কলোনি, বংশ সবখানে ওর খবর ছড়িয়ে পড়ে। এইবার নিজেও অস্বীকার করতে পারেনি যে, আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কারণ কী, এর উত্তর দিতে প্রস্তুত না। বাবা-মা, ভাই-বোন কারো কাছে মুখ খোলেনি।

সিকান্দার উসমান এ-লেভেলের পর ওকে তার বড় ছেলেদের মতো পড়াশোনার জন্য বাহিরে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন তার এই ছেলে যেকোনো জায়গায় শুধু সহজে ভর্তি না, বরং স্কলারশিপও পেয়ে যাবে। কিন্তু সত্য সামনে আসার পর তার সমস্ত প্ল্যান হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এখন সালার সেই সাইকো-আন্যালিস্টের

সামনে, যার কাছে তিনি ওকে এক বন্ধুর পরামর্শে পাঠিয়েছেন।

‘ঠিক আছে সালার, টু দ্য পয়েন্ট কথা বলি, মরতে কেন চাও তুমি?’

সালার কাঁধ উঁচিয়ে বলে। ‘আপনাকে কে বলল আমি মরতে চাই?’

‘তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছ তুমি।’

‘চেষ্টা করা এবং মরার মধ্যে অনেক পার্থক্য।’

‘প্রতিবার কাকতালীয়ভাবে বেঁচে গেছ। নাহলে নিজেকে মারার কোনে সুযোগ বাদ রাখোনি।’

‘দেখুন, আপনি যেটাকে আত্মহত্যা বলছেন আমি সেটাকে আত্মহত্যার চেষ্টা হিসেবে দেখি। আমি শুধু দেখতে চাই মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন।’

সাইকো-অ্যান্যালিস্ট তাকিয়ে ছিলেন। সালার তাকে বেশ শান্ত ভঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করছে।

'মৃত্যুর যন্ত্রণা বুঝে তুমি কী করবে?'

'বাস, এমনিতেই। কৌতূহল বলতে পারেন।'

সাইকো-অ্যান্যালিস্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ও ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। 'তো একবার চেষ্টা করার পরে তোমার সেই কৌতূহল মেটেনি?'

'ওহ! তখন আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, ঠিকমতো কিছু অনুভব করতে পারিনি। দ্বিতীয়বার... তৃতীয়বার ঠিক একই বিষয় ঘটে।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে ও।

'তার মানে তুমি চতুর্থ চেষ্টাও করবে?'

‘অবশ্যই, আমি অনুভব করতে চাই যন্ত্রণার চরমে পৌঁছালে কেমন লাগে।’

‘মানে কী?’

‘যেমন, Joy-এর সমাপ্তি Ecstasy-তে হয়। তবে আনন্দের এই সীমার পরে কী আসে? সুতরাং আবার এই সূত্র অনুযায়ী যন্ত্রণারও কোনে সীমা থাকার কথা। যে এক্সটেন্সিতে বোঝার মতো কিছু থাকে না।’

‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।’ সাইকো-আন্যালিস্ট বললেন।
‘ধরুন, আপনি স্ট্রিপটিজ দেখছেন। চারপাশে জোরে মিউজিক চলছে। ড্রিংক করছেন, কিছু ড্রাগস নিয়েছেন, নাচছেন। ক্রমশ ধীরে ধীরে চেতনা হারিয়ে ফেলছেন। আপনি এক্সটেন্সিতে আছেন অর্থাৎ মোহাবিষ্ট অবস্থায় আছেন। কোথায় আছেন, কেন আছেন, কী করছেন... কিছু জানেন না। শুধু জানেন যা করছেন আপনার তা ভালো লাগছে। আমি যখন ছুটি কাটাতে দেশের বাহিরে যাই, তখন কাজিনদের

সাথে এই ধরনের বারে যাই। তবে আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি ওদের মতো নেশায় বুঁদ হই না। I never get wild with joy. আমি এসবে তেমন সুখ খুঁজে পাই না, যা অন্যরা পায়। এই বিষয় আমাকে হতাশ করে। তাই ভাবলাম আনন্দের শেষ সীমায় না পৌঁছাতে পারি, অন্তত যন্ত্রণার চরম সীমায় পৌঁছে দেখি। কিন্তু সেটাও হচ্ছে না।

'তুমি এই ধরনের বিষয়ে কেন সময় নষ্ট করছ? কত উজ্জ্বল একাডেমিক রেকর্ড রয়েছে তোমার...'

সালার বিরক্ত হয়ে বলে উঠল। 'প্লিজ। প্লিজ। এখন আমার গুণকীর্তন শুরু করবেন না। আমার জানা আছে আমি কী। অসহ্য হয়ে গেছি নিজের প্রশংসা শুনতে শুনতে।' ওর সুরে তিক্ততা।

সাইকো-অন্যালিষ্ট কিছুক্ষন তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখলেন। 'তুমি নিজের জন্য কোনো গোল কেন সেট করছ না?'

'করেছি আমি।'

'কী সেটা?'

'আত্মহত্যার আরেকটা চেষ্টা।'

'তোমার কোনো ডিপ্রেশন আছে?'

'Not at all.'

'তাহলে মরতে কেন চাও?'

সালার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'আপনাকে এখন আবার নতুন করে বলতে হবে আমি মরতে চাই না, অন্য কিছু করার চেষ্টা করছি।'

ঘুরেফিরে কথা সেই এক জায়গা এসে দাঁড়িয়েছে। সাইকো-আন্যালিস্ট কিছুক্ষণ ভাবলেন। 'তুমি এসব কোন মেয়ের জন্য করছ?'

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক চোখে তার দিকে তাকায়। 'মেয়ের জন্য?'

'হ্যাঁ, কোনো মেয়ে যাকে তুমি পছন্দ করো। বা বিয়ে করতে চাও।'

সালার জোরে হেসে ওঠে। এরপর শুধু হাসতেই থাকে। 'My God! আপনার কথার মানে হচ্ছে, কোনো মেয়ের জন্য আমি আত্মহত্যা...' কথা অসম্পূর্ণ রেখে আবার হাসতে থাকে। 'মেয়ের প্রেম...সেজন্য আত্মহত্যা... ভালো জোক্স!' হাসি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ও।

সাইকো-অ্যান্যালিস্ট এমন আরও বেশ কয়েকটা সেশন ওর সাথে করেন। কিন্তু ফলাফল প্রতিবার সেই পুরোনো গল্প।

'আপনারা ওকে পড়াশোনার জন্য বাহিরে পাঠানোর পরিবর্তে আপাতত এখানেই রাখুন। সেইসাথে আরও মনোযোগ দিন।

হতে পারে মনোযোগ পাওয়ার জন্যই এসব করছে।" পরামর্শ দেন তিনি।

যার কারণে ওকে বাহিরে পাঠানোর পরিবর্তে ইসলামাবাদের এক প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। সিকান্দার উসমান ভাবলেন কাছে রাখলে হয়তো ছেলে আর এসব করবে না। সালার বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তে কোনো দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ঠিক যেমন তাদের বাহিরে পাঠানোর সিদ্ধান্তে কোনো আনন্দঘন প্রতিক্রিয়া ছিল না ওর মাঝে।

সাইকো-অ্যান্যালিস্টের সঙ্গে শেষ সেশনের পর সিকান্দার উসমান বাড়ি নিয়ে এলেন ওকে। এসে তিনি এবং তার স্ত্রী মিলে ওর সাথে লম্বা-চওড়া মিটিং করেন। নিজেদের বেডরুমে বসিয়ে সেসব আরাম-আয়েশের কথা মনে করায়, যা তারা বছরের পর বছর ওকে দিচ্ছে। ওর কাছে থাকা নিজেদের আশার কথা জানায়। আদর করে বোঝায়, যা তারা ওর জন্য অনুভব করে। ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে চুইংগাম চিবুতে চিবুতে বাবার অস্থিরতা আর মায়ের কান্না দেখছিল ও।

কথাবার্তার শেষদিকে সিকান্দার উসমান প্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন। 'কীসের কমতি রয়ে গেছে তোমার? কী নেই যা তুমি চাও? বলো।'

সালার কিছুক্ষণ ভাবে। 'স্পোর্টস কার।' পরের মুহূর্তেই বলে ওঠে।

'ঠিক আছে, স্পোর্টস কার আনিয়ে দেবো। কিন্তু এমন কিছু আর না, যা এতদিন করেছ, ওকে?' সিকান্দার উসমান কিছুটা হালকাবোধ করলেন।

সালার মাথা নাড়ে। তায়িবা সিকান্দার টিস্যুতে চোখের পানি মুছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ও রুম থেকে বেরিয়ে গেলে সিকান্দার উসমান সিগারেট ধরাতে ধরাতে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন। 'তায়িবা। ওর প্রতি তোমার আরও মনোযোগ দিতে হবে। নিজের এক্টিভিটিস কমিয়ে ছেলের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করো।'

তায়িবা সিকান্দার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

ওয়ারসিম দূর থেকে বোনকে লনে বসা দেখতে পায়। কানে হেডফোন লাগিয়ে কিছু শুনছে ইমামা। ওয়ারসিম পা টিপে টিপে পেছন থেকে এসে একটানে ওর কান থেকে হেডফোনের কর্ড খুলে নেয়। টের পেয়ে ইমামা দ্রুত স্টপ বাটন ক্লিক করে ওয়াকম্যান বন্ধ করে দিলো।

'এখানে একা বসে বসে কী শোনা হচ্ছে হ্যাঁ?' বলে ওয়ারসিম হেডফোন নিজের কানে লাগায়।

ততক্ষণে ইমামার ক্যাসেট বন্ধ করা শেষ। চেয়ার থেকে উঠে হেডফোন নিজের দিকে টানতে টানতে ভাইকে বলল। 'অভদ্রতারও একটা সীমা থাকা উচিত ওয়ারসিম! বিহেভ ইউরসেলফ!' চেহারা রাগে লাল হয়ে ওঠে।

ওয়ারসিম হেডফোনের কর্ড ছাড়ল না। বোনের রাগ নরম করতে পারেনি ওকে। 'আমিও শুনতে চাই তুমি কী

শুনছিলো। এখানে অভদ্রতা কোথেকে এলো? ক্যাসেট অন করো।"

ইমামা বিরক্ত হয়ে ওয়াকম্যান থেকে হেডফোন খুলে আলাদা করে। 'তোমার শোনার জন্য আমি এখানে ওয়াকম্যান নিয়ে বসিনি। হেডফোন নিয়ে এখান থেকে বিদায় হও।' হেডফোনের আশা ছেড়ে নিজের চেয়ারে বসল ও।

ইমামা শক্ত করে ওয়াকম্যান ধরে রেখেছে। ওয়াসিমের মনে হলো ওর বোন কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু ঘাবড়াতে যাবে কেন? মনে মনে ভাবে। কিন্তু ভাবনা ঝেড়ে সামনের চেয়ারে বসে হেডফোন টেবিলের উপর রেখে বলে। 'এই নাও, রাগ থামাও। ফিরিয়ে দিচ্ছি হেডফোন, শোনো যা শুনছিলো।' মিটমাট করার উদ্দেশ্যে হাত সরিয়ে নেয়।

‘এখন আর শোনার ইচ্ছে নেই আমার। হেডফোন তুমিই রেখে দাও।’ ইমামা হেডফোনের দিকে হাত বাড়ায় না।

'কিন্তু...কী শুনছিলে?'

'মানুষ কী শোনে?'

"গজল হয়তো?"

'জানো ওয়াসিম, তোমার অনেক স্বভাব বয়স্ক মহিলাদের মতো।'

'যেমন?'

'যেমন, চুলচেরা বিশ্লেষণ করা। অন্যদের পেছনে লেগে থাকা, তাতে লজ্জাও না পাওয়া।'

'আর তুমি জানো, ধীরে ধীরে তুমি নিজে কতটা স্বার্থপর হয়ে উঠছ?' ওয়াসিমও পাল্টা বলল।

ইমামা ভাইয়ের কথায় কিছু মনে করে না। 'আচ্ছা, তুমি জেনে গেছ আছি স্বার্থপর?' হেসে বলল।

'তুমি যে পরিমাণ বোকা, তাতে আশা করিনি এত দ্রুত আমার কথার মানে বুঝে ফেলবে। আর শোনো, যদি তুমি আমাকে লজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করো তাহলে থেমে যাও। কারণ আমি আজকে লজ্জা পাব না।' ওয়াসিম গোঁয়ারতুমি দেখিয়ে বলে।

'তারপরও এই ধরনের চেষ্টা আমাদের ওপর ফরজ।'

'আজ তোমার মুখ একটু বেশিই চলছে না?'

'হতে পারে...'

'হতে পারে না, এটাই হচ্ছে। তাও ভালো নীরবতার রোজা ভেঙে ফেলেছ, যা ইসলামাবাদ এসে রাখা শুরু করে দাও।'

ইমামা ভাইয়ের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। 'কীসের
নীরবতার রোজা?'

'লাহোর যাওয়ার পর থেকে তুমি অনেক বদলে গেছ।'

'আমার ওপর পড়াশোনার চাপ থাকে।'

'সবার ওপর থাকে, ইমামা! কিন্তু কেউ এভাবে মাথায় নিয়ে
ঘোরে না।'

'আচ্ছা এসব বাজে তর্ক বাদ দাও। বলো, তুমি আজকাল কী
করছ?'

'আরাম...' ওয়াসিম চেয়ার দোলাতে দোলাতে বলল।

'এটা তো সারা বছরই করো। ইদানীং কী নিয়ে ব্যস্ত?'

'ইদানীং বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছি। তোমার জানার কথা পরীক্ষা শেষে আমার ব্যস্ততা কেমন থাকে। সবকিছু ভুলে যাচ্ছ তুমি?' ওয়াসিম বিষণ্ণ চোখে তাকায়।

'আমি এই আশায় প্রশ্ন করেছিলাম হয়তো এই বছর তোমার কোনো উন্নতি হয়েছে, কিন্তু না। আমার প্রশ্ন অপচয় হলো।' ইমামা অভিযোগের উত্তরে বলল।

'তোমাকে মনে করিয়ে দেই আমি তোমার চেয়ে এক বছরের বড়, তুমি না। তাই নিজের জ্ঞানগর্ভ নিজের কাছে রাখো।'

'পাশের বাড়ির ছেলের সাথে তোমার সম্পর্কের কী অবস্থা?' ইমামার হঠাৎ করে মনে পড়ায় জিজ্ঞেস করল।

'চুচুর সাথে? ব্যস, অদ্ভুতরকম।' ওয়াসিম কাঁধ উঁচিয়ে বলল।

'ভীষণ আজর মানুষ একটা! মুড ভালো থাকলে মানুষকে সপ্তম আসমানে বসিয়ে রাখবে আর খারাপ হলে... সোজা নর্দমায় ফেলে আসবে।'

'তোমার বেশিরভাগ বন্ধুই এমন।' ইমামা হাসতে হাসতে বলল। 'ঝাঁকের কই ঝাঁকে গিয়েই মেশে।'

'ঠিক তেমনও না। অন্তত আমার অভ্যাস আর চালচলন চুচুর মতো না।'

'ওর তো বাহিরে যাওয়ার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, জানি না... মনে হয় ওর বাবা-মা পাঠাচ্ছে না।'

'বেশভূষা কেমন অদ্ভুত! আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়, কোনো-না-কোনোভাবে হিল্লিদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিংবা ভবিষ্যতে হয়ে যাবে।'

'তুমি দেখেছ ওকে?'

'কাল বাড়ি ফেরার পথে দেখলাম। বের হচ্ছিল, সঙ্গে একটা মেয়ে।'

'একটা মেয়ে?'

'জিন্স পরা ছিল।'

'জিন্স পরা?'

"হ্যাঁ।"

'মাশরুম কাট চুল? ফর্সা?' ওয়াসিম তুড়ি বাজিয়ে হেসে বলল। 'আরসা... ওর গার্লফ্রেন্ড।'

'আগেরবার তো তুমি অন্য কারো নাম নিচ্ছিলে?' ইমামা বাঁকা চোখে তাকায়।

'আগেরবার কবে?' ওয়াসিম ভাবতে লাগল।

'সাত-আট মাস আগে, তোমার সঙ্গে ওর গার্লফ্রেন্ডের কথা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তখন শিবা ছিল। এখন সেই মেয়ে কোথায় আছে কে জানে! একবার তো চুচু গাড়ির পেছনের কাঁচে মোবাইল নাম্বার প্রিন্ট করিয়েছিল।'

ইমামা একটা মোবাইল নাম্বার বলতে বলতে হাসে।

'তোমার মনে আছে?' ওয়াসিমও হাসল।

'জীবনে প্রথমবার কোথাও এত বড় করে মোবাইল নাম্বার লেখা দেখেছি, তাও গাড়ির কাঁচে নিজের নামসহ! মনে তো থাকবেই।'

'আমিও ভাবছি গাড়ির কাঁচে মোবাইল নাম্বার প্রিন্ট করানোর কথা।' ওয়াসিম ভাব নিয়ে চুল পেছনে ঠেলে বলল।

'কোন মোবাইলের... যা তুমি এখনো কিনতেই পারোনি?' ইমামা ভাইকে নিয়ে ইয়ার্কি করে।

'এই মাসেই মোবাইল কিনব আমি।'

‘তাহলে বাবার কাছ থেকে জুতা খাওয়ার জন্যও তৈরি
থেকো। তুমি মোবাইল নাম্বার গাড়ির কাঁচে লেখালে, প্রথম
ফোন তারই আসবে।’

‘ব্যস! এজন্যই প্রতিবার থেমে যাই।’ ওয়াসিম ঠান্ডা নিশ্বাস
ফেলে বলল।

‘এটাই ভালো, বাবার হাতে এই বয়সে নিজের হাড় ভাঙার
চেয়ে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করো। তাছাড়া... তোমার জন্য
বিপদ আরও বেশি। সামিয়া এই ধরনের কোনো মোবাইল
নাম্বারের কথা জানতে পারলে তো...’

ওয়াসিম বোনকে থামায়। ‘তো কী করবে সামিয়া? আমি ভয়
পাই নাকি ওকে?’

‘আমি জানি তুমি সামিয়াকে ভয় পাও না। কিন্তু ছয় ভাইয়ের
একমাত্র বোনের সঙ্গে বাগদানের আগে সেসব সুযোগ-

সুবিধার কথাও বিবেচনা করা উচিত ছিল, যা এসব কাজ করার পর তোমাকে মোকাবেলা করতে হবে।" ইমামা ভাইয়ের বাগদত্তার কথা টেনে খোঁচা মারে।

'এখন আর করার কী? আমার ভাগ্যে লেখা ছিল এইসব।' ওয়াসিম আফসোসের শ্বাস ফেলে। 'আমার মোবাইল কেনা উচিতই হবে না। কারণ কাজে লাগাতে পারব না তা। অন্তত যতদূর বিষয় গার্লফ্রেন্ড খোঁজার...' বলে আবার চেয়ার দোলাতে লাগল।

'যাক, দেহিতে হলেও তোমার মাথায় ঢুকেছে।' ইমামা হাত বাড়িতে হেডফোন নেয়।

'কী শুনছিলে তুমি?' বোনকে হেডফোন নিতে দেখে ওয়াসিমের আবার মনে পড়ে।

'তেমন কিছু না।' ইমামা উঠে যায়, যেন ওয়াসিমের কাছ থেকে রেহাই দরকার।

'যেহেতু লাহোর যাচ্ছেন, ফেরার পথে মেয়ের হোস্টেলে একটু গিয়ে আসুন। এগুলো ওর কিছু জামা-কাপড়, টেইলারের কাছ থেকে এনে রেখেছি, দিয়ে আসবেন।' সালমা মুবীন স্বামীকে বললেন।

'লাহোরে আমি ব্যস্ত থাকব। ওর হোস্টেলে আসা-যাওয়ার সময় কোথায়?' হাশিম মুবীন স্ত্রীর কথা কানে নিলেন না।

'ড্রাইভারও তো থাকবে। নিজে না পারলে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দি়েন, দিয়ে আসবে প্যাকেটটা। সিজন শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাপড় এভাবেই পড়ে থাকবে। মেয়ের তো খবর নেই, আবার কবে আসে।' সালমা মুবীন লম্বা-চওড়া কারণ দেখান।

'আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছি। সময় থাকলে নিজে দিয়ে আসব, নাহলে ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।' হাশিম মুবীন রাজি হয়ে যায়।

লাহোরে বেশ ব্যস্ত দিন পার করতে হয় তাকে। বিকেল পাঁচটার দিকে একটু অবসর পাওয়ায় সেই প্যাকেটের কথা মনে পড়ে। ড্রাইভারকে পাঠানোর পরিবর্তে নিজেই ইমামার হোস্টেলে চলে আসেন। মেয়ের অ্যাডমিশনের পর আজ প্রথম এখানে আসা হলো তার। দারোয়ানকে দিয়ে ইমামাকে ডাকতে পাঠিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। এতক্ষণে এসে পড়ার কথা। কিন্তু দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, বিশ মিনিট... ইমামা আসে না। অধৈর্য হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয়বার খবর পাঠাতে যাবেন, তখন দারোয়ানের সাথে একটা মেয়েকে আসতে দেখেন। কাছে আসার পর চিনতে পারে মেয়েটা জাভেরিয়া। ইমামার ছোটবেলার বান্ধবী, ওর বাড়িও ইসলামাবাদেই।

'আসসালামু আলাইকুম আক্কেল।' জাভেরিয়া সামনে এসে বলল।

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম, মা।' কেমন আছো তুমি?

'ভালো আছি আক্কেল।'

'ইমামার কিছু কাপড় দিতে এসেছি। লাহোর আসার পথে ওর মা দিয়ে দিলেন। এক ঘন্টা ধরে বসে আছি, কিন্তু কেউ ওকে ডেকে দেয়নি।' হাশিম মুবীনের কণ্ঠে অভিযোগ।

'আঙ্কেল! ইমামা একটু মার্কেটে গেছে বান্ধবীদের সাথে। আমাকে দিয়ে যান প্যাকেট, আমি ওকে দিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে, রেখে দাও।' হাশিম মুবীন প্যাকেট জাভেরিয়ার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে চলে যান তিনি। জাভেরিয়াও প্যাকেট নিয়ে হোস্টেলের ভেতরে পা বাড়ায়। কিন্তু এখন আর মুখে হাসি নেই। যে-কেউ ওর চেহারা দেখে ভেতরের দুশ্চিন্তা ধরে ফেলতে পারবে। হোস্টেলে ঢুকতেই ওয়ার্ডেনের মুখোমুখি হতে হয়। যিনি সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। জাভেরিয়া আবারও মুখে হাসি সাজিয়ে তোলে।

'ইমামার বাবার সাথে কথা হয়েছে তোমার?' ওয়ার্ডেন কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'জি, চিন্তার কিছু নেই। ইমামা বাড়িতে। আমার বাসা থেকে কিছু জামা-কাপড় পাঠিয়েছে, সেগুলো দিয়ে গেছেন। আফ্কেল লাহোর আসছিলেন, তাই ও নিয়ে আসতে বলে। কিন্তু আফ্কেল ভুল করে আমার নাম বলার পরিবর্তে ওর নাম বলে ফেলেছে।' জাভেরিয়া এক নিশ্বাসে অনেকগুলো মিথ্যে বলে ফেলল।

ওয়ার্ডেন স্বস্তির স্বাস নেয়। 'আল্লাহ তোমার শুকরিয়া! আমার তো চিন্তা হচ্ছিল। মেয়েটা উইকেন্ডে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে কোথায় গেল?' যেতে যেতে বললেন।

জাভেরিয়া প্যাকেট নিয়ে রুমে ফিরল। রাবেয়া ওকে দেখে তিরের মতো সোজা চলে আসে।

'কী হয়েছে? ইসলামাবাদই আছে না ও?'

'না' জাভেরিয়া হতাশা নিয়ে মাথা নাড়ে।

'মাই গড!' রাবেয়া অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বলে। 'তাহলে কোথায়?'

'আমি কী করে বলব? আমাকেও বলে গেছে বাড়ি যাবে। কিন্তু বাড়িতে যায়নি, তাহলে? ইমামা তো এমন না...।' জাভেরিয়া প্যাকেট বিছানায় ছুঁড়ে মারে।

'ওয়ার্ডেনকে কী বলেছ?' রাবেয়া চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কী বলার ছিল... মিথ্যে বলেছি। কী বলতাম? যদি বলতাম ও ইসলামাবাদ নেই, হোস্টেলে এতক্ষণে হাস্পাসা শুরু হয়ে যেত। তারা পুলিশ ডেকে আনত।' জাভেরিয়া নখ কামড়াতে কামড়াতে বলল।

'আর আফ্লেলকে... তাকে কী বলেছ?' রাবেয়া জিজ্ঞেস করল।

'তাকেও মিথ্যে বলেছি। বলেছি ইমামা মার্কেটে গেছে।'

'কিন্তু এখন কী হবে?' রাবেয়া উৎকণ্ঠা নিয়ে বলে।

'আমার চিন্তা হচ্ছে, ও না ফিরলে আমি বাজেভাবে ফেঁসে যাব। সবাই ভাববে আমি ওর ব্যাপারে জানতাম তাই ওয়ার্ডেন আর ওর বাড়ির মানুষের কাছ থেকে সব লুকিয়েছি।' জাভেরিয়ার অস্থিরতা বাড়তে থাকে।

'ওর সাথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? ও এমন ধরনের মেয়ে নয় যে...!'

রাবেয়ার মনে নতুন এক ভয়ের উদয় হয়।

'এখন আমাদের কী করার আছে? কারো সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে কথাও বলতে পারব না।' জাভেরিয়া চিন্তায় নখ কামড়াচ্ছিল।

'জয়নবের সাথে কথা বলি?' রাবেয়া বলল।

'ফর গড সেক, রাবেয়া। কখনো তো নিজের মাথা খাটাও, জয়নবকে কী বলব আমরা?' জাভেরিয়ার ভ্রু কুঁচকে যায়।

'তাহলে অপেক্ষা করি... হয়তো আজ রাতে বা কাল সকালে এসে পড়বে। চলে এলে সমস্যা থাকবে না। কিন্তু না ফিরলে ওয়ার্ডেনকে সব সত্য খুলে বলব।' রাবেয়া গম্ভীর হয়ে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়।

জাভেরিয়া কিছু বলল না। দুশ্চিন্তা চোখ-মুখ দিয়ে উপচে পড়ছিল। দু'জন সারা রাত ঘুমাতে পারল না। আপাদমস্তক আতঙ্কে কাবু হয়ে থাকে। ইমামা না ফিরলে কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর বারবার ওদের সামনে বিভিন্ন ভয়ংকর রূপে

হাজির হচ্ছিল। নিজেদের ক্যারিয়ার ডুবতে দেখে। জানে এই বিষয়ে ওদের পরিবারের মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। তারা রাগারাগি করবে। ইমামার বাবাকে সত্য না বলার কারণে সন্দেহের নিশানা বানাবে। আবার ওয়ার্ডেনের কাছে ব্যাপারটা লুকানোর জন্য আরও বকাঝকা করবে। কিন্তু ওরা জানে না, এই সত্য বেরিয়ে আসার পর স্বয়ং হাশিম মুবীন এবং তার পরিবারের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? উনি পুরো বিষয়ে ওদের রোল কীভাবে দেখবেন? হোস্টেলের মেয়েরা ওদের নিয়ে কী কী বলাবলি করবে। আর যদি পুরো বিষয়টা পুলিশ কেস হয়ে যায়...? পুলিশ ওদের এই ধামাচাপা দেওয়াকে কী ভাববে? আংশিক হলেও অনুমান করতে পারছিল। যার ফলে ওদের শরীরের পশম বারবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হলো ইমামা কোথায় গেছে এবং কেন? রাবেয়া আর জাভেরিয়া ওর পেছনের আচরণগুলো মেলানোর চেষ্টা করে। কীভাবে গত এক বছর ধরে পুরোপুরি বদলে গেছে। সবার সাথে চলাফেরা কমিয়ে দেওয়া, একা থাকতে শুরু

করা, পড়াশোনায় আগ্রহ কমে আসা এবং ওর সেই নীরবতা...।

'যে-বার ইমামা আমাদের শপিংয়ের সময় গায়েব হয়েছিল, ও নিশ্চয়ই তখনো সেখানেই গেছে, যেখানে আজ আছে। অথচ আমরা বোকার মতো ওর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।' রাবেয়ার পুরনো কথা মনে পড়ে যায়।

'কিন্তু ইমামা এমন ছিল না, আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। মোটেও এমন ছিল না ও...' জাভেরিয়ার এখনো কোনো সন্দেহ ছিল না ইমামার ওপর।

'এমন হতে সময় লাগে নাকি আবার? মানুষের চরিত্র দুর্বল হয়ে গেলেই হয়।' রাবেয়া তখন সন্দেহের চরমে।

'রাবেয়া! ওর ইচ্ছেতে এনগেজমেন্ট হয়েছিল। ইমামা আর আসজাদ একে অপরকে পছন্দ করে। ও এমনকিছু কেন করবে?' জাভেরিয়া বান্ধবীর পক্ষ নেয়।

'তাহলে তুমিই বলো ইমামা কোথায়? আমি তো জাদু করে ওকে মাছি বানিয়ে কোনো দেয়ালের সাথে আটকে রাখিনি। ওর বাবা দেখা করতে এখানে এসেছে এবং উনি বাড়ি থেকে এসেছিল, তাই এটা পরিস্কার যে ও বাড়িতে যায়নি। কিন্তু আমাদের বলে গেছে বাড়িতে যাচ্ছে।' রাবেয়া রাগ হয়ে বলল।

'এমনও তো হতে পারে ওর সাথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই হয়তো বাড়ি পৌঁছাতে পারেনি।'

'প্রতিবার হোটেল থেকে ইসলামাবাদ যাওয়ার আগে ফোন করে খবর দেয়। যাতে ওর ভাই বাসষ্ট্যান্ড থেকে নিয়ে যায়। এবারও জানালে না-পৌঁছানোর পর তারা নিশ্চয়ই ওখানে নিশ্চিন্তে বসে থাকত না, বরং এখানে ফোন করে খবর জানত। তাছাড়া ওর বাবার আচরণে তো মনে হলো না যে, এই উইকেন্ডে ওর ইসলামাবাদ যাওয়ার কোনো প্ল্যান ছিল।' জাভেরিয়ার যুক্তি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে রাবেয়া বলে।

'তা ঠিক, আগে কখনো এক মাসে দুইবার ইসলামাবাদ যায়নি ও। কিন্তু এখন প্রতি সপ্তাহে যাওয়া শুরু করেছে। ওয়ার্ডেনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে অনুমতি নেয়। কোথাও নিশ্চয়ই কিছু আছে, অবশ্যই ভুল কিছু হচ্ছে।' জাভেরিয়াকে চিন্তা আবারও জ্বালিয়ে মারছিল।

'ওর সাথে আমরাও বাজেভাবে ডুববা। এভাবে সব আড়াল করা অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। ওর বাবাকে পরিক্রার বলে দেওয়া উচিত ছিল, ও এখানে নেই। তারপর উনি যা ইচ্ছা করত, সেটা তাদের বিষয় হতো। অন্তত আমরা এভাবে ফেঁসে যেতাম না, যেভাবে এখন ফেঁসে গেছি।' রাবেয়া ক্রমাগত বিড়বিড় করছিল।

'বাদ দাও, এখন আর কী করার। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কালকে না এলে ওয়ার্ডেনকে সব বলবা।' জাভেরিয়া রুমে পায়চারি করতে করতে বলে।

সেই রাতটা ওরা দু'জন এভাবে কথা বলে, জেগে কাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালে কলেজে যায় না ওদের কেউ। এই অবস্থায় কলেজ যাওয়ার কোনো মানে নেই। ইমামা ছুটি শেষ করে সাধারণত নয়টার দিকে ফিরে আসত। কিন্তু আজ ফিরল না। মস্তিষ্ক ওদের বিপদসংকেত দিতে শুরু করে। দুপুর আড়াইটার দিকে ফ্যাকাসে চেহারা আর কাঁপা-কাঁপা হাত নিয়ে ওরা ওয়ার্ডেনের রুমে যাওয়ার জন্য নিজেদের রুম থেকে বের হয়। মস্তিষ্কে সেসব বাক্য গুছিয়ে নিচ্ছিল, যা ওয়ার্ডেনের সাথে বলতে হবে। ওয়ার্ডেনের রুম থেকে তখন ওরা একটু দূরেই, যখন ইমামাকে নিশ্চিন্তে ভেতরে ঢুকতে দেখে। কাঁধে ব্যাগ, হাতে ফোল্ডার। বোঝা যাচ্ছে কলেজ থেকে ফিরছে। রাবেয়া আর জাভেরিয়ার মনে হলো ওদের পায়ের নিচ থেকে সরে যাওয়া মাটি ফিরে এসেছে। থেমে থাকা শ্বাস সচল হয়েছে। কালকের খবরের কাগজের যে শিরোনামগুলো ভূত হয়ে ওদের চারপাশে নাচছিল, তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর সেই সবকিছুর জায়গা দখল করে নেয় রাগ, যা ইমামার চেহারা দেখে উঠছিল। ওদেরকে দেখে ইমামা এগিয়ে আসে। চেহারা বেশ হাস্যোজ্জ্বল।

'তোমরা দু'জন আজকে কলেজে আসোনি কেন?' সালাম
বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করে ও।

'আগে তোমার বিপদ থেকে নাজাত মিলুক, তারপর না
কোথাও আসা-যাওয়ার চিন্তা করতে পারব।' রাবেয়া তিক্ত
সুরে বলল।

ইমামার মুখের হাসি মিইয়ে যায়। 'কী হয়েছে রাবেয়া? এত
রেগে আছো কেন?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'তুমি একটু রুমে আসো, তারপর বলছি কেন এত রেগে
আছি।' রাবেয়া ওর হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে আসে।

জাভেরিয়া কিছু না বলে ওদের পিছু নেয়। ইমামা হতভম্ব,
বান্ধবীদের এমন আচরণে। রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়
রাবেয়া।

'কোথা থেকে আসছ তুমি?' রাবেয়া কড়া আর কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল।

'ইসলামাবাদ থেকে আর কোথা থেকে?' ইমামা কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে রাখে।

ওর উত্তর রাবেয়াকে আরও রাগিয়ে তোলে। 'লজ্জা লাগা উচিত ইমামা। এভাবে আমাদের ধোঁকা দিয়ে, চোখে ধুলো দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাও? আমরা ডাফার, ইডিয়ট আর পাগল? হ্যাঁ তাই, আমরা এগুলোই, আমরা মানি। নাহলে তোমার ওপর এমন অন্ধ বিশ্বাস করে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতাম না।'

'আমি তোমার কোনো কথা বুঝতে পারছি না। কীসের বিশ্বাসঘাতকতা? আগে শান্ত হয়ে বুঝিয়ে বলো।' ইমামা বিরক্ত হয়ে বলল।

'তুমি ছুটি কোথায় কাটিয়ে এসেছ?' জাভেরিয়া এবার কথোপকথনে যোগ দেয়।

'তোমাদের বলেছি ইসলামাবাদে। ওখান থেকে আজ সোজা কলেজে এসেছি আর কলেজ থেকে...'

রাবেয়া কথা শেষ করতে দেয় না। 'বাজে কথা বন্ধ করো। এসব মিথ্যে এখন আর চলবে না, তুমি ইসলামাবাদ যাওনি।'

'তুমি এটা কীভাবে বলছ?' ইমামাও এবার জোরে বলল।
'কারণ তোমার বাবা কালকে এখানে এসেছিল।'

ইমামার চেহারার রং উড়ে যায়। কিছু বলতে পারে না।

'এখন কেন মুখ বন্ধ? বলো ইসলামাবাদ ছিলো।' রাবেয়া খোঁচা মেরে বলে।

'বাবা... এখানে এসেছিল?' ইমামা থেমে থেমে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তোমার কিছু জামা-কাপড় দিতে।' জাভেরিয়া বলল।

'বাবা কি জেনে গেছে আমি হোস্টেলে ছিলাম না?'

'না। মিথ্যে বলেছি, তুমি একটু হোস্টেলের বাইরে। উনি প্যাকেট দিয়ে চলে গেছেন।' জাভেরিয়া বলল।

ইমামা অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। 'তার মানে বাবা কিছু জানতে পারেননি।' বিছানায় বসে জুতার ফিতা খুলতে থাকে।

'না, কিছু জানতে পারেননি। পরের সপ্তাহে আবার অন্য কোথাও চলে যেও। মাইন্ড ইট ইমামা! তোমার ব্যাপারে আমি ওয়ার্ডেনের সাথে কথা বলব। যথেষ্ট ঝামেলা মাথায় নিয়ে ফেলেছি তোমার জন্য, আর না। ভালো হবে, তোমার

বাবা-মা জেনে রাখুক তুমি কীসব করে বেড়াচ্ছ।' রাবেয়া কঠিন গলায় বলে।

ইমামা মাথা তুলে রাবেয়ার দিকে তাকায়। 'কোন সব? আমি কী করেছি?'

'কী করেছ... হোস্টেল থেকে এভাবে বাড়ির কথা বলে দুদিনের জন্য গায়েব হয়ে যাওয়া তোমার কাছে কোনো বড় ব্যাপার না?'

ইমামা উত্তর না দিয়ে অন্য জুতার ফিতা খুলতে থাকে।

'আমার ওয়ার্ডেনের কাছেই যাওয়া উচিত।' রাবেয়া রেগে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল।

জাভেরিয়া এগিয়ে রাবেয়াকে থামায়। 'ওয়ার্ডেনের সাথে কথা বলা যাবে, আগে ওর সাথে কথা বলে নেই। তাড়াহুড়ো করো না।'

'এই গোঁয়ারের চেহারা দেখো, সামান্য লজ্জাও যদি থাকত ওর মাঝে।' রাবেয়া ইমামার দিকে ইশারা করে বলে।

'তোমাদেরকে সব বলব, এত রাগারাগির দরকার নেই। আমি ভুল কিছু করিনি, ভুল জায়গায়ও যাইনি... আর হ্যাঁ, পালিয়েও যাইনি।' ইমামা জুতার বন্দিশালা থেকে পা মুক্ত করে খানিক ধীর কণ্ঠে বলল।

'তাহলে কোথায় ছিলে?' জাভেরিয়া জিজেস করে।

'আমার এক বন্ধুর বাসায়।'

'কোন বন্ধু?'

'আছে একজন....'

'এভাবে মিথ্যে বলে কেন?'

'তোমাদের প্রশ্ন থেকে বাঁচার জন্য। বাড়ির মানুষকে বললে বা অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করলে দিত না।'

'কার কাছে, আর কেন?' জাভেরিয়া এবার কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করল।

'বললাম তো বলব, আমাকে একটু সময় দাও।' ইমামা উত্তরে বলে।

'কোনো সময় দিতে পারব না। সময় দিব যাতে আবার গায়েব হয়ে যাও, আর ফিরেই না আসো?' রাবেয়া এবারও রেগে বলল। কিন্তু কণ্ঠ আগের চেয়ে নরম। 'তোমার কোনো আন্দাজ আছে কতটা অকোয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিলে আমাদের? তোমার এভাবে নাই হওয়ার কথা জানাজানি হলে আমরা কী পরিমাণ অপমান হতাম, এর কোনো খেয়াল আছে তোমার?'

'আমি ভাবিনি বাবা হঠাৎ এভাবে চলে আসতে পারে, তাই জানি না তোমাদের জন্য কেমন অকোয়ার্ড পজিশন তৈরি হয়েছিল। এমন জানলে বা বুঝলে আমি কখনোই যেতাম না।' ইমামা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলে।

'আমাদেরকে বিশ্বাস করে বলে যেতে পারতো।' জাভেরিয়া বলল।

'আমি আর কখনো এমন কিছু করব না।' ইমামা বলল।

'অন্তত আমি তোমার কোনো কথা বা ওয়াদায় ভরসা করতে পারছি না।' রাবেয়া সরাসরি বলে।

'আমাকে আমার পজিশন ক্লিয়ার করতে দাও, রাবেয়া! তুমি ভুল বুঝছ।' ইমামা ক্ষীণ স্বরে বলল।

'একবার ভেবে দেখো তোমার জন্য আমাদের ক্যারিয়ার, লাইফ কীভাবে ঝুঁকিতে পড়েছিল? এমন হয় বন্ধুত্ব? একে বন্ধুত্ব বলে?'

'ঠিক আছে, ভুল হয়েছে আমরা। এখন মাফ করে দাও।'
ইমামা ক্ষমা চায়।

'যতক্ষণ না বলছ কোথায় ছিলে, ততক্ষণ অর্থাৎ কোনো মাফ চাওয়া কবুল হবে না।' রাবেয়া নিজের কথায় অনড়।

ইমামা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল।
'আমি সাবিহাদের বাড়িতে ছিলাম।'

জাভেরিয়া আর রাবেয়া অবাক হয়ে একে-অপরের মুখ দেখল। 'কার...'

দুজনেই প্রায় একসাথে বলে উঠল।

'তোমরা সাবিহাকে চেনো।' ইমামা বলল।

'ফোর্থ ইয়ারের সাবিহা?' জাভেরিয়া জিজ্ঞেস করে।

ইমামা মাথা নেড়ে সাই জানায়।

'কিন্তু তার বাসায় তুমি কেন?'

'বন্ধুত্ব হয়েছে তার সাথে।'

'বন্ধুত্ব? কীসের বন্ধুত্ব? দুই-চারদিনের সালাম দেয়া শুধু। যতদূর আমার মনে পড়ে, তুমি সাবিহাকে ভালো করে চেনোই না। তাহলে কীভাবে তার বাড়িতে থাকতে চলে গেলে?' জাভেরিয়া আপত্তি করে বলল।

'তাও এভাবে মিথ্যে বলে? অন্তত সাবিহার বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে বা পরিবারকে মিথ্যে বলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না।' রাবেয়াও একই সুরে বলল। 'তোমরা ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো তাকে, কাল আমি তাদের বাড়িতে ছিলাম কি না।' ইমামা বলল।

'আচ্ছা, মেনে নিলাম তুমি তাদের বাড়িতে ছিলে। কিন্তু কেন?' জাভেরিয়া জিজ্ঞেস করল।

ইমামা চুপ থাকে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বলল। 'সাবিহার সাহায্য প্রয়োজন আমার।'

ওরা দুজন আবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'কোন বিষয়ে?'

ইমামা মাথা তুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে।

জাভেরিয়া অস্থিরতা অনুভব করছিল। 'কোন বিষয়ে?'

'তুমি ভালো করেই জানো।' ইমামা ক্ষীণ স্বরে বলে।

'আমি...?' জাভেরিয়া খতমত খায়। চোখ ঘুরিয়ে রাবেয়ার দিকে তাকায়, যে গম্ভীর দৃষ্টিতে ওকেই দেখছিল।

'হ্যাঁ, তুমি তো ভালো করেই জানো।'

'ধাঁধাঁয় ফেলা বন্ধ করে সোজাসাপ্টা কথা বলো।' জাভেরিয়া শক্ত গলায় বলে।

ইমামা নিঃশব্দে পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা নত করে নেয়।

'বলো না তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে কী?' সেইদিন কলেজে বান্ধবীকে জোর করেছিল ইমামা।

জাভেরিয়া কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল।
'আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছে হলো, তুমি যেন মুসলমান হয়ে যাও।'

ইমামার শরীরে যেন কারেন্ট বয়ে যায়। পাথরের মতো অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

জাভেরিয়া ধীরে ধীরে বলল। 'তুমি আমার এত কাছের বন্ধু যে, এটা ভেবে কষ্ট হয় তুমি গোমরাহির পথে হাঁটছ। এমনকি তা বুঝতেও পারছ না। শুধু তুমি নও, তোমার পুরো ফ্যামিলি। আমার ইচ্ছে, যদি কখনো কোনো নেক আমলের কারণে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দেন, তুমি যেন আমার সাথে থাকো। কিন্তু এর জন্য মুসলমান হওয়া আবশ্যিক।'

ইমামার চেহারার রং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পর কিছু বলার মতো অবস্থায় আসে ও। 'জাভেরিয়া, আমি আশা করিনি তুমিও তাহরিমের মতো কথা বলবে আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে বন্ধু ভাবতাম, অথচ তুমি...?'

জাভেরিয়া ধীরে ওকে থামিয়ে বলল। 'তাহরিম তোমাকে যা বলেছিল, তা ঠিক ছিল।'

ইমামা পলকহীন তাকিয়ে থাকে। জাভেরিয়ার কথায় ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

'শুধু আজ না, সেইদিনও তাহরিমকে ঠিক ভাবতাম আমি। কিন্তু আমার বন্ধুত্ব তোমার সাথে ছিল। তাই চেয়েও বলতে পারিনি তাহরিম ঠিক বলছে। ওর বলা কথা "তুমি মুসলমান না" এটা ভুল ছিল না... তুমি মুসলমান নও।'

ইমামার চোখে পানি এসে পড়ে। কিছু না বলে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায়। জাভেরিয়াও উঠে পড়ে। ইমামা কিছু না বলে ওখান থেকে যাওয়ার চেষ্টা করলে জাভেরিয়া হাত ধরে থামায়।

'হাত ছাড়া, যেতে দাও। আমার সাথে আর কখনো কথা বলবে না।' ইমামা অশ্রুসিক্ত গলায় হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলে।

'ইমামা! আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো। আমি...'

বলতে দেয় না ইমামা। 'তুমি আমাকে হাট করেছ। জাভেরিয়া। অন্তত তোমার কাছে আমি এটা আশা করিনি।'

'আমি হাট করছি না, সত্য বলছি। আবেগী হয়ে কান্নাকাটি করার বদলে শান্ত হয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো। অহেতুক বিষয় নিয়ে আমি কেন তোমাকে হাট করতে যাব?' জাভেরিয়া হাত ছাড়ে না।

'কেন করছ সেটা তুমিই ভালো জানো। কিন্তু আজ আমি জেনে গেছি তোমার আর তাহরিমের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তুমি ওর চেয়েও বেশি কষ্ট দিলে। ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব এত পুরনো ছিল না, যতটা তোমার সাথে।' ইমামার গাল বেয়ে চোখের পানি পড়ছিল। বারবার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে ও।

'এটা তোমার জোর ছিল, আমি যেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছের কথা তোমাকে বলি। আমি বলতে চাইনি। আগেই সতর্ক করেছি শুনলে কষ্ট পাবে। কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে এমন কিছু হবে না।' জাভেরিয়া মনে করায়।

'যদি জানতাম এই ধরনের কথা বলবে, তাহলে কখনোই তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে জানতে জোর করতাম না।' ইমামা রেগে ওঠে।

'আচ্ছা, আর কখনো আমি তোমার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলব না।' জাভেরিয়া আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে বলল।

'তাতে কী হবে? আমার তো জানা হয়ে গেছে তুমি কী ভাবো। আমাদের বন্ধুত্ব আর কখনো আগের মতো হওয়া সম্ভব না। আজ পর্যন্ত আমি কখনো তোমার আকিদা নিয়ে এই ধরনের সমালোচনা করিনি। কিন্তু তুমি আমার আকিদাকে ইসলামের একটা সম্প্রদায় না ভেবে সোজা অমুসলিম বলছ?'

'আমি যা বলছি, ভুল না। ইসলামের সব সম্প্রদায় অন্তত এই ব্যাপারে ইমান রাখে যে, হুজুর সা. শেষ রসুল। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে।'

'মাইন্ড ইউর ল্যাস্‌য়েজ।' ইমামা জ্বলে উঠল।

'আমি তোমাকে যেটা সত্য সেটাই বলছি। শুধু আমি না, সবাই জানে তোমার ফ্যামিলি টাকার জন্য মাজহাব বদলেছে। আমার কথায় এত রাগের কিছু নেই, শান্ত মন আর মস্তিষ্ক নিয়ে...'

'এসব কথা শান্ত মন-মস্তিষ্ক নিয়ে ভাবার সময় নেই আমার। আমি জানি কোনটা সত্য, কোনটা না।'

'তুমি জানো না, এটাই সবচেয়ে বড় আফসোসের বিষয়।'

ইমামা আর কিছু না বলে জোরে ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে সেখান থেকে দ্রুত পায়ে চলে যায়। জাভেরিয়া পিছু নিলো না। কিছুটা চিহ্নিত হয়ে বান্ধবীর চলে যাওয়া দেখল। ইমামা কখনো এত রাগ করে না, যা আজ করেছে। এই বিষয়টা ওকে অস্বস্তিতে ফেলছিল।

দুই

এসব স্কুলের এক ঘটনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ইমামা তখন ম্যাট্রিকের ছাত্রী। তাহরিম ও ওর ভালো বন্ধুদের একজন। অনেক বছর ধরে শুধু এক স্কুলে পড়া না; বরং ওদের পরিবারের মাঝেও ভালো জানাশোনা ছিল। অন্য সবার চেয়ে তাহরিম আর জাভেরিয়া ছিল ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। কিন্তু ইমামা অবাক ছিল, এত ভালো বন্ধুত্ব থাকলেও জাভেরিয়া, তাহরিম ওদের বাড়িতে আসতে দ্বিধা করত। ওর জন্মদিন বা বাড়ির অন্যান্য আয়োজনে ওদের দাওয়াত দিলে বাড়ি থেকে অনুমতি না পাওয়ার বাহানা দেখাত। তাই নিজেই কয়েকবার ওদের বাবা-মায়ের সাথে কথা বলে অনুমতি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু বহু মিনতির পরেও দুজনের কারো বাবা-মা ওদের বাড়িতে আসার অনুমতি দেয়নি। তাদের আচরণে কষ্ট পেয়ে মায়ের কাছে নালিশ করে ও।

'তোমার দুই বন্ধু সৈয়দ, সাধারণত এরা আমাদের সম্প্রদায়কে পছন্দ করে না। তাই ওদের বাবা-মা আমাদের বাড়ি আসতে দেয় না।' নালিশে ওর মা বললেন।

'এটা কেমন কথা? আমাদের সম্প্রদায়কে কেন পছন্দ করবে না?' ইমামা মায়ের কথায় অবাক হয়ে বলল।

'তারাই বলতে পারবে ভালো, কেন আমাদের সম্প্রদায়কে অপছন্দ করে। এরা আমাদেরকে অমুসলিমও ভাবে।'

'আমাদেরকে অমুসলিম কেন ভাবে? আমরা তো অমুসলিম না।' ইমামা অশান্ত হয়।

'হ্যাঁ, আমরাও মুসলমান। কিন্তু এরা আমাদের নবীকে মানে না।'

'কেন?'

'এখন এই কেন এর উত্তর আমি কীভাবে দেবো? এরা কটুরপন্থি। হাশরের দিনই বোঝা যাবে কারা সঠিক পথে ছিল, তারা না আমরা।'

'আম্মি! ওরা তো কখনো আমার সাথে মাজহাব নিয়ে কথা বলে না। তাহলে মাজহাব কেন সমস্যা হতে যাবে? কী আসে-যায় কে কোন মাজহাব মানে? তাছাড়া বাড়িতে এলে কী এমন হবে?'

'তাদেরকে এই কথা কে বোঝাবে? তারা আমাদের মিথ্যেবাদী বলে, অথচ আমাদের ব্যাপারে জানেই না কিছু। শুধু আলেমদের কথা শুনে চড়াও হয়। আমাদের মাজহাব বা নবীর শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা জানলেও এসব করতে লজ্জা পেত। তোমার বন্ধুরা আমাদের বাড়ি আসতে না চাইলে তুমিও যাবে না ওদের বাড়ি, ব্যসা।'

'কিন্তু আম্মি! আমার সম্পর্কে ওদের ভুল ধারণা দূর করা প্রয়োজন।'

'সম্ভব না। কারণ ওদের বাবা-মা ক্রমাগত বাচ্চাদের ব্রেইন ওয়াশ করে। ওদের মনে আমাদের জন্য বিষ ঢালে।'

'আম্মি। ওরা আমার বেষ্টফ্রেন্ড। আমাকে নিয়ে ওদের এমন ভাবা উচিত না। আমি ওদেরকে আমার বই পড়তে দেবো, যাতে আমাকে নিয়ে থাকা ভুল দূর হয়ে যায় ওদের মাঝে। এমনও হতে পারে, সত্য জানার পর ওরাও আমাদের নবীর ওপর ইমান এনে ফেলবে।'

ইমামার মা কিছু ভাবলেন।

'আমার পরামর্শ পছন্দ হয়নি আপনার?'

'তা নয়, অবশ্যই ওদেরকে বই দিতে পারো। কিন্তু এমনভাবে না, মনে হয় তুমি নিজের মাজহাব প্রচার করছ। বলবে তুমি চাও ওরা যাতে আমাদের ব্যাপারে জানে এবং আমাদের ভালোভাবে বোঝে। এটাও বলে দেবে, এই বইয়ের কথা

যেন বাড়িতে না বলে। নাহলে কিন্তু ওদের বাড়ির লোকজন
আরও রাগ করবে।

ইমামা মায়ের কথায় মাথা নেড়ে সায় জানায়।

কয়েকদিন পরের কথা, স্কুলে কিছু বই নিয়ে যায় ইমামা।
টিফিন টাইমে মাঠে আসার সময় সেগুলো সাথে নিয়ে
আসে।

'আমি তোমার আর জাভেরিয়ার জন্য কিছু এনেছি।'

'কী এনেছ? দেখাও।'

ইমামা ব্যাগ থেকে বইগুলো বের করে দুইভাগ করে
দুইজনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। বইয়ের দিকে তাকিয়ে ওরা
কিছুটা চুপ হয়ে যায়। জাভেরিয় কিছু না বললেও তাহরিম
তেতে ওঠে।

'এগুলো কী?' শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'বই, তোমাদের জন্য এনেছি।'

'কেন?'

'যাতে তোমাদের ভুল দূর হয়।'

'কোন ভুল?'

'যা আমাদের মাজহাব নিয়ে তোমাদের মাঝে রয়েছে।'

'কে বলল, তোমাদের মাজহাব বা নবীকে নিয়ে আমরা ভুল ভাবি?'

'আমি আন্দাজ করতে পারি। এই জন্য তোমরা আমাদের বাড়িতে আসো না। হয়তো ভাবো আমরা মুসলমান না, কুরআন পড়ি না বা হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে নবী মানি না।'

অথচ এমন না। আমরা সবকিছুর ওপর ইমান রাখি। আমরা শুধু বলি হজরত মুহাম্মাদ সা.-র পরে আমাদের একজন নবী আছেন এবং তিনিও একই শ্রদ্ধেয়।" ইমামা বেশ গম্ভীর হয়ে ব্যাখ্যা করে।

তাহরিম হাতে থাকা বইগুলো ফিরিয়ে দেয়। 'তোমাদের নিয়ে বা তোমাদের মাজহাব নিয়ে আমাদের কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই। বরং এই বিষয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জানি, তাই তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না।' বেশ তীক্ষ্ণ সুরে বলল। 'আর যতদূর কথা রইল এই বইয়ের, তাহলে বলব আমার বা জাভেরিয়ার হাতে এত অহেতুক সময় নেই যে এই অযথা দাবি, নিজেদের মনমর্জির নিয়ম এবং গোঁড়ামির পথ চেনার জন্য নষ্ট করব। যেগুলোকে তুমি নিজের বই বলছ।'

তাহরিম এক টানে জাভেরিয়ার হাতে থাকা বইগুলোও ফিরিয়ে দেয়। লজ্জায় ইমামার চেহারা লাল হয়ে ওঠে।

তাহরিমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই ধরনের ব্যবহার পাবে আশা করেনি। বুঝলে বই দেওয়ার মতো বোকামি করত না।

'সেই নবী, যাঁর ওপর নবুওয়াত নাজিল হয়েছে এবং সে, যে নিজে ঘোষণা দেয় তার নবী হওয়ার; তাদের মাঝে জমিন-আসমানের তফাত। যদি তোমরা সত্যিই কুরআন বিশ্বাস করতে, তবে এর প্রতিটি হরফের ওপর ইমান থাকত। নবী হওয়া এবং নবী দাবি করা দুটো আলাদা বিষয়।'

'তাহরিম! তুমি আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে অসম্মান করছ।' ইমামা ছলছল চোখে বলে।

'আমি কাউকে অসম্মান করছি না, শুধু সত্য বলছি। এটা তোমার কাছে অসম্মান মনে হলে আমার কিছু করার নেই।' তাহরিম নির্লিপ্তভাবে বলল। 'রোজা রাখা এবং না খেয়ে থাকার মাঝে যেমন পার্থক্য, তেমন কুরআন পড়া এবং তার ওপর বিশ্বাস রাখার মাঝে। বহু খ্রিষ্টান, হিন্দুরা ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য কুরআন পড়ে, তাই বলে কি তাদের

মুসলিম মেনে নেওয়া যাবে? বহু মুসলিমও অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে, তাহলে কি তারা অমুসলিম হয়ে যাবে? তোমরা হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে নবী মেনে কোনো অনুগ্রহ করছ না। তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার পর কী বাকি থাকে? হ্যাঁ, ইঞ্জিল অস্বীকার করতে পারো। যাতে হুজুর সা.-র নবুওয়াতের সুসংবাদ জানানো হয়েছিল। তাওরাত অস্বীকার করতে পারো, যার মাঝে তাঁর নবুওয়াতের বর্ণনা ছিল। তাহলে তো পবিত্র কুরআনকেও অস্বীকার করতে হবে, কারণ এর মাঝে তাঁকে শেষ নবী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তোমাদের নবী যদি হজরত মুহাম্মাদ সা.-র নবুওয়াতের সমাপ্তি অস্বীকার করে, তাহলে নিজস্ব নবুওয়াত দাবি করার আগে এত বছর যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রচার করত মুহাম্মাদ সা. শেষ নবী এবং ইসলাম চূড়ান্ত ধর্ম, সেগুলো কী ছিল? সুতরাং ইমামা হাশিম, সেসব বিষয় নিয়ে তর্ক করতে এসো না, যার মূল সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। না তুমি এই মাজহাব সম্পর্কে জানো, যার ওপর চলছ, না সেই মাজহাব সম্পর্কে যা নিয়ে কথা বলছ। আর একটা বিষয় আমি

তোমাকে বলে দিচ্ছি, ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। তোমরা মুহাম্মদ সা.-র শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করলেও ধর্মের কিছু যায়-আসে না।"

'কিন্তু আমরা হজরত মুহাম্মাদ সা.-র নবুওয়াতকে বিশ্বাস করি।' ইমামা জোর দিয়ে বলে।

'আমরাও ইঞ্জিল কিতাব বিশ্বাস করি, ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে মানি। হজরত ইসা আ.-এর নবুওয়াত বিশ্বাস করি। তাহলে কি আমরা খ্রিষ্টান? হজরত মুসা আ.. হজরত দাউদ আ.-র নবুওয়াত বিশ্বাস করি, তাহলে কি আমরা ইহুদি!' তাহরিম বিদ্রূপের সুরে বলল। 'তবু আমাদের ধর্ম ইসলাম, কারণ আমরা মুহাম্মাদ সা.-কে অনুসরণ করি। অন্য সব নবীর ওপর বিশ্বাস রাখলেও আমরা খ্রিষ্টান বা ইহুদি হয়ে যাই না। ঠিক একই বিষয় তোমাদের ক্ষেত্রেও। কারণ তোমরা নিজের নবির অনুসারী। যাইহোক, তোমরাও তো আমাদের মুসলমান মনে করো না। তুমি জোর দিচ্ছ তোমরা ইসলামের একটা সম্প্রদায়, কিন্তু তোমাদের নবী এবং তার পরে আসা

জামায়েতের সকল নেতার দাবি, যার মির্জার নবুওয়াত বিশ্বাস করে না তারা মুসলমান না। তাহলে তো তোমরাই আগে থেকে সব মুসলমানকে ইসলাম থেকে বাদ দিয়ে রেখেছ।

'এমন কিছু না। আমি কখন এমন কিছু বললাম?' ইমামা বিড়বিড় করে বলে।

'তুমি এই বিষয় নিয়ে তোমার বাবার সাথে ডিসকাস করো। তিনি এই সম্পর্কে তোমাকে বেশ আপডেট দিতে পারবেন। মাজহাবের বিশিষ্ট নেতা বলে কথা।' তাহরিম বলল। 'আর এই যে বইগুলো আমাদের দিচ্ছিলে, নিশ্চয়ই তুমিও পড়েছ। পড়োনি? পড়লে তো এসব প্রধান নেতা সম্পর্কে জানার কথা।'

জাভেরিয়া পুরো কথোপকথনে নীরব থাকে। শুধু আড়চোখে ওদের দেখেছিল।

'আল্লাহ তায়ালা বলেন, হজরত মুহাম্মাদ সা. তাঁর শেষ নবী। আমাদের নবীও এই সাক্ষ্য দেন তিনি আল্লাহর শেষ নবী। আমাদের কিতাব এ দুটো বিষয়কে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে পৌঁছে দিয়েছে। তাই আমার জন্য অন্যদের প্রমাণ বা স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই, বুঝেছ?' তাহরিম নিজের প্রতিটি শব্দে জোর দেয়। 'তোমার মাজহাব হোক বা আমার মাজহাব, এসব নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। এত বছর ধরে বন্ধুত্ব চলছে, চলতে দাও। কথা রইল তোমাদের বাড়ি না যাওয়ার। হ্যাঁ এটা ঠিক, আমার বাবা-মা তোমাদের বাড়ি যাওয়া পছন্দ করেন না। স্কুলে বন্ধুত্ব অন্য বিষয়। এখানে সবাই সমান। তাছাড়া বন্ধুত্বে মাজহাব কোনো বাধা না। কিন্তু বাড়িতে আসা-যাওয়া ভিন্ন বিষয়। হয়তো আমার কোনো হিন্দু-খ্রিষ্টান বা ইহুদি বন্ধুর বাড়িতে যাওয়াতেও তাদের আপত্তি থাকবে না, কিন্তু তোমার বাড়িতে যাওয়ায় আছে। কারণ অন্যরা নিজস্ব ধর্ম পালন করে নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে না। যে ধর্ম মানে সেটাই স্বীকার করে। আরেকটা সত্য হচ্ছে, যতটা অপছন্দ তোমাদের করা হয়, ততটা অন্যদের করা হয় না। কারণ তোমরা অর্থ-সম্পদ,

ভালো-সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য মাজহাব বদলেছ এবং ধর্মেও
টোকার চেষ্টা করছ। কিন্তু হিন্দু, খ্রিষ্টান বা ইহুদিরা তা করে
না।"

তাহরিমকে থামিয়ে ইমামা বলল। 'কীসের টাকা-পয়সার কথা
বলছ? তুমি আমার ফ্যামিলিকে চেনো, তারা শুরু থেকেই
ধনী। আমাদেরকে কীসের টাকা দেওয়া হয় এই মাজহাব
পালন করার জন্য?'

'হ্যাঁ, এখন তোমরা অনেক সচ্ছল। কিন্তু শুরু থেকে সব এমন
ছিল না। তোমার দাদা একজন মুসলমান ছিল। সাধারণ গরিব
মানুষ। কৃষি কাজ করতেন। রাবওয়াহ থেকে একটু দূরে তার
কিছু জমি ছিল। একদিন তোমার চাচা তার এক বন্ধুর মাধ্যমে
কোথাও গিয়ে এই মাজহাব গ্রহণ করে আসে এবং ধনী হয়ে
যায়। কারণ ওখান থেকে প্রচুর টাকাপয়সা পাওয়া শুরু
করেছিল। আন্তে আন্তে তোমার বাবা এবং কাকারাও
নিজেদের মাজহাব পরিবর্তন করে নেয়। এরপর থেকে
তোমাদের পরিবার দেশের অন্যতম প্রভাবশালী পরিবার

হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। এসব করা মানুষ তোমরা একা নও, অধিকাংশ মানুষকে এভাবেই এই মাজহাবের অনুসারী বানানো হয়।

'তুমি মিথ্যে বলছ।' ইমামা রেগে উঠল।

'বিশ্বাস না হলে নিজের বাড়ির লোকজনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, এত সম্পদ কী করে এলো? এখনো-বা কীভাবে আসছে? তোমার বাবা এই মাজহাবের তাবলিগ করে। প্রতিবছর লাখো ডলার আসে তার কাছে বিদেশি মিশন, এনজিও থেকে।' তাহরিম তাক্ষিল্যের সুরে বলল।

'মিথ্যে, একদম পরিষ্কার মিথ্যে।' ইমামা চোঁচিয়ে ওঠে। 'আমার বাবা কোথাও থেকে কোনো টাকা পায় না। মাজহাব নিয়ে কাজ করায় ভুল কী? অন্যসব মাজহাব নিয়ে কি কাজ করা হয় না? অন্য মাজহাবেরও তো নেতা থাকে, এমন অনেক লোকজন থাকে যারা সাপোর্ট করে।'

'অন্যসব মাজহাবের মানুষ ইউরোপীয় মিশন থেকে টাকা পায় না।'

'আমার বাবাও কোথাও থেকে কিছু পান না।'

তাহরিম প্রত্যুত্তর না করে উঠে চলে যায়। ইমামা তাকিয়ে থাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে বসে থাকা জাভেরিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'তুমিও কি আমার সম্পর্কে এমন ভাবো?'

'তাহরিম রাগের মাথায় এসব বলেছে, তুমি ওর কথায় কষ্ট পেয়ো না।' জাভেরিয়া সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। 'এসব ছাড়ো, চলো ক্লাসে। টিফিন শেষের দিকে।'

জাভেরিয়ার কথায় নীরব সায় জানিয়ে ইমামা উঠে দাঁড়ায়।

সেদিন বাড়ি ফিরে রুম আটকে কাঁদতে থাকে ইমামা। তাহরিমের বলা কথা ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। হাশিম মুবীন

সেই সন্ধ্যায় এমনিই তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে এসে স্ত্রী সালমার কাছে শোনে মেয়ের শরীর ভালো না। তাই অবস্থা জানতে ওর রুমে আসে। মেয়ের ফোলা ফোলা চোখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। 'কী হয়েছে ইমামা?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

ইমামা উঠে বসল। কোনোরকম লুকোনোর চেষ্টা না করে ইচ্ছেমতো কাঁদতে থাকে।

হাশিম মুবীন চিন্তিত হয়ে মেয়ের পাশে বসলেন। 'কী হয়েছে ইমামা?'

'আজ স্কুলে তাহরিম আমার সঙ্গে অনেক বাজে ব্যবহার করেছে।'

হাশিম মুবীন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। 'আবার ঝগড়া হয়েছে তোমাদের?'

'বাবা! আপনি জানেন না ও আজ কী করেছে।' তার স্বস্তি টের পেয়ে নারাজ হয় ও। 'বাবা, তাহরিম...'

তাহরিমের সাথে হওয়া সবকিছু খুলে বলতে থাকে। হাশিম মুবীনের চেহারায় পরিবর্তন চলে এলো।

'তোমাকে কে বলেছে ওদের শেখাতে স্কুলে বই নিয়ে যাও?' মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন।

'আমি ওদের ভুল দূর করতে চেয়েছিলাম।' ইমামা ক্ষীণ আওয়াজে বলে।

'তোমার কী দরকার কারো ভুল দূর করার? ওরা আমাদের বাড়িতে না আসতে চাইলে, না আসুক। আমাদের খারাপ ভাবলে, ভাবুক। তাতে আমাদের কী?' হাশিম মুবীন বোঝাতে লাগল। 'কিন্তু তোমার এই আচরণে না-জানি ওরা কী ভাববে? কাকে, কাকে বলে বেড়াবে তুমি ওদেরকে বই দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ওদের পরিবারের মানুষজন জানলে আরও রাগ

করবে। ইমামা! আমরা কী, তা সবাইকে বলে বেড়ানোর দরকার নেই। এমনকি নিজের মাজহাব নিয়েও তর্কে জড়াতে নেই। কেউ তর্কের চেষ্টা করলে হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মিলিয়ে চলে আসতে হয়। নাহলে মানুষ অযথা কথা বানায়, আজেবাজে সন্দেহ করে।

'কিন্তু বাবা! আপনি তো কত মানুষকে তাবলিগ করেন, তাহলে আমাকে কেন নিষেধ করছেন?' ইমামা মিনমিনিয়ে বলে।

'আমার কথা আলাদা। আমি তাদের সাথে মাজহাব নিয়ে কথা বলি, যাদের সঙ্গে আমার খোলামেলা সম্পর্ক। যারা আমার তাবলিগ দ্বারা প্রভাবিত হবে বলে আমি আশ্বস্ত। দুই-চার দিনের পরিচয়ে আমি কাউকে বই দেওয়া শুরু করি না।' তিনি বললেন।

'বাবা! ওদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দুই-চার দিনের না, আমরা অনেক বছর ধরে বন্ধু।' ও আপত্তি করে।

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা দুজন সৈয়দ এবং ওদের পরিবার খুব ধার্মিক। তোমার এটা মাথায় রাখা উচিত ছিল।'

'আমি শুধু নিজেদের মাজহাব সম্পর্কে বলতে চেয়েছি, যাতে ওরা আমাদের অমুসলিম না ভাবো।'

'ভাবলেই হবে? ওরা নিজেরা অমুসলিম।' হাশিম মুবীন আকিদা নিয়ে বললেন। 'গোমরাহির পথে হাঁটছে।'

'বাবা! তাহরিম বলেছে আপনি বিদেশি মিশন ও এনজিও থেকে টাকা পান। তা দিয়ে মানুষকে আমাদের মাজহাবের অনুসারী বানান।'

হাশিম মুবীন না-বোধক মাথা নাড়েন। 'আমি শুধু জামায়াত থেকে টাকা পাই। তাও যা আমাদের কমিউনিটি সংগ্রহ করে। আমাদের নিজেদের টাকার কমতি কোথায়? আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরি নেই? তাছাড়া বিদেশি মিশন ও এনজিও থেকে টাকা দিলেও আমি তা আনন্দের সাথে নেব। এতে

দোষের কী আছে? ধর্মের খেদমত করা, নিজের মাজহাবের প্রচার-প্রসার করায় দোষ কোথায়? যদি এই দেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার হয়, তাহলে আমাদের মাজহাব কেন না? আমরাও ইসলামের একটা দল, মানুষকে হেদায়তের পথে আনার চেষ্টা করছি।" বিশদভাবে বললেন। 'কিন্তু তুমি মানুষের সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাবে না। এমন তর্কে ফায়দা নেই। আমরা এখন সংখ্যায় অল্প। যখন বেড়ে যাব তখন এসব মানুষ আমাদেরকে নির্দিধায় এতকিছু বলে যেতে পারবে না। এভাবে অপমান করার আগে ভাববো। কিন্তু আপাতত এ ধরনের মানুষের সাথে তর্কে জড়ানো উচিত না।'

'বাবা! সংবিধান আমাদের সংখ্যালঘু ও অমুসলিম বলে কেন ঘোষণা দিয়েছে? আমরা যেহেতু ইসলামের একটা সম্প্রদায়, তাহলে কেন তারা আমাদের বারবার অমুসলিম বলে?' ইমামার আরেকটা কথা মনে পড়ল।

'এসব আলেমদের কাজকর্ম। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। যখন আমাদের সংখ্যা

বেড়ে যাবে, আমরাও তখন আইন নিজেদের অনুকূলে আনব। সংবিধান থেকে এ জাতীয় সব সংশোধনী অপসারণ করব।" হাশিম মুবীন তেজি কণ্ঠে বললেন। 'তখন আর তোমাকে এভাবে বোকার মতো রুম আটকে কান্না করতে হবে না।' মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যান।

সেটা তাহরিমের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের শেষ দিন ছিল। এর পেছনে তাহরিমের চেয়ে ওর আচরণই বেশি দায়ী। তাহরিমের কথায় এত কষ্ট পেয়েছিল যে, আগের মতো সম্পর্ক রাখা কঠিন ছিল ওর জন্য। তাহরিমও সেই নীরবতার দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করেনি।

আহমাদিয়া জামায়াতের প্রভাবশালী নেতাদের একজন হাশিম মুবীন। তার বড় ভাই আজম মুবীনও এই জামায়াতের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাদের বংশের গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া সকলেই বহু বছর আগে কাদিয়ানি মাজহাব গ্রহণ করে নিয়েছিল, যখন তার ভাই এই মাজহাবের প্রচার শুরু করেছিল। বংশের যারা কাদিয়ানি মাজহাব গ্রহণ করেনি,

তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয় তারা। বড় ভাই আজম মুবীনকে অনুসরণ করে হাশিম মুবীনও মাজহাবের প্রচার-প্রসার করতে থাকে। দশ-পনেরো বছরের মধ্যে তারা দু'জন এই মাজহাবের বিশিষ্ট নেতায় গণ্য হতে শুরু করে। সেইসাথে প্রচুর অর্থ-সম্পদ উপার্জন হয়। যা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে তারা। কিন্তু তাদের আয়ের মূল উৎস ছিল তাবলিগের প্রচারের জন্য আসা বিভিন্ন তহবিল। এরপর থেকে তাদের পরিবার ইসলামাবাদের এলিট ক্লাসের অংশ হয়ে ওঠে।

অঢেল ধন-সম্পদ থাকার পরও হাশিম মুবীন ও আজম মুবীনের বাড়ির পরিবেশ বেশ প্রথাশীল ছিল। বাড়ির মেয়েরা নিয়মিত ঢেকে চলাফেরা করত। কিন্তু তার মানে এই না, মেয়েদের ওপর অযাচিত বিধিনিষেধ বা জবরদস্তি চাপানো ছিল। এই মাজহাবের মেয়েদের শিক্ষার হার সবসময়ই পাকিস্তানের অন্য যেকোনো মাজহাবের তুলনায় বেশি ছিল। এসব পরিবারের মেয়েরা স্বনামধন্য সব প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বের হয়। ইমামাও এই পরিবেশে বেড়ে

উঠেছে। যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়, ওকে তাদের একজন বলা যায়। কখনো বাবা হাশিম মুবীনকে আর্থিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে দেখেনি ও। তাই তাহরিমের বলা কথা 'ওর পরিবার টাকার জন্য এই মাজহাব গ্রহণ করেছে' তা অবিশ্বাস্য ছিল। বিদেশি মিশন, এনজিও থেকে আসা তহবিলের দায়ও অগ্রহণযোগ্য ছিল ওর কাছে। কারণ জানে ওর বাবা এই মাজহাবের প্রচার-প্রসার এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। যা স্বাভাবিক। ছোট থেকেই এসব বিষয়ে বাবা-চাচাদের মাথাব্যথা দেখে বড় হয়েছে। এটা ওর জন্য অন্যসব মাজহাবের প্রচার-প্রসারের মতো ছিল। পরিবারের সাথে নিজেও বহুবার মাজহাবি সমাবেশে যোগ দিত। নিয়মিত লন্ডন থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হওয়া বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতা শুনে-দেখে বড় হয়েছিল। তাই তাহরিমের সাথে ঝগড়া হওয়ার আগে কখনো নিজস্ব মাজহাব নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেনি। নিজেদের মাজহাব ওর কাছে ইসলামের অন্যান্য মাজহাবের মতোই ছিল। ওর ব্রেইন এভাবেই ওয়াশ করা রাখা হয়েছিল যে, ভাবত ওরা সঠিক পথে আছে এবং জান্নাতে যাবে।

বাড়িতে শুরু থেকেই অন্যসব ভাইবোনের সাথে ইমামাকেও এই উপদেশ দেওয়া হয় যে, কারণ ছাড়া কাউকে না বলে বেড়াতে ওরা কোন মাজহাবের। স্কুলে পড়াকালীন জানতে পারে, ১৯৭৪ সালে পার্লামেন্ট এই মাজহাবকে একটি অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ভেবেছিল এটা অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের চাপের মুখে নেওয়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাহরিমের সাথে হওয়া ঝগড়া ওকে নিজের মাজহাব নিয়ে খেয়াল করতে, ভাবতে বাধ্য করে। ঝগড়ার পর যে পরিবর্তনটা ওর মাঝে আসে তা হলো মাজহাব নিয়ে অধ্যয়ন। কাদিয়ানি মাজহাবের পবিত্র কিতাব এবং মাজহাবের প্রচারে ব্যবহার হওয়া বই ছাড়াও অন্যসব বই পড়তে শুরু করে। মূলত তখন ওর ভেতরে সংশয়ের সূত্রপাত হয়। কিন্তু কিছু সময় যাওয়ার পর মাথা থেকে সেরসব খটকা ঝেড়ে ফেলে। ম্যাট্রিক শেষ হওয়ার পর আসজাদের সঙ্গে বাগদান হয়ে যায়। আসজাদ ওর বড় চাচা আজম মুবীনের ছেলে। এটা প্রেমের বাগদান না হলেও ইমামা ও আসজাদের একে-অপরের প্রতি পছন্দ এই সম্পর্কের ভিত মজবুত করে। সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পর

আসজাদের জন্য মনের মাঝে বিশেষ জায়গা তৈরি হয়ে যায় ওর। পছন্দের মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পর নেক্সট টার্গেট ছিল মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়া। এই বিষয় নিয়ে যদিও বিশাল কোনো চাপ ছিল না। জানত বাবার নাগাল এত দূর যে, মেরিট লিস্ট না এলেও তিনি ওকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করাতে পারবেন। নাহলে বিদেশ পাঠিয়ে দেবে।

'গত কয়েকদিন ধরে তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে, কোনো সমস্যা?' রাতে বোনকে জিজ্ঞেস করে ওয়াসিম। ইদানীং অনেক চুপচাপ আর অস্থির লাগছিল ইমামাকে।

'না তো, তেমন কিছু না। তোমার ভুল হচ্ছে।' ইমামা হাসতে চেষ্টা করে। 'ভুল হচ্ছে না, কিছু একটা হয়েছে। যাইহোক, বলতে না চাইলে আলাদা বিষয়।'

ডাবল বেডে বোনের কাছ থেকে একটু দূরে শুয়ে ছিল ওয়াসিম। ইমামা ফাইলে রাখা নোট উল্টে-পাল্টে দেখছিল।

কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে ওয়াসিম আবার একই কথা তোলে। 'আমি ঠিক বলছি না, তুমি বলতে চাইছ না?'

'হ্যাঁ, আমি আপাতত বলতে চাই না।' ইমামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বীকার করে। 'বলতে পারো, হয়তো আমি কোনো সাহায্য করতে পারব।' ওয়াসিম উসকায় ওকে।

'ওয়াসিম! আমি বলব, কিন্তু এখন না। সাহায্য লাগলে নিজেই চাইব।' ইমামা ফাইল বন্ধ করে বলল।

'ঠিক আছে, যেমন তোমার ইচ্ছে। আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।' ওয়াসিম বিছানা ছেড়ে উঠে যায়।

ওয়াসিমের অনুমান ঠিক, জাভেরিয়ার সাথে হওয়া সেদিনের ঝগড়ার পর থেকে ইমামা চিন্তিত। যদিও জাভেরিয়া পরদিনই মাফ চেয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাতে ইমামার অস্থিরতা, খটকা একটুও কমেনি। জাভেরিয়ার কথা ওকে নতুন করে চিন্তায়

ফেলে দেয়। এক-দেড় বছর আগে তাহরিমের সাথে হওয়া ঝগড়া মনে পড়ে যায়। সেইসাথে নিজের মাজহাব নিয়ে জমে থাকা প্রশ্ন আর দ্বিধা জেগে ওঠে, যা মাজহাব অধ্যয়নের সময় মস্তিষ্কে অনুভব করেছিল।

'জাভেরিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে আমি যেন মুসলমান হয়ে যাই। মুসলমান হয়ে যাই...?' এক অদ্ভুত দোটানার মাঝে ছিল ও। 'তাহলে কি আমি মুসলমান না? আমার বেস্টফ্রেন্ডও আমাকে মুসলমান মনে করে না? এসব কি শুধু সেই প্রোপাগান্ডার কারণে, যা আমাদের নিয়ে ছড়ানো হয়েছে? কেন শুধু আমাদের ব্যাপারেই এসব বলা হয়? আমরা সত্যিই কি তবে ভুল কিছু করছি? ভুল কোনো আকিদা কবুল করে নিয়েছি? কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? আমার পরিবার কেন এমন করতে যাবে বা আমাদের পুরো কমিউনিটি কেন এরকম করবে?' এসব প্রশ্ন থেকে মুক্তির চেষ্টায় এক সপ্তাহ পর একজন বড় আলেমের দ্বীনের কুরআনের তাফসির কিনে ফেলল। ওদের ব্যাপারে অন্যান্য মাজহাবের মতামত কী জানতে। কুরআনের তরজমা এর

আগেও বহুবার পড়েছিল, তবে পরিবর্তিত অবস্থায়। কিন্তু আগে বিশ্বাস করত না ওরা যে কুরআন পড়ে তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ আলেমের তাফসির পড়াকালীন সেসব পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারে, যা ওদের মাজহাবের কুরআন তরজমায় ছিল।

পর্যায়ক্রমে একের পর এক বিভিন্ন মাজহাবের তরজমা দেখতে শুরু করে। সেগুলোর কোনোটার মাঝেই সেসব পরিবর্তন ছিল না, যা ওদের তরজমায় ছিল। যদিও প্রতিটি সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার ব্যবধান অনেক। ইসলাম ও নিজের মাজহাব নিয়ে যত জানতে থাকে, ভেতরের অস্থিরতা তত বেড়ে চলে। প্রতিটি তাফসিরে ইসলামের শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে বলা হয়েছে। কোথাও কোনো ছায়াময় বা উন্মি নবীর অস্পষ্ট ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। মাসিহ মাওউদের সত্যতাও খোলাসা হয়ে যায় ওর সামনে। নিজের মাজহাবের নেতাদের মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী এবং বাস্তবতার দ্বন্দ্ব ওকে ব্যথিত করে তোলে। নবুওয়াত দাবি করার আগে ওদের পয়গম্বর সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছিল

ইসা আ.-কে নিয়ে। অথচ পরে নবুওয়াত দাবি করার সময় বলেছে, হজরত ঈসা আ.-এর রুহ তার মধ্যে স্থাপিত করা হয়েছে। এই কথা মেনে নিলেও হজরত ঈসা আ. তাঁর পুনরুত্থানের পর চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন। যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন সারা বিশ্বে ইসলামের আধিপত্য চলবে। কিন্তু সেই পয়গম্বরের মৃত্যুর পর সারা বিশ্বে তো দূরের কথা, বরং ভারতবর্ষে মুসলমানরা নিজেদের স্বাধীনতা পায়নি।

নিজেদের পয়গম্বরের সেসব কথাবার্তায়ও বিস্মিত হয়, যা তিনি বিভিন্ন কিতাবে বিরোধীদের এবং অন্যান্য নবীর জন্য বলে গেছে। কখনো কোনো নবী এমন ভাষা ব্যবহার করতে পারে, যা সেই নবুওয়াতের দাবিদার করেছিল? অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ওর মন নিজস্ব মাজহাবের লিটারেচার ও ধর্মীয় কিতাবের ওপর থেকে উঠতে শুরু করে। আগের মতো বিশ্বাস, ভরসা তো অনেক দূরের কথা... সবকিছুর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। যদিও জাভেরিয়ার কাছে বলেনি নিজেদের মাজহাব থেকে সরে অন্যান্য বই পড়ছে ও। বাড়ির মানুষও কখনো টের পায়নি ঘরে বসে কীসব পড়ছিল।

বইগুলো নিজের রুমে খুব নিরাপদে লুকিয়ে রাখত। শুধু একদিন এমন হয়েছিল, ওয়াসিম ওর রুমে বই খুঁজতে এলে সেই কুরআনের তাফসির হাতে পড়ে যায়।

'এটা কী ইমামা?' ওয়াসিম আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

ইমামা মাথা তুলে তাকিয়ে থমকে যায়। 'এটা... এটা... কুরআনের তাফসির।' কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে।

'আমিও জানি, কিন্তু এটা এখানে কী করছে? তুমি এটা কিনেছ?'

'হ্যাঁ, কিনেছি। তাতে এত অবাক হওয়ার মতো কী আছে?'

'বাবা জানলে কী পরিমাণ রাগ করবে আন্দাজ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু এটা আপত্তি করার কিছু না।'

'তোমার এটা কেন দরকার হলো?' ওয়াসিম তাফসির আগের জায়গায় রেখে দেয়।

'কারণ আমি জানতে চাই অন্য মাজহাব কুরআনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী।'

ওয়াসিম পলকহীন বোনের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমার মাথা ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। অন্য মাজহাব সম্পর্কে জানলে বা তাদের তাফসির পড়লে খারাপ কী?'

'আমাদের এসবের কোনো প্রয়োজন নেই।' ওয়াসিম রেগে উঠে বলল।

'তোমার না থাকলেও আমার আছে। চোখ বন্ধ করে সবকিছু মেনে নেওয়ার পক্ষবাদী না আমি।'

'তো... এসব তাফসির পড়ে তোমার সন্দেহ দূর হয়ে গেছে?'
ওয়াসিম খোঁচা মেরে বলল।

ইমামা মাথা তুলে তাকায়। 'আগে নিজের আকিদা নিয়ে
আমার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এখন আছে।'

বোনের কথায় ওয়াসিমের চোখ কপালে ওঠে। 'দেখেছ!
এসব বই পড়লে এমনই হয়...' এজন্য বলছি এ ধরনের বই
পড়ার দরকার নেই। আমাদের জন্য নিজেদের বই যথেষ্ট।'

'ওয়াসিম! আমি কুরআনের এত তাফসির, এত তরজমা
দেখেছি কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় হলো কোথাও আমাদের
নবীর উল্লেখ নেই। প্রতিটি ব্যাখ্যায় আহমাদ বলতে মুহাম্মাদ
সা.-কে বোঝানো হয়েছে, আমাদের নবীকে না। কোথাও
আমাদের নবীর উল্লেখ থাকলেও সেটা একজন মিথ্যে
নবুওয়াতের দাবিদার হিসেবে।'

'অন্য মাজহাবের মানুষেরা আমাদের ব্যাপারে এমন কথা ছড়াবে না তো কারা ছড়াবে? তারা যদি আমাদের নবীর নবুওয়াত সত্য বলে, তাহলে তো দ্বন্দ্বই শেষ হয়ে যাবে। তাই এরা কখনো নিজেদের তাফসিরে সত্য লিখবে না।'

'যা আমাদের তাফসিরে রয়েছে, তা সব সত্য লিখেছি আমরা?'

'মানে কী বলতে চাও ইমামা?' ওয়াসিম হতভম্ব হয়ে যায়।

'আমাদের নবী কেন অন্য নবীদের ব্যাপারে অসংযত ভাষা ব্যবহার করেছেন?'

'তিনি তাদের প্রসঙ্গে বলে গেছেন, যারা তার ওপর ইমান আনেনি।'

'কেউ ইমান না আনলেই তাকে গালি দেওয়া যাবে?'

'রাগের বহিঃপ্রকাশ যেকোনো উপায়ে ঘটতে পারে।'

'রাগের বহিঃপ্রকাশ না অসহায়ত্ব লুকানো?'

এই বাক্যে ওয়াসিম স্তব্ধ হয়ে রইল।

'যখন হজরত ঈসা আ.-এর ওপর মানুষ ইমান আনেনি, তখন তো তিনি মানুষকে গালি দেননি। হজরত মুহাম্মাদ সা.-র ওপরও প্রথমদিকে মানুষ ইমান আনেনি, কিন্তু তিনিও কাউকে গালি দেননি। মুহাম্মদ সা. তো তাদের জন্যও দোয়া করেছিলেন, যারা তাঁকে পাথর মেরেছিল। যে ওহি কুরআন আকারে হজরত মুহাম্মদ সা.-র ওপর নাজিল হয়েছে, তাতে কোনো গালি নেই। কিন্তু যে সংকলনকে আমাদের নবী তার ওপর নাজিলকৃত বলে, তা গালিতে ভরপুর।'

'ইমামা! সবার মেজাজ একে-অপরের চেয়ে ভিন্ন। প্রতিটি মানুষ আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।' ওয়াসিম দ্রুত বলে উঠল।

ইমামা দমে না। 'আমি সব মানুষের কথা বলছি না, নবীর কথা বলছি। যে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তিনি নবুওয়াতের দাবি কীভাবে করেন? যার মুখ দিয়ে গালি বের হয়, তার মুখ থেকে কী করে সত্য ও ন্যায়ের কথা বের হতে পারে? নিজের মাজহাব ও আকিদা নিয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় এখন। এত তাফসিরে কোনো উম্মি নবীর উল্লেখ থাকলেও সেটা হজরত ঈসা আ.-র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় না আমাদের নবী হজরত ঈসা আ. ছিলেন বা সেই মাসিহ মাউদ। না... উনি তিনি নন, যার প্রত্যাবর্তনের কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।'

'তোমার ভাষণ বন্ধ করলে ভালো হয়। যথেষ্ট বাজে কথা বলে ফেলেছ।' ওয়াসিম ধমক দিয়ে বলল।

'বাজে কথা!' ইমামা ভাইয়ের দিকে তাকায়। 'তোমার মনে হলো আমি বাজে কথা বলছি? আচ্ছা, মসজিদে আকসা যদি আমাদের শহরে থাকে তাহলে এত-শত বছর ধরে ফিলিস্তিনে যে মসজিদে আকসা রয়েছে সেটা কী? এক

নামের দুটি পবিত্র স্থান তৈরি করে আল্লাহ কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন? মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, ইহুদি... খ্রিষ্টান... পুরো পৃথিবী সেই মসজিদকে প্রথম কেবলা স্বীকার করে। যদি কেউ না করে, সেটা শুধুই আমরা। অদ্ভুত না।"

'ইমামা! এসব বিষয় নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করে পারব না। ভালো হবে যদি তুমি বাবার সাথে আলোচনা করো।' ওয়াসিম বিরক্ত হয়ে উঠল। 'কিন্তু বড় ভুল করছ এমন অহেতুক আলোচনা শুরু করে। আমি বাবাকে সব বলব, এটাও যে আজকাল ঘরে বসে কীসব পড়ছ।' হুমকি দেয়।

ইমামা ভাবতে ভাবতে শঙ্কিত হয়ে চোঁট কামড়াতে থাকে। ওয়াসিম আরও কিছুক্ষণ রাগ ঝেড়ে রুম থেকে চলে যায়। সারা রুমে পায়চারি করতে থাকে ও। বাবাকে খুব ভয় পায়। আর জানে ওয়াসিম এসব বলবেই। যার ফলে বাবার প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা নিয়ে ভীত ছিল।

বোনের সাথে হওয়া তর্কের কথা হাশিম মুবীনকে বলে দেয় ওয়াসিম। তবে এমন অনেক কিছু এড়িয়ে যায়, যা শুনলে উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু এতেই তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যেন নিজের বাড়িতে সাপের গন্ধ পেয়েছে।

'এসব ইমামা বলেছে?' ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন।

ওয়াসিম উত্তর হিসেবে মাথা নাড়ায়।

'ওকে ডেকে আনো।'

ওয়াসিম ইতস্ত হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে আসে। ইমামাকে ডাকতে কাজের লোক পাঠিয়ে ও নিজের রুমে চলে যায়। বাবা আর বোনের কথার মাঝে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে নেই। রুমের দরজায় নক করে ইমামা রুমে ঢুকে দেখল বাবা-মা চুপ করে বসে আছে। হাশিম মুবীন যে দৃষ্টিতে তাকালেন, তাতে ওর ভেতরটা আরেকটু জোরেশোরে কেঁপে ওঠে।

বাবা, আপনি...ডে... কে...ছেন...?' চেষ্টা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারল না।

'হ্যাঁ, ডেকেছি। ওয়াসিমের সাথে কীসব বলেছ তুমি?' হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ইমামা ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকে।

'শোনোনি কী জিজ্ঞেস করেছি?' আবার গর্জে ওঠেন। 'লজ্জায় ডুবে মরা উচিত তোমার। নিজে গুনাহ করে সঙ্গে আমাদেরকেও টানছ?'

ইমামার চোখে পানি চলে আসে।

'তোমাকে নিজের সন্তান বলতে লজ্জা লাগছে আমার। কীসব বই এনেছ?' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। 'যেখান থেকে ওসব এনেছ, কালকেই সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। নাহলে তুলে বাইরে ফেলব আমি।'

'জি, জি বাবা!' চোখের পানি মুহুতে মুহুতে এটুকু বলতে পারে ও।

'আজকের পর থেকে জাভেরিয়ার সঙ্গে মেলামেশা রাখলে তোমার কলেজে যাওয়া বন্ধ।'

'বাবা! জাভেরিয়া আমাকে কিছু বলেনি। এ ব্যাপারে কিছু জানে না।' ইমামা এবার কিছুটা প্রতিবাদ করে।

'তাহলে আর কে আছে, যে তোমার মাথায় এসব আবর্জনা ভরছে?' বজ্র কঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমি নিজেই... বাবা...' ও কিছু বলার চেষ্টা করে।

'কী মনে করো নিজেকে? আকিদা পরীক্ষা করতে নামার আগে নিজের বয়স দেখেছ একবার? তুমি করবে নবুওয়াত যাচাই?' হাশিম মুবীন বলতে থাকেন। 'নিজের বাবার চেহারা দেখো! যে সারা জীবন তাবলিগ করে কাটিয়েছে। আমি

মস্তিষ্কের দিক থেকে অন্ধ, নাকি তুমি আমার চেয়ে বেশি
জ্ঞানী? দুই শুক্রবার মিলিয়ে আট দিন হবে জন্মের আর তুমি
নেমেছ নবীকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে? তুমি সেই নবীর জন্য মুখে
সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছ, যার নবুওয়াত আজ যাচাই
করতে বের হয়েছে। তার ছায়া না থাকলে আমাদের পুরো
পরিবার আজ পথে পথে ধাক্কা খেত। অথচ তুমি এত
অকৃতজ্ঞ, যে থালায় খাও তাতেই ছিদ্র করো।" রাগে তার কণ্ঠ
ফেটে আসছিল।

ইমামার চোখের পানির গতি আরও বাড়ে।

'বন্ধ করো এসব পড়াশোনা, ঘরে বসে থাকো। এসব শিক্ষা
পাচ্ছ, যা গোমরাহির পথে নিয়ে যায়?'

এই বাক্যে ইমামার হুঁশ উড়ে যায়। ওর কল্পনায়ও ছিল না
তিনি ঘরে বসিয়ে রাখার কথা বলতে পারেন। 'বাবা, আ'ম
সরি!' এই এক বাক্য ওকে নতজানু হতে বাধ্য করে।

‘তোমার কোনো এক্সকিউসের দরকার নেই। ব্যস, বলে দিয়েছি বাড়িতে থাকবে; এটাই হবে।’

‘বাবা! আমি... আমার এমন কোনো মানে ছিল না। জানি না ওয়াসিম... আপনার সাথে কীভাবে বলেছে।’ ওর চোখের পানি ক্রমশ বাড়ছিল। ‘তবু বলছি সামনে থেকে এমন কিছু পড়ব না, বলবও না। প্লিজ বাবা।’ ইমামা মিনতি করে।

এই মাফ চাওয়ার ধারা সেখানেই শেষ হয়নি। পরবর্তী বেশ কিছুদিন তার কাছে মাফ চাইতে থাকে ও। প্রায় এক সপ্তাহ পর তিনি নরম হয়ে কলেজে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু সেই এক সপ্তাহ পুরো বাড়ির অভিশাপ আর অভিযোগের শিকার হয় ও। হাশিম মুবীন কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে কলেজে যেতে দিয়েছিলেন। তবে সেই এক সপ্তাহ সবার আচরণ নিজের আকিদার প্রতি আরও বিমুখ করে তোলে ওকে।

সেসব বই পড়ার ধারাবাহিকতা বন্ধ করেনি ও। শুধু পার্থক্য ছিল, আগে বাড়িতে নিয়ে আসত এরপর থেকে কলেজের

লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ত। এফ.এস.সিতে মেরিট লিস্টে আসার পর মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেয়।

জাভেরিয়াও একই কলেজে অ্যাডমিশনের সুযোগ পায়। ওদের বন্ধুত্ব আগের চেয়ে বেশি জোরালো হয়ে ওঠে। যার প্রধান কারণ ছিল ওর মাঝে আসা সেই পরিবর্তন।

সাবিহার সাথে ইমামার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটনাচক্রে হয়। জাভেরিয়ার এক কাজিন সাবিহার ক্লাসফেলো ছিল। সেইসূত্রে ওর সঙ্গে পরিচয়। সাবিহা ধর্মীয় সংগঠনের শাখার সাথে যুক্ত থাকায় প্রতি সপ্তাহে একবার ক্লাসরুমে ইসলাম সম্পর্কিত ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে লেকচার দিত। প্রায় ৪০ থেকে ৫০জন মেয়ে সেই লেকচারে এটেন্ড করত। সাবিহা সেদিন পরিচিত হওয়ার পর ওদেরকে লেকচারে ইনভাইট করে, তখন ওরা চারজনই সেখানে ছিল।

'অবশ্যই, অন্তত আমার উপস্থিতি নিয়ে আশ্বস্ত থাকতে পারেন।' জাভেরিয়া বলল।

'আমি চেষ্টা করব, তবে কথা দিতে পারছি না।' রাবেয়া খানিক লাজুক হেসে বলল।

'আমার আসা একটু কঠিন, কারণ আমি একটু ব্যস্ত থাকব।' জয়নব ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলল।

সাবিহা হেসে ইমামার দিকে তাকায়, যে এতক্ষণ ধরে চুপ করে আছে। ওর চেহারার রং কিছুটা উড়ে যাওয়া। 'আর আপনি? আপনি আসবেন না?'

ইমামার দৃষ্টি জাভেরিয়ার সাথে মেলে, যে ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল।

'বাই দ্য ওয়ে, এবার কোন টপিক নিয়ে কথা বলবেন?' ইমামা কিছু বলার আগে জাভেরিয়া সাবিহার মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করে। হয়তো বান্ধবীকে বাঁচানোর জন্য ইচ্ছে করেই এমন করা।

'এবার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আলোচনা হবে। এই এক অভ্যাসের কারণে আমাদের সমাজ কত দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং তা বন্ধ করতে কী কী করা যেতে পারে, সেসব নিয়ে আলোচনা।' সাবিহা বলে। 'আপনি বললেন না তো ইমামা, আপনি আসবেন কি না?' জাভেরিয়ার সাথে কথা বলতে বলতে আবার ওর দিকে ফিরল সে।

ইমামার রং আবার বদলে যায়। 'আমি... আমি দেখবা' কাঁচুমাচু হয়।

'আমি খুশি হব জাভেরিয়ার সাথে যদি আপনারা তিনজনও আসে। ধর্মের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিদিন না হলেও মাঝেমাঝে কিছু শেখার চেষ্টা করা উচিত আমাদের। আমি একা লেকচার দেই না। আমরা সবাই যারা একত্রিত হই, তাদের মধ্যে যে-কেউ কথা বলতে পারে। যদি কেউ অন্য কোনো বিষয় নিয়েও বলতে চায় বা জিজ্ঞেস করতে চায়, আমরা সেটাও অ্যারেঞ্জ করে দেই।' সাবিহা বেশ মৃদুস্বরে বলছিল।

কিছুক্ষণ পর জাভেরিয়া, ওর কাজিন আর সাবিহা রুম থেকে বেরিয়ে আসে। করিডোরে দাঁড়িয়ে সাবিহা জাভেরিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল। 'আপনি অন্তত ইমামাকে নিয়ে আসতে পারেন। আমার মনে হয়েছে আসতে চায় ও।'

'ওর আকিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই ধরনের আলোচনায় অংশ নেবে না।' জাভেরিয়া গম্ভীর হয়ে বলে।

সাবিহা কিছুটা অবাক হয়। 'তাহলে তো আপনার উচিত ওকে ইসলাম সম্পর্কে জানার দাওয়াত দেওয়া। হয়তো এর ফলে ভুল আর সঠিকের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে ও।' হাঁটতে হাঁটতে বলে।

'একবার চেষ্টা করেছিলাম, খুব রেগে গেছে। আমি চাই না আমাদের এত দীর্ঘ বন্ধুত্ব এভাবে শেষ হয়ে যাক।'

'ভালো বন্ধু তাকে বলে, যে অপরজনকে বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এটা কর্তব্য আপনার।'

'তা ঠিক, তবে কেউ যদি শুনতেই প্রস্তুত না হয় তাহলে?'

'তবুও যা সঠিক তা বলতে থাকা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
হয়তো কখনো না-কখনো মানুষটা ভাবতে বাধ্য হবে।'

সাবিহা নিজের জায়গায় ঠিক ছিল। তাই জাভেরিয়া নীরবে
হেসে তার কথার সম্মান জানায়।

'তুমি যাবে লেকচার শুনতে?' সাবিহা বেরিয়ে গেলে
রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করে জয়নব।

'না, আমার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি এসব হজম করতে পারি
না।' রাবেয়া নির্লিপ্তভাবে বলে।

ইমামা, জয়নব ও জাভেরিয়ার তুলনায় রাবেয়া কিছুটা
অন্যমনা ছিল। ধর্মের প্রতি যাদের ঝোঁক কম, এমন।

'তবে আমি সাবিহার বেশ প্রশংসা শুনেছি।' রাবেয়ার কথার ওপর জয়নব বলল।

'শুনতেই পারো, বলে খুব ভালো। আমি তো শুনেছি তার বাবাও নাকি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত। তাই মেয়ের মধ্যে সেই প্রভাব থাকবে স্বাভাবিক।' রাবেয়া আরও তথ্য যোগ করে।

কোণায় বই নিয়ে বসে ছিল ইমামা। যদিও বইয়ের আড়ালে ওদের কথাই শুনছে। মনে মনে শুকরিয়া আদায় করে ওকে এই আলাপের মাঝে টানেনি। তিনদিন পর নির্দিষ্ট সময়ে সবার কাছে অজুহাত দেখিয়ে সাবিহার লেকচার শুনতে চলে যায় ও। রাবেয়া, জাভেরিয়া বা জয়নব কেউ লেকচারে আসেনি। তাই মন বদলে ফেলল। কাউকে আর লেকচারে এটেন্ড করার কথা জানায় না। সাবিহা ওকে দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিল সেদিন।

'আপনাকে এখানে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করিনি আপনি আসবেন।' সাবিহা উষ্ণ ভঙ্গিতে বলেছিল।

এটা ইসলামের দিকে বাড়ানো ইমামার প্রথম পদক্ষেপ ছিল। এত বছর ধরে ইসলাম সম্পর্কিত এত বই, তাফসির, তরজমা পড়ার পর তেমন কিছুই সাথে অপরিচিত ছিল না ও। বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ইসলাম এবং কুরআনে কী আহকাম দেওয়া, সেসবও জানে। তবু সাবিহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখানের পরিবর্তে গ্রহণ করার একমাত্র কারণ ছিল, নিজের মাজহাব থেকে ইসলামের মাঝের সেই দূরত্ব দূর করা, যা খুব কঠিন মনে হতো ওর কাছে। সেটা প্রথম লেকচার হলেও শেষ লেকচার ছিল না ওর। এরপর থেকে নিয়মমাফিক সব লেকচারে এটেন্ড করতে থাকে। যে বিষয়গুলো এতদিন বইয়ে পড়েছিল, তা অন্যদের মুখ থেকে শোনার পর আরও বেশি প্রভাব ফেলতে শুরু করে। সেইসাথে সাবিহার প্রতি ভক্তি বাড়তে থাকে। সাবিহাও জানতে দেয়নি ওর আকিদা সম্পর্কে জানে সে।

লেকচারে আসা-যাওয়া তখন দুই মাসের মাথায়, যখন একদিন সাবিহা খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে লেকচার দেয়। 'কুরআন সেই পবিত্র কিতাব, যা হজরত মুহাম্মাদ সা.-র ওপর নাজিল হয়েছে।' লেকচার শুরু হয়। 'কুরআনে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা হজরত মুহাম্মাদ সা.-এর মাধ্যমে শেষ করে দিয়েছেন। অন্য কোনো নবীর অবকাশ রাখেননি। কোনো নবী অর্থাৎ হজরত ঈসা আ.-এর দ্বিতীয়বার অবতরণের কথা উল্লেখ থাকলেও তা নতুন নবী হিসেবে নয়; বরং এমন একজন নবির পুনরায় অবতরণ, যার ওপর নবুওয়াত হজরত মুহাম্মাদ সা.-এর বহু আগে নাজিল করা হয়েছিল। তাঁর পুনরায় অবতরণও নিজের উম্মতের জন্য হবে না; বরং হজরত মুহাম্মাদ সা.-র উম্মতের জন্য হবে। সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সা.-ই থাকবেন। অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে এই পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কাউকে দেওয়া হয়নি এবং দেওয়া হবেও না। এটা কি সম্ভব, আল্লাহ একজন নবীকে যে পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা ছিনিয়ে আবার অন্য একজন নবীকে দেবেন? কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবানী কে

আছে?" তাহলে এটা কি আদতে সম্ভব, তিনি নিজের কথা নিজেই প্রত্যাখান করবেন? স্বয়ং রসুল সা. সাক্ষ্য দেন, "হ্যাঁ আমি আল্লাহর শেষ রসুল এবং আমার পরে কোনো নবী আসবে না।" তারপরও কি আমাদের জন্য এটা জায়েজ বা মুনাসিব অন্য কারো নবুওয়াতের দাবি বিবেচনা করে দেখা?"

'আল্লাহ তায়ালা'র অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সেই একমাত্র সৃষ্টি, যাকে জ্ঞানের মতো নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। তারা এমন সৃষ্টি, যারা নিজেদের জ্ঞান ব্যবহার করে ভেবে দেখলে নিজেরাই আল্লাহ তায়ালা'র অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে যাবো। কিন্তু যারা আল্লাহর নিয়ম না মেনে নবীদের ধারাবাহিকতা প্রসারিত করতে চায়, কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নতুন নবী খুঁজে বেড়ায়। ভুলে যায় নবী মানুষের হাতে তৈরি কোনো বস্তু নয়, আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হয়; তারা বিপথে হাঁটছে। আমরা মানব বিবর্তনের সেই শেষ দশকে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে নবীদের ধারাবাহিকতা এ কারণে শেষ হয়ে গেছে যে, মানুষের জন্য এক দ্বীন ও একজন নবীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখন কোনো নতুন

আকিদার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু অনুশীলনের, ব্যস... অনুশীলন। অনুশীলন অর্থাৎ প্র্যাকটিস। সেই একক, শেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের, যা হজরত মুহাম্মাদ সা.-র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং সেই সকল মানুষ ক্ষতির মুখে পড়বে, যারা ধর্মের দড়িকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার পরিবর্তে বিভক্তির পথে হাঁটবে। আমাদের উচ্চশিক্ষা ও চেতনা যদি ধর্মের ব্যাপারে সঠিক-ভুলের পার্থক্য শেখাতে না পারে, তাহলে আমাদের ও সেই প্রাণীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; যা একগুচ্ছ তাজা ঘাসের পেছনে যেকোনো জায়গায় ছুটে যায়, ওর খুঁটি কোথায় তা ভুলে।

চল্লিশ মিনিটের এই লেকচারে সাবিহা একবারও অন্য কোনো আকিদা বা মাজহাব নিয়ে কথা বলেনি। যা বলেছে সব পরোক্ষ ছিল। একমাত্র যা সরাসরি বলেছে, তা ছিল হজরত মুহাম্মাদ সা.-র খতমে নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি। 'আল্লাহ তায়ালার শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সা. ছিলেন। যিনি চৌদ্দশ বছর আগে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। চৌদ্দশ বছর আগে সমস্ত মুসলমান এক উম্মত হয়ে তাঁর ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল।

চৌদ্দশ বছর পরও আমাদের জন্য তিনিই শেষ নবী সা। যাঁর পরে কোনো নবী পাঠানো হয়নি এবং পাঠানো হবে না। প্রতিটি সেই মানুষ, যারা নতুন করে অন্য কারো মাঝে নবী খোঁজার চেষ্টা করে, তাদের উচিত নিজের ইমানকে পুনরায় পরীক্ষা করা। সম্ভবত এই প্রচেষ্টা তাদেরকে সেই আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে, যার দিকে তারা নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।"

ইমামা প্রতিবার লেকচার শেষে সাবিহার সাথে দেখা করে যায়। কিন্তু এই লেকচারের পর তা করল না। বরং এক মুহূর্তও দেরি না করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। অদ্ভুত এক মানসিক অবসাদ নিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে। কতক্ষণ... কতদূর... ফুটপাথ দিয়ে... রাস্তাজুড়ে... হেঁটেছে ওর আন্দাজ নেই। যন্ত্রের মতো হেঁটে হেঁটে ফুটপাথের নিচে খালের কিনারে থাকা বেঞ্চের উপর বসল। সূর্য তখন অস্ত যাওয়ার পথে। উপরে রাস্তার যানজটের শব্দ বেড়ে গেছে। চুপচাপ খালের বয়ে যাওয়া পানির দিকে

তাকিয়ে রইল ও। দীর্ঘ নীরবতার পর নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করে।

'আমি আদতে নিজের সঙ্গে কী করছি? কেন নিজেকে অস্থির করে তুলছি? কোন আকিদার খোঁজে ঘুরছি? এসবের জন্য তো আমি লাহোর আসিনি। আমি এখানে ডাক্তার হতে এসেছিলাম... আমাকে আই স্পেশালিস্ট হতে হবে...। নবী, নবী, নবী... আমার সবকিছু কেন এখানে এসে থেমে যায়?' দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। 'আমাকে এসব কিছু থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। এমন চলতে থাকলে পড়াশোনায় মন দিতে পারব না। মাজহাব, আকিদা আমার সমস্যা হতে পারে না। ভুল-ঠিক যা আমার বড়রা দিয়েছে, সেটাই আমার জন্য সঠিক। আমি আর কখনো সাবিহার কাছে যাব না। মাজহাব বা নবী নিয়ে ভাবব না...কখনোই না...' খালের ধারে বসে সিদ্ধান্ত নেয়।

রাত আটটায় যখন হোস্টেলে ফেরে, তখন রাবেয়া আর জাভেরিয়া ওকে নিয়ে চিন্তিত ছিল।

'এমনিতেই মার্কেটে চলে গেছিলাম।' থমথমে চেহারা
ওদেরকে বলে।

'আরে ইমামা! অনেকদিন পরে এলে, আসা বন্ধ করেছিলে
কেন?'

অনেকদিন পর ইমামা আবার একবার সাবিহার কাছে আসে।
লেকচার শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

"আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।" লেকচার শেষ হওয়া পর্যন্ত
অপেক্ষা করছি।" তার উত্তর না দিয়ে নিজের কথা বলে ও।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সাবিহা লেকচার শেষ করে বাইরে
এসে দেখে করিডোরে পায়চারি করছে ও। তার সঙ্গে
ক্লাসরুমের ভেতরে এসে বসল। ক্লাসরুম এখন খালি। সাবিহা
চুপ করে ওর তরফ থেকে কথা শুরু হওয়ার অপেক্ষায়

রইল। কিছুক্ষণ ভাবনায় ডুবে থেকে বলতে শুরু করে ইমামা।

'আপনি জানেন আমি কোন মাজহাবের?'

'হ্যাঁ, জানি। জাভেরিয়া বলেছিল।' সাবিহা উত্তর দেয়।

'আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, আমি কী পরিমাণ ফ্রাস্ট্রেটেড! আমার মন বলে পৃথিবী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে। আমি... আমি...' দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে ও। 'আমি জানি...' আবারও নিজের কথা অসম্পূর্ণ রেখে থেমে যায় ইমামা। ফের নীরবতা....!

'কিন্তু আমি আমার মাজহাব ছাড়তে পারব না। ধ্বংস হয়ে যাব আমি। আমার বাবা-মা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার ক্যারিয়ার... আমার স্বপ্ন... সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। আমি সেই মাজহাবের ইবাদত করাও ছেড়ে দিয়েছি, তবু শান্তি পাচ্ছি না। আপনি আমার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন।

আমার মনে হচ্ছে এই সবকিছু ভুল। আর সঠিক কী তা আমি জানি না...'

'ইমামা! তুমি ইসলাম কবুল করে নাও।' সাবিহা শুধু একটা বাক্য বলল।

"আমি পারব না, বললাম তো আপনাকে। অনেক সমস্যা পড়ে যাব।"

'তাহলে আমার কাছে কেন এসেছ?' সাবিহা জিজ্ঞেস করল।

ইমামা করুণ চোখে তাকায়। 'আমি জানি না কেন এসেছি।'

"তুমি এটা শুনতেই এসেছ, যা আমি তোমাকে বলেছি। আমি কোনো যুক্তি বা দলিল দেবো না। কারণ তুমি কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজছ না। সব প্রশ্নের উত্তর তোমার মাঝেই আছে। যা জানা দরকার তুমি তা জানো। এখন স্বীকার করা বাকি, এমনটাই নয় কি?"

ওর চোখে পানি টলমল করে। 'সাবিহা! আমার মনে হয়
পায়ের নিচে মাটি নেই, কোনো অজানায় ভেসে বেড়াচ্ছি।'

সাবিহা কিছু না বলে ধীরে ধীরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুরু করে।
ইমামা ভেজা চোখে তার দিকে তাকায়।

'আমি কোথাও কিছু দেখতে পাই না, সাবিহা! কিছু না...'
হাতের পিঠ দিয়ে চোখের পানি মোছে ও।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।' সাবিহার ঠোঁট মৃদু ছন্দে দুলতে থাকে।
ইমামা দুই হাতে মুখ ঢেকে বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে
ওঠে। কান্নার মাঝে সাবিহার সঙ্গে কালিমার শব্দগুলো
পুনরাবৃত্তি করছিল। 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' পরের শব্দও
পুনরাবৃত্তি করে। আওয়াজ কান্নায় ভেঙে আসে। বুঝতে
পারছে না এত কান্না কীসের...? কোনো অনুতাপ... কোনো
আক্ষেপ তো নেই ওর। তবু চোখের পানি যেন বাঁধ মানছে
না। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কান্নার পর মাথা তুলে দেখল

সাবিহা ওর পাশেই বসে আছে। অশ্রুসিক্ত চেহারা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

রাবেয়া আর জাভেরিয়া একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ইমামা পায়ের আঙুল মেঝেতে ঘষতে ঘষতে কিছু ভাবছে।

'আমাদেরকে এসব আগেই বলা উচিত ছিল তোমারা' জাভেরিয়া দীর্ঘ বিরতির পর নীরবতা ভাঙে।

ইমামা মাথা তুলে শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল। 'তাতে কী হতো?'

'অন্তত কোনো সন্দেহের শিকার হতাম না, সাহায্য করতে পারতাম।'

ইমামা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। 'তাতে তেমন কোনো উপকার হতো না।'

'আমি খুব খুশি, ইমামা। তুমি সঠিক পথ বেছে নিয়েছ। দেরি করে হলেও ভুল পথ থেকে সরে এসেছ।' জাভেরিয়া ওর পাশে বসে মৃদু আওয়াজে বলল। 'তুমি আন্দাজ করতে পারবে না এই মুহূর্তে আমি তোমার জন্য নিজের ভেতর কী অনুভব করছি...'

ইমামা চুপচাপ জাভেরিয়াকে দেখে।

'আমাদের দুজনের তরফ থেকে কোনো সাহায্য লাগলে সংকোচ করবে না। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমরা খুশি হব।'

'আমার সত্যিই তোমাদের সাহায্য দরকার... খুব করে দরকার...।' ইমামা বলল।

'আমার কারণে যদি তুমি নিজের মাজহাবের সত্যতা যাচাই করে তা ছেড়ে থাকো, তাহলে...।' জাভেরিয়া বলছিল।

ইমামা মনে মনে ভাবে। তোমার কারণে...? মস্তিষ্ক অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে ওকে। ধোঁয়াশার মাঝে একটা চেহারা ফুটে উঠছিল। তাকিয়ে থাকে, চেহারা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। নকশার মতো মুখচ্ছবিটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। হাসে, কারণ এই চেহারা ওর চেনা। কল্পনায় তার ঠোঁট নড়তে দেখে। ধীরে ধীরে সেই আওয়াজ শুনতে পায়।

কাতরা মাঙ্গে যো কয়ি তু উসে দারিয়া দে দে
(বিন্দু চায় যে তাকে সমুদ্র দিয়ে দাও)

মুঝাকো কুছ অর না দে আপনি তামান্না দে দে
(আমাকে অন্য কিছু না হোক তোমার আরাধনা দাও)

'আমি শুধু চাই তোমরা কাউকে কিছু বলবে না, জয়নবকেও না।' রাবেয়া আর জাভেরিয়াকে বলল ও।

ওরা দুজন ইমামার কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

কুছ নেহি মাঙ্গতা শাহো ছে এ্যায় শেষতা তেরা
(কিছু চায় না তোমার প্রজা অন্য কোনো রাজার থেকে)

ইসকি দৌলাত হ্যায় ফাকাত নাকশ-এ-কাফে পা তেরা
(এর সম্পদ তো কেবল তোমার দেখানো পথের দিশা)

পুরে কাদ ছে ম্যায় খাঁড়া হু তো এ্যায় তেরা হ্যায় কারাম
(মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি আমি তোমার অনুগ্রহে)

মুরাকো বুকনে নেহি দেতা হ্যায় সাহারা তেরা
(আমাকে ঝুঁকতে দেয় না অবলম্বন তোমার)

লোক কেহতে হ্যায় ছায়া তেরে পেরকার কা না থা
(মানুষ বলে তোমার কায়ার ছায়া খুঁজে পায় না)

ম্যায় তো কেহতা হু জাহা ভারপে হ্যায় ছায়া তেরা
(আমি তো বলি সর্বত্র জুড়ে তোমারই ছায়া)

আওয়াজ ওর চেনা। এটা জালাল আনসারের কণ্ঠ। মেডিকেল কলেজে ভর্তির হওয়ার কয়েকদিন হয়েছিল তখন। যার মধ্যে এক উইকেন্ডে ইসলামাবাদ যাওয়ার পর রাতে লাহোরে জয়নবের কাছে ফোন করেছিল ও।

'আমি জয়নবকে ডেকে দিচ্ছি, তুমি একটু হোল্ড করো।' বলে জয়নবের মা ফোন রেখে চলে যান।

ও রিসিভার কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করছিল। 'কুছ নেহি মাস্ততা শাহো ছে এ্যায় শেষতা তেরা, ইসকি দৌলাত হ্যায় ফাকাত নাকশ-এ-কাফে পা তেরা।' পুরুষালি কণ্ঠে ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসা এই নাত এর আগেও শুনেছে। কিন্তু তখন যে তা পাঠ করছিল, সে গভীর আন্তরিকতা নিয়ে করছিল। 'পুরে কাদ ছে ম্যায় খাঁড়া হু তো এ্যায় তেরা হ্যায় কারাম, মুঝকো বুকনে নেহি দেতা এ্যায় সাহারা তেরা।' ওর ধারণা ছিল না একজন পুরুষের কণ্ঠ এত সুন্দর হতে পারে! এত সুন্দর যে, পুরো পৃথিবী তাতে বিমোহিত হয়ে পড়বে। ও শ্বাস আটকে রাখে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস নেওয়ার

কথা ভুলেই যায়। 'লোক কেহতে হয় ছায়া তেরে পেরকার
কা না থা, ম্যায় তো কেহতা হু জাহা ভারপে হয় ছায়া
তেরা।'

মানুষের জীবনে কিছু মুহূর্ত বরকতের জন্য আসে। শবে-
কদরের বরকতময় সেই রাতের মতো, যা হয়তো বহু মানুষ
অযত্নে চলে যেতে দেয়। তবে অল্প কিছু মানুষ থাকে, যারা
সেই বরকতের আশায় হাত তোলে, আঁচল বিছিয়ে অপেক্ষা
করে। সেই বরকতের অপেক্ষায়, যা প্রবাহিত পানিকে
থামিয়ে দেয় এবং থেমে থাকা পানিকে প্রবাহিত করে। যা
হৃদয় থেকে বের হওয়া দোয়া জিহবা পর্যন্ত পৌঁছানোর
আগেই তাকদিরে পরিণত করে দেয়। ইমামা হাশিমের
জীবনে সেই বরকতময় মুহূর্ত কোনো শবে-কদরের রাতে
আসেনি। সেই বরকতের জন্য হাত তুলতে হয়নি, আঁচল
বিছিয়ে অপেক্ষা করতে হয়নি। তবু কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবী
আর আকাশের গতি থেমে যেতে দেখে ও। পুরো কায়নাত
গোলকধাঁধায় পরিণত হয় ওর জন্য, যার চারপাশে শুধু একটা
কণ্ঠই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

দাঙগিরি মেরি তানহাই কি তুনে হি তো কি
(আমাকে একাকিত্বে তুমিই তো সামলে ছিলে)

ম্যায় তো মার যাতা আগার সাথ না হোতা তেরা
(আমি তো মরে যেতাম যদি সঙ্গ না হতো তোমার)

ওহ আন্ধেরো ছেভি দাররা'না গুজার যাতে হ্যায়
(নিঃশব্দে তারা অন্ধকারও হতে পারে পার)

যিনকে মাথে ম্যায় চামাকতা হ্যায় সিতারা তেরা
(যাদের কপালে চমকায় রহমত তোমার)

আওয়াজ খুব পরিষ্কার আর স্পষ্ট হয়ে আসছে। ভূতের মতো
রিসিভার হাতে বসে ছিল ও।

'হ্যালো ইমামা!' অপর পাশ থেকে জয়নবের আওয়াজ
ভেসে আসে।

কিছুক্ষণের জন্য থমকে যাওয়া পৃথিবী নিজের গতিতে সচল হয়। 'হ্যালো ইমামা! আমার কথা শুনছ?' জয়নব জিজ্ঞেস করল।

এক ঝটকায় চেতনার জগতে ফিরল ও। 'হ্যাঁ, শুনছি।' 'আমি ভেবেছি লাইন কেটে গেছে।' জয়নব নিশ্চিত্ত হয়।

পরের কিছুক্ষণ বান্ধবীর সাথে কথা বললেও মন আর মস্তিষ্ক অন্য কোথাও পড়ে ছিল ওর।

জয়নব ওর ক্লাসফেলো। মেডিকেল কলেজে জালালুদ্দিন আনসার, জয়নবের বড় ভাই। ইমামা সরাসরি তাকে না চিনলেও তার সম্পর্কে জানে। পড়তে এসে পরিচয়। কয়েক মাসের পরিচয়ে ভালো বন্ধু হয়ে গেছে ওরা।

সেইসূত্রে জানতে পারে, জয়নবরা চার ভাই-বোন। জালাল সবার বড়। বর্তমানে হাউস জব করছে। জয়নবের বাবা ওয়াপদার (পাকিস্তান ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার

ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) একজন ইঞ্জিনিয়ার। পরিবার বেশ মাজহাবি ঘরনার।

ইসলামাবাদ থেকে ফিরে জয়নবের কাছে সেই নাত পাঠ করা ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। 'জয়নব! সেদিন যখন তোমাকে ফোন করেছিলাম তখন কেউ নাত পড়ছিল, কে ছিল ওটা?' যথাসম্ভব কণ্ঠকে স্বাভাবিক রাখে।

'ওহ! ওটা জালাল ভাই। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য চর্চা করছিলেন। ফোন করিডোরে থাকে। ভাইয়ের রুমের দরজা খোলা থাকায় আওয়াজ তোমার পর্যন্ত চলে গেছে।' জয়নব কারণ বলে।

'তার কণ্ঠ খুব ভালো।'

'হ্যাঁ। কিরাত নাতে চেয়েও সুন্দর। কত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছেন! সামনেই কলেজে প্রতিযোগিতা আছে, তুমি চাইলে শুনতে পারো।'

জয়নব তখন জানত না ইমামা কোন মাজহাবের। যেভাবে পর্দার খেয়াল রাখত, তাতে জয়নবের মনে হয়েছিল ইমামার পরিবারও বেশ মাজহাবি হবে। জয়নব নিজেও মাজহাবি পরিবারের। তাই সবসময় চাদরে ঢেকে চলাফেরা করত। ইমামা দুদিন পর জালাল আনসারের নাত শুনতে ক্লাস বাংক করে সেই প্রতিযোগিতায় চলে যায়। সেই প্রথম সরাসরি জালালকে দেখে। উপস্থাপক জালাল আনসারের নাম ডাকলে বেগতিক হৃৎসম্পন্দন নিয়ে জয়নবের সঙ্গে মিল আছে, এমন চেহারার চব্বিশ-পঁচিশ বছরের দাড়িওয়ালা এক ছেলেকে স্টেজে উঠতে দেখে বোঝে এটা জালাল। স্টেজের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা থেকে রোষ্ট্রামের পেছনে গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত একবারের জন্যও চোখ সরায়নি ও। জালাল বুকে হাত ভাঁজ করে চোখ বন্ধ করে নেয়।

'কুছ নেহি মাঙ্গতা শাহো ছে এ্যায় শেষতা তেরা, ইসকি দৌলাত হ্যায় ফাকাত নাকশ-এ-কাফে পা তেরা।' ইমামা অনুভব করে ওর মাঝে তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। হলজুড়ে পিনপতন নীরবতা। চারপাশে শুধু জালালের কণ্ঠ। মন্ত্রমুগ্ধের

মতো তাকে শুনতে থাকে। জালাল কখন নাত শেষ করেছে, কখন স্টেজ থেকে নেমেছে, প্রতিযোগিতার ফলাফল কী এসেছে, এরপর কারা নাত পড়েছে, কখন হল খালি করে সবাই যে যার মতো চলে গেছে, কিছু টের পায়নি ও। অনেকক্ষণ পর হুঁশ ফিরলে নিজের আশেপাশে তাকিয়ে বোঝে হলে একা।

'কাল তোমার ভাইয়ের নাত শুনেছি আমি।' ইমামা পরদিন জয়নবকে বলে।

'আচ্ছা, ভাই প্রথম পুরস্কার জিতেছে।' জয়নব ওর কথায় হেসে জানায়।

'খুব সুন্দর নাত পড়ে সে।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলে ইমামা।

'হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে ভাই নাত পড়ে। এত আবৃত্তি আর নাত প্রতিযোগিতা জিতেছে যে, এখন সেই হিসেব তার নিজেরও মনে নেই।' জয়নব গর্ব করে বলল।

'তার কণ্ঠ খুব ভালো।' ইমামা আবার বলে।

'হ্যাঁ, কণ্ঠ ভালো। কিন্তু সব রহস্য সেই ভালোবাসা ও ভক্তির, যা নিয়ে সে নাত পড়ে। ভাই রসুল সা.-কে এত ভালোবাসে, যার কোনো সীমা নেই। কিরাত-নাত ছাড়া কখনো অন্যকিছু আবৃত্তি করেনি। স্কুল-কলেজ থেকে অনেক চাপ দেওয়া হতো। কিন্তু তার একটাই উত্তর থাকত যে কণ্ঠে আমি হুজুর সা.-র কাসিদা পড়ি, সেই কণ্ঠে অন্যের কাসিদা পড়তে পারব না। আমরাও রাসুল সা.-কে ভালোবাসি, তবে ভাইয়ের মতো পারি না। বিগত দশ বছরে সে এক ওয়াক্ত নামাজও কাজা করেনি। প্রতিমাসে একবার কুরআন খতম করে। তুমি শুধু নাতের প্রশংসা করছ, একবার তেলাওয়াত শুনলে তো...!' জয়নব গর্বের সাথে বলে যাচ্ছিল।

ইমামা নিঃশব্দে শুনতে থাকে। আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

পরদিন সকালে কলেজ যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার বদলে
বিছানায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পরও
জাভেরিয়া ওকে বিছানা ছেড়ে উঠতে না দেখে গলা খাঁকরে
বলল। 'ওঠো ইমামা! কলেজে যাওয়া লাগবে না? দেরি হয়ে
যাচ্ছে তো।'

'আজকে যাব না আমি।' ইমামা চোখ বন্ধ করে বলে।

'কেন?' জাভেরিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'শরীর ভালো লাগছে না।' ইমামা বলল।

'তোমার চোখ লাল, রাতে ঘুমাওনি?'

'না, ঘুম আসেনি। এখন প্লিজ! ঘুমাতে দাও।' নতুন প্রশ্ন থেকে
বাঁচতে কথা শেষ করে ফেলে। জাভেরিয়া কিছুক্ষণ ওর

দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের ব্যাগ আর ফোল্ডার নিয়ে বেরিয়ে যায়। জাভেরিয়া চলে গেলে চোখ খোলে ও। এটা সত্য যে, সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। কারণ ছিল জালাল আনসারের কণ্ঠ। সেই কণ্ঠ ছাড়া অন্য কোথাও নিজের মস্তিষ্কে ফোকাস করতে পারছিল না। 'জালাল আনসার' এক নিশ্বাসে কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করল।

তার কণ্ঠ আমার এত ভালো কেন লাগছে? কেন আমি মাথা থেকে বের করতে পারছি না?' এলোমেলো মস্তিষ্কে বিড়বিড় করতে করতে বিছানা ছেড়ে খোলা জানালায় এসে দাঁড়ায়। 'ভাইয়ের কণ্ঠের সমস্ত সার্থকতা হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে ভালোবাসার কারণে।' ওর কানে জয়নবের বলা কথা প্রতিধ্বনিত হয়। 'কণ্ঠে ভক্তি? ভালোবাসা?' ব্যাকুল হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। 'গান্ধীর্ষ... আবেগ... বেদনা নাকি মাধুর্য... আদতে কী ছিল সেই আওয়াজে?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। পৃথিবী আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা দিয়ে শুরু হয় এবং শেষ হয় রাসুলকে ভালোবাসার মাধ্যমে। আরেকটা বাক্য মনে পড়ে ওর, ইশকে রাসুল। 'ইশকে রাসুল সা. নাকি

ইশকে মুহাম্মাদ সা.?' নিজের ভেতরে এক অজানা উপলব্ধি টের পায়। অন্ধকারে সেই উপলব্ধিকে খুঁজতে শুরু করে। নিজের ভেতরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। কোথাও কোনো আলো নেই। 'আদতে তা কী, যা হজরত মুহাম্মাদ সা.-র নাম শুনলে মানুষের চোখে পানি, ঠোঁটে দরুদ নিয়ে আসে? বিশ্বাস... আন্তরিকতা...না ভালোবাসা... এর মধ্যে কী? আমি কেন কিছু অনুভব করতে পারি না? আমার চোখে কেন পানি আসে না... ঠোঁটে কেন দরুদ আসে না...? আমার কণ্ঠে সেই তাসির...?' এক মুহূর্তের জন্য ভাবনা থামিয়ে ঠোঁট উল্টে পড়তে শুরু করল।

'কুছ নেহি মাস্ততা শাহো ছে এ্যায় শেষতা তেরা, ইসকি দৌলাত হ্যায় ফাকাত নাকশ-এ-কাফে পা তেরা।' টের পায় কণ্ঠ ভেঙে আসছে। হয়তো ঠিকমতো ঘুম হয়নি, তাই আওয়াজ এমন শোনাচ্ছে। ভেবে গলা পরিকার করে আবার পড়তে শুরু করে। 'কুছ নেহি মাস্ততা।' আবার থেমে যায়। এবার ওর কণ্ঠে কাঁপুনি ছিল। আবার শুরু করে। 'কুছ নেহি মাস্ততা শাহো ছে এ্যায় শেষতা তেরা।' জানালা দিয়ে শূন্য

তাকিয়ে ভাঙা কণ্ঠ আর কাঁপতে থাকা ঠোঁট নিয়ে প্রথম পণ্ডিত শেখ করল। কিন্তু দ্বিতীয় পণ্ডিত পড়তে শুরু করে থেমে যায়। ওর কানে জালালের কণ্ঠ ভেসে আসছে। উঁচু, স্বচ্ছ, স্পষ্ট কণ্ঠ। আজানের মতো হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়ার মতো। গালে আর্দ্রতা টের পেয়ে চেতনায় ফেরে। বুঝতে পারে এতক্ষণ কাঁদছিল। কয়েক সেকেন্ড অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ভেজা আঙুলের দিকে ঝুঁক হয়ে তাকিয়ে রইল। নিজেকে অসহায়ত্বের শিখরে আবিষ্কার করে। চোখের উপর হাত রেখে আন্তে আন্তে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে খুব করে কাঁদতে লাগল।

একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি হলো, যখন তার হৃদয় কিছুর সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু জিহবা নীরব থাকে। যখন তার মস্তিষ্ক উচ্চস্বরে কিছুর সত্যতা স্বীকার করে নেয়, কিন্তু ঠোঁট নীরব রয়। ইমামা হাশিমের জীবনও সেই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে সিদ্ধান্ত গত দুই-তিন বছরে নিতে পারেনি ও, একটা কণ্ঠ কয়েকদিনের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ করে দেয়। এটা না জেনে, না বুঝে, না পরখ করে যে,

আদতে কেন মানুষ রসুল সা.-র ওপর এত আকিদা রাখে...
কেন বারবার ইশকে রসুলের কথা বলা হয়...? এত বছর ধরে
নিজের নবীর কাসিদা শুনে এসেছে, কিন্তু কখনো ওর ওপর
এমন প্রভাব পড়েনি। নিজের সত্তা এভাবে মোমের মতো
গলতে অনুভব করেনি। কিন্তু প্রতিবার রাসুল সা.-র নাম
পড়লে, দেখলে বা শুনলে অন্যরকম অনুভূতির শিকার হয়।
বারবার, প্রতিবার অস্তিত্ব সেই নামের দিকে ছুটে যায়।
সাবিহার কাছে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।
জালাল আনসারের কণ্ঠ অন্ধকারে পথ দেখানো জোনাকি
হয়ে ধরা দেয়। যার পেছনে কোনোরকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়া
পা বাড়ায় ইমামা হাশিম।

ম্যায় তুজে আলামে আশিয়ামে ভি পা লেতা হ
(আমি তো তোমাকে সবখানে খুঁজে পাই জগতের)

লোক কেহতে হ্যায় কে হ্যায় আলামে-বালা তেরা
(অথচ মানুষ বলে অক্ষয়লোকে আবাস তোমার)

ইমামার জন্য এটা নতুন যাত্রার সূচনা ছিল। আগের মতো নিয়মিত সাবিহার কাছে যাওয়া শুরু করে ও। লেকচারে অংশ নেওয়া একদিকে যেমন ওকে নিজের সিদ্ধান্তে অটল করে তোলে, অন্যদিকে ভেতরে থাকা অবশিষ্ট সন্দেহগুলোও দূর করে দেয়। মাজহাব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ছোট বা সামান্য বিষয় ছিল না। এই সিদ্ধান্ত ওর জীবনের প্রতিটি মোড়ে প্রভাব ফেলবে। এখন আর আসজাদকে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ সে অমুসলিম। তাড়াতাড়ি হোক বা দেরিতে, পরিবারের কাছ থেকে আলাদা হতে হবে। কারণ এমন কোনো পরিবেশে থাকতে চায় না, যেখানে আকিদা আর শরিয়াকে এভাবে বিকৃত করা হয়েছে। বাবার কাছ থেকে নেওয়া পড়াশোনা ও অন্যান্য খরচের টাকা নিয়েও দোটানায় ভুগছিল। কয়েক বছর আগ পর্যন্ত রূপকথার মতো কাটানো জীবন হুট করে দুঃস্থপ্নে बदলে যায়। কিন্তু জীবনের এই কঠিন পথ নিজে বেছে নিয়েছে ও। মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে ভাবে, কী করে এত বড় সিদ্ধান্ত নিলো? আল্লাহর কাছে ধৈর্য চায়। ওকে তা দেওয়া হয়। কিন্তু তখনো ওর বয়স এত কম ছিল

যে, ভয়-দুশ্চিন্তা বা সংশয় থেকে পুরোপুরি পিছু ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব ছিল।

'ইমামা! আপাতত মাজহাব পরিবর্তনের কথা তোমার বাবা-মাকে বলার দরকার নেই। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও। এতে সহজেই আসজাদের সাথে বিয়েতে অমত করতে পারবে এবং মাজহাব পরিবর্তনের কথা জানাতে পারবে তাদের?' সাবিহা ওর দুশ্চিন্তা শুনে পরামর্শ দেয়।

'বাবার দেওয়া টাকা নিজের জন্য খরচ করতে চাই না। কারণ এখন যেহেতু জেনে গেছি তিনি একটা মিথ্যে মাজহাব প্রচার করেন। সুতরাং তার টাকা ব্যবহার করা হালাল না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু তোমার কাছে কোনো পথ নেই। ভালো হয় যদি পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাও। এরপর আক্সেলের কাছ থেকে কিছু নিতে হবে না।' সাবিহা ওকে বোঝায়।

সাবিহা এই পথ না দেখালেও এছাড়া করার মতো কিছু নেই।
কারণ এই মুহূর্তে ওর মাঝে এত সাহস ছিল না যে, জীবনের
সবচেয়ে বড় ইচ্ছে উৎসর্গ করে দেবে।

তখন রাত দশটা বাজছে, যখন ছেলেটা সিনেমা হল থেকে
বের হয়। হাতে এখনো পপকর্নের প্যাকেট। কোনো গভীর
চিন্তায় ডুবে পপকর্ন খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ও।
আধা ঘন্টার রাস্তা শেষ করে একটা বড় বাংলো বাড়ির সামনে
এসে বেল বাজায়।

'সাহেব! খাবার দেবো?' ওকে ঢুকতে দেখে কাজের লোক
জিজ্ঞেস করে।

মাথা না-বোধক নেড়ে উত্তর দেয় ও।

'দুধ?'

'না।'

না থেমে নিজের রুমে এসে দরজা বন্ধ করে নিলো। রুমের লাইট অন করে কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে চারপাশে তাকিয়ে বাথরুমে চলে যায়। শেভিং-কিট থেকে একটা ব্লেড বের করে রুমে নিয়ে আসে। বিছানায় বসে বেডসাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে টিউব লাইট অফ করে দেয়। রেজার ব্লেডের উপরের প্যাকেট খুলে কয়েক সেকেন্ড ল্যাম্পের আলোতে ব্লেডের ধারালো সাইডের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর ব্লেডটা দিয়ে এক টানে নিজের ডান হাতের কবজির শিরা কেটে ফেলে। গলা দিয়ে চিৎকার বেরোতে চাইলে চোঁট চেপে ধরে। চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করে, পারছে না। হাতের কজি এখন বিছানার পাশে ঝুলছে। রক্তের ধারা মেঝের কার্পেটকে ভিজিয়ে তোলে। মস্তিষ্ক অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। তীব্র আওয়াজ অন্ধকারে যাওয়া মস্তিষ্ককে কিছুক্ষণের জন্য আলোয় ফিরিয়ে আনে। আওয়াজ ক্রমশ বেড়ে চলছে। তাৎক্ষণিকভাবে আওয়াজের কারণ ধরতে

পারল না। চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করলেও কিছু বোঝার মতো অবস্থা ছিল না।

ইমামা ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠল। রুমের দরজায় ক্রমাগত কেউ নক করছে।

'ইমামা! ইমামা!' ওয়াসিম দরজায় জোরে জোরে নাম ধরে ডাকছিল।

'কী হয়েছে? চিৎকার করছ কেন?' দরজা খুলে আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করে ও।

ওয়াসিমের চেহারার রং উড়ে যাওয়া। 'তোমার কাছে ফাস্ট এইড বক্স আছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?' আরও চিন্তায় পড়ে যায় ও।

'ওটা নিয়ে আমার সাথে চলো।' ওয়াসিম বলল।

'কী হয়েছে?' ওর পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছিল।

'চুচু...! আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে কজির শিরা কেটে ফেলো। ওদের বাড়ির কাজের লোক নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'

ইমামা স্বস্তির শ্বাস ফেলো। 'তোমার বন্ধু যা করে বেড়ায়, তাতে মানসিক হাসপিটালে রেখে আসা উচিত ওকে।' বিরক্ত হয়ে ভেতরে এসে বিছানায় থাকা ওড়না গায়ে জড়িয়ে নেয়।

'আমি একনজর দেখে দৌড়ে এসেছি, এখনো জ্ঞান আছে।'

ওরা দু'জন সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

'সোজা হাসপিটালে নিয়ে যাও।' ইমামা শেষ সিঁড়িতে নেমে বলে।

'যাব, আগে ব্যান্ডেজ করো। রক্ত পড়া তো বন্ধ হোক।'
ওয়াসিম বলল।

'ওয়াসিম! আমি ভালো ফার্স্ট এইড দিতে পারব না। কী দিয়ে
হাত কেটে বসে আছে কে জানে... ক্ষতই-বা কত গভীর?
আচ্ছা...ওর বাড়ির মানুষজন কোথায়?'

'বাড়িতে কাজের লোক ছাড়া কেউ নেই। কপাল ভালো,
একটা ফোনকলে কাজের লোক ওকে ডাকতে গিয়েছিল।
ভেতর থেকে সাড়া না পাওয়ায় সবাই মিলে দরজা ভেঙে
ফেলো।'

ওরা একসাথে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে
আসে।

'তোমার যে এই বন্ধু আছে না...' ইমামা রাগ নিয়ে সালারের
ব্যাপারে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু ওয়াসিম ধমক দিয়ে থামায়। 'ফর গড সেক ইমামা।
নিজের এই অভিশাপ-অভিযোগ বন্ধ করো। অবস্থা সিরিয়াস!
আর তুমি ওকে খারাপ বলতে ব্যস্ত...?'

'এ ধরনের কাজ করা মানুষদের প্রতি আমার কোনো
সহানুভূতি নেই।'

সালারদের লাউঞ্জে পৌঁছে গেল ওরা। কয়েক পা ফেলে
ওয়াসিম ঘুরে পাশের এক রুমে ঢোকে। ইমামা ভাইয়ের পিছু
নিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। দরজা দিয়ে ঢুকতেই সামনের
জানালায় কিছু মডেল-অভিনেত্রীর বিশাল বিশাল নগ্ন ছবি
এমনভাবে লাগানো, যা দেখে এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে
হয়েছে মেয়েগুলো বাস্তবেই রুমো। লজ্জায় চেহারা লাল
হয়ে ওঠে। বিছানায় করুণ অবস্থায় পড়ে থাকা আহত
মানুষটার প্রতি ওর অভিব্যক্তি আরও খারাপ হয়। এই
ছবিগুলো সেই মানুষটার নীচু চরিত্রের আরেকটা বড় প্রমাণ।
রুমে তিন-চারজনের উপস্থিতিতে সেই ছবিগুলো ওর জন্য
বেশ অস্বস্তি আর বিব্রতকর পরিবেশ তৈরি করছিল।

ছবিগুলো থেকে চোখ সরিয়ে ইমামা কোনোরকম ডাবল বেডের দিকে চলে আসে। যেখানে সালার শোয়া অবস্থায় ছিল। ওয়াসিম বিছানার একপাশে বসে ফার্স্ট এইড বক্স খুলতে থাকে। অপরপাশে ওদের বড় ভাই বসে সালারের হাত বিছানার চাদরে চেপে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। আর সালার অবচেতন অবস্থায় নিজের হাত ছাড়ানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগে আছে। কাজের লোক আর ওয়াসিমকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছিল। ইমামাকে এগিয়ে আসতে দেখে বড় ভাই চেয়ার ছেড়ে উঠে একে বসতে দেয়। 'ওর ক্ষত দেখো। রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করেছি, কাজ হচ্ছে না।' উনি সালারের কজি ইমামার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন।

ইমামা চেয়ারে বসে সালারের কজি থেকে চাদর সরায়, ক্ষত অনেক গভীর ও লম্বা। একনজর দেখেই বুঝতে পারে। সালার তখনো হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায়। ইমামা কজির একটু নিচ থেকে শক্ত করে হাত চেপে ধরে। 'ওয়াসিম! শুধু ব্যান্ডেজ বের করো। ক্ষত অনেক গভীর, এখানে কিছু সম্ভব না। ব্যান্ডেজ করলে আপাতত রক্ত বন্ধ হবে, এরপর

হসপিটালে নিয়ে যাও।' একনজর রক্তে ভিজে যাওয়া কার্পেটের দিকেও তাকাল।

ওয়াসিম দ্রুত ফাস্ট এইড বক্স থেকে ব্যান্ডেজ বের করে। সালার মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ খোলার চেষ্টা করে। চোখের সামনে সব ঝাপসা। তবু বিছানার পাশে থাকা মেয়েটার হাতে নিজের হাত দেখতে পায়। কিছুটা উত্তেজিত হয়ে নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল। হাত ছাড়া পায় না। কিন্তু ব্যথার তীব্র ঢেউ ওকে থামিয়ে দেয়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওর মনে হলো এবার সত্যি প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

'তোমরা বেরিয়ে যাও, এখনই যাও। কোথা থেকে এসেছ?' সালার উত্তেজিত হয়ে ভেঙে ভেঙে বলল। 'এটা আমার রুম, তোমাদের ভেতরে ঢোকার সাহস কী করে হয়? তুমি, তুমি, ওয়াসিমও বের হয়ে যাও। Get lost, just get lost...bloody bastard!' চিৎকার করে ও।

ওর মুখ থেকে বের হওয়া গালিতে ইমামার চেহারার রং পাল্টে যায়। তবু শক্ত করে হাত ধরে বসে রইল। ওয়াসিমের কাছ থেকে তুলা নিয়ে তা ক্ষতের উপর রাখে। সালার হাত সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বা নড়াচড়া করা থামায়নি। ব্যান্ডেজ নিয়ে ইমামা হাত প্যাঁচানো শুরু করে। সালার ঝাপসা চোখে হাতের কজিতে নরম কিছু টের পায়। কিছুটা অসহায়বোধ আর প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে। ঝাপসা চোখে বাড়ানো হাত গিয়ে লাগে ইমামার মাথায়। যার ফলে মাথা থেকে শুধু ওড়নাই পড়েনি; চুলও খুলে যায় ওরা।

ইমামা হড়বড়িয়ে সালারের দিকে তাকায়। যে আবার হাত বাড়চ্ছিল। বাঁ-হাতে কজি ধরে রেখে, ডান হাতে থাকা ব্যান্ডেজ ছেড়ে পুরো শক্তি লাগিয়ে সালারের ডান গালে ঠাস করে থাপ্পড় বসিয়ে দেয় ও। থাপ্পড় এত জোরালো ছিল যে, এক মুহূর্তের জন্য সালারের চোখের সামনে থাকা কুয়াশা সরে যায়। হা হয়ে যাওয়া মুখ ও সম্পূর্ণ খোলা চোখে শুক্ক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকায়।

যে রক্তিম চেহারা নিয়ে উঁচু আওয়াজে কিছু বলছে। 'আবার যদি নড়ো, তাহলে এবার তোমার অন্য হাতও কেটে দেবো আমি। শুনেছ তুমি?' ইমামা বলল। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধু ওয়াসিমকেও কিছু বলতে শোনে। কিন্তু বোঝে না কে কী বলছে। মস্তিষ্ক আবার অন্ধকারে ডুবতে শুরু করে। এখনো সেই আওয়াজটা ভেসে আসছে, মেয়েলি আওয়াজ... 'ওর ব্লাড প্রেশার চেক করো।' কয়েক সেকেন্ড আগে নিজের গালে পড়া থাপ্পড়টা মনে পড়ল সালারের। চেয়েও আর চোখ মেলতে পারেনি। মেয়েলি আওয়াজটা এখনো ভাসছে। কিন্তু সেই আওয়াজের কোনো অর্থ দাঁড় করাতে পারল না। মস্তিষ্ক পুরোপুরি অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

পরেরবার একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে সালারের জ্ঞান ফিরল। চোখ খুলে চারপাশ দেখার চেষ্টা করে। কেবিনে তখন শুধু একজন নার্স ছিল, যে পাশে দাঁড়িয়ে ওর ড্রিপ ঠিক করছিল। তাকে হাসতে দেখে বুঝল কিছু বলতে চায় সে। কিন্তু ওর মস্তিষ্ক আবার অন্ধকারে ডুবে যায়। দ্বিতীয়বার কখন জ্ঞান ফিরল আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার চোখ খুলে

কেবিনে কিছু পরিচিত চেহারা দেখে। ছেলেকে চোখ মেলতে দেখে তায়িবা সিকান্দার কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কেমন লাগছে তোমার?' খানিকটা ঝুঁকে ব্যাকুলতা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'Just fine.' দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে আড়চোখে দেখে আন্তে করে বলে ও।

তায়িবা সিকান্দার আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগে কেবিনে থাকা ডাক্তার এগিয়ে আসে। ওর পালস চেক করে ইনজেকশন দিয়ে আবার ড্রিপ লাগায়। সালার বিরক্ত হয়ে নিজের সাথে ঘটা এসব কাজকর্ম সহ্য করে। ড্রিপ লাগানোর পর সিকান্দার উসমান এবং তার স্ত্রীর সাথে কথা বলেন ডাক্তার। তাদের কথার মাঝে রুমের ছাদ দেখছিল ও। ডাক্তার কথা শেষ করে চলে গেলে কেবিনে নীরবতা নেমে আসে। সিকান্দার আর তায়িবা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। তাদের এত চেষ্টা আর সতর্কতা পরও এটা সালার

সিকান্দারের আত্মহত্যার চতুর্ন চেষ্টা। এবার তো সত্যিই মরতে মরতে বেঁচে গেছে। ডাক্তারের ভাষ্যমতে কয়েক মিনিট দেরি হলেই ওকে বাঁচাতে পারত না। রাতে ফোন দিতেই কাজের লোক তাদেরকে সালারের এই আত্মহত্যার চেষ্টার খবর জানায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জন সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। ফ্লাইট কনফার্ম হওয়া পর্যন্ত সিকান্দার উসমান প্রায় দেড়শ সিগারেট ফুঁকে শেষ করে ফেলেছিল। তবু তার অস্থিরতা-দুশ্চিন্তা এক বিন্দুও কমেনি।

'আমার বুঝে আসে না ও আদতে এসব কেন করে? আমাদের উপদেশ, শাসন, মানা কেন ওর মাথায় ঢোকে না?' সিকান্দার উসমান যাত্রাপথে বলছিলেন। 'মাথা নষ্ট হয়ে যায় ওকে নিয়ে ভাবতে গেলে। কী বাকি রেখেছি আমি ওর জন্য? সব ধরনের বিলাসিতা, উচ্চপর্যায়ের পড়াশোনা... এমনকি বড় থেকে বড় সাইকো-আন্যালিস্টও দেখিয়েছি। তবুও ফলাফল এই যে...! আমার তো বুঝে আসে না আমাকে দিয়ে কী এমন ভুল হয়েছে, যার কারণে আমি এই শাস্তি পাচ্ছি? পরিচিত সবার মাঝে হাসির পাত্র হয়ে গেছি এর জন্য।'

তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। 'সবসময় আমার দম গলায় আটকে থাকে, না-জানি কখন এই ছেলে কী করে বসে! এত সতর্ক থাকার পরিণাম এটা যে. আমরা আবার ব্যর্থ হয়েছি আর ও নিজের কাজ করে ফেলেছে।'

তায়িবা সিকান্দার টিস্যু দিয়ে চোখে মোছেন। তারা দু'জন করাচি থেকে ইসলামাবাদ এসেছেন। কিন্তু সালারের সামনে এসে চুপ হয়ে গেলেন। বুঝতে পারছিলেন না এই অবস্থায় ওর সাথে কী বলবেন। বাবা-মায়ের মন ও মস্তিষ্কের অবস্থা ভালো করেই জানে ও। তাদের নীরবতার সুযোগ নেয়। তারা সেদিন কিছুই বলেনি। পরদিনও চুপচাপ থাকেন। কিন্তু তৃতীয় দিন... নিজেদের নীরবতা ভেঙে ফেলে দু'জনেই।

'আমাকে শুধু এটুকু বলো...তুমি আদতে এসব কেন করো?'

সিকান্দার উসমান রাতে ভীষণ ধৈর্য নিয়ে ছেলের সঙ্গে কথা শুরু করেন। 'সমস্যা কী। তুমি কথা দিয়েছিলে এমন কিছু আর করবে না। আমি সেই কথার উপর তোমাকে স্পোর্টস কার আনিয়ে দিয়েছি। তোমার সব কথা রাখি আমরা। অথচ

তোমার সামান্য খেয়াল নেই আমাদের ব্যাপারে? পরিবারের
সম্মানের ব্যাপারে?’

সালার চুপচাপ বসে থাকে।

‘অন্য কারো জন্য না হোক, অন্তত আমাদের দু’জনার কথা
ভাবে। তোমার জন্য আমাদের রাতের ঘুম উড়ে গেছে।’
তায়িবা সিকান্দার বললেন ‘তোমার কোনো চিন্তা বা সমস্যা
থাকলে আমাদের সঙ্গে ডিসকাস করো, আমাদের বলো।
কিন্তু এভাবে বারবার মরার চেষ্টা করবে...। কখনো ভেবে
দেখেছ তুমি এসব চেষ্টায় সফল হয়ে গেলে... আমাদের কী
হতো?’

সালার তাদের কথা শুনছে। তাদের কথার মাঝে নতুন কিছু
নেই। প্রতিবার আত্মহত্যার চেষ্টার পরে এগুলোই শুনে
আসছিল।

'কিছু বলো, চুপ করে আছো কেন? মাথায় কিছু ঢুকছে তোমার?' তায়িব্যা রেগে বললেন। 'বাবা-মাকে এভাবে অপমান করে বেশ আনন্দ পাও, তাই না?'

'কত সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। আর তুমি আহাম্মকের মতো কাজকর্ম করে নিজের জীবন শেষ করতে চাও? মানুষ পাগল এমন একাডেমিক রেকর্ড পাওয়ার জন্য।' সিকান্দার উসমান ছেলেকে ওর একাডেমিক রেকর্ড মনে করানোর চেষ্টা করেন।

সালার হাই তোলে। জানে, তারা ছোটবেলা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ওর সব অর্জনের গল্প পুনরাবৃত্তি করবেন। পরের পনেরো মিনিট যাবৎ সেসব নিয়ে কথা বলার পর সিকান্দার উসমান ক্লান্ত হয়ে জিঙেঙ্গ করলেন। 'কিছু বলছ না কেন? বলো!'

'কী বলব? যা বলার আপনারা দু'জনই বলে ফেলেছেন।' সালার কিছুটা বিরক্ত হয়। 'আমার জীবন আমার পার্সোনাল

ম্যাটার। তবু আপনাদেরকে বলেছি, আমি মোটেও মরার চেষ্টা করছি না।

সিকান্দার উসমান ওকে বাধা দিয়ে বললেন। 'যা করছ সেটাই বন্ধ করো, আমাদের ওপর করুণা হলেও...'

সালার রুষ্ট চোখে বাবার দিকে তাকায়।

'বলো সামনে থেকে এমন কিছু করবে না, অযথা তর্ক বাড়াচ্ছ কেন?'

এবার তায়িবা সিকান্দার বললেন।

'আচ্ছা ঠিক আছে, করব না এমন কিছু।' সালার কোনোরকম তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বলে।

সিকান্দার উসমান দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ওর কথায় তিনি বা তার স্ত্রী দু'জনার কেউ নিশ্চিত হননি। কিন্তু এইটুকু শোনার বাইরে

তাদের কাছে অন্য কোনো উপায়ও যে নেই। এই ছেলে নিয়ে ছোটবেলা থেকে তারা ভীষণ গর্ব করে এসেছেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে... তাদের সমস্ত গর্ব চূর্ণ হয়ে গেছে ওর কাজকর্মে। যতটা পেরেশানিতে ও একা তাদেরকে রেখেছিল, ততটা তাদের বাকি সব ছেলেমেয়ে মিলেও পারে নি।

‘এখন কেমন আছে তোমার বন্ধু? দেখতে গিয়েছিলে ওকে?’ ইমামা ভাইয়ের সাথে মার্কেটে যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করল।

‘আগের চেয়ে অবস্থা ভালো। হয়তো কাল-পরশু ডিসচার্জ হয়ে যাবো।’ ওয়াসিম বলল। ‘ফেরার পথে দেখতে যাবে তুমি?’

“আমি...!” ইমামা অবাক হয়। ‘আমি... গিয়ে কী করব?’

‘অবস্থা জিজ্ঞেস করবে, আর কী করতে...?’ ওয়াসিম বলল।

ইমামা অলস ভঙ্গিতে কাঁধ নেড়ে বলল। 'আচ্ছা, যাব। যদিও এসব রোগীর খবর নেওয়া অর্থহীন। ভেবেছিলাম ওর বাবা-মা আমাদের বাড়ি আসবে, তাদের ছেলের জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ জানাবো। ঠিক কোন মুহূর্তে সাহায্য করেছিলাম আমরা...কিন্তু তারা দেখছি ভুল করেও আমাদের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়নি।' অভিযোগ করে ও।

'তুমি এই বেচারাদের কন্ডিশন আন্দাজ করতে পারছ না। কোন মুখে তারা ধন্যবাদ জানাতে আসবে, এর মাঝে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসে-আপনার ছেলে এসব কেন করে? তখন কী উত্তর দেবে? এই মানুষ দুটো অদ্ভুত দুর্দশায় ফেঁসে গেছেন।' ওয়াসিম আফসোসের সুরে বলল। 'কিন্তু ওর বাবা-মা আমাকে অনেক ধন্যবাদ বলেছে। পরশু যখন আমি-বাবা ওকে দেখতে গেছেন, তখন তাদেরকেও শুরুরিয়া জানিয়েছেন। এটা তো আমি-বাবার বিচক্ষণতা যে, তারা সালারের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেনি। নাহলে সেখানেও বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেত।'

'কিন্তু তোমার এই বন্ধুর আসলে সমস্যা কী? বসে-বসে কেন আহাম্মকের মতো এসব কাজ-কারবার করে?'

'এমনভাবে জিজ্ঞেস করছ, যেন আমাকে সব জানিয়ে করে। আমি কী করে বলব কেন বা কীসের জন্য এসব করে?'

'তোমার এত কাছের বন্ধু। তুমি জিজ্ঞেস করো না ওকে?'

'এত কাছেরও না যে, এসব ব্যাপারে বলবে। তাছাড়া আমার এত জানার দরকার কী? আছে হয়তো ওর কোনো ঝামেলা।'

'এসব বন্ধুর থেকে দূরে থাকো। এ ধরনের মানুষের সাথে বন্ধুত ভালো না। কাল তুমিও যদি এমন কিছু করা শুরু করে দাও...?'

'চিন্তা করো না, সেদিন তুমি যা করেছ তা ওর মনে থাকলে আমাদের বন্ধুত্বে এমনিতেই ভালো দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে। ওয়াসিম কিছু মনে করায়।'

‘আমার মনে হয় না ওর সেই থাপ্পড়ের কথা মনে আছে। ঠিকমতো হুঁশই তো ছিল না তখন। তোমাকে কিছু বলেছে ও?’

‘না, কিছু বলেনি। কিন্তু হতে পারে মনে আছে। ভালো করোনি কাজটা তুমি।’

‘ওর আচরণ দায়ী ছিল। একদিকে হাত নাড়ে, অন্যদিকে গালি দেয়। তার ওপর আমার ওড়না টেনে ফেলে দিয়েছে।’

‘ও তোমরা ওড়নায় টান দেয়নি, হাত লেগে গিয়েছিল।’
‘ওয়াসিম বন্ধুর পক্ষ নিয়ে বলল।’

‘যাইহোক, সেই মুহূর্তে আমার অনেক রাগ উঠে যায়। পরে যদিও আফসোস করেছি। আমি তো আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছি ও বেঁচে যাওয়ায়। কোনোভাবে মরে গেলে নিজের এই থাপ্পড় নিয়ে আমি ভীষণ পস্তাতাম!’ ইমামা অনুতপ্ত ছিল।

'আচ্ছা আজকে যেহেতু যাচ্ছ, মাফ চেয়ে নিও।' ওয়াসিম পরামর্শ দেয়।

'মাফ কেন চাইতে যাব? হয়তো ওর কিছু মনেই নেই। খামোখা কবর খুঁড়ে লাশ তুলব কেন? ওকে মনে করাব সেদিন আমি কী করেছিলাম ওর সাথে।' ইমামা বিরক্ত হয়ে বলল।

'আর ধরে নাও... যদি ওর সব মনে থাকে তাহলে...?'

'তাহলে... তাতে কী? ওর সাথে আমাদের কীসের আত্মীয়তা যে, সম্পর্ক খারাপ হলে মেলামেশা কমে যাবে?'

শপিং শেষে ওয়াসিম ক্লিনিকে নিয়ে আসে ইমামাকে। যেখানে সালারের চিকিৎসা চলছে। ওরা যখন কেবিনে ঢোকে, সালার তখন সুপ খাচ্ছিল। ওয়াসিমের সঙ্গে আসা মেয়েটাকে দেখে চিনে ফেলল। সেই রাতে ওই অবস্থায় যদিও ঠিকঠাক চিনতে পারেনি, তবে আজ চিনতে দেরি

হলো না। মায়ের কাছ থেকে আগেই জেনেছে ওয়াসিমের বোন ওকে ফাস্ট এইড দিয়েছিল। যদিও ফাস্ট এইডের কথা মনে নেই। মনে আছে শুধু ঠাস করে দেওয়া থাপ্পড়, যা ওর গালে সেই রাতে পড়েছিল। তাই ইমামাকে দেখে সুপ খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সালারের সূচালো দৃষ্টি দেখে ইমামার আন্দাজ হয়ে যায়, সেই রাতের ঘটনা বেশি-কম হলেও এই ছেলের মনে আছে। কুশল বিনিময়ের পরে তায়িবা সিকান্দার ইমামাকে ধন্যবাদ জানান। সালার তখনো সুপ খাওয়ার ফাঁকে ইমামার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওয়াসিমের সাথে ওর বন্ধুত্ব অনেক বছরের। ওয়াসিমদের বাড়িতে মেয়েটাকে অসংখ্যবার দেখেছে। তবে আগে কখনো মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু সেদিন প্রথম বাঁকা চোখে দেখছিল। ইমামার প্রতি ওর কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ বা ঋণী মনোভাব নেই। কারণ এই মেয়ের জন্য ওর সব প্ল্যান পানিতে গেছে।

তায়িবা সিকান্দারের সাথে কথা বললেও ইমামা নিজের ওপর পড়ে থাকা সালারের দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন ছিল। জীবনে এই প্রথম কারো চাহনি ওর খারাপ লাগলো। এক মুহূর্তের জন্য মন বলছিল ওখান থেকে উঠে পালিয়ে যেতে। সালারের ব্যাপারে ওর রায় আরও খারাপ হয়। নিজের সেই থাপ্পড়ের জন্য মাফ চাইতে এলেও এখন ওর মন চাইছিল সামনে থাকা ছেলেটারে আরও দু'চারটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতে। ভদ্রতার খাতিরে কিছুক্ষণ বসে বের হওয়ার জন্য উঠে পড়ে। বের হওয়ার সময় সালারের সাথে ভদ্রতাও দেখানোর প্রয়োজনবোধ করেনি। তায়িবা সিকান্দারের সঙ্গে দোয়া-সালাম শেষ করে রোগীর দিকে কোনোরকম না তাকিয়েই বেরিয়ে আসে। বাইরে এসে স্বস্তির শ্বাস নেয়।

'এমন বন্ধু বানিয়েছ তুমি?' ইমামা বাইরে বেরিয়েই ভাইকে বলল।

ওয়াসিম অবাক হয়ে বোনকে জিজ্ঞেস করল। 'কেন? এখন কী হয়েছে!' 'তাকানোর ভদ্রতাটুকুও নেই ওর। এই বোধ নেই যে, আমি ওর বন্ধুর বোন।'

ওয়াসিম বোনের কথায় মিইয়ে গেল।

'এই মানুষটা খোঁজখবর নেওয়ার মতোও যোগ্য না। আর তুমি...এর সাথে চলাফেরা বন্ধ করো।'

"আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এড়িয়ে চলব। কিন্তু তুমি বারবার একই কথা বলতে থেকো না।"

ইমামা চুপ হয়ে যায়। ততক্ষণে সালার ওর অপছন্দের তালিকায় যুক্ত হয়ে গেছে। এটা কাকতালীয় যে, এই সময় কিছুদিনের ছুটি কাটাতে ইসলামাবাদ এসেছিল। নাহলে হয়তো... সালারকে এত কাছ থেকে দেখা বা ওদের মাঝে এমন অপছন্দনীয় পরিচয় বা জানাশোনা তৈরি হতো না।

ইসলাম কবুলের পর ইমামা প্রথম জালালকে সেদিন কাছ থেকে দেখে, যখন একদিন ওরা চারজন কলেজের লনে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিল। কোনো কাজে জালাল ওদের কলেজে এসেছে। সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শেষ করে জয়নবকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায় সে। তার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারেনি ও। এক অজানা তৃপ্তি, আনন্দ ওকে ঘিরে ধরে। জয়নবের সাথে কয়েক মিনিট কথা বলে জালাল চলে যায়। তার গমনপথে ও ততক্ষণ তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ না সে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। আশেপাশে থাকা অন্য সবাই তখন কী নিয়ে কথা বলছে, ওর সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। জালাল দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে ঘোর কাটিয়ে নিজের পরিবেশে ফেরে।

জালাল আনসারের সঙ্গে দ্বিতীয় দেখা জয়নবদের বাড়িতে। সেদিন কলেজ শেষ করে জয়নবের সাথে ওদের বাড়ি চলে আসে ইমামা। কয়েকদিন ধরেই জয়নব সবাইকে ওদের বাড়িতে আসার কথা বলছিল। কিন্তু সবাই যে যার মতো অজুহাত দেখায়। তবে ইমামা সেদিন আসে। এই বাড়িতে

এসে অদ্ভুত এক স্বস্তি অনুভব করে। হয়তো এই অনুভূতির কারণ বাড়ির সাথে থাকা জালাল আনসারের সম্পৃক্ততা। ওকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে জয়নব কিচেনে চা বানাতে যায়। জালাল ড্রয়িংরুমে এসে ইমামাকে দেখে চমকায়। অপরিচিত কেউ এখানে থাকতে পারে বলে আশা করেনি হয়তো।

'আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন?' হুট করে প্রবেশ করার লজ্জা এড়ায় জালাল।

ইমামা লাজুক চেহারা নিয়ে তাকে উত্তর দেয়।

'জয়নবের সাথে এসেছেন?'

'জি।' ইমামা বলল।

'জয়নব কোথায়? আমি ওকে খুঁজতে এসেছি, জানতাম না মেহমান আছে।' ক্ষমাপ্রার্থীর সুরে বলল জালাল।

'আপনি খুব সুন্দর নাত আবৃত্তি করেন।' ইমামা মুখ ফসকে বলে ফেলে।

জালাল থমকে যায়। 'ধন্যবাদ, আপনি কোথায় শুনলেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'একদিন জয়নবকে কল করেছিলাম, ফোন যতক্ষণ হোল্ড ছিল ততক্ষণ আপনার আওয়াজ পৌঁছায় আমার কাছে। এরপর জয়নবের কাছে আপনার ব্যাপারে শুনলাম। আমি সেই নাত-প্রতিযোগিতায়ও গেছি, যেখানে আপনি এই নাত আবৃত্তি করেছিলেন...' ইমামা লাগামহীনভাবে বলতে থাকে।

জালাল বুঝতে পারছে না অবাক হওয়া উচিত না খুশি! 'খুব ভালো তো না, কিন্তু আবৃত্তি করতে পারি। ব্যাস, আল্লাহ তায়ালার রহমত।' ধাক্কা সামলে সাদা চাদর জড়ানো হালকা-পাতলা গড়নের লম্বা উচ্চতার মেয়েটার প্রশংসা সম্পূর্ণ আলাদা। কণ্ঠের প্রশংসা এর আগেও বহুজনের কাছ থেকে শুনেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ভালো করে তাকায়। যার গভীর

কালো চোখে অজানা অভিব্যক্তি। নিজের এই প্রশংসা মেয়েটা যে ভঙ্গিতে বলছে, তা আরও বেশি আলাদা। ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়েদের সাথে কথা বলায় তেমন দক্ষতা নেই। তার উপর এমন একটা মেয়ের সঙ্গে, যার সাথে পরিচয় কেবল মুখ-চেনা পর্যন্ত।

ইমামা অদ্ভুত সুখানুভূতি নিয়ে বসে রইল। বিশ্বাস হচ্ছিল না ও জালাল আনসারের সাথে কথা বলেছে। সামনে থেকে, এত কাছে দাঁড়িয়ে। ড্রয়িংরুমের কার্পেটের সেই অংশের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে কিছুক্ষণ আগে জালাল দাঁড়ানো ছিল। কল্পনার চোখে এখনো জালালকে সেখানে দেখতে পাচ্ছে।

তৃতীয় দেখা হসপিটালে। গতবার ইমামা ইচ্ছে করে জয়নবের সাথে বাড়িতে গেলেও এবারের দেখা হওয়া সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। রাবেয়ার সঙ্গে আসে ও। রাবেয়া এখানে এক ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে হসপিটালের করিডোরে ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টদের

গ্রুপে জালালকে দেখে হার্টবিট মিস হয় ওর। করিডোরে এত রাশ ছিল যে, কাছে যেতে পারেনি। সে প্রথম বুঝতে পারে জালালকে সামনে পেয়ে নিজেকে থামিয়ে রাখা ওর জন্য কত কঠিন। রাবেয়া আর রাবেয়ার ফ্রেন্ডের সাথে বসে থাকলেও মনোযোগ সম্পূর্ণ বাইরে ছিল ওর। এক-দেড় ঘন্টা পর রাবেয়ার ফ্রেন্ডের রুম থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। করিডোরে ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টদের সেই গ্রুপ আর নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও খারাপ লাগে। কথা বলতে বলতে বের হচ্ছিল ওর তখনই সিড়িতে জালালের মুখোমুখি হয়। ওর ভেতরে খুশির বাতাস বয়ে যায়।

'আসসালামু আলাইকুম জালাল ভাই! কেমন আছেন?'
রাবেয়া কথা শুরু করে।

জালাল সালামের উত্তর নিয়ে বলল। 'আলহামদুল্লিহ। আপনার এখানে?' ইমামার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'এক ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে আসা। ইমামাকে আমি নিয়ে এসেছি।' রাবেয়া মুখে হাসি নিয়ে বলল।

ইমামা চুপচাপ স্থির চোখে শুধু তাকে দেখছিল। 'দাস্তানগি মেরি তেনহাই কিতনে হি তো কেয়া, ম্যায় তো মার যাতা আগার সাথ না হোতা তেরা।'

জালালের গলা শুনে ঘোরের মধ্যে চলে যায় ও। খুব কম মানুষকে এত স্পষ্ট উচ্চারণে উর্দু বলতে শুনেছে এর আগে, যে উচ্চারণে জালাল কথা বলছিল।

কেন জানি প্রতিবার তার গলা শুনলে ওর কানে সেই নাত বেজে ওঠে। এক অদ্ভুত হিংসা কাজ করে জালালের দিকে তাকিয়ে। রাবেয়ার সাথে কথা বলার সময় জালাল হয়তো ওর একাগ্রতা ধরে ফেলে। তাই কথা বলতে বলতে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। ও চোখ সরিয়ে নেয়। অথচ মন বলে আরও কাছে চলে যেতে। জালালের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে তিনবার লা-হাওলা পড়ে।

'হয়তো শয়তান আমাকে বিপথে নেওয়ার জন্য তার দিকে এমন আকৃষ্ট করছে।' মনে মনে ভাবে।

কিন্তু লা-হাওলা পড়ার পরও কোনো পরিবর্তন এলো না। এখনো জালালের প্রতি আগের মতোই আকর্ষণ অনুভব করছিল ও। আসজাদের সঙ্গে এত বছরের বাগদান সত্ত্বেও কখনো নিজেকে এমন লাগামহীন হতে দেখেনি, যেমনটা এই মুহূর্তে হচ্ছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে সেই প্রথম জালালকে ভীষণ ভয় পেতে শুরু করে। 'আমি কী করব যদি আমার মন এই লোকটাকে দেখলে লাগামহীন হয়ে যায়? তাকে দেখলে আমার...?' অসহায়ভাবে ভাবে। 'আমি তো এত দুর্বল কখনো ছিলাম না যে, কাউকে দেখেই...?' নিজের অস্তিত্ব ওর কাছে মোম মনে হয়।

'ভাই আপনি ফ্রি আছেন?' দরজায় আওয়াজ করে জয়নব ভাইয়ের রুমে ঢোকে।

'হ্যাঁ, আসো।' জালাল পড়ার টেবিল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বোনের দিকে তাকায়।

'আপনার জন্য একটা কাজ আছে।' জয়নব ভাইয়ের কাছে এসে বলল।

'কী কাজ?' বোনকে জিজ্ঞেস করে জালাল।

'একটা ক্যাসেটে আপনার কণ্ঠে কিছু নাত রেকর্ড করে দিতে হবে।'

জালাল অবাক হয়ে বোনের অনুরোধ শোনে। 'কীসের জন্য?'

'আমার ফ্রেন্ড ইমামা, আপনার কণ্ঠ ওর খুব পছন্দ। ও আবদার করেছে, আমিও রাজি হয়ে গেছি।'

জালাল হাসে। কয়েকদিন আগের সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। 'এটা সেই মেয়েটা না, যে আমাদের বাসায় এসেছিল?'

‘হ্যাঁ, ওই মেয়েটাই। ইসলামাবাদ থেকে এসেছে।’

‘ইসলামাবাদ থেকে? হোস্টেলে থাকে?’

‘হ্যাঁ। পরিবার খুব নামকরা। বাবা বড় এক শিল্পপতি। কিন্তু ওর সাথে চলাফেরা করলে মোটেও মনে হয় না।’ জয়নব বান্ধবীর প্রশংসা করে।

‘বেশ ধার্মিক মনে হয়? দুয়েকবার তোমার সাথে দেখেছি। কলেজেও চাদর জড়িয়ে রাখে। এখানকার আবহাওয়া এখনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।’

‘ভাই! ওর পরিবারও খুব ধার্মিক। যখন থেকে এসেছে এমনই দেখছি। মনে হয় খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলি। কিন্তু বেশ উচ্চশিক্ষিত। শুধু এর ভাইয়েরা না বোনরাও। ইমামা বাড়ির ছোটো মেয়ে।’ জয়নব বিস্তারিত বলে ভাইকে জিজ্ঞেস করল। ‘কবে রেকর্ড করে দিচ্ছেন?’

'কালকে এসে নিয়ে যেও, আমি রেকর্ড করে রাখব।' জালাল উত্তরে বলল।

জয়নব রুমে থেকে বেরিয়ে যায়। জালাল কিছুক্ষণ ভেবে আবার বইয়ে মন দেয়।

এরপরের দেখা হওয়া লাইব্রেরিতে। জালালকে দেখে তার কাছে চলে আসে ইমামা।

কুশল বিনিময়ের পর তাকে বলে। 'আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ছিল।'

'কীসের জন্য?'' জালাল প্রশ্ন তোলে।

'রেকর্ড ক্যাসেটের জন্য।'

জালাল হাসে। 'এর দরকার নেই। আন্দাজ ছিল না কেউ আমার কাছেও এমন আবদার করতে পারে।' বলে।

"আপনি ভীষণ ভাগ্যবান।" ইমামা মৃদু আওয়াজে তার দিকে তাকিয়ে বলে।

'আমি... কোন দিক থেকে?' জালাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'সবদিক থেকে, আপনার কাছে সব আছে।'

'আপনার কাছেও তো অনেক কিছু আছে।'

ইমামা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে। জালালের মনে হলো ওর চোখে আর্দ্রতা। কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারছে না। কারণ মাথা নিচু করে রাখা।

'আগে কিছুই ছিল না, এখন সত্যিই সবকিছু আছে।'

জালাল মৃদু আওয়াজে ওকে বলতে শুনে অবোধ্য ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে।

'আপনি এত ভালোবাসা নিয়ে রসুল সা.-এর নাম নেন যে, তখন আমি ভাবি...' ইমামা কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে যায়।

জালাল চুপ করে ইমামার কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে।

'আপনার প্রতি আমার হিংসা হয়।' কিছুক্ষণ পর ইমামা আঙুঠে করে বলে।

'সবাই আপনার মতো হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে ভালোবাসতে পারে না। বাসলেও সবাই আপনার মতো এমনভাবে তা প্রকাশ করতে পারে না, যা শুনে অন্য কেউও তাকে ভালোবাসতে বাধ্য হয়ে যাবে। রাসুল সা.-ও নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক ভালোবাসেন।'

ইমামার চোখ ভেজা না। হয়তো আমার ভ্রম ছিল, জালাল মনে মনে ভাবে। 'এটা তো জানা নেই। তবে এমন কিছু হলে সত্যিই আমি খুব ভাগ্যবান! আমি শুধু জানি, সত্যিই আমি রসুল সা.-কে ভালোবাসি এবং আমার মতো মানুষের জন্য

তো এটাই যথেষ্ট। কারণ সবাইকে আল্লাহ এই ভালোবাসার সুযোগ দেন না।" বেশ তৃপ্তি নিয়ে বলল।

জালালের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না ইমামা। জীবনে কখনো কারো সামনে এমন হীনম্মন্যতা অনুভব করেনি, যা জালাল আনসারের সামনে এলে করে। 'আমিও তো নাত পড়ি। হয়তো চেষ্টা করলে খুব ভালো পারব, কিন্তু আমি... কখনো জালাল আনসার হতে পারব না। কখনো আমার কণ্ঠ শুনে কারো মাঝে সেই অনুভূতি জাগবে না, যা জালাল আনসারের কণ্ঠ শুনে জাগে।' লাইব্রেরি থেকে বের হওয়ার সময় ক্রমাগত ভাবছিল।

গত কয়েকবারের সাক্ষাতের পর ইমামা যথাসাধ্য চেষ্টা করে আর কখনো জালালের মুখোমুখি না হওয়ার। তাকে নিয়ে না ভাবার এবং জয়নবদের বাড়িতে না যাওয়ার। এমনকি নিজের তরফ থেকে জয়নবের সাথেও দূরত্ব বাড়িয়ে চলে। কিন্তু ওর সব আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। দিন অতিক্রম হওয়ার সাথে-সাথে ভেতরের অস্থিরতা বাড়তে থাকে।

অতঃপর একদিন হাঁট গেড়ে পরাজয় বরণ করে নেয় ও। 'সেই মানুষটার মাঝে এমন কিছু আছে, যার কারণে তার সামনে আমার সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা মরে যায়।' হয়তো এটা স্বীকারোক্তি ছিল, যা ওকে আবার জালালের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

প্রথমদিকে এই অপারগতা উদ্দেশ্যহীন হলেও পরে ইচ্ছাকৃত আসজাদের স্থান জালালকে দিয়ে দেয় ও। 'মন্দ কী যদি আমি সেই লোকটার সঙ্গে চাই, যার আওয়াজ আমাকে বারবার নবীর সান্নিধ্যে ফিরতে বাধ্য করে? আমি সেই তাকে চাইব না, যে আমার তুলনায় রসূল সা.-কে বেশি ভালোবাসতে জানে? ক্ষতি কী যদি আমি তাকে নিজের নিয়তি হিসেবে পাওয়ার দোয়া করি, যার প্রতি আমার অনুভূতি কাজ করে? যার চরিত্রের সাথে আমি পরিচিত। এমন চাওয়া কি ভুল যে, জালাল আনসারের নামে আমার পরিচয় হোক? সেই ব্যক্তির নামে, যাকে শুনলে-দেখলে তার প্রতি হিংসা কাজ করে।' নিজের আবেগ সঠিক প্রমাণের সব যুক্তি-প্রমাণ হাজির ছিল ওর কাছে।

তাই খুব অগোচরে সেসব জায়গায় যেতে শুরু করে, যেখানে জালালের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। আর প্রায়ই সেসব জায়গায় তাকে পেয়ে যেত। জয়নবকে তখন ফোন করত, যখন জালাল বাড়িতে থাকত। কারণ বাড়িতে থাকলে সে-ই প্রথম ফোন রিসিভ করত। দু'জনের ছোট-ছোট কথাবার্তা ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। এরপর দেখা করা শুরু হয়। জাভেরিয়া, রাবেয়া বা জয়নব তিনজনের কেউই জালাল আর ওর মধ্যকার ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক টের পায়নি। জালাল হাউজ জব করছিল। তাই প্রায় তার হসপিটালে চলে আসত ও। সরাসরি কেউ কাউকে ভালোবাসি না বললেও দু'জনই একে-অপরের অনুভূতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। জালাল জানত ইমামা তাকে পছন্দ করে, আর এই পছন্দ সাধারণ পর্যায়েই না। ইমামাও জেনে যায় জালাল ওর প্রতি বিশেষ কিছু অনুভব করতে শুরু করেছে।

জালাল নিজেকে এত ধার্মিক ভাবত যে, কখনো কল্পনা করেনি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে যাবে। এমনকি শুধু প্রেম নয়; বরং এভাবে দেখা করবে। কিন্তু এসব বেশ নীরবে

এগোচ্ছিল। কখনো বোনকেও বলেনি ইমামার সঙ্গে তার আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যদি স্বীকার করত বা বলত, তাহলে জয়নব নিশ্চয়ই ভাইকে ইমামার ঠিক হয়ে থাকা সম্বন্ধের ব্যাপারে সাবধান করে দিত। এর ফলে শুরুর দিকেই ইমামার এমন কোনো সম্পর্কের ব্যাপারে জানলে সে অবশ্যই সতর্ক হয়ে যেত। তাতে এতদূর জড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসত না, যতদূর এখন হয়ে গেছে। এমনই এক সাক্ষাতে জালালকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে ইমামা। জালাল ওর সাহসে অবাক হয়। নিজে ছেলে হয়েও এখন পর্যন্ত সাহস করে এমন কিছু বলতে পারেনি।

'কিছুদিনের মধ্যে আপনার হাউস জব শেষ হয়ে যাবে, তারপর কী করবেন?' ইমামা জিজ্ঞেস করে।

'তারপর আমি স্পেশলাইজেশনের জন্য দেশের বাইরে যাব।' জালাল উত্তর দেয়।

'আর তারপর?'

'ফিরে এসে নিজে হসপিটাল দেবো।'

'বিয়ে নিয়ে কিছু ভেবেছেন?' ইমামা পরের প্রশ্ন করে।

জালাল হেসে উত্তর দেয়। 'বিয়ে নিয়ে সবাই ভাবে।'

'কাকে বিয়ে করবেন বলে ভাবছেন?'

'সেটা এখনো ভাবা বাকি।'

ইমামা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে। 'আমাকে করবেন?'

জালাল থা বনে যায়। এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে আশা করেনি।

'আমার কথা খারাপ লেগেছে?' তার চুপ হয়ে যাওয়া দেখে ইমামা জিজ্ঞেস করে।

জালাল নিজেকে সামলে বলল। 'না। এই প্রশ্ন আমার তোমাকে করা উচিত ছিল। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ।' ইমামা বিনা বাক্যে উত্তর দেয়। 'আর আপনি?'

'আমি... আমি... হ্যাঁ, অফকোর্স। তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারি?' এই বাক্যে ইমামার চেহারা উজ্জ্বল হতে দেখে জালাল। 'হাউস জব শেষ হলে বাবা-মাকে তোমার পরিবারের কাছে পাঠাব।'

ইমামা এবার চুপ হয়ে যায়। 'জালাল! যদি পরিবারের সম্মতি ছাড়া আমি আপনাকে বিয়ে করি?'

জালাল ওর কথার মানে বুঝল না। 'মানে কী?'

'হয়তো আমার বাবা-মা এই বিয়েতে রাজি হবে না।'

'তুমি তাদের সাথে কথা বলেছ?'

'না, বলিনি।'

'তাহলে কীভাবে বলছ?'

'কারণ আমি তাদেরকে চিনি।'

জালাল কিছুটা চিন্তায় পড়ে। 'ইমামা! আমি কখনো ভাবিনি আমাদের বিয়েতে তোমার বাবা-মায়ের আপত্তি থাকতে পারে। আমার মনে হয় না এমন কিছু হবে।'

'কিন্তু এমন হতে পারে। আপনি শুধু এইটুকু বলুন, এমন পরিস্থিতি তৈরি হলেও আপনি আমাকে বিয়ে করবেন কিনা?'

জালাল চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। ইমামা অস্থিরতা নিয়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। অবশেষে জালাল নীরবতা ভাঙে।

'হ্যাঁ, তখনো তোমাকে বিয়ে করব। আমার পক্ষে এখন আর অন্য কাউকে বিয়ে করা সম্ভব না। চেষ্টা করব তোমার বাবা-

মাকে রাজি করার। তবে রাজি না হলে আমরা তাদের সম্মতি ছাড়াই বিয়ে করে নেব।"

"আপনার বাবা-মা কি এমন বিয়েতে রাজি হবে?"

"আমি তাদের মানিয়ে নেব। তারা আমার কথা ফেলে না।"
জালাল গর্ব করে বলল।

হ্যালোর আওয়াজে ঘুরে তাকায় ইমামা। কিছুটা দূরে সালার দাঁড়ানো। নিজের সেই বেহাল বেশভূষায়। টি-শার্টের সব বোতাম খোলা, জিপ্সের পকেটে হাত, আর নিজে বেশ ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য ইমামার বুঝে আসে না কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। সালারের সাথে তৈমুর।

'চলো, ওই মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।' বইয়ের দোকানের দিকে পা বাড়ায় সালার।

তৈমুর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল। 'ওই চাদরওয়ালির সাথে?'

'হ্যাঁ।' বলে সামনে আগায় সালার।

'এটা কে?' তৈমুর প্রশ্ন করে।

'ওয়াসিমের বোন।'

'ওয়াসিমের... তুমি কেন দেখা করবে? ওদের পরিবার খুব কনজারভেটিভ জানো না? দেখা করে কী হবে?' দূর থেকে ইমামাকে একনজর দেখে তৈমুর বলল।

'এই প্রথম নয়, এর আগেও দেখা করেছি। কথা বলতে সমস্যা কোথায়?' সালার বন্ধুর কথায় ক্রম্বেপ করল না।

ইমামা ম্যাগাজিন হাতে একনজর সালারকে, আরেক নজর সাথে থাকা অন্য ছেলেটাকে দেখে। যার বেশভূষাও প্রায় সালারের মতো।

'How are you?' সালার জিজ্ঞেস করল।

'Fine.' ইমামা ম্যাগাজিন বন্ধ করে বলল।

'ও তৈমুর, ওয়াসিমের সাথে ওরও ভালো বন্ধুত্ব।' সালার পরিচয় করায়।

ইমামা একনজর তৈমুরের দিকে তাকিয়ে শপিং সেন্টারের দিকে ইশারা করে বলল। 'ওয়াসিম ওখানে।'

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে ইমামা যেদিকে ইশারা করেছে সেদিকে একবার তাকাল, এরপর বলল। 'আমরা ওয়াসিমের সাথে দেখা করতে আসিনি।'

'তাহলে?' ইমামা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।'

'আমি তো আপনাকে চিনি না, আমার সাথে কী বলবেন?'
ইমামা শীতল গলায় বলে। সালারের দৃষ্টিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল।
এই মানুষটাকে যদি কেউ চোখ নামিয়ে কথা বলা শেখাত,
অন্তত একটা মেয়ের সাথে। মনে মনে ভেবে ম্যাগাজিন খুলে
নেয়।

'আপনি আমাকে চেনেন না?' সালার ঠাট্টাচ্ছিলে বলল।
'আপনার বাড়ির পাশেই আমার বাড়ি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে চিনি না।'
ইমামা রুক্ষভাবে বলল।

'কয়েক মাস আগে একরাতে আমার জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন।'
সালার মনে করায়।

'একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে সেটা আমার দায়িত্ব ছিল। আমার সামনে যে-কেউ মরতে বসলেই আমি তা করতাম। এখন আমাকে এক্সকিউস করুন, আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

সালার এই বাক্যের পরও নড়ল না। তৈমুর হালকা করে ওর বাহু টেনে যাওয়ার ইঙ্গিত করে। সম্ভবত ওয়াসিমের খাতিরে ইমামার প্রতি ভদ্রতা দেখাচ্ছিল। কিন্তু সালার বাহু ছাড়িয়ে নেয়।

'আমি সেই রাতের সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। যদিও আপনি কোনো প্রফেশনাল পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট দেননি আমাকে।' এবার গম্ভীর হয়ে বলল সালার।

ইমামা এবার ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে তাকায়। 'যদি আপনার ইশারা সেই থাপ্পড়ের দিকে হয়, তাহলে হ্যাঁ! ওটা মোটেও প্রফেশনাল ছিল না। আমি এর জন্য দুঃখিত!'

'আমি তাতে মাইন্ড করিনি, আমার ইশারা সেদিকে ছিল না।'
সালার নির্লিপ্তভাবে বলে।

'আমিও আশা করেছিলাম আপনি সেই থাপ্পড় নিয়ে মাইন্ড করেননি।' কারণ আপনার প্রাপ্য সেটা, শুধু একটা না আরও দশটা। কথার বাকি অর্ধেক নিজের মাঝে রেখে ইমামা জিজ্ঞেস করল। 'যাইহোক, আপনার ইশারা কোনদিকে ছিল?'

'ভীষণ হার্ডক্লাস টাইপের ব্যান্ডেজ করেছিলেন। এমনকি আপনি প্রপারলি ব্লাড প্রেশার চেক করতেও পারেন না।'
সালার চুইংগামের একটা ষ্টিক মুখে দেয়।

ইমামার কানের লতি লাল হয়ে উঠল। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে।

'ভীষণ আফসোসের বিষয়... একজন ডাক্তার সেসব ছোটখাটো কাজ পারে না, যা একজন সাধারণ মানুষও পারে।' সালারের সুরে টিটকারি।

'প্রথমত, আমি ডাক্তার না; মেডিকেলের ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট। আর দ্বিতীয়ত যতদূর প্রসঙ্গ রইল আনপ্রফেশনাল হওয়ার, তবে পরেরবার হোক... আপনার তো এখনো এমন অনেক চেষ্টা করার বাকি। আমি ধীরে ধীরে আপনার ওপর প্র্যাকটিস করে নিজের হাত পাকিয়ে নেব।'

এক মুহূর্তের জন্য সালার কিছু বলতে পারল না। কিন্তু ওর চেহারায়ে হাসি ফুটে ওঠে। যেন ইমামার কথায় মজা পেয়েছে, লজ্জা না। সেটা পরিষ্কারও করে দেয়। 'আপনি যদি আমাকে লজ্জা দিতে চান, তাহলে ব্যর্থ হবেন।'

'আমি জানি আপনি লজ্জা পান না, কারণ এটা মানুষের বৈশিষ্ট্য।' ইমামা বলল।

‘তবে আপনার মত অনুযায়ী আমি কী?’ সালারও একই সুরে জিজ্ঞেস করল।

‘জানি না। একজন ভেট এই ক্ষেত্রে আপনাকে ভালো গাইড করতে পারবে।’

সালার হাসে। ‘দুই পায়ে চলা প্রাণীকে প্রতিটি মেডিকেল ডিকশনারি মানুষ বলে এবং আমি দুই পায়ে হাঁটি।’

‘ভাল্লুক থেকে কুকুর পর্যন্ত প্রতিটি চারপেয়ে প্রাণীও প্রয়োজন হলে বা ইচ্ছে করলে দুই পায়ে হাঁটতে পারে।’

‘কিন্তু আমার চার পা নেই। তাছাড়া শুধু প্রয়োজনের সময় না; বরং সবসময় আমি দুই পায়ে হাঁটি।’

‘এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, আপনার চার পা নেই। এজন্যই ভেটের সাথে দেখা করতে বলছি। যাতে সে আপনাকে

আপনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিকভাবে বলতে পারে।" ইমামা শীতল গলায় বলে। সালার ওকে বিরক্ত করায় সত্যি সফল।

'যত ভালো আপনি প্রাণী সম্পর্কে জানেন, তাতে আপনি একজন ভালো ভেট প্রমাণিত হতে পারেন। আপনার জ্ঞানে আমি বেশ মুগ্ধ!'

ইমামার চেহারার লালচে ভাব আরও গাঢ় হয়।

'আপনি যদি আমার ভেট হয়ে যান, তাহলে আমি পরামর্শ অনুযায়ী আপনার কাছে আসতে পারি। যাতে আপনি আমার রিসার্চ করে বলতে পারেন আমার বৈশিষ্ট্য কী।' সালার বেশ গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল।

ইমামা উত্তরে কিছু বলতে পারে না। শুধু তাকিয়ে ছিল। এই মানুষটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঠোঁটকাটা। আর এমন মানুষের সাথে লম্বা সময় কথা বলার মানে, ঘাঁড়ের সামনে

লাল কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। যে বোকামি ও এতক্ষণে করে ফেলেছে।

'আপনি ফি হিসেবে কত চার্জ করবেন?' সালার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'এটা ওয়াসিম আপনাকে বলে দেবে।' ইমামা এবার হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করল।

'চলুন ঠিক আছে, আমি ওয়াসিমকে জিজ্ঞেস করে নেব। এটা তো আরও সহজ হয়ে গেল।' সালার যে হুমকিতে দমেনি তা বুঝিয়ে দেয়।

তৈমুর আবার ওর বাহু চেপে ধরল। 'সালার! চলো যাই। জরুরি কাজ মনে পড়ে গেছে আমার।' তাড়াহুড়ো করে একপ্রকার নিজের সাথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু সালার পাতা দেয় না। 'যাচ্ছি ইয়ার! এভাবে টানাটানি
করো না। তৈমুরকে থামিয়ে ইমামার দিকে ফেরে ও।
'যাইহোক, এসব মজা ছিল। সত্যিই আপনাকে ধন্যবাদ
জানাতে এসেছি। আপনি আর ওয়াসিম আমার অনেক বড়
সাহায্য করেছেন। Good bye.' বলে ঘুরে যায়।

ইমামা অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মাথার তার আসলেই
ছেঁড়া। মনে মনে বলে। ভেবে কূল পায় না ওর ভাই ওয়াসিম
এর সাথে কীভাবে বন্ধুত্ব করেছে। হাতে থাকা ম্যাগাজিনের
পাতা আবার উল্টাতে থাকে।

'সালার এসেছিল তোমার কাছে?' ওয়াসিম বোনের কাছে
এসে জিজ্ঞেস করে। দূর থেকে সালার আর তৈমুরকে
দেখেছে।

'হ্যাঁ।' ইমামা একবার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার
ম্যাগাজিনে মন দেয়।

'কী বলে গেছে?' ওয়াসিম কিছুটা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আমার আশ্চর্য লাগছে, ওর মতো মানুষের সাথে তুমি কীভাবে বন্ধুত্ব করলে? আমার জীবনে এর চেয়ে অভদ্র আর যাচ্ছেতাই ছেলে কখনো দেখিনি।' ইমামা রুম্ম গলায় বলল।
'ধন্যবাদ দিতে এসেছিল। সাথে বলে গেছে আমি ভালো করে ব্যান্ডেজ করতে পারি না, ঠিকমতো ব্লাড প্রেশার চেক করতে জানি না।'

ওয়াসিমের চেহারা হাসি ভেসে ওঠে। 'ও একটা তারছেঁড়া!
ওর কথা বাদ দাও।'

'আমার তো ইচ্ছে করছিল আরও কয়েকটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতে। যাতে মাথা ঠিক হয়ে যায়। মুখ তুলে দৌড়ে এসেছে বন্ধুকে নিয়ে। ভাই! কে বলেছে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে? আমার তো সাথের ছেলেটাকেও বেশ বাজে লেগেছে।
সালার বলছিল ওর সাথেও নাকি তোমার বন্ধুত্ব?'

'বন্ধুত্ব না, শুধু জানাশোনা।' ওয়াসিম নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।

'এমন ছেলেদের সাথে জানাশোনা রাখারও দরকার নেই। বেশভূষা দেখেছ ওদের? না আছে কথা বলার ভদ্রতা, না আছে পোশাক পরার শালীনতা। আর দৌড়ে এসেছে ধন্যবাদ দিতে...। তুমি ওর সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক কাট করো। কোনো দরকার নেই এসব ছেলের সাথে পরিচয় রাখারও।' ইমামা ম্যাগাজিন রেখে ভাইকে সতর্ক করে বাইরে পা বাড়ায়। ওয়াসিমও বোনের সাথে হাঁটতে থাকে।

'কিন্তু একটা বিষয়ে আমি অবাক! ও তখন যে অবস্থায় ছিল তাতে কীভাবে খেয়াল করেছে আমি ঠিকমতো ওর ব্যান্ডেজ করিনি বা ব্লাড প্রেশার চেক করতে আমার সমস্যা হচ্ছিল?' ইমামা ভাবে। 'আমি মনে করেছিলাম এমনি হাত-পা নড়াচড়া করছে। কিন্তু আমার আন্দাজ ছিল না নিজের চারপাশের সবকিছু অবজার্ড করছে ও।'

'আর যাইহোক, ব্যাণ্ডেজ আসলেই খারাপ করেছিলে তুমি। আমি সাহায্য না করলে তো ব্লাড প্রেশারের রিডিংও নিতে পারতে না। অন্তত এ ব্যাপারে যা বলে গেছে, সত্য ছিল।' ওয়াসিম হাসে।

'জানি, কারণ আমি খুব নার্ভাস ছিলাম।' ইমামা মেনে নেয়। 'প্রথমবার এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম। তার ওপর ওর হাত থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত আমার ভয় বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারচেয়ে বেশি ওর আচরণ...! কোনো আত্মহত্যা করা মানুষকে এমন আচরণ করতে দেখিনি আমি।'

'অথচ তুমি ডাক্তার হতে যাচ্ছ, তাও একজন বিশিষ্ট এবং নামকরা ডাক্তার, অবিশ্বাস্য!' ওয়াসিম ফোড়ন কেটে বলল। 'এখন তুমি অন্তত বলা শুরু করো না।' ইমামা অনুযোগ করে। 'মজা নেওয়ার জন্য আমি তোমার কাছে এসব স্বীকার করিনি।'

ইমামা বেশ কয়েকদিন ধরে জালাল ও জয়নবের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করে। দু'জন যেন দূরত্ব রেখে চলছিল। এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নিজের মাঝে অনুভব করে ও। জালালকে এক-দুবার হসপিটালে ফোন করেছিল। কিন্তু প্রতিবার উত্তর আসে 'সে ব্যস্ত।' জয়নবকে কলেজ থেকে নিতে এলেও আগের মতো ওর সাথে দেখা করে না। দেখা হয়ে গেলেও সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলে চলে যায়। প্রথমদিকে এই পরিবর্তন মনের ভুল মনে করে। কিন্তু চিন্তা বেশি জেঁকে ধরলে একদিন জালালের হসপিটালে এসে হাজির হয়। জালালের আচরণ ভীষণ শীতল ছিল। ওকে দেখে চেহারায়া হাসিও ফোটেনি।

‘অনেকদিন হলো আমাদের দেখা হয়নি, তাই আমি নিজেই এসেছি।’ নিজের সমস্ত শঙ্কা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে বলল ইমামা। ‘আমার শিফট শুরু হচ্ছে, যেতে হবে।’ জালাল বলল।

ইমামা অবাক হয়। 'জয়নব বলেছিল এখন আপনার শিফট শেষ হয়, তাই আমি এই সময় এসেছি।'

জালাল কিছুক্ষণের জন্য চুপ থেকে বলল। 'হ্যাঁ, কিন্তু আজ আমার অন্য ব্যস্ততা আছে।'

ইমামা তাকিয়ে থাকে। 'জালাল! আপনি কোনো কারণে আমার ওপর রেগে আছেন?'

'না, আমি কারো ওপর রেগে নেই।' জালাল রুম কণ্ঠে উত্তর দেয়। 'দশ মিনিটের জন্য বাইরে এসে আমার কথা শুনতে পারবেন?' জালাল কিছুক্ষণ ইমামার দিকে তাকিয়ে থেকে ওভারঅল হাতে নিয়ে কিছু না বলে রুম থেকে বের হয়। বাইরে এসে একনজর হাতঘড়ির দিকে তাকায়, যা হয়তো ইমামার জন্য কথা শুরু করার ইঙ্গিত ছিল।

'আপনি আমার সাথে এমন মিসবিহেইভ কেন করছেন?'

'কী মিসবিহেইভ করছি?' পাল্টা জিজ্ঞেস করে জালাল।

'গত কয়েকদিন ধরে আমাকে ইগনোর করছেন।'

'হ্যাঁ করছি।'

জালাল এত সহজে স্বীকার করে নেবে ইমাম আশা করেনি।

'কারণ আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই না।'

ইমামা কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা বলতে ভুলে গেল। 'কেন?'

'এটা জানার প্রয়োজন নেই।' জালাল আগের মতোই রুক্ষভাবে বলল।

'আমি জানতে চাই, কেন হঠাৎ আচরণ বদলে গেল আপনার? নিশ্চয়ই কারণ আছে।'

'হ্যাঁ আছে। তবে আমি তোমাকে বলা প্রয়োজন মনে করছি না। যেনে তুমি অনেক কিছু বলা আমাকে প্রয়োজন মনে করেনি।'

'আমি... আমি!' ইমামা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। 'আমি আপনাকে কী বলিনি?'

'এই যে তুমি মুসলমান নও।' জালাল ভীষণ তিক্ত সুরে বলল। ইমামা শ্বাস নিতে পারল না।

'তুমি আমার কাছে এটা লুকানি?'

'জালাল! আমি বলতে চেয়েছি...' ইমামা পরাজিত ভঙ্গিতে বলল।

'চেয়েছিলে, কিন্তু বলোনি আমাকে। ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছ তুমি।'

'ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করিনি।' ইমামা প্রতিবাদ করে।

'আপনাকে ধোঁকা কেন দেবো?'

'কিন্তু তুমি এটাই করেছ।' জালাল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

'জালাল আমি...'

জালাল ওকে থামিয়ে বলল। 'তুমি জেনে-বুঝে আমাকে
ট্র্যাপড করেছ।'

ইমামার চোখে পানি চলে আসে। 'ট্র্যাপড করেছি?' ও
বিড়বিড় করে।

'তুমি জানতে নবী সা.-র প্রতি আমার ভালোবাসার কথা।
এখন বিয়ে তো দূরের কথা, যেহেতু সব জেনে গেছি;
তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কও রাখতে চাই না। আর কখনো

আমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করবে না।" জালাল শক্ত গলায় বলল।

'জালাল! আমি ইসলাম কবুল করে নিয়েছি।' ইমামা মৃদু আওয়াজে বলল।

বিক্রপের ভঙ্গিতে হাসে জালাল।

'ওহ, কাম অন! এখানে দাঁড়িয়ে তুমি আমার জন্য ইসলাম কবুল করেছ?'

'জালাল! আমি আপনার জন্য মুসলমান হইনি। হ্যাঁ, আপনি আমার জন্য একটা উৎস হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমার ইসলাম কবুল করার কয়েক মাস হয়ে গেছে, বিশ্বাস না হলে আমি প্রমাণ দিতে পারি আপনাকে। চলুন আমার সাথে।'

জালাল এবার কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে ওর দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ আমি মানি, আপনার দিকে পা আমি বাড়িয়েছিলাম। আপনার ভাষায় বললে, ট্র্যাপড করেছি। তবে আমি ট্র্যাপড করিনি, আপনার ক্ষেত্রে শুধু অপারগ ছিলাম। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি আপনার কণ্ঠের সামনে। আমি বলেছিলাম প্রথমবার আপনাকে নাত আবৃত্তি করতে শুনে কী অনুভব করেছিলাম। আমার ব্যাপারে এসব আগে জানলে এখন যে আচরণ করছেন, সেটা তখন করতেন। শুধু এই ভয়ে আমি লুকিয়েছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আপনার ক্ষেত্রেও আমার সাথে এমনটা হয়েছে।' ইমামা বিমর্ষ হয়ে বলল।

'তোমার পরিবার এ ব্যাপারে জানে?'

'না, তাদেরকে বলতে পারিনি। আমি এনগেজড। এ ব্যাপারেও 'আপনাকে বলিনি।' এক মুহূর্তের জন্য থেমে আবার বলতে থাকে ইমামা। 'কিন্তু আমি ওখানে বিয়ে করতে চাই না, আপনাকে বিয়ে করতে চাই। আমি শুধু পড়াশোনা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলে

আপনাকে বিয়ে করতে পারব। চার-পাঁচ বছর পর ডাক্তার হয়ে গেলে তখন হয়তো আমার বাবা-মায়ের আপনার সাথে বিয়েতে এখনে মতো আপত্তি থাকবে না। যদি এই ভয় না থাকত, তারা পড়াশোনা বন্ধ করে আসজাদের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে তাহলে হয়তো এখনই জানিয়ে দিতাম ইসলাম কবুল করেছি। কিন্তু এখন আমি পরোপুরি তাদের ওপর ডিপেন্ডেন্ট। হাত-পা বাঁধা আমার। আপনি একমাত্র পথ, যা আমি দেখতে পেয়েছি। আমি আপনাকে সত্যি ভালোবাসি। তাই বিয়ের কথা না বলে কী বলতাম, বলুন? আমি যে পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে যাচ্ছি আপনি আন্দাজও করতে পারবেন না তা। আমার জায়গায় থাকলে বুঝতেন, এসব আড়াল করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।"

জালাল কিছু না বলে পাশের কাঠের বেঞ্চে বসে। চেহারা চিন্তার ভাব। ইমামা নিজের চোখ মুছে নেয়।

'আপনার মনে আমার জন্য কিছু নেই? আমি ভালোবাসি বলে শুধু আমার সাথে ছিলেন এতদিন?'

জালাল উত্তর না দিয়ে ওকে বলল। 'ইমামা বসো। পুরো প্যান্ডোরা বক্স আমার সামনে খুলে গেছে। আমি যেমন তোমার পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারছি না, তুমিও তেমন আমার পরিস্থিতি বুঝতে পারছ না।'

ইমামা কিছুটা দূরে থাকা আরেকটা বেঞ্চে গিয়ে বসল।

'অমুসলিম কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আমার বাবা-মা রাজি হবে না, সেই মেয়ের প্রতি আমার যে ধরনের অনুভূতিই থাক না কেন।'

'জালাল! আমি অমুসলিম নই।'

'এখন নও, আগে তো ছিলে। তার ওপর তোমার পরিবার...'

'এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই।' ইমামা দুর্বল কণ্ঠে বলে।

জালাল কিছু বলল না। অনেকক্ষণ দু'জনই নীরবে বসে রইল সেখানে।

'আপনার বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া আপনি বিয়ে করতে পারবেন না আমাকে?' কিছুক্ষণ পর ইমামা জিজ্ঞেস করে।

'এটা অনেক বড় স্টেপ।' জালাল না-বোধক মাথা নাড়ে।
'এমন কিছু করার কথা ভাবলেও পারব না তা। তোমার মতো আমিও বাবা-মায়ের ওপর ডিপেন্ডেন্ট।' নিজের দুর্বলতা স্পষ্ট করল।

ইমামা ব্যাকুল হয়ে বলে। 'কিন্তু আপনি হাউস জব করছেন, কয়েক বছরের মধ্যে স্টাবলিশড হয়ে যাবেন।'

'হাউস জব শেষ করে স্পেশালাইজেশনের জন্য দেশের বাইরে যেতে চাই, যা আমার বাবা-মায়ের আর্থিক সাপোর্ট ছাড়া সম্ভব না। স্পেশালাইজেশনের পর ফিরে নিজের

প্র্যাকটিস স্টাবলিশ করতে পারব। তিন-চার বছর নিজের পড়াশোনা শেষ করতেই লেগে যাবো।

'তারপর?' ইমামার আওয়াজে হতাশা ফুটে ওঠে।

'তারপরের জন্য ভাবতে সময় দাও। হয়তো কোনো রাস্তা বেরিয়ে আসবে। আমি তোমাকে ছাড়তে চাই না কিন্তু নিজের ক্যারিয়ারও নষ্ট করতে পারব না। সমস্যা হলো আমার বলতে কিছু নেই, যা আছে সব বাবা-মায়ের। তারা নিজেদের সমস্ত সঞ্চয় আমার ওপর খরচ করছে এই আশায়, যাতে ভবিষ্যতে তাদের জন্য কিছু করতে পারি।' জালাল বলতে বলতে থামল। "আচ্ছা, এটা কি সম্ভব না তোমার বাবা-মা নিজেদের ইচ্ছেয় তোমাকে আমার সাথে বিয়ে দেবে? সেক্ষেত্রে অন্তত আমার বাবা-মায়ের এই আপত্তি থাকবে না যে, তুমি তোমার বাবা-মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদেরকে না জানিয়ে আমাকে বিয়ে করেছে।"

'জানি না...এটা সম্ভব কিনা। আমি কিছুই বলতে পারছি না...তারা আমার কথা শুনবে কিনা। আমি...' ইমামা অসহায়ের মতো কথা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়।

জালাল অপেক্ষা করতে থাকে ওর কথা শেষ হওয়ার।

'আমার ফ্যামিলিতে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে নিজের পছন্দে বাইরের কোনো ছেলেকে বিয়ে করেনি। তাই জানি না তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। তবে এটুকু বলতে পারি, তাদের প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ হবে... ভীষণ খারাপ! তারা আমাকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু এত বড় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি কখনোই দেবে না। আপনার আন্দাজ থাকা উচিত, এই পরিস্থিতিতে আমার বাবাকে কত লজ্জা ও অপমানের মুখোমুখি হতে হবে। শুধু আমার জন্য নিশ্চয়ই সব বদলে ফেলবেন না তিনি। যদি নিজের ফ্যামিলি থেকে সাহায্যের আশ্বাস থাকত, তাহলে আমি কেন বাড়ির বাইরে সঙ্গ খুঁজছি? কেন আপনার কাছে এভাবে অসহায়ের মতো সাহায্য

চাইছি?' মৃদু কণ্ঠে ইমামা কাঁপতে থাকা আওয়াজে জোর দিয়ে বলল।

'ইমামা! আমি তোমাকে সাহায্য করব। বাবা-মা আমার কথা ফেলবেন না। বোঝাতে সময় লাগবে। কিন্তু তাদেরকে মানিয়ে নেব। তুমি ঠিক বলছ, আমার তোমাকে সাহায্য করা উচিত।' জালাল ভরসা দেয়।

ইমামা শান্তি পায়। এটাই আশা করেছিল। আমার পছন্দ ভুল না। মনে মনে ভাবে।

১ তিন ১

‘এমন প্রস্তাব আসজাদ ছাড়া অন্য কারো হতেই পারে না। সে কি বুঝতে পারছে না আমি এখন পড়াশোনা করছি?’ ইমামা ভাবিকে বলল।

‘না, আসজাদ বা তাদের পরিবারের কেউ এমন ইচ্ছে প্রকাশ করেনি। বাবা নিজে তোমার বিয়ে দিতে চাইছেন।’ ভাবি ধীরভাবে উত্তর দেয়।

‘বাবা বলেছেন...? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যখন মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নিলাম, তখন তো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার এমন কোনো ইচ্ছে ছিল না। আফেল আজমকেও বলতেন হাউস জব শেষ হলে বিয়ে দেবেন। তাহলে হঠাৎ কী হলো?’

‘হয়তো কোনো চাপ আছে। মা বললেন এটা বাবার ইচ্ছে।’ ভাবি বলল।

'আপনি তাদের গিয়ে বলুন, হাউস জব শেষ হওয়ার আগে আমি বিয়ে করব না।'

'ঠিক আছে, বলব। তবে ভালো হয় যদি তুমি এই বিষয়ে বাবার সাথে কথা বলো।' ভাবি পরামর্শ দেয়।

ভাবি চলে যাওয়ার পর ইমামা দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে রইল। এই খবর এত আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত যে, ওর পায়ের নিচ থেকে আক্ষরিক নয় বাস্তবিক অর্থেই মাটি সরে গেছে। ও নিশ্চিত ছিল হাউস জব পর্যন্ত বিয়ের কথা সামনে আসবে না। আর হাউস জবের পর নিজেকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো স্টাবলিশ হয়ে যাবে। জালালকে বিয়ে করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। ততদিনে জালালও হাউস জব শেষ করে সেট হয়ে যাবে। ওদের জন্য কোনো সমস্যা তৈরি হবে না। কিন্তু এখন হঠাৎ পরিবারের মানুষ বিয়ের কথা বলছে... কিন্তু কেন? রাতে বাবা হাশিম মুবীনের রুমে যায় ও।

'না, আসজাদ বা ওই পরিবারের কেউ আমার কাছে এমন ইচ্ছে প্রকাশ করেনি। আমিই তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।' মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি খুব সহজ গলায় বললেন।

'কথাও বলে ফেলেছেন তাদের সাথে! আমাকে না জিজ্ঞেস করে আমার বিয়ে কীভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারেন বাবা?' ইমামা অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বলল।

হাশিম মুবীন ভ্রুকুটি করে মেয়ের দিকে তাকান। 'এই সম্পর্ক তোমার ইচ্ছেতে ঠিক হয়েছে, জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন।' মেয়েকে মনে করিয়ে দেন।

'এনগেজমেন্ট এক বিষয়, বিয়ে অন্য বিষয়। আপনি বলেছিলেন হাউস জবের আগে বিয়ে দেবেন না।' ইমামা তার দেওয়া কথা মনে করায়।

'বিয়েতে তোমার আপত্তি কেন? তুমি কি আসজাদকে পছন্দ করো না?'

'বিষয় পছন্দ-অপছন্দের না, বাবা! পড়াশোনার মাঝে আমি বিয়ে করতে চাই না। আপনি ভালো করে জানেন আমি আই স্পেশালিস্ট হতে চাই। কিন্তু এভাবে বিয়ে হয়ে গেলে আমার স্বপ্ন অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।'

'অনেক মেয়ে বিয়ের পর পড়াশোনা শেষ করে। নিজের ফ্যামিলির দিকেই তাকাও, কতজন আছে...' তিনি মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

'সেসব মেয়েরা অনেক মেধাবী আর যোগ্য। আমি তাদের মতো না। এক সময়ে আমি একটা কাজই করতে পারি।'

'আমি আজম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি, তারা তারিখ ঠিক করতে আসছেন।'

'বাবা! আমার সব পরিশ্রম শেষ করে দিচ্ছেন আপনি। যদি এমন কিছুই করবেন, তাহলে কোনো কথা দেওয়া উচিত ছিল না।'

'যখন কথা দিয়েছিলাম তখন সময়-পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল আর এখন..."

'এখন কী এমন বদলে গেছে? পরিস্থিতিতে কী এমন পরিবর্তন এসেছে, যার কারণে আমার সাথে এমন করছেন?'

'আমি ভরসা দিচ্ছি, পড়াশোনার ক্ষেত্রে আসজাদ তোমাকে সবরকম সাহায্য করবে। কোনোকিছুতে বাধা দেবে না।'

'বাবা! আমার আসজাদের না, আপনার সাহায্য দরকার। আমাকে পড়াশোনা শেষ করতে দিন।' ইমামা অনুরোধ করল।

'ইমামা! অহেতুক জেদ করো না। আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটাই হবে।' হাশিম মুবীন পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন।

'আমি জেদ করছি না, অনুরোধ করছি। বাবা প্লিজ। আমি এখন বিয়ে করতে চাই না।' ইমামা আবার অনুরোধ করে।

'তোমাদের সম্বন্ধের চার বছর হয়ে গেছে, এটা একটা লম্বা সময়। কিছুদিন পর তারা যদি কোনো কারণ দেখিয়ে সম্বন্ধ ভেঙে ফেলে।"

'তাতে কী হবে? কোনো কিয়ামত চলে আসবে না। তারা সম্বন্ধ ভেঙে ফেলতে চাইলে ভাঙুক, দরকার হলে এখনই ভাঙুক।'

'সেই লজ্জা আর অপমান নিয়ে তোমার সামান্য কোনো মাথাব্যথা নেই, যার মুখোমুখি আমাদেরকে হতে হবে?'

'কেমন লজ্জা বাবা? এটা তাদের সিদ্ধান্ত হবে, এতে আমাদের দোষ থাকার কথা না।' ইমামা বোঝায় তাকে।

'তোমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, না মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে?' হশিম মুবীন ধমকে বললেন।

‘বাবা! কিছু হবে না। মানুষ কয়েকদিন কথা বলে সব ভুলে যাবে। আপনি অযথা দুশ্চিন্তা করছেন।’

‘যথেষ্ট অহেতুক কথা বলে ফেলেছ, এখন যাও।’ হাশিম মুবীন বিরক্ত হয়ে বললেন ওকে।

ইমামা না চাইতেও রুম থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু রাতভর চিন্তায় কাটায়। পরদিন লাহোর ফেরে। হাশিম মুবীন আর কিছু বলেননি। লাহোর এসে কিছুটা নিশ্চিত হয় ও। মাথা থেকে চিন্তা ঝেড়ে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হাশিম মুবীন সেই ঘটনাকে মস্তিষ্ক থেকে বের করেননি। তিনি একজন সতর্ক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাই মেয়েকে নিয়ে প্রথম উদ্বিগ্নের শিকার তখন হয়েছিলেন, যখন স্কুলে তাহরিমের সাথে ঝগড়ার ঘটনা ঘটে। যদিও বিষয়টা তেমন গুরুতর ছিল না। তবু সেই ঘটনার পর সতর্কতাবশত তিনি আসজাদের সাথে মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেন। ভাবেন, এর ফলে ওর মস্তিষ্ক নতুন সম্পর্কের দিকে মনোযোগী হয়ে

পড়বে। মনে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন এলেও নতুন সম্পর্কের কারণে সেসবে অত মন দেবে না। তার ভাবনা সঠিক প্রমাণ হয়। ইমামার মস্তিষ্ক তাহরিমের কথা থেকে সরে যায়। আসজাদের প্রতি আগেও কিছুটা আগ্রহ ছিল ওর। সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পর সেই আগ্রহ বেড়ে যায়। তিনি মেয়েকে এই সম্পর্ক নিয়ে তৃপ্ত ও মগ্ন দেখেন। আগের মতো আবার সমস্ত মাজহাবি রীতিনীতিতে স্বাভাবিক হয়ে পড়তে দেখেন।

কিন্তু এবার ওয়াসিম যা বলেছিল, তাতে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায় তার। তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও টের পেয়ে যান মেয়ের আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ পরিবর্তন এসেছে। এটা শুধু তার জন্য না, বরং পুরো পরিবারের জন্য ওমলি। বড় মেয়েদের মতো ইমামাকেও তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইতেন। বিশেষ করে এই কারণে যে, বিয়ের পর নিজেদের বংশের মধ্যেই থাকতে হবে ওকে। তাদের বংশ বেশ সুশিক্ষিত। তাছাড়া আসজাদও চাইত ইমামাকে উচ্চশিক্ষিত দেখতে। তাই হাশিম মুবীনের জন্য মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে ওকে বাড়িতে বসিয়ে রাখা সহজ ছিল

না। সেক্ষেত্রে বড় ভাই আজম মুবীনকে এর কারণ বলতে হতো। মেয়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ সত্ত্বেও তিনি চাননি আজম মুবীন অথবা সেই পরিবারের কেউ ইমামার পরিবর্তন হওয়া আকিদার ব্যাপারে জানুক। যার ফলে আসজাদের সাথে বিয়ের পর ওকে অসুখী জীবন কাটাতে হতে পারে। তাই একদিকে তিনি নিজের পরিবারের সবাইকে বিষয়টা গোপন রাখার ওপর জোর দেন, অন্যদিকে মেয়ের পীড়াপীড়িতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি।

সাবিহার লেকচার এটেন্ড করা বা জালালের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে ইমামা এত সতর্ক ছিল যে, ওর এই মেলামেশা পরিবারের নজরদারিতে আসেনি। সম্ভবত এর পেছনে বড় একটা ভূমিকা পালন করেছিল জাভেরিয়া আর রাবেয়াকেও এ বিষয় থেকে অন্ধকারে রাখা। নাহলে কিছু না-কিছু ভেসে হাশিম মুবীনের কান পর্যন্ত নিশ্চিত চলে যেত। তবে তেমন কিছু হয়নি। তিনি এমনিতে ওকে নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু মেয়ের মাঝে আসা পরিবর্তন তাকে আশঙ্কায় ফেলে। তার মস্তিষ্ক সমাধান হিসেবে একমাত্র যা খুঁজে পায়, তা হচ্ছে ওর

বিয়ে দেওয়া। বিয়ে দিয়ে দিলে তিনি অন্তত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। এটাই কারণ ছিল ইমামার হুট করে বিয়ে ঠিক হওয়ার পেছনে।

ইমামা লাহোর এসে সবার প্রথমে জালালের সাথে দেখা করে।

'জালাল! বাবা-মা আসজাদের সাথে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে আমাকে।'

'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে হাউস জবের আগে বিয়ে দেবে না।' জালাল বলল।

'হ্যাঁ, এটাই বলেছিল। কিন্তু এখন বলছে বিয়ের পরও পড়াশোনা করা যাবে। আসজাদ লাহোরে ফ্ল্যাট নিলে আরও সহজ হবে আমার জন্য।'

ইমামার চেহারা দেখে জালাল ওর ভেতরের দুশ্চিন্তা পরিমাপ করতে পারছিল। তাই নিজেও কিছুটা চিন্তায় পড়ে।

'জালাল! আমি আসজাদকে বিয়ে করতে পারব না, কোনো অবস্থায় না।' ইমামা বিড়বিড় করে।

'তাহলে তোমার বাবা-মাকে সরাসরি বলে দাও।'

'কী বলব?'

'এটা যে, তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও।'

'আপনার কোনো আন্দাজ নেই তারা কীভাবে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। তাছাড়া শুরু থেকেই তাহলে সব বলতে হবে।' ইমামা একটু ভেবে বলল। 'জালাল! আপনার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলুন এই ব্যাপারে, তাদেরকে জানান। বাবা-মা আরও চাপ দিলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া আমার

কোনো উপায় থাকবে না। তখন আপনার সাহায্যের দরকার হবে আমার।"

‘আমি বাবা-মায়ের সাথে কথা বলব, তারা রাজি হয়ে যাবে। আমি জানি তাদেরকে মানিয়ে নিতে পারব।’ জালাল আশ্বস্ত করে।

এতক্ষণের কথাবার্তায় এই প্রথম ইমামার মুখে হাসি ফোটে। পরের কয়েক সপ্তাহ পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে ও। জালালের সাথে কথা বলা বা দেখা করার সুযোগ হয় না। শেষ পরীক্ষার দিন ওয়াসিম ওকে নেওয়ার জন্য লাহোর এসে হাজির হয়। ভাইকে দেখে ধাক্কা অনুভব করল।

‘ওয়াসিম! আমি এখন যেতে পারব না। আজই পরীক্ষা শেষ হলো, কিছু কাজ বাকি আমার।’

'আমি কাল পর্যন্ত আছি, এক বন্ধুর সাথে থাকব। ততক্ষণে কাজ শেষ করে নাও, একসাথে যাব।' ওয়াসিম বিকল্পের পথ বন্ধ করে দেয়।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' না চাইতেও রাজি হয়। বুঝল ভাই ওকে রেখে যাবে না।

'তোমার সবকিছু প্যাক করে নিও। পুরো ছুটি ওখানে কাটিয়ে একবারে আসবো।'

মাথা নাড়ে ইমামা। কিন্তু সবকিছু প্যাক করা বা পুরো ছুটি ইসলামাবাদ কাটানোর কোনো ইচ্ছে নেই ওর। ভাবল কয়েকদিন কাটিয়ে অজুহাত দেখিয়ে লাহোর চলে আসবো। যা ছিল সবচেয়ে বড় ভুল ভাবনা। রাতের বেলা ইমামা পুরো পরিবারের সাথে খাবার খাচ্ছিল। সবাই খোশগল্পে মগ্ন।

'পরীক্ষা কেমন হয়েছে তোমার?' হাশিম মুবীন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব ভালো, সবসময়ের মতো।' বলে এক চামচ ভাত মুখে দেয় ইমামা।

'ভেরি গুড! যাক পরীক্ষার চিন্তা তো শেষ। এখন কাল থেকে শপিং শুরু।'

ইমামা অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকায়। 'শপিং....! কীসের শপিং বাবা?'

'ফার্নিচারের। আর হ্যাঁ, জুয়েলারের কাছে আগে চলে যেও। বাকি সব ধীরে ধীরে হয়ে যাবো।' হাশিম মুবীন এবার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

'বাবা! কিন্তু কেন?' ইমামা আবার জিজ্ঞেস করে।

'তোমার মা বলেনি, আমরা তোমার বিয়ের তারিখ ঠিক করেছি?'

ইমামার হাত থেকে চামচ ছুটে প্লেটে পড়ে। চেহারার রং পাণ্ডুর হয়ে যায়। 'আমার বিয়ের তারিখ!' দফায় দফায় বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

হাশিম মুবীন আর সালমা মুবীনও মেয়ের এমন আচরণে অবাক।

'হ্যাঁ, তোমার বিয়ের তারিখ।' হাশিম মুবীন বললেন।

'আমাকে না বলে, না জিজ্ঞেস করে কীভাবে করলেন?'

'গতবার এই প্রসঙ্গে তোমার সাথে কথা হয়েছে আমার।'

'আর আমি তখন না বলেছিলাম আপনাকে, বাবা! আমি...'

হাশিম মুবীন কথা শেষ করতে দিলেন না। 'আমিও বলেছিলাম, তোমার না বলায় আমার সিদ্ধান্ত নড়বে না।'

আসজাদের পরিবারের সাথে কথা বলে ফেলেছি।" এলান করলেন তিনি।

ডাইনিং টেবিলে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসে। সবাই খাওয়া থামিয়ে দেয়। ইমামা এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে যায়।

'আই অ্যাম সরি বাবা! কিন্তু আমি এখন বিয়ে করতে পারব না। আপনি বিয়ে ঠিক করেছেন, তাই আপনিই কথা বলে থামিয়ে দিন। নাহলে আমি নিজেই তাদের সাথে কথা বলব।'

হাশিম মুবীন রাগে লাল হয়ে ওঠেন। 'তুমি আসজাদকে বিয়ে করবে এবং আমার ঠিক করা তারিখেই। শুনছে?'

'ইট'স নট ফেয়ার!' ইমামা কান্নায় ভেঙে আসা কণ্ঠে বলল।

'এখন তুমি আমাকে শেখাবে কোনটা ফেয়ার কোনটা না? তুমি শেখাবে?'

'বাবা! আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। কেন এমন জোর করছেন।'

'এটা জোর হলে হ্যাঁ, আমি জোরই করছি। আমার অধিকার আছে।' ইমামা ঠোঁট চেপে কান্না আটকে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

'আমি ওর সাথে কথা বলছি। আপনি খাবার শেষ করুন। রাগারাগির কিছু হয়নি। ও একটু আবেগপ্রবণ আর কিছু না।' সালমা মুবীন স্বামীকে থামিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে যান।

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে ইমামা সামনে ভাইকে দেখতে পায়। 'তুমি... এখান থেকে যাও, বের হও।' কাছে এসে ধাক্কা দিতে দিতে বলল।

ওয়াসিম পেছনে সরে যায়। 'কেন? আমি কী করলাম?'

'মিথ্যে বলে, না জানিয়ে আমাকে এখানে এনেছ। যদি লাহোর থাকতেই টের পেতাম এজন্য আমাকে ইসলামাবাদ আনা হচ্ছে তাহলে আমি... আমি কক্ষনো এখানে আসতাম না।' ইমামা চিৎকার করে।

'আমি সেটাই করেছি, যা বলা হয়েছে। বাবা বলেছিলেন তোমাকে না বলতো।' ওয়াসিম কারণ দেখায়।

'তাহলে এখন আমার সামনে কী করছ? যাও বাবার কাছে, তার পাশে গিয়ে বসো। সামনে থেকে দূর হও।'

ওয়াসিম কিছুক্ষণ বোনের দিকে তাকিয়ে সামনে থেকে সরে যায়। ইমামা নিজের রুমে এসে ধপ করে বসে পড়ে। ওর পায়ের নিচে মাটি নেই। কল্পনায়ও ভাবেনি নিজের পরিবার ওর সাথে এমন করতে পারে। তারা এত রুঢ় আর তুর কখনো ছিল না, যা এখন হয়ে গেছে। এখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না এইসব ওর সাথে হচ্ছে। হৃদয় ডুবতে শুরু করে। 'আমাকে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে, হার মেনে নিলে

চলবে না। কোনোভাবে জালালের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সে নিশ্চয়ই এতদিনে তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলে ফেলেছে। তার সাথে কথা বলতে পারলে কোনো রাস্তা ঠিকই বেরিয়ে আসবে।" রুমজুড়ে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে। সেই রাতে বাড়ির কেউ আর ডাকতে আসেনি ওকে। রাত বারোটার দিকে রুম থেকে বের হয় ও। জানে, এই সময় সবাই ঘুমের জন্য চলে যায়। টেলিফোনের কাছে এসে জালালের বাড়ির নাম্বার ডায়াল করতে থাকে। কিন্তু কেউ ফোন রিসিভ করে না। আধা ঘন্টা এভাবে কল করার পর হতাশ হয়ে ফোন রেখে দেয়। জাভেরিয়া বা রাবেয়াকে ফোন করা সম্ভব না। কারণ এখন ওরা হোস্টেলে নেই। কিছুক্ষণ ভেবে সাবিহার নাম্বার ডায়াল করে। ফোন সাবিহার বাবা তুলল।

'সাবিহা ওর মায়ের সাথে পেশোয়ার গেছে।' সাবিহার বাবা বললেন।

'পেশোয়ার!' ইমামার হৃৎস্পন্দন থেমে যায়।

‘ওর কাজিনের বিয়ে। মা-মেয়ে আগেই চলে গেছে। আমিও কাল যাব।’ সাব্বিহার বাবা বললেন। ‘কোনো কথা থাকলে আমাকে বলতে পারো, আমি ওর কাছে পৌঁছে দেবো।’

‘না আঙ্কেল, ধন্যবাদ!’

‘এই বিষয়ে তার সঙ্গে কী বলবে...’ ফোন রেখে দেয়। ওর ডিপ্রেসন বাড়তে থাকে। ‘যদি জালালের সাথে যোগাযোগ না হয়, তাহলে?’ হৃদয় ডুবতে শুরু করে। আবার জালালের নাম্বার ডায়াল করতে থাকে। সেই মুহূর্তে কেউ পেছন থেকে রিসিভার টেনে নেয়। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে আসে ওর। হাশিম মূবীন পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

‘কাকে ফোন করছ?’ তার কণ্ঠে প্রবল সন্দেহের আভাস।

‘ফ্রেন্ডকে।’ ও নিচে তাকিয়ে বলে। বাবার চোখে তাকিয়ে মিথ্যে বলা কঠিন।

'আমি করে দিচ্ছি।' তিনি রিডায়াল বাটন টিপে রিসিভার কানে ধরলেন।

ইমামা ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। হাশিম মুবীন কিছুক্ষণ রিসিভার কানে ধরে নামিয়ে রাখলেন। হয়তো অন্যপাশ থেকে কল রিসিভ হয়নি।

'কেমন ফ্রেন্ড তোমার, যাকে তুমি এই সময়ে কল করছ?'

শক্ত গলায় মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন।

'জয়নবকে।' ফোনের স্ক্রিনে জয়নবের নাম্বার। ও চায়নি তিনি জয়নবের ওপর সন্দেহ করে জালাল পর্যন্ত পৌঁছে যাক।

এজন্য জিজ্ঞেস করতেই সত্য বলে।

'কীসের জন্য?'

'ওকে দিয়ে জাভেরিয়ার কাছে কিছু বলার ছিল আমার।'

'যা বলার আমাকে বলো, আমি জাভেরিয়ার কাছে পৌঁছে দেবো। দরকার হলে নিজে লাহোর গিয়ে বলে আসব। ইমামা। সত্যি করে বলো আমাকে, তুমি অন্য কোনো ছেলের প্রতি আগ্রহী নও তো?' তিনি কোনো রাখঢাক না রেখে সোজা জিজ্ঞেস করলেন।

একটু চুপ থেকে ইমামা বলল। 'হ্যাঁ।'

'অন্য ছেলের প্রতি আগ্রহী?' অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে আবার জিজ্ঞেস করেন।

ইমামা আবার এই কথায় মাথা নেড়ে সাঁয় জানায়।

হাশিম মুবীন সজোরে ওর গালে থাপ্পড় মারেন। 'আমি এটাই সন্দেহ করেছিলাম তোমাকে নিয়ে, এই ভয়ই ছিল আমার...!' রাগে ফেটে পড়লেন।

ইমামা চুপচাপ গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা ওর জীবনের প্রথম থাপ্পড়, যা বাবা ওকে মেরেছে। বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর বাবা গায়েও হাত তুলতে পারে? ও তো তার সবচেয়ে আদরের মেয়ে। তারপরও তিনি... গাল গড়িয়ে চোখের পানি নিচে পড়ছিল।

'আসজাদের বাইরে তোমার বিয়ে আমি অন্য কোথাও হতে দেবো না। অন্য কারো প্রতি আগ্রহ থাকলেও এখন, এই মুহূর্তে ভুলে যাও সেই ছেলেকে। রুমে যাও। দ্বিতীয়বার যদি তোমাকে ফোনের কাছে দেখেছি, পা ভেঙে রেখে দেবো।'

গালে হাত দিয়ে তুলতে তুলতে ইমামা নিজের রুমে চলে আসে। এসে বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। 'বাবা আমাকে মারতে পারে?' ওর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। অনেকক্ষণ এভাবে কাঁদার পর চোখের পানি শুকিয়ে আসে। ভেতরে অস্থিরতা নিয়ে রুমের জানালার সামনে দাঁড়ায়। বন্ধ জানালার কাঁচ দিয়ে ফাঁকা মস্তিষ্কে বাইরে তাকায়। নিচে বাড়ির লন। অনিচ্ছাকৃতই ওর চোখ পাশের বাড়ির উপর

পড়ে। ওটা সালারদের বাড়ি। সালারের রুম নিচতলায়। যদিও দূর থেকে কিছুই পরিষ্কার দেখাচ্ছে না। তবু সেই বাড়িতে একবার যাওয়ায় রুমের পজিশন আর রুমে পায়চারি করা ছায়ার হাবভাব দেখে অনুমান করতে পারে, ওটা সালার ছাড়া অন্য কেউ না। বিদ্যুৎ গতিতে ওর মাথায় চিন্তা কাজ করে। 'হ্যাঁ! এই মানুষটা আমাকে সাহায্য করতে পারে। যদি আমি একে পুরো পরিস্থিতি খুলে বলি এবং লাহোর গিয়ে জালালের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করি... তাহলে আমার সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সালারের সাথে যোগাযোগ কীভাবে...?' ভাবতে ভাবতে গাড়ির পেছনের কাঁচে লেখা মোবাইল নাম্বারের কথা মনে পড়ে যায়। পুরো নাম্বার মনে করার চেষ্টা করল, অসুবিধা হয় না। একটুকরো কাগজে নাম্বারটা সতর্কতার জন্য লিখে রাখল। রাত তিনটার দিকে আবার আন্তে আন্তে লাউঞ্জে এসে সেই নাম্বারে ডায়াল করতে থাকে ও।

ঘুমের মধ্যে মোবাইলের রিংটোন ভেসে আসে সালারের কানে। লাগাতার বাজতে থাকা শব্দে চোখ খুলে যায়। বেশ

বিরক্ত হয়ে বেডসাইড টেবিল হাতড়ে মোবাইল তুলে
রিসিভ করল। 'হ্যালো!'

কণ্ঠ চিনলেও ইমামা তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারল না।

'হ্যালো!' ঘুম জড়ানো কণ্ঠ আবার শোনা যায়।

'সালার!' ইমামা ওর নাম ধরে ডাকে।

'হ্যাঁ বলছি।' একই কণ্ঠে বলল।

'আমি ইমামা বলছি।'

বলতে চেয়েছিল কোন ইমামা? আমি কোনো ইমামাকে চিনি
না। কিন্তু মস্তিষ্ক কারেন্টের মতো সিগন্যাল দেয়। চোখ
আপনা-আপনি পুরো খুলে যায়। নামের সঙ্গে কণ্ঠও চিনে
ফেলে সালার।

'আমি ওয়াসিমের বোন।' অন্যপাশের নীরবতায় ইমামা নিজের পরিচয় দেয়।

'চিনতে পেরেছি।' হাত বাড়িয়ে বেডসাইট ল্যাম্প অন করে সালার। ঘুম নাই হয়ে গেছে। টেবিলের উপর থেকে রিষ্ট-ওয়াচ তুলে সময় দেখল, ঘড়িতে তিনটা দশ বাজে। কিছুটা অবিশ্বাসের ঢৌক গিলে ঘড়ি আবার টেবিলে রেখে দেয়। অপরাপাশ এখন নীরব।

'হ্যালো!!' সালার এপাশ থেকে বলল।

'সালার! তোমার সাহায্য দরকার।'

সালারের কপালে ভাঁজ পড়ে।

'আমি একবার তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলাম, এখন আমি চাই তুমি আমার জীবন বাঁচাও।'

সালার অবোধ্য ভঙ্গিতে ইমামার কথা শুনতে থাকে।

'আমি লাহোরে একজনের সাথে যোগাযোগ করতে চাই,
কিন্তু পারছি না।'

'কেন?'

'ওখানের কেউ ফোন তুলছে না।'

'রাতের এই সময়ে তুমি...'

ইমামা বলতে দিলো না। 'প্লিজ! এখন শুধু আমার কথা শোনো, আমি দিনের বেলা ফোন করতে পারব না। হয়তো কাল রাতেও না। বাড়ির মানুষ আমাকে ফোন করতে দিচ্ছে না। আমি চাই তুমি একটা অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার নোট করে নাও। সেটা দিয়ে একজনের সাথে কন্টাক্ট করো। তার নাম জালাল আনসার। তাকে গিয়ে শুধু বলবে আমার বাবা-

মা এখানে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। বিয়ে না করে তারা আমাকে লাহোর যেতে দেবে না।"

হুট করে সালারের ভেতরে পুরো বিষয় নিয়ে কৌতূহল জাগে। কম্বল হাঁটু পর্যন্ত টেনে ইমামার কথা শুনছিল। একটা অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার বলছে মেয়েটা। ও সেই অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার নোট করেনি, এর প্রয়োজন নেই। জিজ্ঞেস করল। 'যদি আমি ফোন করার পরও কেউ ফোন রিসিভ না করে, তাহলে?'

দীর্ঘ নীরবতার পর ইমামা বলল। 'তুমি লাহোর গিয়ে তার সাথে দেখা করতে পারবে? প্লিজ...! এটা আমার জন্য জরুরি।' এবার সুরে মিনতি ছিল।

'যদি সে জিজ্ঞেস করে আমি কে, তাহলে কী বলব?'

'যা ইচ্ছে বলে দিও, আমার অসুবিধা নেই। আমি শুধু এই বিপদ থেকে মুক্তি চাই।'

'তুমি নিজে তার সাথে কথা বললে বেশি ভালো হয় না?'
সালার ভেবে বলল।

'আগেই বলেছি হয়তো দ্বিতীয়বার কল করার সুযোগ পাবো না, আর এখন সে ফোন রিসিভ করছে না।'

সালার কিছু বলল না। ইমামা হতাশ হয়ে ফোন রেখে দেয়। কল কেটে যাওয়ার পর সালার অনেকক্ষণ ফোন হাতে নিয়ে বসে রইল। জালাল আনসার... ইমামা হাশিম... যোগাযোগ করা... বাবা-মায়ের জোর করে বিয়ে দেওয়া...। পাজলের টুকরোগুলো মেলানোর চেষ্টা করে। যদিও জিজ্ঞেস করেনি, জালালের সাথে ইমামার কী সম্পর্ক। ডান পা নাড়তে নাড়তে এদের দুজনকে নিয়ে ভাবে। এই পরিস্থিতি ওর কাছে বেশ চিত্তাকর্ষক লাগছিল। 'ইমামার মতো একটা মেয়ে এ ধরনের অ্যাফেয়ারে ইনভলভ' নিজের ব্যাপারে ইমামার অপছন্দ সম্পর্কে ও জানে। তাই আরও বেশি অবাক, ইমামা এরপরও ওর কাছে সাহায্য চাইছে!

'এই মেয়ে চায় কী? আমাকে ব্যবহার করতে নাকি ফাঁদে ফেলতে?' ভাবতে ভাবতে বুক অন্দি কম্বল টেনে চোখ বন্ধ করে নেয়। কিন্তু ঘুম ওর চোখ থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে। বিগত অনেক বছর ধরে ওয়াসিম আর সেই পরিবারকে চেনে ও। ইমামাকেও আসা-যাওয়ার পথে দেখেছে। কিন্তু সেসব সাক্ষাতে কখনো তেমন নজর দেয়নি। তাই ইমামার ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না। ওদের পরিবারের তুলনায় ওয়াসিমদের পরিবার বেশ প্রথাশীল। তাই অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের বাড়ির মতো কখনো অবাধে সেই বাড়িতে যাওয়া-আসা করতে পারেনি। এটা নিয়ে ওর মাথাব্যথাও ছিল না। কারণ প্রতিটি পরিবারের আলাদা পরিবেশ ও নিজস্ব কায়দা-কানুন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তারপরও ইমামার মুড আর টেম্পারমেন্ট সম্পর্কে সামান্য ধারণা ছিল। তাই হঠাৎ এভাবে ফোন পাওয়ার ধাক্কা সামলাতে পারছিল না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও ঘুমাতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠল। 'জাহান্নামে যাক ইমামা... আর ওর কাহিনি।' বিড়বিড় করে মুখের উপর বালিশ দিয়ে অন্যপাশে ফিরে শোয়।

রুমে এসে আগের মতো বসে রইল ইমামা। পেটের মধ্যে গিঁট অনুভব করছে। মাত্র কয়েক ঘন্টায় সব বদলে গেল! সারা রাত ঘুমাতে পারে না। সকালে নাস্তার জন্যও বাইরে এলো না। ওর ক্ষুধা যেন মরে গেছে। সাড়ে দশটা নাগাদ পোর্ট থেকে গাড়ি স্টার্ট হওয়ার শব্দ আসে। জানে, এই সময় বাবা আর বড় ভাই অফিসে যায়। তাদের অফিসে যাওয়ার অপেক্ষাই করছিল। তারা যাওয়ার আধা ঘন্টা পর রুম থেকে বের হয় ও। লাউঞ্জে মা আর ভাবি বসে ছিল। আন্তে করে ফোনের কাছে চলে আসে। রিসিভার হাতে নিতেই মায়ের আওয়াজ পায়।

'তোমার বাবা বলে গেছে, তুমি কোথাও ফোন করতে পারবে না।'

ইমামা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল। 'আমি আসজাদকে ফোন করছি।'

'কী জন্য?'

'কথা বলবা।'

'সেসব অহেতুক কথা যা কাল রাতে বলছিলে?' সালমা মুবীন কড়া গলায় বললেন।

'আপনার সামনেই বলব যা বলার। ভুল কিছু বললে ফোন কেটে দিয়েন।' ইমামা শান্ত স্বরে বলল।

মেয়ের অঙ্গভঙ্গিতে সালমা মুবীন নিশ্চিত হয়ে যান। ইমামা নাম্বার ডায়াল করে, কিন্তু আসজাদের ফোনে না। কয়েকবার বেল বাজার পর অন্যপাশ থেকে ফোন তোলা হয়। কল জালাল রিসিভ করেছিল। খুশির স্রোত বয়ে যায় এর মাঝে।

"হ্যালো! আমি ইমামা বলছি।" জালালের নাম না নিয়ে ইমামা বলল।

‘তুমি না বলে ইসলামাবাদ চলে গেলে কেন? আমি কাল দেখা করতে হোস্টেলে গেছি।’ জালাল বলল।

‘আমি গতকাল ইসলামাবাদ এসেছি আসজাদ।’ ইমামা বলল।

জালাল জিজ্ঞেস করে। ‘তুমি কাকে বলছ? আসজাদ!’

‘কাল রাতে বাবা বলল বিয়ের তারিখ নাকি ঠিক করে ফেলেছে।’

‘ইমামা!’ জালালের মাথায় যেন বাজ পড়ল। ‘বিয়ের তারিখ?’

‘আমি জানতে চাই, তোমার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছ?’

‘না, ইমামা! আমি এখনো কথা বলতে পারিনি।’

'তাহলে এখন বলো। আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব না, তুমি জানো। কিন্তু এমন বিয়েও করব না। তাদের সাথে কথা বলে জানাও কী বলে।'

'ইমামা! তোমার আশেপাশে কেউ আছে?' জালাল বুঝতে পারে। 'তাই আমাকে আসজাদ বলে ডাকছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলছি। তুমি আবার কখন ফোন করবে?'

'তুমি বলো তোমাকে কখন ফোন করব।'

'কাল। তোমার বিয়ের তারিখ কবে?'

'এটা আমাকেও জানানো হয়নি।'

'ঠিক আছে, আমি আজকেই বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলছি।
তুমি চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' জালাল ভরসা দিয়ে
ফোন রেখে দেয়।

ইমামা মনে মনে শুকরিয়া আদায় করে মা-ভাবি কেউ ধরতে
পারেনি ও আসজাদ না অন্য কারো সাথে এতক্ষণ কথা
বলছিল।

'এই বিয়ে তোমার বাবা আর আজম ভাই মিলে ঠিক
করেছেন। তাই তোমার বা আসজাদের কথায় দেরি করা হবে
না।' সালমা মুবীন নরম সুরে বললেন।

'আম্মি! মার্কেটে যাচ্ছি। কিছু জরুরি জিনিসপত্র লাগবে
আমার।'

'ফোনের ব্যাপার একরকম, কিন্তু বাড়ি থেকে বের হওয়ার
অনুমতি নেই। তোমার বাবা শুধু আমাকে না, দারোয়ানকেও
বলে গেছে তোমাকে যেন বাইরে যেতে দেওয়া না হয়।'

'আম্মি! সবাই আমার সাথে এমন কেন করছেন আপনারা?'

ইমামা অসহায় ভঙ্গিতে সোফায় বসে। 'আমি বিয়েতে অমত করিনি, বলেছি হাউস জব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তারপর বিয়ে করব।'

'আমার মাথায় কাজ করছে না তুমি বিয়েতে দেরি কেন চাইছ? বিয়ে তাড়াতাড়ি হলেও তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হচ্ছে না।' এবার ইমামার ভাবি বোঝানোর চেষ্টা করে। 'অযথা কাল রাত থেকে সবাই টেনশনে। আমি অবাক হচ্ছি, আগে কখনো এমন জেদ করেনি তুমি। তাহলে এখন কী হয়েছে তোমার? লাহোর যাওয়ার পর তুমি খুব অদ্ভুত হয়ে গেছ!'

'তাছাড়া আমাদের চাওয়ায় কিছু হবে না। আগেও বলেছি। এটা তোমার বাবার সিদ্ধান্ত।' সালমা মুবীন বললেন।

'আপনি অন্তত বাবাকে বোঝাতে পারতেন।' ইমামা মায়ের কথায় প্রতিবাদ করে।

'কীসের জন্য? আপত্তির কিছু থাকলে বোঝাতাম। আমি কিছু খুঁজে পাইনি।'

ইমামা রাগ হয়ে ওখান থেকে উঠে নিজের রুমে চলে যায়।

স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দেরিতে ঘুম ভাঙে সালারের। তাই ঘড়ি দেখে কলেজে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিকান্দার আর তায়িবা করাচি গেছেন। বাড়িতে একা ও। কাজের লোক যখন নাস্তা নিয়ে রুমে ঢোকে, তখন টিভি দেখছিল।

'নাসেরাকে একটু ভেতরে পাঠাও।' কাজের লোককে দেখে কিছু মনে পড়ে। কাজের লোক বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর নাসেরা রুমে আসে।

'জি সাহেব! আমাকে ডেকেছেন?' মধ্যবয়সী একজন গৃহপরিচারিকা ভেতরে ঢুকল।

'হ্যাঁ, কাজ আছে। নাসেরা! তোমার মেয়ে না ওয়াসিমদের
বাড়িতে কাজ করে?' রিমোট রেখে বলল ও।

'হাশিম সাহেবদের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, তাদের বাড়ি।'

'হ্যাঁ, করে।' মহিলা অবাক হয়ে তাকায়।

'কখন যায় তোমার মেয়ে ওই বাড়িতে?'

'এখন ওখানেই আছে। কী হয়েছে সালার সাহেব?'

'কিছু না। তোমার মেয়েকে এই মোবাইল দিয়ে বলবে
ইমামাকে দিয়ে আসতো।' বেশ উদাসীন ভঙ্গিতে নিজের
মোবাইল তুলে কাজের মহিলার দিকে বাড়ায়।

নাসেরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 'আমি আপনার কথা বুঝলাম না। মোবাইলটা আমার মেয়েকে দেবো?'

'হ্যাঁ তোমার মেয়েকে দিয়ে বলবে, কাউকে না জানিয়ে মোবাইলটা ইমামাকে দিয়ে আসতে।'

'কিন্তু কেন?'

'এটা জানা তোমার জন্য জরুরি না। যা বলছি তা করো।'

'যদি কেউ জেনে যায়, তাহলে?'

'কেউ তখন জানতে পারবে যখন তুমি মুখ খুলবে। আর তুমি মুখ খুললে ক্ষতি তোমাদের মা-মেয়ের হবে, অন্য কারো না। যদি মুখ বন্ধ রাখো তাহলে কেউ জানবেও না, তোমারও বেশ লাভ হবে।'

নাসেরা এবার কিছু না বলে নীরবে মোবাইল হাতে নেয়।

সালার বলল। 'আবার বলছি, কেউ যাতে এ ব্যাপারে কিছু না জানে।'

নাসেরা মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল। সালার পেছন থেকে ডাক দেয়। 'এক মিনিট দাঁড়াও।' ওয়ালেট থেকে কিছু কারেন্সি নোট বের করে বাড়িয়ে বলল।

'এগুলো রাখো।' নাসেরা ছোট একটা হাসি দিয়ে নোটগুলো নেয়। যেসব বাড়িতে কাজ করে, সেখানকার ছেলে-মেয়েদের এমন অনেক গোপন বিষয় তার জানা। এতে বাড়তি কিছু আয় হয়। তাৎক্ষণিকভাবে অনুমান করল সালার-ইমামার চক্রর চলছে। আর এই মোবাইল সালারের পক্ষ থেকে ইমামার জন্য উপহার। কিন্তু এটা ভেবে অবাক হচ্ছে আগে কেন টের পায়নি। 'তার তো বিয়ে হচ্ছে, তাহলে এসব কাজ-কারবার কেন করছে? আর একবার আমায় দেখো... ইমামা বিবিকে কত সহজ-সরল ভাবতাম!' নিজের অসতর্কতায় নাসেরার বড্ড আফসোস হচ্ছিল।

'আব্বু! আপনার সঙ্গে কথা ছিল।' জালাল রাতে বাবার রুমে আসে।

জালালের বাবা তখন ফাইল দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। 'হ্যাঁ, বলো। কী কথা।'

জালাল এসে পাশের চেয়ারে বসে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। আনসার জাভেদ বুঝলেন ছেলে কিছু নিয়ে চিন্তিত।

'আব্বু! আমি বিয়ে করতে চাই।' জালাল কোনোরকম ভূমিকা ছাড়া বলে ফেলে।

'কী...?' আনসার জাভেদ ছেলের মুখের দিকে তাকান। 'তুমি কী করতে চাও?'

'আমি... বিয়ে করতে চাই।'

'হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত? কালকে পর্যন্ত তো দেশের বাহিরে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, আর আজকে বিয়ের কথা নিয়ে এসেছ!' আনসার জাভেদ হাসলেন।

'ব্যস, ব্যাপারই এমন যে কথা বলতে হচ্ছে।'

আনসার জাভেদ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'আপনি জয়নবের ফ্রেন্ড ইমামাকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, তোমার পছন্দ?' আনসার জাভেদ অনুমান করলেন।

জালাল মাথা নেড়ে সাই জানায়।

'কিন্তু তাদের পরিবার অনেক ধনী। মেয়ের বাবা শিল্পপতি। তাছাড়া তারা মুসলমান না।' আনসার জাভেদের কথার ধরন বদলে গেছে।

‘আব্বু! ইমামা ইসলাম কবুল করেছে। ওর পরিবার কাদিয়ানি।’ জালাল বলে।

‘ওর পরিবার জানে?’

‘না।’

‘তোমার মনে হয় তারা এই প্রস্তাব মেনে নেবে?’ আনসার জাভেদ তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আব্বু! ওর পরিবারের অনুমতির দরকার নেই। তাদের অনুমতি ছাড়া আমরা বিয়ে করতে চাই।’

‘মাথা ঠিক আছে তোমার?’ আনসার জাভেদ ধমক দেন।

‘আমার মত নেই এই বিয়েতে।’

জালালের চেহারা নিভে যায়। ‘আব্বু! আমি ওকে কথা দিয়েছি।’ নিচু গলায় বলল।

'আমাকে বলে কথা দাওনি। এই বয়সে এমন অনেক কথা দেওয়া-নেওয়া হয়। তাই বলে কি নিজের জীবন নষ্ট করে ফেলবে? তাদেরকে পেছনে লাগিয়ে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব।'

'আব্বু! আমি লুকিয়ে বিয়ে করব। কাউকে না বললে কিছু হবে না।'

'আর যদি জেনে যায়, তাহলে? তাছাড়া পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার বিয়ের কথা ভাবছি না। এখনো তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।'

'আব্বু প্লিজ! আমি ওকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'

জালাল নিচু আওয়াজে বলল।

'আচ্ছা...যদি তা-ই হয়, ওকে বলো ওর বাবা-মায়ের সাথে কথা বলতে। ওর বাবা-মা মেনে নিলে আমি তোমাদের বিয়ে করিয়ে দেবো।' আনসার জাভেদ আদেশের সুরে বললেন। 'কিন্তু আমি এমন কোনো মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে হতে দেবো না, যে নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চায়।'

'আব্বু! আপনি ওর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। ও খারাপ মেয়ে না, অনেক ভালো। শুধু একজন মুসলমানকে বিয়ে করতে চায়, যাতে ওর পরিবার রাজি না।' জালাল ইচ্ছেকৃত ইমামার বাগদানের কথা এড়িয়ে যায়।

'অন্য কারো সমস্যা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তোমারও হওয়া উচিত না। এটা ইমামার সমস্যা, ওকে বুঝতে দাও। তুমি নিজের কাজ করো, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো।'

'আব্বু প্লিজ! আমার কথা বোঝার চেষ্টা করুন। মেয়েটার সাহায্য দরকার।'

'বহু মানুষের সাহায্য দরকার, তুমি ক'জনার করবে? আর যাইহোক আমাদের এবং তাদের স্ট্যাটাসে এত পার্থক্য যে, তাদের সাথে কোনো ধরনের শত্রুতা বা বিরোধিতায় মোড় নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। বুঝেছ তুমি? তার ওপর একটা অমুসলিম মেয়েকে ঘরে এনে চারপাশের সবাইকে কী মুখ দেখাবে?'

'আব্বু! ও মুসলমান হয়ে গেছে আমি আপনাকে বলেছি। জালাল একটু বিরক্ত হয়ে বলল।

'চারদিনের জানাশোনায়ে তোমার এমন প্রভাব পড়েছে যে, ও মুসলমান হয়ে গেছে?'

'আব্বু! আমার সাথে পরিচয় হওয়ার আগেই মুসলমান হয়েছিল।'

'তুমি ইসলাম কবুল করতে দেখেছ ওকে?'

'মাজহাব নিয়ে ওর সাথে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে, তাই জানি।'

'আচ্ছা ধরে নিলাম, এটা সত্য। তাহলে নিজের সমস্যা থেকে নিজে বের হোক। তোমাকে এর মাঝে টানা উচিত না। বাবা-মায়ের সাথে সরাসরি কথা বলুক, জানাক তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর আমি আর তোমার মা দেখব কী করা যায়। দেখো জালাল! ওর পরিবার তাদের ইচ্ছে আর খুশিতে তোমাদের বিয়েতে রাজি হলে আমিও আনন্দের সাথে মেনে নেব। কিন্তু নাম-নিশানা ছাড়া কোনো মেয়ের সাথে আমি তোমার বিয়ে দেবো না। আমরা একটা সমাজে থাকি, মানুষকে মুখ দেখাতে হয়। ছেলের বউয়ের পরিবার নিয়ে কী বলব সবাইকে? মেয়েটা নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে... নিজের পছন্দে আমার ছেলেকে বিয়ে করেছে?'

"আব্বু! ওকে সাহায্য করা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আর..."

আনসার জাভেদ ছেলেকে থামান। 'ধর্মকে মাঝে টেনে আনবে না। সবকিছুতে ধর্ম টানা জরুরি না। ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য শুধু তুমি রয়ে গেছ, বাকি সব মুসলমান মরে গেছে?'

‘আব্বু! মেয়েটা আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে... তাই বলছি।’

‘দেখো বাবা! প্রসঙ্গ সাহায্য বা ধর্ম নিয়ে না। এখানে প্রয়োজন বাস্তবতা দেখা। খুব ভালো কথা, তোমার মাঝে সাহায্য করার অনুভূতি আছে এবং ধর্মীয় কর্তব্যের খেয়াল করো। কিন্তু মানুষের ওপর কিছু অধিকার তার বাবা-মায়েরও আছে, যা ধর্মই ফরজ করেছে। সেই অধিকারের স্বার্থে আমি চাই, ওর পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে তুমি ওকে বিয়ে করবে না। ধরো তুমি বিয়ে করে নিলে, এরপর কী হবে? কয়েক মাসে আমেরিকা চলে যাবে, ও বাড়িতে পড়ে থাকবে। আমার কাছে এত টাকা নেই যে, আমি তোমাদের চারজনকে পড়াশোনা আর ওর পড়াশোনায় খরচ করব। তুমি ভালো

করেই জানো তোমার পেছনে আমার কত টাকা খরচ হচ্ছে।
ও তো ডাক্তার হতে পারবে না। তাহলে কত বছর ঘরে
বসিয়ে রাখবে? আর যদি ওর পরিবার আমাদের বিরুদ্ধে কেস
ফাইল করে, তাহলে তুমি-আমি দুজনেই জেল খাটব।
নিজের বোনের চিন্তা করো। তুমি কি চাও এই বয়সে আমি
হাজতবাস করি? এমনকি হতে পারে তুমিও...!

বাবার কথার ওপর জালাল কিছু বলতে পারল না।

'এসব ব্যাপারে এত আবেগ নিয়ে ভাবতে নেই। আমি
তোমাকে পথ বলে দিয়েছি। ওকে বাবা-মায়ের সাথে কথা
বলে তাদেরকে রাজি করাতে বলো। হতে পারে তারা রাজি
হয়ে যাবে। তাহলে আমার আপত্তি কীসের? যদি না পারে,
তাহলে বলে দিবে অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলতে। ঠান্ডা
মাথায় চিন্তা করলে বুঝবে তোমার এই সিদ্ধান্ত কত
লোকসানদায়ক আমাদের জন্য!' আনসার জাভেদ
আলোচনার দেয়ালে শেষ পেরেক ঠুকলেন।

'আপা! আপনার রুম পরিষ্কার করে দেই?' কাজের মেয়ে দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না, তুমি যাও।' ইমামা হাত দিয়ে ইশারা করে বলল।

কাজের মেয়ে চলে না গিয়ে রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেয়।

'তোমাকে বললাম না...' ইমামা কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু কথা গলাতেই আটকে যায়। কাজের মেয়ে ওড়নার নিচ থেকে একটা মোবাইল বের করছে, যা দেখে ওর চোখ বড় হয়ে যায়।

'আপা! মা এটা দিয়ে বলল পাশের বাড়ির সালার সাহেব আপনাকে দিতে বলেছে।' তড়িঘড়ি করে কাজের মেয়ে মোবাইল বাড়িয়ে দেয়।

মোবাইলটা একপ্রকার ছোঁ মেরে হাতে নেয় ইমামা।
হৃৎস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। 'দেখো, কাউকে বলবে
না তুমি আমাকে মোবাইল এনে দিয়েছ।' সাবধান করে।

'না আপা! চিন্তার কিছু নেই, কাউকে বলব না। আপনার কিছু
দেওয়ার থাকলেও দিতে পারেন।'

'না, আমার কিছু দেওয়ার নেই। তুমি যাও।' ইমামা নিজের
কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে।

কাজের মেয়ে বেরিয়ে গেলে রুম লক করে নেয় ও। কাঁপতে
থাকা হাত আর অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন নিয়ে জালালের
নাম্বারে ডায়াল করে। সব বিস্তারিত বলতে চায়। কল
জালালের মা রিসিভ করল।

'জালাল বাইরে, রাত ছাড়া ফিরবে না। তুমি জয়নবের সাথে
কথা বলো, ওকে ডেকে দেই?' জালালের মা বললেন।

'না আন্টি! আমার একটু তাড়া আছে। জয়নবের সাথে অন্য সময় কথা বলব। জালাল ভাইকে কিছু বইয়ের কথা বলেছি, সেগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতাম। পরে ফোন করব।' বলে ফোন রেখে দেয় ও।

সেদিন দুপুরেও খায় না। শুধু রাত নামার অপেক্ষা করছিল। যাতে জালাল বাসায় ফিরলে কথা বলতে পারে। সন্ধ্যায় কাজের মেয়ে এসে আসজাদের ফোনের খবর দেয়। যখন নিচে আসে, তখন লনে শুধু ওয়াসিম ছিল। ভাইকে পুরো এড়িয়ে ফোনের কাছে চলে আসে ও। রিসিভার তুলতেই অন্যপাশ থেকে আসজাদের গলা শুনে রক্ত টগবগ করে ওঠে। এটা জানার পরও যে, এই বিয়ের পেছনে ওর বাবার ভূমিকাই বেশি। তবুও ভীষণ রাগ উঠছিল। আসজাদ ওর অবস্থা জিজ্ঞেস করছে।

'আসজাদ! তুমি আমাকে এভাবে ধোঁকা দিলে কেন?'

'কীসের ধোঁকা দেওয়ার কথা বলছ ইমামা?'

'বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলা। কথা বললে না কেন?'

'আঙ্কেল তোমার সাথে কথা বলেননি?'

'জিঙেস করেছিল। বলেছিলাম এখনই বিয়ে করতে চাই না।'

'করার কিছু নেই। তাছাড়া সমস্যা কী, বিয়ে এখন হোক বা কয়েক বছর পর।'

'আসজাদ, তোমার সমস্যা না থাকলেও আমার আছে। পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বিয়ে করতে চাই না, তুমিও জানো।'

'হ্যাঁ জানি, কিন্তু এই পুরো বিষয়ে আমি কোথাও ইনভলভ ছিলাম না। বিয়ে আঙ্কেলের পীড়াপীড়িতে হচ্ছে।'

'তাহলে থামিয়ে দাও!'

'কেমন কথা বলছ ইমামা! আমি কীভাবে থামাব?'

'আসজাদ প্লিজ!'

'ইমামা! আমি পারব না। বিয়ের কার্ড ছাপানো শেষ। দুই বাড়িতে আয়োজন করা হচ্ছে, আর...'

পুরো কথা না শুনেই রিসিভার নামিয়ে রাখে ও। ওয়াসিম বোনের কথোপকথনে দখল নেয়নি। শুধু শুনে গেছে। কিন্তু যখন ইমামা ফোন রাখল তখন বলল। 'তুমি অযথা বিষয় নিয়ে এত বড় হাঙ্গামা করছ। কাল হলেও বিয়ে আসজাদকেই করতে হবে। তাই এসব করে নিজের ঝামেলা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। বাবা তোমার ওপর ভীষণ রেগে আছে।'

'আমি তোমার মতামত চাইনি। নিজের কাজ নিয়ে থাকো। তুমি আমার সঙ্গে যা করেছ, তা যথেষ্ট।' ভাইয়ের ওপর চোখ রাঙিয়ে রুমে চলে আসে ইমামা।

রাতেও রুম থেকে বের হয় না ইমামা। কিন্তু কাজের মেয়ে খাবার দিয়ে গেলে খেয়ে নেয়। রাত এগারোটার দিকে জালালকে ফোন করে। এবার কল জালালই তোলে। সে-ও হয়তো ওর ফোনের অপেক্ষায় ছিল। সামান্য খোঁজ-খবরের পর মূল কথায় চলে আসে।

'ইমামা! আমি আব্বুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি।'

"তারপর?" ইমামা জিজ্ঞেস করে।

একটু চুপ থেকে জালাল বলে। 'আব্বু এই বিয়েতে রাজি না।'

ইমামা কেঁপে ওঠে। 'কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন কোনো আপত্তি থাকবে না।'

‘হ্যাঁ, ভেবেছিলাম। কিন্তু আব্বুর অনেক বিষয়ে আপত্তি আছে। তার মনে হয় আমাদের পারিবারিক স্ট্যাটাসে অনেক পার্থক্য। বাবা তোমার ফ্যামিলি সম্পর্কে জানে। তার সবচেয়ে

বড় আপত্তি হচ্ছে, ফ্যামিলির অনুমতি ছাড়া তুমি আমাকে
বিয়ে করত চাও। তিনি এটা ভেবে ভয় পাচ্ছেন যে, এমন
পরিস্থিতিতে তোমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলির জন্য বিপদ
ডেকে আনবে।"

ইমামা স্তব্ধ হয়ে কানের সাথে ফোন ধরে শুনতে থাকে।
'আপনি তাকে রাজি করানোর চেষ্টা করেননি?' লম্বা
নীরবতার পর জিজ্ঞেস করল।

'সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু আবু বলেছেন তোমার
ফ্যামিলি এই বিয়েতে রাজি হলে তার কোনো আপত্তি
থাকবে না। এটা বড় করে দেখবেন না তোমার ফ্যামিলি কোন
মাজহাবের। কিন্তু তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা আমাদের বিয়ে
মানবে না।'

'আর আপনি... আপনি কী বলতে চান?'

'ইমামা! আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'জালাল! আমার বাবা-মা কখনো আমাদের বিয়ের জন্য রাজি হবে না। কারণ এমন কিছু হলে পুরো কমিউনিটি তাদের বয়কট করবে। যা তাদের পক্ষে কোনোভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব না। তার ওপর আসজাদের সাথে আমার বাগদানের কথা আপনি কীভাবে ভুলে যাচ্ছেন?'

'ইমামা! তারপরও তাদের সাথে কথা বলো। হতে পারে কোনো পথ বেরিয়ে আসবে।'

'আমি কালকে বাবার হাতে থাপ্পড় খেয়েছি শুধু এটুকু বলে যে, আমি অন্য কারো প্রতি আগ্রহী।' ইমামার কণ্ঠ কান্নায় জড়িয়ে আসে। 'আর যদি জানে আমি যাকে পছন্দ করি সে তাদের মাজহাবের না, তাহলে মেরে ফেলবে। প্লিজ জালাল! আপনি আঙ্কেলকে বোঝান। আমার সমস্যা খুলে বলুন।' মিনতি করে ও।

'আচ্ছা। আমি কালকে আব্বুর সাথে আবার কথা বলব।
আম্মির সাথেও। তারপর জানাচ্ছি তারা কী বলে।' জালালও
চিন্তায় ছিল।

ফোন রেখে দিয়ে ইমামার মন আরও বিষিয়ে ওঠে। ওর
কল্পনার জগতেও ছিল না, জালালের বাবা-মা এই বিয়েতে
আপত্তি করতে পারে। মোবাইল হাতে নিয়ে শূন্য মস্তিষ্কে
সেভাবেই বসে রইল।

'তোমার বাবা এ বিষয়ে আমার সাথে কথা বলেছে এবং তিনি
যা বলছেন সেটাই ঠিক। তোমার এসব বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার
কোনো দরকার নেই।' জালালের মা পরিস্কার গলায় বললেন।

ইমামার অনুরোধে জালাল মায়ের সাথে কথা বলতে
এসেছিল। 'কিন্তু আম্মি! এখানে বিপদের কী আছে? কিছু হবে
না, আপনারা অকারণে এত ভয় পাচ্ছেন।' জালাল কিছুটা
প্রতিবাদ করল।

'তুমি ঠিক সেই পরিমাণ আহাম্মক, যা পরিমাপ করা যায় না।' ছেলের কথায় জালালের মা রেগে ওঠেন। 'ইমামার পরিবার আর ওর বাবাকে তোমার বাবা ভালো করে চেনে। তোমার কি মনে হয় বিয়ে করে ফেললেই তারা তোমাকে ছেড়ে দেবে, আমাদের কিছু না বলে বসে থাকবে?

'আম্মি! আমরা বিয়ে গোপন রাখব। কাউকে বলব না। আমি স্পেশালাইজেশনের জন্য বাহিরে যাওয়ার পর ইমামাকেও নিয়ে যাব। সবকিছু আড়ালে থাকবে। কেউ কিছু জানতে পারবে না।'

'আর ইমামার জন্য এত বড় ঝুঁকি আমরা কেন নেব? তাছাড়া তোমার জানা উচিত আমাদের পরিবারে নিজেদের ভেতরে বিয়ে হয়। ইমামা বা অন্য কারো দরকার নেই।' জালালের মা প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন। 'যদি আমার আন্দাজ থাকত তুমি এসব মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়বে, তাহলে আগেই কোথাও সম্বন্ধ ঠিক করে রাখতাম।' রেগে বললেন।

'আম্মি! আমি ইমামাকে পছন্দ করি।'

'তোমার পছন্দের এখানে মূল্য নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এক্ষেত্রে আমি আর তোমার বাবা কী ভাবি এবং আমরা কেউ ইমামা বা ওর পরিবার পছন্দ করি না।'

'আম্মি! ও অনেক ভালো, আপনি চেনেন। বাসায় অনেকবার এসেছে, তখন তো খুব প্রশংসা করতেন।'

'প্রশংসা করার মানে এই না যে, ওকে ছেলের বউ বানিয়ে ফেলব।'

'আম্মি! আপনি অন্তত আববুর মতো বলবেন না। একটু সহানুভূতি নিয়ে ভাবুন।'

'জালাল! তোমার বোঝা উচিত, এই জেদ আর সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের পরিবারের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে। আমাদেরও স্বপ্ন আছে তোমাকে একটা উচ্চ ও ভালো বংশে

বিয়ে করানোর। তোমার বাবা এই বিয়েতে অনুমতি দিলেও আমি দেবো না। ইমামাকে ছেলের বউ হিসেবে কখনো মানতে পারব না।"

'ইমামার অবস্থাটা বুঝুন, কত বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন ওর সাহায্য দরকার।'

'যেহেতু নিজে এত বড় পদক্ষেপ নিয়েছে, সুতরাং অন্যের ওপর ঝামেলা চাপানোও উচিত না ওর। আমি ওকে খারাপ বলছি না, অনেক ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। মাথা খাটিয়ে ভাবো, স্পেশালাইজেশন করতে তুমি দেশের বাহিরে যাবে। ফিরে এসে নিজের হসপিটাল করবে।' জালালের মা নরমভাবে বলতে থাকেন। 'বাবা! ভালো পরিবারে বিয়ে হলে মানুষের জন্য এগিয়ে যাওয়ার অনেক পথ খুলে যায়। তোমার জন্য এমনিতেই অনেক ভালো-ভালো পরিবার থেকে সম্বন্ধ আসছে। যখন স্পেশালাইজেশন করে ফিরবে, তখন আরও কত ভালো পরিবারে বিয়ে হতে পারে তোমার কোনো

আন্দাজ নেই। নিজে ভেবে দেখো, শুধু ইমামাকে বিয়ে করে কী পাবে তুমি? পরিবার ওকে বাদ দিয়ে দেবো। সমাজে যে বদনাম হবে তা আলাদা। বিয়ে হয়ে গেলেও আগামীতে সন্তানরা তোমাদের নিয়ে কী ভাববে? এটা দু-চারদিনের বিষয় না, সারা জীবনের বিষয়।' গম্ভীরভাবে বোঝালেন।

জালাল কোনোরকম আপত্তি বা প্রতিবাদ ছাড়া চুপচাপ মায়ের কথা শোনে। চেহারা দেখে অনুমান করা যাচ্ছিল কথায় কতটুকু প্রভাবিত হচ্ছে।

পরের রাতে আবার কল দেয় ইমামা। ফোন জালাল রিসিভ করে।

'ইমামা! আমি কথা বলেছি। আমি আব্বুর চেয়েও বেশি রেগে গেছি।'

ইমামার আধভাঙা মন এবার পুরো ভেঙে যায়।

'আম্মি বলেছেন এসব অহেতুক বিষয়ে নিজেকে জড়ানোর দরকার নেই।' জালাল সোজাসাপ্টা বলে। 'তোমার সমস্যার কথা বলেছি। তিনি বলেছেন ওটা তোমার সমস্যা, আমাদের না।'

জালালের প্রতিটা শব্দের সাথে ইমামার কণ্ঠ বাড়ছিল। 'অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু আম্মি রাজি না, মনে হয় হবেনও না।' জালালের কণ্ঠ নিচু হয়ে আসে।

প্রতিটা শব্দ ইমামার বুকে তীরের মতো গিয়ে লাগে। 'জালাল! আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার।' ভাঙা মন নিয়ে শেষ আশায় বলে।

'জানি ইমামা! কিন্তু আমার কিছু করার নেই, বাবা-মা রাজি না।'

'আপনি তাদের অনুমতি ছাড়া আমাকে বিয়ে করতে পারবেন না?'

‘না, তাদের মনে কষ্ট দিয়ে তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।’

‘প্লিজ জালাল!’ ইমামা মিনতি করে। ‘আপনি ছাড়া আমার কোনো পথ নেই।’

‘আমি বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে পারব না। আমাকে এসব করতে বাধ্য করো না।’

‘অবাধ্য হতে বলছি না। শুধু আপনার কাছে আমার জীবন ভিক্ষা চাইছি।’ ইমামার শরায় দুর্বল হয়ে আসে। মনে করতে পারে না জীবনে এর আগে কখনো কারো সামনে এমন অসহায়ের মতো কথা বলেছিল কিনা। ‘আপনি শুধু আমাকে বিয়ে করুন, আপনার বাবা-মাকে জানাতে হবে না। এরপর চাইলে তাদের পছন্দে অন্য কোথাও বিয়ে করে নিয়ন, আমি আপত্তি করব না।’

'এখন তুমি বাচ্চাদের মতো কথা বলছ। নিজে ভেবে দেখো, এমন বিয়ের কথা শুনলে আমার বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? বাড়ি থেকে বের করে দেবে আমাকে, এরপর তুমি আর আমি কী করব?'

'আমরা দু'জন পরিশ্রম করব, কিছু একটা জোগাড় হয়ে যাবো।'

'তোমার সেই কিছু একটা দিয়ে আমি বাহিরে পড়তে যেতে পারব?'

ইমামা কিছু বলার মতো ভাষা হারিয়ে ফেলল।

'না ইমামা! আমার এত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা তোমার জন্য বা অন্য কারো জন্যই আমি ছাড়তে পারব না। ভালোবাসি, কিন্তু তুমি যে আবেগ দেখাচ্ছ, আমি তা দেখাতে পারব না। আর ফোন করবে না। পুরো বিষয়টা আমি এখানে শেষ করতে চাই। তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু নিজের সমস্যার

সমাধান নিজে বের করো। আমি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারছি না। খোদা হাফেজ।" জালাল কল কেটে দেয়।

রাত ১০:৫০। নিজের চারপাশের পৃথিবীকে ধোঁয়ায় বিলীন হয়ে যেতে দেখে ইমামা। সবকিছু হাতের মুঠোয় থাকা এবং তা হাত ফসকে একদম দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়ার পার্থক্য ওর চেয়ে ভালো হয়তো কেউ বলতে পারবে না। মূর্তির মতো বসে থাকে। অসার মন আর ক্ষতবিক্ষত স্নায়ু নিয়ে দীর্ঘসময় বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। 'বাবাকে সব বলে দেওয়া উচিত এখন। এছাড়া কোনো পথ নেই। এতে হয়তো তিনি নিজেই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। তাতে অন্তত এই বাড়ি থেকে মুক্তি পাবো।'

'আমি আসজাদকে বিয়ে করব না। তাই শপিংয়ের তো প্রশ্নই আসে না।' ইমামা শক্ত গলায় মাকে বলল।

পরের দিনের কথা। সালমা মুবীন মেয়েকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে এসেছিলেন।

'আগে বিয়ে নিয়ে আপত্তি ছিল, এখন আসজাদকে নিয়ে... চাও কী তুমি?' সালমা রেগে বললেন।

'শুধু এটাই, আপনারা আসজাদের সাথে আমার বিয়ে দেবেন না।'

'তাহলে কার সাথে দেবো?' হাশিম মুবীন হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

করিডোর থেকে মেয়ে আর স্ত্রীর কথা শুনে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ইমামা একদম চুপ যায়।

'বলো, কাকে বিয়ে করতে চাও? এখন মুখ কেন বন্ধ? আসজাদকে কেন বিয়ে করবে না, সমস্যা কী তোমার?'

"বাবা! বিয়ে একবারই হয় এবং আমি তা নিজের পছন্দেই করব।" ইমামা কিছুটা সাহস জুগিয়ে বলল।

'কাল পর্যন্ত তো আসজাদ তোমার পছন্দ ছিল।' হাশিম মুবীন দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললেন।

'কাল পর্যন্ত ছিল, আজ বা এখন নেই।'

'এখন কেন নেই? কী হয়েছে পছন্দের?'

'বাবা! আমি কোনো মুসলমানকে বিয়ে করব।'

হাশিম মুবীনের মনে হলো আকাশ ভেঙে তার মাথায় পড়েছে। 'কী... কী বললে তুমি?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'আমি কোনো অমুসলিমকে বিয়ে করব না। কারণ আমি ইসলাম কবুল করেছি।'

পরের কয়েক মিনিট রুমজুড়ে নিস্তব্ধতা ছেয়ে থাকে। সালমা মুবীন নির্বাক হয়ে যান। হাশিম মুবীন পাথরের মূর্তির মতো মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার মুখ খোলা, যেন শ্বাস নিতে ভুলে গেছেন। কল্পনায়ও ছিল না জীবনে কখনো সন্তান দিয়ে... তাও সবচেয়ে আদরের মেয়ের কারণে তাকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। তার চল্লিশ বছর জীবনের সব সাধনা ঝড়ের কবলে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তুমি কীসব আজেবাজে কথা বলছ?' তার মধ্যে ক্ষোভের ঢেউ ওঠে।

'বাবা! আপনি জানেন আমি কী বলছি। খুব ভালো করে জানেন।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ।' তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন।

কিছু না বলে শুধু না-বোধক মাথা নাড়ে। বাবার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছিল।

'এজন্য তোমাকে জন্ম দিয়েছি, বড় করেছি? যাতে তুমি...
তুমি...' হাশিম মুবীন কথা খুঁজে পেলেন না বলার মতো। 'শুধু
আসজাদকে বিয়ে না করার জন্য তুমি এসব করছ, তাই না?
যেন আমরা তোমার বিয়ে সেই ছেলের সাথে দেই, যাকে
তুমি পছন্দ করো...?'

'না, বাবা! তেমন কিছু না।'

'এমনই, তুমি বোকা ভাবো আমাকে?' তার মুখে ফেনা উঠে
গেল।

'আপনি যার সাথে ইচ্ছে বিয়ে দিতে পারেন, আমি আপত্তি
করব না। শুধু সে আপনাদের কমিউনিটির হতে পারবে না।
তাতে অন্তত এটা বলতে পারবেন না, আমি নির্দিষ্ট কারো
জন্য এসব করছি।'

'দুই শুক্রবার মিলিয়ে আট দিনের বাচ্চা তুমি, জানো কী হ্যাঁ?'
দাঁতে দাঁত চেপে বললেন তিনি।

'আমি সব জানি বাবা! আমার বয়স বিশ বছর। এখন আর আপনার আঙুল ধরে হাঁটা বাচ্চা নেই। এটাও জানি, এই মাজহাবের কারণে আমাদের পরিবারের এত সমৃদ্ধি।' স্থির আর স্পষ্ট গলায় বলল ও।

'তুমি... তুমি কখনো মাফ পাবে না। তুমি...!' হাশিম মুবীন মেয়ের দিকে আঙুল তাক করে বলতে থাকেন।

ইমামার তার জন্য মায়া লাগছিল। নিজে জাহান্নামে দাঁড়িয়ে অন্যকে জাহান্নামের হুমকি দেওয়া মানুষটার জন্য দয়া হচ্ছিল। চোখের ওপর পর্দা টানা, হৃদয়ে মোহর লাগানো মানুষটার জন্য করুণা জাগছিল। আত্মমগ্ন ও বিভ্রান্তির সবচেয়ে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার জন্য দুঃখ লাগছিল।

'তুমি গোমরাহির পথে চলে গেছ। কয়েকটা বই পড়ে...'

ইমামা তাকে বাধা দেয়। 'আপনি এসব বিষয়ে আমার সাথে তর্ক করে পারবেন না, বাবা! আমি সব জানি এখন। খুঁজে দেখেছি, যাচাই করেছি, নিশ্চিত হয়েছি। এখন কী বলে বোঝাবেন? আপনি নিজের পছন্দের পথ বেছে নিয়েছেন, আমি নিজের পছন্দের। আপনি সেটা করছেন যেটা নিজে সঠিক ভেবেছেন, আমি সেটা করছি যেটা আমার সঠিক মনে হয়েছে। আপনার আকিদা আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা, আমার আকিদা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা। তাই আমাকে আমার সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়াই ভালো। আবেগের বশে করা মূর্খতা না, খুব ভেবেচিন্তে নেওয়া পদক্ষেপ হিসেবে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিন।' খুব গম্ভীর হয়ে বলল।

হাশিম মুবীনের রাগ আরও বেড়ে যায় এতে। 'আমি... আমার মেয়েকে মাজহাব পরিবর্তন করতে দেবো... যাতে পুরো কমিউনিটি আমাকে বয়কট করে দেয়? আমি ফুটপাতে চলে আসব। না ইমামা! এটা হতে পারে না। তোমার মাথাখারাপ হয়ে গেছে। এর মানে এই না যে, আমাকেও মাথাখারাপ করতে হবে। যে মাজহাব ইচ্ছে কবুল করো, কিন্তু বিয়ে

তোমার আসজাদের সাথেই হবে, ওর বাড়িতেই যেতে হবে। সেই বাড়িতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিও কী করবে আর কী করবে না। হয়তো ততদিনে মাথা ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি উত্তেজিত হয়ে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'যদি জানতাম তোমার জন্য এত অপমান হতে হবে, তাহলে জন্মের সময়ই গলা টিপে মেরে ফেলতাম।' হাশিম মুবীন চলে গেলে সালমা মুবীন দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললেন। 'তুমি আমাদের মান-সম্মান ধুলোয় মেশানোর কসম খেয়েছ।'

বলে তিনিও রুমে থেকে বেরিয়ে যান। তার যাওয়ার হয়তো ঘন্টাখানেকই ইমামা চুপ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবে বকাবকি হয়েছিল, যখন দরজায় নক করে আসজাদ ভেতরে ঢোকে। এই সময় আসজাদকে এখানে আশা করেনি ইমামা। তার চেহারায়ও দুশ্চিন্তার ছাপ। বুকতে বাকি নেই হাশিম মুবীন ডাকিয়েছে এবং সবকিছু বলেছে।

‘এসব কী হচ্ছে ইমামা?’ ভেতরে ঢুকেই আসজাদ জিজ্ঞেস করে।

ইমামা বিছানায় বসে ছিল।

‘এসব কেন করছ তুমি?’

‘আসজাদ! তোমাকে যদি বলা হয়ে থাকে আমি কী করছি, তাহলে এটাও বলা হয়েছে কেন করছি।’

‘তোমার কোনো আন্দাজ আছে কী করছ?’ আসজাদ চেয়ার টেনে বসল।

‘হ্যাঁ, আছে।’

‘এই বয়সে মানুষ আবেগের বশে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।’

‘আবেগের বশে... আবেগের বশে কেউ মাজহাব বদলায়?
উহু, আমি চার বছর ধরে ইসলাম সম্পর্কে পড়েছি। চার বছর
কম সময় না।’

‘তুমি মানুষের কথায় প্রভাবিত হয়ে...’

‘আমি কারো কথায় প্রভাবিত হইনি। যা ভুল দেখেছি ছেড়ে
দিয়েছি, ব্যস!’

আসজাদ বিরক্ত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ‘ঠিক আছে,
এসব কথা বাদ দাও। বিয়েতে কেন আপত্তি? তোমার
আকিদার পরিবর্তনের বিষয় আলাদা, অন্তত আমাদের
বিয়েটা হতে দাও।’

‘তোমার সাথে আমার বিয়ে জায়েজ না।’

ওর কথায় আসজাদ থ বনে যায়। ‘আমি অমুসলিম?’

'হ্যাঁ, তুমি অমুসলিম।'

'আফ্কেল ঠিক বলেছিলেন, কেউ তোমার ব্রেনওয়াশ করেছে।'

'তাহলে এমন মেয়েকে কেন বিয়ে করতে চাইছ? অন্য কাউকে করো।'

'কারণ আমি চাই না তুমি এভাবে নিজের জীবন নষ্ট করে ফেলো।'

আসজাদের কথায় ইমামা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে। 'জীবন নষ্ট করা? জীবন যা তোমাদের মতো মানুষদের সঙ্গে কাটাচ্ছি? যারা টাকার জন্য এই মাজহাব বদলায়?'

'বিয়েভ ইউরসেলফ। কথা বলার সব ম্যানার'সও ভুলে গেছ। কোন বিষয়ে কতটুকু বলা যায়, কতটুকু না সেটাও মনে রাখোনি।' আসজাদ ধমকে বলল।

'আমি এমন কাউকে সম্মান দেখাতে পারব না, যারা মানুষকে গোমরাহ করে।' ইমামা তেজি গলায় বলল।

'যে বয়সে তুমি আছো সেই বয়সে সবাই এমন কনফিউজ হয়ে যায়, যেমন তুমি হয়েছে। যখন এই বয়স পেরিয়ে যাবে তখন বুঝবে, তুমি না আমরা ঠিক ছিলাম।' আসজাদ আবার বোঝানোর চেষ্টা করে।

'যেহেতু তোমরা ভাবছ আমি ভুল, তাহলে আমাকে একা ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? এভাবে কেন আটকে রেখেছ? যদি নিজেদের মাজহাবের সত্যতায় তোমাদের এত বিশ্বাস, তাহলে আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দাও, সত্য খুঁজতে দাও।'

'আপন কেউ নিজের ক্ষতি করতে চাইলে তাকে একা ছাড়তে নেই, তাও একটা মেয়েকে... ইমামা! এই বিষয়ের সংবেদনশীলতা বোঝার চেষ্টা করো। নিজের ফ্যামিলির চিন্তা করো। তোমার জন্য সবকিছু ঝুঁকির মুখে পড়েছে।'

'আমার জন্য কিছু ঝুঁকিতে পড়েনি, কিছু না। পড়লেও আমি কেন পরোয় করব? তোমাদের জন্য আমি কেন দোজখে যাব? শুধুমাত্র বংশের নামের জন্য কেন নিজের ইমান হারাব? না আসজাদ! আমি তোমাদের সাথে গোমরাহির পথে হাঁটব না। যা করতে চাইছি আমাকে করতে দাও।' ইমামা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। 'তুমি আমাকে জোর করে বিয়ে করলেও লাভ হবে না। আমি নিজেকে তোমার স্ত্রী মানব না। তোমার বিশ্বস্ত হব না। সুযোগ পেলে পালিয়ে যাব। আদতে ক'বছর আমাকে এভাবে বন্দি করে রাখবে, পাহারা দেবে, আমার শুধু কয়েক মিনিট লাগবে তোমার বন্দিশালা থেকে পালাতে। তোমর বাচ্চাও সঙ্গে নিয়ে যাব। জীবনভর কখনো আর ওদের দেখতে পাবে না।' কল্পনাভীত ভবিষ্যতের নকশা এঁকে আসজাদকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। 'আমি তোমার জায়গায় থাকলে ইমামা হাশিমের মতো মেয়েকে বিয়ে করতাম না। এটা সম্পূর্ণ ক্ষতির চুক্তি, বোকামির শেষ সীমা। ভেবে দেখো, পিছিয়ে যাও। সামনে তোমার পুরো জীবন পড়ে আছে। তুমি চাইলে যেকোনো মেয়েকে বিয়ে করে সুখী জীবন কাটাতে পারো, কোনো

ধরনের অস্থিরতা-অশান্তি ছাড়া। কিন্তু আমার সাথে তা হবে না। আমি তোমার জন্য সবচেয়ে খারাপ স্ত্রী প্রমাণিত হব। সুতরাং পুরো বিষয় থেকে আলাদা হয়ে যাও। বিয়েতে না করে দাও। আফ্কেল আজমকে বলো, তুমি বিয়ে করবে না আমাকে। নাহলে কিছুদিনের জন্য বাড়ি থেকে গায়েব হয়ে যাও। যখন সব সমস্যা শেষ হবে, ফিরে এসো।’

‘আমাকে আহাম্মকের মতো বুদ্ধি দেওয়া বন্ধ করো। কোনো মূল্যেই আমি তোমাকে ছাড়ব না। বিয়েতেও অমত করব না। এই বিষয় থেকে আলাদাও হব না। বাড়ি থেকেও কোথাও যাব না। আমি তোমাকেই বিয়ে করব ইমামা। এখন এটা আমাদের পরিবারের সম্মান ও নামের প্রশ্ন। এই বিয়ে না হলে বা তুমি বাড়ি থেকে চলে গেলে, আমাদের পরিবার কী পরিমাণ ক্ষতির মুখোমুখি হবে, সেই ধারণা নেই তোমার। থাকলে এমন আহাম্মকের মতো বুদ্ধি দিতে না। যতদূর কথা রইল খারাপ স্ত্রী হওয়ার বা বাড়ি থেকে পালানোর, সেটা পরের সমস্যা। আমি তোমাকে খুব ভালো করে চিনি। তুমি এমন টেম্পারমেন্টের মালিক নও যে, অন্যদের অহেতুক

চিন্তায় রাখবে। তাও আমাকে...? যাকে তুমি ভালোবাসো।"
আসজাদ বেশ নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল।

'ভুল ভাবছ, আমি তোমাকে ভালোবাসি না। বিশেষ করে মানসিকভাবে তোমার সঙ্গে এবং তোমার সাথে থাকা সম্পর্ককে আমি তখন থেকে মুছে ফেলেছি, যখন মাজহাব বদলেছি। এখন আমার জীবনের কোথাও তুমি নেই। যদি আজ আমি নিজের ফ্যামিলির জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারি, তাহলে কাল তোমার জন্যও পারব। তোমার আন্দাজ করা উচিত। তাই পুরনো ধারণা থেকে বেরিয়ে আসো। আমরা দু'জন এক হতে পারব না। আমি তোমার পরিবারের অংশ হতে চাই না। আসজাদ! তোমার-আমার মাঝে অনেক দূরত্ব নেমে এসেছে। এত দূরত্ব যে, এখন আমি তোমাকে দেখতেও পাই না। আর এই দূরত্ব আমি কখনো শেষ হতে দেবো না। তোমার সঙ্গে বিয়ের জন্য মোটেও প্রস্তুত নই আমি।'

আসজাদ বদলে যাওয়া চেহারা নিয়ে ইমামার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তুমি আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?' ইমামা বলল।

'তোমার কী মনে হয় এই পর্যন্ত আমি কী করছি?' সালার জিজ্ঞেস করল।

অপরপাশ নীরব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ইমামা বলল।
'লাহোর গিয়ে জালালের সাথে দেখা করতে পারবে?'

ইমামার কণ্ঠ ভারী লাগছে, যেন জ্বর এসেছোহঠাৎ ওর মাথায় কাজ করে নিশ্চয়ই কান্না করেছে, সেই প্রভাব। সালার কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে। 'কী জন্য?'

‘আমার হয়ে তাকে রিকোয়েস্ট করবে, যাতে আমাকে বিয়ে করে। সবসময়ের জন্য না হলেও কিছুদিনের জন্য। আমি শুধু এই বাড়ি থেকে বের হতে চাই। কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়া সম্ভব না। ব্যস, কিছুদিনের জন্য আমাকে বিয়ে করুক।’

‘তোমার তো তার সাথে ফোনে যোগাযোগ আছে, তাহলে এসব কলে কেন বলছ না?’ সালার চিপস খেতে খেতে পরামর্শ দেয়।

‘বলেছি।’ ইমামা অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল।

‘তারপর...?’

‘না বলে দিয়েছে।’

‘Very sad!’ সালার আফসোস প্রকাশ করে। ‘এটা তো One-sided love affair হয়ে গেল।’

'না, তেমন কিছু না।'

'তাহলে না করল যে?' সালার আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি এসব জেনে কী করবে?' ইমামা কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল।

সালার আরেকটা চিপস মুখে দেয়। 'ওখানে গিয়ে আমার কথা বলায় কী হবে? ভালো হয় তুমিই যদি আবার কথা বলো।'

'সে আমার সাথে কথা বলছে না। ফোন রিসিভ করে না। হসপিটালের কেউও ডেকে দিচ্ছে না তাকে। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে।'

'তাহলে তুমি কেন অযথা তার পেছনে পরে আছো? যেতে দাও তাকে। সে তোমাকে ভালোবাসে না।'

'তুমি এসব বুঝবে না, শুধু আমাকে সাহায্য করো। একবার গিয়ে তাকে আমার অবস্থা বলো। আমার সঙ্গে এমন করতে পারে না সে।'

'যদি সে আমার সাথে কথা বলতে না চায়, তাহলে?'

'তারপরও তুমি তার সঙ্গে কথা বলবে। হয়তো কোনো পথ বেরিয়ে আসবে, আমার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।'

সালারের চেহারায হাসি ফোটে। ইমামার দুর্দশায় বেশ মজা পাচ্ছিল। ফোন রেখে চিপস খেতে খেতে পুরো বিষয় নিয়ে ভাবে। যতদিন যাচ্ছে ততই এর সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এটা ওর কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার মনে হচ্ছিল। প্রথমে ইমামা পর্যন্ত ফোন পৌঁছানো, এখন জালালের সাথে যোগাযোগ করা। 'ইমামার বয়ফ্রেন্ড...?' নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করে। ইমামা ওকে জালালের হসপিটাল আর বাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত বলে দিয়েছে। ও এখন ভাবছে জালাল আনসারের সাথে দেখা করে কী বলবে।

সালার মানুষটাকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখে হতাশ হয়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা খুব সাধারণ চেহারার। ওর নিজের দীর্ঘ উচ্চতা এবং শারীরিক অবকাঠামো ওকে বিপরীত লিঙ্গের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলায় সক্ষম ছিল। কিন্তু সামনে থাকা ছেলেটা এই দুই বিষয় থেকেই বঞ্চিত। স্বাভাবিক উচ্চতার মালিক সে। চেহারা দাঁড়ি না থাকলে হয়তো দেখতে আরেকটু ভালো লাগত। সালার সিকান্দারকে বেশ নিরাশ হতে হলো জালাল আনসারের সঙ্গে দেখা করে। আর ইমামাকে এখন আগের চেয়ে বেশি বোকা মনে হয়।

‘আমি জালাল আনসার, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?’

‘আমার নাম সালার সিকান্দার।’ হাত বাড়িয়ে দেয় সালার।

‘মাফ করবেন, কিন্তু আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।’

‘চেনার কথাও না, আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এটা।’

জালালের খোঁজে হসপিটালে আসে সালার। কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে পেয়ে যায়। জালাল তখন ডিউটি রুমের বাইরে।

‘আমরা কোথাও বসে কথা বলতে পারি?’

জালাল অবাক হয়। ‘বসে। কিন্তু কোন বিষয়ে?’

‘ইমামার বিষয়ে।’

জালালের চেহারার রং বদলায়। ‘আপনি কে?’

‘আমি ওর বন্ধু।’

জালালের চেহারার রং আবার বদলায়। চুপচাপ একদিকে হাঁটতে থাকে। সালার সাথেই ছিল।

'পার্কিং লটে আমার গাড়ি আছে, ওখানে যাই।' সালার বলে।

গাড়ি পর্যন্ত আসা এবং ভেতরে বসা অর্থাৎ দু'জনের মাঝে কোনো কথা হয় না।

'আমি ইসলামাবাদ থেকে এসেছি।' সালার বলতে শুরু করে।

'ইমামা চায় আমি যেন আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

'ইমামা কখনো আপনার ব্যাপারে বলেনি আমাকে।' জালাল অদ্ভুত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল। 'আপনি ইমামাকে কবে থেকে চেনেন?'

'প্রায় ছোটবেলা থেকেই। আমাদের দু'জনার বাড়ি পাশাপাশি। খুব গভীর বন্ধুত্ব ওর সঙ্গে আমার।' সালার নিজেও জানে না

শেষের বাক্য কেন বলল। হয়তো জালালের চেহারার
রংবদল আরেকটু উপভোগ করতে চাইছিল।

জালালের চেহারা়় অপছন্দভাব ফুটে ওঠে॥ 'ইমামার সাথে
আমার বেশ বিস্তারিত কথা হয়েছে। এত বিস্তারিত কথার
পরও কী বাকি রয়েছে?' স্পষ্ট সুরে বলল সে।

'ইমামা চায় আপনি ওকে বিয়ে করুন।' সালার নিউজ
বুলেটিনের মতো বলতে থাকে।

'আমি ওকে আমার উত্তর জানিয়ে দিয়েছি।'

'ও চায় আপনার সিদ্ধান্ত আবার বিবেচনা করে দেখুন।'

'এটা সম্ভব না।'

'ইমামা বাড়িতে ওর বাবা-মায়ের কাছে বন্দি। সবসময়ের জন্য না হলেও সাময়িক সময়ের জন্য বিয়ে করে বেলিফের সাহায্যে ছাড়িয়ে আনুন ওকে।'

'ও যদি তাদের কাছে বন্দি থাকে তাহলে বিয়ে কীভাবে হবে?'

'মোবাইলের মাধ্যমে।'

'আমি এত বড় ঝুঁকি নিতে পারব না। তাছাড়া এসব বিষয়ে নিজেকে জড়ানোর ইচ্ছে নেই আমার।' জালাল বলল।
'আমার বাবা-মায়ের এই বিয়েতে মত নেই, তারা ইমামাকে মেনে নিতে প্রস্তুত না।' তার চোখ সালারের চুলের পনিটেলের দিকে। নিশ্চয়ই জালালও এতক্ষণে ওকে অপছন্দের তালিকায় ফেলে দিয়েছে, যেমনটা সালার ইতিমধ্যে করে ফেলেছে।

'এটা সাময়িক সময়ের বিয়ে, যাতে ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারে। এরপর চাইলে আপনি ওকে তালাক দিতে পারেন।'

'আমি বলে দিয়েছি ওর কোনো সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাও এ ধরনের বিষয়ে...' 'আপনি নিজে কেন ওকে বিয়ে করে নিচ্ছেন না? যদি সাময়িক সময়ের বিষয় হয়ে থাকে, তবে আপনি করে ফেলুন। সর্বোপরি আপনি ওর বন্ধু।' জালাল খোঁচা মেয়ে বলল। 'ইসলামাবাদ থেকে লাহোর ওর সাহায্যের জন্য আসতে পারলে এটাও করতে পারবেন।'

'আমাকে বিয়ে করতে বলেনি। তাই এই বিষয়ে ভাবিনি।' সালার ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে বলল। 'তাছাড়া ও আপনাকে ভালোবাসে, আমাকে না।'

'অস্থায়ী বিয়েতে ভালোবাসা থাকা জরুরি না। পরে আপনিও তালাক দিতে পারবেন।' জালাল সমস্যার সমাধান বের করে ফেলো।

‘আপনার পরামর্শ ওর কাছে পৌঁছে দেবো আমি।’ সালার গম্ভীর হয়ে বলল।

‘যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে ওকে বলবেন অন্য কোনো পথ খুঁজে নিতে। বরং আপনি কোনো পত্রিকার অফিসে চলে যান, গিয়ে তাদেরকে ওর ব্যাপারে বলুন, কীভাবে ওর পরিবার জোর করে ওকে আটকে রেখেছে। যখন মিডিয়া এই বিষয়টা হাইলাইট করবে, তখন ওর পরিবার চাপে পড়ে নিজেরাই ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। নাহলে আপনি গিয়ে বিষয়টা পুলিশকে জানান।’

সালার অবাক হয়, জালালের পরামর্শ মন্দ না। তাহলে ইমামা কেন এসব নিয়ে ভাবছে না? এই পথ বেশি নিরাপদ। ‘আমি আপনার এই পরামর্শও পৌঁছে দেবো।’

‘আমার কাছে আর আসবেন না। ইমামাকেও বলে দেবেন, যাতে আমার সঙ্গে কোনোভাবে, কারো মাধ্যমে

যোগাযোগের চেষ্টা না করে। আমার বাবা-মা এমনিতেই আমার সম্বন্ধ দেখছে।' জালাল যেন ঘোষণা করল।

'ঠিক আছে, আপনার সব কথাই ওর পর্যন্ত পৌঁছে দেবো।' সালার ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে বলল। জালাল গাড়ি থেকে নেমে যায়।

যদি ইমামা আশা করে বসে থাকে সালার যেকোনোভাবে ওকে বিয়ে করতে জালালকে রাজি করাবে, তাহলে সেটা ইমামার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। ইমামার প্রতি সালারের কোনোরকম সহানুভূতি নেই। এমন না যে, খোদার ভয়ে এই পুরো বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওর জন্য সবকিছু একটা অ্যাডভেঞ্চার। আর এই অ্যাডভেঞ্চারে জালালের সাথে ইমামার বিয়ে অর্ন্তভুক্ত না। তাছাড়া বিয়ের জন্য যুক্তি দেখাতে হলে কী যুক্তি দেখাত? ওর কাছে একটা যুক্তির বাইরে অন্যকিছু নেই। জালাল আর ইমামা একে অপরকে ভালোবাসত, ব্যস! আর এটা সেই যুক্তি, যা জালাল ইতিমধ্যে নাকচ করে বসে আছে। ধর্মীয় বা নৈতিকতা

দেখিয়ে বোঝানোর মতোও সক্ষম না। কারণ এসব বিষয়ে নিজেই অজ্ঞ। ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে দূরদূরান্তেও কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইমামার জন্য আরেকজনের সাথে এত লম্বা তর্ক কেন করতে যাবে ও? তাও এমন একজনের সাথে, যাকে দেখেই পছন্দ হয়নি।

এগুলো সেসব কথা, যা লাহোর থেকে ইসলামাবাদ ফেরার পথে সালার ভাবছিল। এসেছিল জালালের সঙ্গে দেখা করতে এবং এটা দেখতে ইমামার খবর পেয়ে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়। কোনোরকম না বদলে, না বাড়িয়ে একই বাক্যে ইমামার সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে। এখন জালালের উত্তর নিয়ে বেশ ফুরফুরে হয়ে ফিরছে। 'এই খবর পাওয়ার পর মেয়েটা কী করবে? কী বলবে? আসজাদকে ও বিয়ে করবে না। জালাল ওকে বিয়ে করতে প্রস্তুত না। বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। অন্য এমন কেউ নেই, যে ওকে সাহায্য করতে পারে। তাহলে সামনে কী করবে? সাধারণত এই পরিস্থিতিতে মেয়েরা আত্মহত্যা করে। Oh yes! মেয়েটা নিশ্চয়ই এখন

আমার কাছে বিষ অথবা রিভলবার চাইবে। প্রত্যাশিত পরিস্থিতি ভেবে আগ্রহদীপ্ত হয়ে উঠছিল।

"আত্মহত্যা... Very exciting! তাছাড়া আর কী করতে পারে?"

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

সালার ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে যায়। 'মোবাইলে নিকাহ...?'

ইমামা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য খানিকটা থম মেরে রইল।

লাহোর থেকে ফিরে জালালের উত্তর ইমামার কাছে একইভাবে পৌঁছে দিয়েছে সালার। ওর আন্দাজ ছিল ইমামা কান্নাকাটি শুরু করবে, ওর কাছে কোনো অস্ত্র চাইবে। কিন্তু ইমামা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর যা বলল, তা কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওর হুঁশই উড়িয়ে দেয়।

'আমার শুধু কিছুদিনের জন্য তোমার সঙ্গ দরকার। যাতে বাবা-মা আসজাদের সাথে বিয়ে দিতে না পারে আমাকে। বেলিফের সাহায্যে এখান থেকে বের হলে তোমাকে আর লাগবে না। বাবা-মাকে তোমার নাম বলব না।' ইমামা বলছিল।

'ওকে, করে নিচ্ছি... কিন্তু এই বেলিফওয়ালা কাজ একটু ঝামেলার। এর সাথে অনেক আইনি জটিলতা জড়িয়ে থাকে। উকিল হায়ার করা আর....'

ইমামা বাধা দিয়ে বলল। 'তুমি এ বিষয়ে তোমার ফ্রেন্ডদের সাহায্য নিতে পারো। তোমার ফ্রেন্ডরা এসব কাজে বিশেষজ্ঞ।'

সালারের কপালে ভাঁজ পড়ে। 'কোন সব কাজে?'

'এসব কাজে।'

'তুমি কীভাবে জানলে?'

'ওয়াসিম আমাকে বলেছে তোমার সঙ্গী-সাথি ভালো না।'
ইমামা মুখ ফসকে বলে চুপ হয়ে যায়। এই বাক্য যথাযথ না।

'আমার সঙ্গী-সাথি অনেক ভালো, অন্তত জালাল আনসারের
সঙ্গী-সাথিদের চেয়ে।' সালার তীক্ষ্ণ সুরে বলল।

ইমামা চুপ করে রইল।

'যাইহোক, আমি দেখছি এ বিষয়ে কী করা যায়।' সালার
কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে আবার নিজেই বলল। 'কিন্তু
তোমার মনে রাখা উচিত এই কাজ অনেক রিস্কি!'

'আমি জানি। কিন্তু হতে পারে বিয়ে করে নিয়েছি শুনেই
বাবা-মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। বেলিফের
সাহায্য নিতে হবে না। অথবা যদি তারা বিয়েটা মেনে নেয়,
তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে তালাক নিয়ে জালালকে
বিয়ে করে ফেলব।'

সালার আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলায়। পৃথিবীতে এমনতর আহাস্মক এর আগে কখনো দেখেনি। মেয়েটা বোকার স্বর্গের রানি ছিল অথবা খুব শীঘ্রই হতে যাচ্ছে। 'আচ্ছা, দেখা যাক কী হয়।' বলে ফোন রেখে দেয়।

'আমি একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

হাসান মনোযোগ দিয়ে বন্ধুর চেহারার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। 'এটা বছরের নতুন নাকি শেষ অ্যাডভেঞ্চার?'

'শেষ অ্যাডভেঞ্চার।' সালার খুব গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়।

'তার মানে তুমি বিয়ে করছ।' হাসান বার্গার খেতে খেতে বলে।

'বিয়ে করার কথা কে বলছে?' সালার বন্ধুর দিকে তাকায়।

'তাহলে?'

‘একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, যার সাহায্য লাগবে।
আমি সাহায্য করছি।’

হাসান ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ‘আজকে তুমি
ইয়ার্কির মুডে আছো?’

‘মোটাই না, আমি তোমাকে এখানে ইয়ার্কি করতে ডাকব
না নিশ্চয়ই।’

‘তাহলে কীসব বলছ? বিয়ে, মেয়েকে সাহায্য ইত্যাদি
ইত্যাদি।’ হাসান একটু বিরক্ত হয়ে বলল। ‘প্রেমে পড়েছ?’

‘My foot! আমার মাথা খারাপ নাকি কারো প্রেমে পড়ব,
তাও এই বয়সে...?’ সালার তাচ্ছিল্যের সুরে বলল।

‘আমিও তো এটাই বলছি, তাহলে কী করতে চাইছ?’

সালার বন্ধুকে ইমামা আর ইমামার সমস্যা খুলে বলে। শুধু বলল না মেয়েটা ওয়াসিমের বোন। কারণ ওয়াসিমকে চেনে হাসান।

কিন্তু ওর কাছ থেকে সব শোনার পর হাসানের প্রথম প্রশ্নই ছিল। 'মেয়েটা কে?'

সালার একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল। 'ওয়াসিমের বোন।'

'হোয়াট?' হাসান লাফিয়ে ওঠে। 'ওয়াসিমের বোন... যে মেডিকেল কলেজে পড়ে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মাথাখারাপ হয়ে গেছে! কেন খামোখা এমন বোকামি করতে চাইছ? ওয়াসিমকে বলে দাও।'

'আমি তোমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি। পরামর্শের জন্য না।' সালার বিরক্ত হয়।

'আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করব?' হাসান অবোধ্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি একজন কাজি আর কয়েকজন সাক্ষীর ব্যবস্থা করবে, যাতে আমি ফোনে ওকে বিয়ে করতে পারি।' সালার তৎক্ষণাৎ কাজের কথা বলল।

'কিন্তু এই বিয়ে করে তোমার লাভ কী?'

'কিছুই না। আমি কোনো লাভের কথা ভাবছিও না।'

'এসব বাদ দাও সালার! তুমি কেন অযথা অন্যের বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে? তাও ওয়াসিমের বোনের বিষয়ে, অদ্ভুত!'

সালার এবার শক্তভাবে বাধা দিয়ে বলল। 'তুমি শুধু বলো, সাহায্য করতে পারবে কিনা। অন্যসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করা তোমার কাজ না।'

'ঠিক আছে, করব। আমি সাহায্যের ব্যাপারে মানা করছি না। কিন্তু তোমার ভেবে দেখা উচিত এটা খুব বিপজ্জনক!' হাসান হাল ছেড়ে দিয়ে বলল।

'আমার ভেবে দেখা শেষ। তুমি এখন আমাকে বিস্তারিত বলো।' সালার এবার নিশ্চিত হয়ে ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই খেতে খেতে বলল।

'শুধু একটা কথা, যদি আফ্কেল-আন্টি জেনে যায় তাহলে কী হবে?'

'জানবে না, তারা এখানে নেই। করাচিতে, কয়েকদিন ওখানেই থাকবে। তারা থাকলে এসব করা কঠিন ছিল।' সালার বন্ধুকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। ওর বার্গার প্রায়

শেষের দিকে। হাসান নিজের বার্গার খেতে খেতে গম্ভীর চিন্তায় ডুবে আছে। কিন্তু সালারের বন্ধুর অভিব্যক্তির দিকে মনোযোগ নেই। কারণ জানে হাসান এখন সামনের পরিকল্পনা করছে। হাসানকে নিয়ে ওর কোনো ভয় বা চিন্তা নেই। কারণ এই ছেলেটা ওর সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

হাসান বিয়ের বন্দোবস্ত খুব সহজেই করে ফেলো। সালার কিছু টাকা দিয়েছিল, তা দিয়ে তিনজন সাক্ষীর ব্যবস্থা করে এবং চতুর্থ সাক্ষী হিসেবে নিজেই উপস্থিত থাকে। কাজি টের পায় এই বিয়েতে আলাদা কোনো কাহিনি আছে। কিন্তু মোটা অঙ্কের টাকার সাথে তাকে এই পরিমাণ হুমকিও দেওয়া হয়েছিল যে, নীরব হয়ে যায়। বিকেলের দিকে কাজি আর সাক্ষীদের নিয়ে আসে হাসান। সবাই সালারের রুমে ঢোকে। ওখানে বসে নিকাহনামার ফর্ম পূরণ করা হয়। এ বিষয়ে ইমামাকে আগেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে কাজি সাহেব ফোনে দু'জনার বিয়ে সম্পন্ন করেন। কাজের মহিলাকে দিয়ে ইমামার কাছে পেপার'স পাঠিয়ে দেয় সালার। ইমামা পেপার'স হাতে পেয়েই দ্রুত সাইন করে

ফেরত পাঠায়। কাজের মহিলা পেপার'স ফিরিয়ে আনে। তবে এসবের মাঝে সে আপাদমস্তক কৌতূহলে ঘিরে ছিল। সালারের রুমে এসব মানুষ কারা, কাগজপত্রগুলো কীসের, যাতে ইমামা স্বাক্ষর করেছে? সে আন্দাজ করতে পারছিল ওরা বিয়ে করেছে। সালারকে পেপার'স ফেরত দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না।

'এগুলো কীসের কাগজপত্র সালার সাহেব?' বেশ সরল সেজে প্রশ্ন করে নাসেরা।

'তোমার তা দিয়ে কী, যেই কাগজপত্র হোক। তুমি নিজের কাজ নিয়ে থাকো।' সালার কড়াভাবে ধমক দেয়। 'আরেকটা কথা কান খুলে শোনো, এই পুরো বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখা তোমার জন্যই ভালো; বরং বলা চলে অনেক বেশি ভালো।'

'আমার কী দরকার এ বিষয়ে কারো সাথে কিছু বলার। আমি তো এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আপনি নিশ্চিত থাকুন সাহেব! আমি কাউকে কিছু বলব না।'

কাজের মহিলা ঘাবড়ে গেল। সালার যা জেদি তাতে এমনিতেই ওর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায় সে। মাথার ইশারায় তাকে বেরিয়ে যেতে বলে। ওর মাঝে এই ভয় ছিল না যে, মহিলা এসব কাউকে বলে দিতে পারে। কারণ বলে দিলেও ওর কিছু যায়-আসে না।

"আরেকবার জালালের সাথে দেখা করবে, আরেকবার প্লিজ!" ইমামা সেদিন ফোনে বলছিল।

সালার এই কথায় রেগে ওঠে। 'জালাল তোমাকে বিয়ে করতে চায় না ইমামা। কতবার বলেছে। কেন বুঝতে চাইছ না আবার কথা বলেও লাভ হবে না। সে আমাকে বলে দিয়েছে তার জন্য সম্বন্ধ দেখছে, বিয়ে ঠিক করতে চাইছে তার বাবা-মা।'

'মিথ্যে বলেছে।' ইমামা কথার মাঝে বলল। 'যাতে আমি তার সাথে যোগাযোগ না করি। এত তাড়াতাড়ি তার বিয়ে ঠিক করার কথা না।'

‘যখন সে চায় না বিয়ে করতে, যোগাযোগ রাখতে; তাহলে তুমি কেন অপমান হচ্ছ তার পিছনে?’

‘কারণ আমার ভাগ্যেই অপমান লেখা।’ ইমামা অপরপাশে অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল।

‘এর মানে কী?’ সালার বিভ্রান্ত হয়।

‘কোনো মানে নেই। তুমি বুঝবে না। শুধু গিয়ে বলো আমার সাহায্য দরকার। জালাল হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে অনেক ভালোবাসে। তাকে বলবে শুধু নবীর জন্য হলেও আমাকে বিয়ে করুক।’ কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ইমামা।

‘এটা কেমন যুক্তি?’ ইমামার কান্না অগ্রাহ্য করে জিজ্ঞেস করে সালার। ‘এই যুক্তি দিলে সে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?’

ইমামা উত্তর দেয় না, ও হেঁচকি তুলে কাঁদছিল। সালার বিরক্ত হয়।

'হয়তো কান্না করো, নয়তো আমার সাথে কথা বলো।'

অপরপাশ থেকে কল কেটে দেওয়া হয়। সালার সাথে-সাথেই ব্যাক করে। কিন্তু রিসিভ হয় না। পনেরো-বিশ মিনিট পর ইমামাই আবার কল করে।

'এক শর্তে কথা বলব, যদি কথা দাও কান্না না করে ঠিকমতো কথা বলবে। নাহলে ফোন রেখে দাও।' ইমামার গলা শুনেই বলে সালার।

'তাহলে তুমি লাহোর যাচ্ছ?' উত্তর না দিয়ে ইমামা নিজের কথা জিজ্ঞেস করল।

ইমামার জেদি স্বভাব দেখে অবাক সালার। মেয়েটা আসলেই একগুঁয়ে, এখনো নিজের কথায় অটল।

'আচ্ছা, যাব। বাড়ির মানুষকে বিয়ের কথা বলেছ?' সালার প্রসঙ্গ বদলায়।

'না, এখনো বলিনি।' ইমামা নিজেকে সামলে নিয়েছিল ততক্ষণে।

'কবে বলবে?' নাটকের পরের দৃশ্যের জন্য যেন তর সইছিল না সালারের।

'জানি না আমি।' ইমামা কিছুক্ষণ ভাবে। 'তুমি কবে লাহোর যাবে?'

'এই তো, খুব শীঘ্রই। এখানে কিছু কাজ আছে, নাহলে এখুনি চলে যেতাম।' সালার মিথ্যে বলল। না এখানে ওর কোনো কাজ আছে, না এইবার লাহোর যাওয়ার কোনো ইচ্ছা। 'বেলিফের সাহায্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কী করবে? আই মিন কোথায় যাবে?' আবার ইমামাকে প্রসঙ্গ থেকে সরানোর

চেষ্টায় বলল। 'যেহেতু জালালও তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত না।'

'আমি এখনো এমন কিছু ভাবছি না। সে অবশ্যই সাহায্য করবে।' সালারের কথা খামিয়ে ইমামা জোর দিয়ে বলল।

সালার কাঁধ ঝাঁকায়। 'তুমি কিছুই ভাবতে রাজি না। নাহলে আমি ঠিকই বলতাম, তুমি যেমন ভাবছ তেমন কিছুই হবে না। তখন কী করবে? তোমার আবার বাবা-মাকে প্রয়োজন হবে। তাই ভালো হয় যদি তুমি এখনই এখান থেকে যাওয়ার কথা না ভাবো এবং বেলিফ কোর্টের সাহায্য না নেও। কারণ পরেও তোমাকে এখানেই আসতে হবে।'

'আমি এখানে আর ফিরব না, কোনো অবস্থাতেই না।'

'এগুলো আবেগি কথাবার্তা।' ইমামার কথার ওপর রায় দেয় সালার।

'তুমি এসব বুঝবে না।' যথারীতি নিজের স্বভাবগত বাক্য পুনরাবৃত্তি করে ইমামা।

সালার বিম্বুদ্ধ হয়। 'Okay! তুমি যা করতে চাও করো।' বেপরোয়াভাবে বলে ফোন রেখে দেয়।

'কাল সন্ধ্যায় আসজাদের সাথে তোমার বিয়ে। রুখসাতিও একইসাথে।' রাতে হাশিম মুবীন মেয়ের রুমে এসে কড়া সুরে বললেন।

'বাবা! আমি না বলে দেবো। আমার সাথে এমন জোরজবরদস্তি না করাই ভালো আপনার জন্য।'

'না করলে সেই মুহূর্তেই গুলি করে মেরে ফেলব, কথাটা মাথায় রেখো।'

ইমামা মাথা তুলে তাকায়। 'বাবা! আমি বিয়ে করে ফেলেছি।'

হাশিম মুবীনের চেহারার রং উড়ে যায়।

'এজনাই বিয়েতে অমত করছি।'

'তুমি মিথ্যে বলছ।'

'না, ছয় মাস আগে বিয়ে করেছি।'

'কাকে বিয়ে করেছ?'

'সেটা আপনাকে বলতে পারব না।'

হাশিম মুবীনের ধারণার বাইরে এই সন্তানের কারণে তাকে এত অপমানিত হতে হবে। আগুনের ফোয়ারা হয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে একের পর এক গালে থাপ্পড় মারতে থাকলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় ও। রুমের হইচই শুনে সবার আগে ওয়াসিম সেখানে আসে।

তাকে জোর করে বোনের কাছ থেকে সরায়। ইমামা দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে কাঁদতে থাকে।

‘কী করছেন? বিষয়টা ঠান্ডা মাথায়ও সমাধান করা যাবে।’ ওয়াসিমের পেছন পেছন বাড়ির অন্য সবাইও শব্দ পেয়ে চলে আসে।

‘ও...ও বিয়ে করে নিয়েছে কাউকে।’ হাশিম মুবীন রাগান্বিত আওয়াজে বললেন।

‘মিথ্যে বলছে। কীভাবে বিয়ে করবে? একবারও বাড়ি থেকে বের হয়নি।’

ওয়াসিম বলল।

‘ছয় মাস আগে বিয়ে করেছে ও।’

ইমামা মাথা তুলল না।

'আমি মানি না। ও এমন কিছু করতে পারে না।' ওয়াসিম বোনকে শিরায় শিরায় চেনে।

ইমামা ঝাপসা চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল। 'এমনটা হয়ে গেছে।'

'প্রমাণ কী? নিকাহনামা আছে তোমার কাছে?' ওয়াসিম রেগে বলল।

'এখানে নেই। লাহোর আছে, আমার জিনিসপত্রের ভেতর।'

'বাবা। কাল লাহোর থেকে আমি ওর জিনিসপত্র নিয়ে আসব। তারপর দেখা যাক।'

ইমামা পস্তায়। জিনিসপত্র থেকে পাওয়ার মতো কিছু নেই।

'বিয়ে করলেও ব্যাপার না। তালাক নিয়ে তোমার বিয়ে আমি আসজাদের সাথে দেবো। যদি সেই ছেলে তালাক দিতে না

চায়, তাহলে সোজা মেরে ফেলবা" রাগে লাল হয়ে ওঠা চেহারায় রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন তিনি।

রুম আন্তে আন্তে খালি হয়ে যায়। ইমামা বিছানায় বসে। এই প্রথম বুঝতে পারছিল জালে আটকানোর অনুভূতি কেমন। এটা কাকতালীয় যে, নিকাহনামার দলিল সালার ওকে পাঠায়নি। তাছাড়া কাছে থাকলেও দেখাতে পারত না কাউকে। কারণ সালার সিকান্দারের নাম নিকাহনামায় দেখার পর হাশিম মুবীনের জন্য সালারের কাছে পৌঁছানো এবং ওকে ছাড়িয়ে আনা মিনিটের কাজ। জিনিসপত্র থেকে নিকাহনামা পাওয়া যাবে না, তাই বিয়ে করে নিয়েছে এই কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না। রুমের দরজা লক করে মোবাইলে সালারের নাম্বার ডায়াল করতে লাগল। পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানোর জন্য।

"তুমি আরেকবার লাহোর গিয়ে জালালকে আমার ব্যাপারে বলো। আমি এখন আর বাড়িতে থাকতে পারব না, বের হতে হবে। জালালের বাইরে অন্য কোনো পথ নেই আমার। তুমি

একজন উকিল হায়ার করো, তাকে বলো আমার স্বামীর পক্ষ থেকে আমাকে ঘরে আটকে রাখায় আমার বাবা-মায়ের কাছে আইনি নোটিশ পাঠাতে।

'তোমার স্বামী! মানে আমার তরফ থেকে?'

‘উকিলকে নিজের নাম বলবে না। ভালো হয় যদি কোনো ফ্রেন্ডের মাধ্যমে উকিল হায়ার করো। স্বামীর নামের জায়গায় বানানো নাম দেবে। উকিলের মাধ্যমে নাম জেনে তোমার পর্যন্ত তারা পৌঁছে যাক আমি তা চাই না।’

সালারকে বলল না ওর ভয় কোথায়। সালারও অনুমান করার চেষ্টা করেনি। কথা শেষ করে ইমামা ফোন রেখে দেয়।

পরদিন সকাল। একজন উকিল ফোন করে হাশিম মুবীনের সাথে ইমামার বিষয়ে কথা বলে। ওকে জোর করে বাড়িতে আটকে রাখার কারণে ওর স্বামীর পক্ষ থেকে করা কেসের কথা জানায়। হাশিম মুবীনের জন্য আর কোনো প্রমাণের

দরকার ছিল না। রাগে গজগজ করতে করতে মেয়ের রুমে এসে ইচ্ছেমতো মারেন ওকে।

'দেখবে ইমামা। কীভাবে ধ্বংস হও তুমি। একেকটা জিনিসের জন্য কীভাবে আতঁনাদ করো। তোমার মতো যে মেয়েরা নিজের বাবা-মায়ের সম্মান নিলামে তোলে, ওদের সাথে এমনটাই হয়। তুমি আমাদেরকে কোট পর্যন্ত নিয়ে গেছ। তোমার ওপর করা আমাদের সব মায়া-মমতা ভুলে গেছ। তোমার মতো মেয়ে জন্ম হতেই দাফন করে দেওয়া উচিত।'

তাকে নিজের অবস্থা বা অনুভূতি বোঝাতে পারছে না ইমামা। চুপচাপ মার খেতে থাকে। বাবার অবস্থা বুঝতে পারছিল।

'মুখ দেখানোর অবস্থায় রাখোনি আমাদেরকে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলেছ।' সালমা মুবীন স্বামীর পেছনেই রুমে এসেছিলেন। কিন্তু তাকে থামানোর চেষ্টা করেনি। বরং নিজেও রেগে ছিলেন। কারণ জানতেন মেয়ের এই

পদক্ষেপে পুরো পরিবারের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে।
বিশেষ করে তার স্বামীর ওপর।

‘তুমি আমাদের বিশ্বাসের খুন করেছ। আফসোস। যদি তুমি আমার সন্তানই না হতে। কখনো আমাদের পরিবারে জন্ম না নিতে, জন্ম হলেও তখনই মরে যেতে। নাহলে আমি নিজেই যদি তোমাকে মেরে ফেলতাম তখন।’

ইমামা আজ তাদের কোনো কথাবার্তা বা মারধরে কাঁদেনি। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টাও করেনি। কেবল চুপচাপ মার খাচ্ছিল।

একসময় হাশিম মুবীন ক্লান্ত হয়ে পড়েন। মারতে মারতে থেমে যান। তার শ্বাস ঘন হয়ে উঠেছিল।

ইমামা একদম চুপচাপ সামনে দেয়ালের সাথে লেগে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তোমার কাছে এখনো সময় আছে, সবকিছু ছেড়ে দাও। ওই ছেলের কাছ থেকে তালাক নিয়ে আসজাদকে বিয়ে করো। আমরা সব ভুলে যাব, মাফ করে দেবো।' এবার সালমা তেজি সুরে বললেন।

'না আমি! ফিরে আসার জন্য ইসলাম কবুল করিনি। ফিরতেও চাই না আমি।' মৃদু আওয়াজে দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'আপানারা আমাকে এই বাড়ি থেকে চলে যেতে দিন, আমাকে মুক্ত করে দিন।'

'বাড়ি থেকে বেরিয়ে পৃথিবীতে শুধু হোঁচট খেতে হবে। কোনো আন্দাজ আছে, বাইরের জগতের কুমির কীভাবে তোমার মতো মেয়ে গ্রাস করতে বসে আছে। যেই ছেলেকে বিয়ে করে তুমি আমাদেরকে অপমানিত করছ, সেই ছেলে তোমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। আমাদের বংশ দেখে ও তোমার সঙ্গে এভাবে লুকিয়ে সম্পর্ক করেছে। যখন আমরা তোমাকে পরিবার থেকে বের করে দেবো, তুমি একেকটা পয়সার জন্য নির্ভর হয়ে পড়বে; তখন সে-ই তোমাকে

ছেড়ে যাবে। কোথাও আশ্রয় হবে না তোমার, কোনো ঠিকানা থাকবে না।" সালমা মুবীন মেয়েকে ভয় দেখায়। 'এখনো সময় আছে ইমামা। তোমার কাছে এখনো সময় আছে।'

'না আম্মি! আমার কাছে সময় নেই। আমি ভেবে নিয়েছি এবং আপনাদেরকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি। আমি এই জীবন মানতে পারছি না, আপনারা আমাকে যেতে দিন। পরিবার থেকে আলাদা করতে চাইলে, করে ফেলুন। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, সেটাও করুন। বেছে নেওয়া শেষ আমার। আপনারা বা অন্য কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।'

'যদি তা-ই হয়, তবে এই বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখাও! আমি তোমায় জানে মেরে ফেলব। কিন্তু এই বাড়ি থেকে বের হতে দেবো না। ওই উকিলকেও ভালোভাবে দেখছি। যদি মনে করে থাকো কোনো আইন বা আদালত তোমাকে এই বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে পারবে, তাহলে সেটা তোমার

ভুল। আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না। বেলিফ আসার আগেই অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলব। তারপর দেখব কীভাবে তুমি নিজের সিদ্ধান্ত না বদলে থাকো। আর যদি সেই ছেলেকে না খুঁজে পাই যাকে বিয়ে করেছ, তাহলে তোমার বিয়ে হয়েছে এর পরোয়া না করে আসজাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবো। তোমার করা বিয়ে আমি মানতে অস্বীকার করছি। তোমার বিয়ে সেটা যা আমার ইচ্ছেতে হবে, এর বাইরে না।" বিক্ষুব্ধ অবস্থায় তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

ইমামা দেয়ালের সাথে লেগে ভীত চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। যে উদ্দেশ্যে বিয়ে করেছে তার কোনো উপকার চোখে পড়ছে না। হাশিম মুবীন আহমেদ নিজের কথায় প্রাচীরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

'বেচারি ইমামা বিবি!' নাসেরা সালারের রুম পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ জোরে আফসোস শুরু করে।

সালার ঘুরে তার দিকে তাকায়। টেবিলের অগোছালো বইগুলো গুছিয়ে রাখছিল।

নাসেরা ওকে মনোযোগী দেখে দ্রুত বলল। 'অনেক মার পড়েছে কাল রাতে।'

'কার ওপর মার পড়েছে?' সালার বই একপাশে রেখে জিজ্ঞেস করল। 'ইমামা বিবির ওপর, আর কার...?'

সালার বই গোছানো থামিয়ে তাকায়, নাসেরা রুমের সেলফ ঝাড়ামোছা করছে।

‘হাশিম মুবীন কালকে অনেক মেরেছে।’

সালার আগ্রহী হয়ে উঠল। 'সত্যি...?'

‘হ্যাঁ, আমার মেয়ে আমাকে বলল।’

'Very nice!' সালার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

‘জি। কী বললেন?’ নাসেরা জিজ্ঞেস করল। সালারের ঠোঁটের হাসি তার কাছে অদ্ভুত লাগে। আশা করেনি এই খবর শুনে সালার হাসবে। তার ব্যক্তিগত আদর্শ অনুসারে, ওদের মাঝে যে সম্পর্ক তাতে এই খবর শুনে সালারের অস্থির হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। বেচারি ইমামা বিবি যদি জানতে পারে সালার সাহেব এই খবর শুনে হাসছে, তাহলে হয়তো দুঃখেই মরে যাবে। নাসেরা মনে মনে ভাবে।

‘কীসের জন্য মেরেছে?’

‘আসজাদ সাহেবকে বিয়ে করতে রাজি না, অন্য কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে চায়।’ নাসেরা অন্য ছেলের ওপর জোর দিয়ে আড়চোখে ওর দিকে তাকায়।

‘শুধু এই কথার ওপর?’ সালার গা-ছাড়াভাবে জিজ্ঞেস করল।

'এটা কোনো সামান্য ব্যাপার নাকি? ওনাদের বাড়িতে ঝড় চলছে। বিয়ের তারিখ ঠিক করা, কার্ড এসে গেছে। এখন ইমামা বিবির জেদ আসজাদ সাহেবকে বিয়ে করবে না। ব্যস, এই নিয়ে হাশিম সাহেব মারধর করছে।'

'এটা তেমন বড় ব্যাপার না, যার জন্য মেয়েকে মারতে হবে।' সালার বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'আপনার জন্য না, কিন্তু তাদের জন্য তো। আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। ইমামা বিবি অনেক ভালো, আদব-কায়দাওয়ালি। অথচ কী কেয়ামত এসে পড়ল তার ওপর! হাশিম সাহেব ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমার মেয়ে রোজ তার ঘর গোছায়। মেয়ে বলল চেহারাই নাকি পাল্টে গেছে।' নাসেরা ক্রমাগত বলে যাচ্ছে।

হয়তো চাইছিল সালার তাকে শুভাকাজক্ষী ভেবে গোপন কিছু বলুক। কিন্তু সালার আহাম্মক না। মহিলার এই লোকদেখানো সহানুভূতির প্রতি ওর কোনো আশ্রয় নেই।

যদি ইমামা মার খায় বা কোনো সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায়, তাতেই-বা ওর কী? কিন্তু এই অবস্থার কথা শুনে ওর হাসি ঠিকই পাচ্ছে। এই যুগে এসেও কেউ এই বয়সী সন্তানের ওপর হাত তুলতে পারে? তাও হাশিম মুবীনের মতো উঁচু শ্রেণির একজন মানুষ, আশ্চর্যের কথা! একই চিন্তার ধারায় আলাদা আলাদা অনেক খেয়াল বয়ে যাচ্ছে।

নাসেরা কিছুক্ষণ এভাবে বলতে বলতে কাজ করতে থাকে। কিন্তু যখন দেখল সালার তার কথায় কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না, নিজের কাজে ব্যস্ত। সে কিছুটা হতাশ হয়ে চুপ করে যায়। তার দেখা এরা প্রথম প্রেমিক যুগল, যাদের আচরণ ভীষণ অদ্ভুত! কোনো অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তা এদের দু'জনের মাঝে নেই। এমনকি একে-অপরের কষ্টের কথা শুনেও না। হয়তো ইমামা বিবিও সালার সাহেবের ব্যাপারে এমন কিছু শুনে এভাবে হাসবে, কে জানে? নাসেরা সেলফ থেকে একটা ফটোফ্রেম তুলে পরিস্কার করতে লাগল।

বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত ইমামার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টদায়ক সিদ্ধান্তের একটি। কিন্তু এর বাইরে কোনো পথ নেই। হাশিম মুবীন ওকে কোথায় নিয়ে যাবে, কীভাবে তালুক নিয়ে আসজাদের সাথে বিয়ে দেবে; কিছুই জানে না ও। একমাত্র এই সত্য জানে এখান থেকে একবার অন্য কোথাও নিয়ে গেলে ওর জন্য মুক্ত হওয়া বা পালানোর পথও থাকবে না। ভালোভাবে জানে তারা ওকে প্রাণে মারবে না। কিন্তু বেঁচে থেকে তেমন জীবন কাটানো বেশি কঠিন, যা তারা ওকে কাটাতে বলবে। হাশিম মুবীন চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে কাঁদল। এরপর প্রথমবার নিজের অবস্থার দিকে মনোযোগ দেয়। সকাল হওয়ার আগেই বাড়ি থেকে বের হতে হবে এবং কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়...? মাথার আবার জালাল আনসারের খেয়াল আসে। এই মুহূর্তে শুধু সেই মানুষটা সত্যিকার অর্থে তাকে সুরক্ষা দিতে পারত। 'হতে পারে আমাকে সামনে দেখে তার সিদ্ধান্ত, আচরণ বদলে যাবে। ভেবে দেখবো। হতে পারে আমাকে সাহায্য ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। হয়তো তার বাবা-মায়ের আমার ওপর করুণা হবে।'

সুপ্ত এক আশা ওর মনে উকি দেয়। 'তারা সাহায্য না করুক, বের হলে অন্তত এখান থেকে মুক্তি পাবো। নিজের জীবন নিজের মতো কাটাতে পারব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমি এখান থেকে কীভাবে বের হব এবং যাব কোথায়?' অনেকক্ষণ ভাবতে থাকে। হুট করে সালারের চিন্তা মাথায় আসে। 'কোনোভাবে সেই বাড়িতে যেতে পারলে ও আমাকে সাহায্য করতে পারবো।' মোবাইলে সালারের নাম্বার ডায়াল করে। মোবাইল অফ। কয়েকবার ফোন করলেও যোগাযোগ সম্ভব হয় না। মোবাইল রেখে দেয়।

একটা ব্যাগে নিজের কিছু জামাকাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নেয়। দামি জিনিসপত্র রুমে ছিল, সহজে নিতে পারবে এবং পরে বিক্রি করে টাকা জোগাড় করতে পারবে, ওর কাছে কিছু টাকা আর গয়না ছিল, সেগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। সেসব ভরে ব্যাগ বন্ধ করে দেয়। কাপড় পালেট দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে। হৃৎস্পন্দন বেগতিক ওর। অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা পুরো সত্তাকে গ্রাস করে রেখেছে। চোখের পানি ফেললেও মনের ভার কমেনি। নামাজ শেষ

করে যতগুলো আয়াত-সুরা ওর মুখস্থ ছিল, সব পড়ল। ব্যাগ নিয়ে রুমের লাইট অফ করে নীরবে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাউঞ্জের একটা লাইট ছাড়া বাড়ির সব লাইট অফ। তাই খুব একটা আলো নেই কোথাও। খুব সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। এরপর কিচেনের দিকে যেতে থাকে। কিচেন অন্ধকারে ডুবে আছে। সাবধানে জিনিসপত্র ধরে ধরে কিচেনের সেই দরজার দিকে আগায়, যা বাইরের লনে খোলে। লনের পেছনের এই দিকটায় শাকসবজি লাগানো। বাড়ির একমাত্র এই দরজাই তালা লাগানো হয় না, শুধু ছিটকিনি লাগিয়ে রাখা হয়। দরজায় সেই রাতেও তালা দেওয়া ছিল না। আন্তে করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে ও। একটু দূরেই সার্ভেন্ট কোয়ার্টার। খুব সাবধানে লন পেরিয়ে নিজেদের আর সালারদের বাড়ির মাঝামাঝি দেয়ালের কাছে পৌঁছায়। দেয়াল খুব বেশি উঁচু না। ধীরে ব্যাগ অপরপাশে ছুঁড়ে মারে। কিছুক্ষণ নিজেও লাফালাফি করে দেয়াল টপকাতে সফল হয়।

গভীর ঘুম অবস্থায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনতে পায় সালার।
আন্তে আন্তে শব্দটা ঠকঠক আওয়াজে রূপ নিচ্ছে। থেমে
থেমে, কিন্তু ক্রমাগত ভেসে আসা শব্দ। উপুড় হয়ে
ঘুমাচ্ছিল ও। ঠকঠকের সেই আওয়াজ ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।
উঠে বসে। অন্ধকারে নিজের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা
করে। আতঙ্কের এক শিহরণ বয়ে যায় ভেতর দিয়ে।
আওয়াজটা জানালার দিক থেকে আসছে। যেন কেউ
ওখানে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করছে খুব আন্তে আন্তে। অথবা
জানালাগুলো খোলার চেষ্টা করছে। ওর মাথায় প্রথম চিন্তা
আসে চোর হতে পারে। জানালাগুলো স্লাইডিং উইন্ডো,
দুর্ভাগ্যবশত কোনো গ্রিল নেই। গ্রিলের প্রয়োজন কখনো
অনুভব হয়নি। কারণ ওগুলো ইম্পোর্টেট কাঁচের তৈরি, যা
সহজে ভাঙা বা কাটা যায় না, শুধু ভেতর থেকে খোলা যায়।
তাছাড়া বাড়ির লনে রাতে কুকুর খোলা ছেড়ে রাখা হয়,
সাথে তিনজন গার্ডও থাকে। কিন্তু এসব নিরাপত্তা ব্যবস্থা
সত্ত্বেও এই মুহূর্তে জানালার ওপাশে থাকা ছোট বারান্দায়
কেউ ছিলো। পা টিপেটিপে অন্ধকারে জানালার কাছে যায়
ও, যেখান থেকে শব্দ আসছে। ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে

খুব সাবধানে পর্দার এক কোণা তুলে বাইরে তাকায়। লনে জ্বলতে থাকা আলোয় যাকে ওপাশে দেখে তাতে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যায়। 'ও পুরোই পাগল।' মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। এ সময় যদি লনে ঘোরাফেরা করা বিদেশি জাতের চারটা কুকুরের একটাও একে দেখতে পেত, তাহলে ও কিংবা অন্য কেউ পৌঁছানোর আগেই কামড়ে ছিড়ে ফেলত। আর যদি গার্ডদের মধ্যে কেউ দেখতে পেত, তাহলে তারাও খোঁজ বা জিজ্ঞাসাবাদে সময় নষ্ট না করে গুলি করত। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটা সম্পূর্ণ নিরাপদে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিশ্চয়ই বাড়ির দেয়াল টপকে এসেছে। ঠোঁট কামড়ে রুমের লাইট অন করে। লাইট অন হতেই ঠকঠক আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। কুকুরের ঘেউঘেউ আওয়াজ ভেসে আসে। পর্দা সরিয়ে স্লাইডিং উইন্ডো খুলে দেয়।

'ভেতরে এসো তাড়াতাড়ি।' চটজলদি বলল ও।

ইমামা কিছুটা নার্ভাস হয়ে ভেতরে ঢোকে। হাতে ব্যাগ। পর্দা ঠিক করে সালার ঘুরে বলল। 'For god's sake ইমামা। তুমি কি পাগল?'

ইমামা উত্তরে কিছু বলল না। ব্যাগ নামিয়ে পায়ের কাছে রাখে।

'দেয়াল টপকে এসেছ, হ্যাঁ? কুকুর কিংবা গার্ডদের মধ্যে কেউ দেখলে এখন বাইরে তোমার লাশ থাকত।'

'অনেকবার কল করেছি, তোমার মোবাইল অফ। অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।'

এই প্রথম ইমামার চেহারার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায় সালার। চোখগুলো ফোলা, মুখ পাংশুটে। লম্বা একটা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখা। জামাকাপড় আর চাদরের জায়গায় জায়গায় মাটির দাগ লেগে আছে।

'তুমি আমাকে লাহোর দিয়ে আসতে পারবে?' ইমামা জিজ্ঞেস করল।

'এই সময়?' সালার অবাক হয়।

'হ্যাঁ, এখনই। আমার কাছে সময় নেই।'

সালার দেয়াল ঘড়ির দিকে একনজর তাকায়। 'উকিল ফোন করেছিল, তোমার সমস্যার সমাধান হয়নি?'

ইমামা না-বোধক মাথা নাড়ে। 'না, তারা আমাকে সকালে কোথাও পাঠিয়ে দেবে। এজন্য সারা দিন তোমাকে ফোন করেছি। কিন্তু মোবাইল অন করোনি। আমি চাইছিলাম তুমি উকিলকে বলবে, সে বেলিফের সাথে এসে যেন আমাকে ছাড়িয়ে আনে। কিন্তু তোমার সাথে কন্টাক্ট হয়নি, কাল হলেও কিছু করার থাকত না। কারণ এর আগেই তারা আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দিত, কোথায় তা জানি না আমি।'

সালার হাই তোলে, ওর ঘুম আসছে। 'তুমি বসো।'

ইমামা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। 'লাহোর নিয়ে যেতে না পারলেও অন্তত বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত দিয়ে আসো। ওখান থেকে

নিজেই যেতে পারব আমি।" সালারকে হাই তুলতে দেখে বলল ও।

‘আমার অনুমান এই সময় কোনো গাড়ি লাহোর যাবে না। আমি তোমাকে সকালে...’

ইমামা ওকে থামিয়ে বলল। 'না, সকালে না। আমি সকালের আগেই এখান থেকে চলে যেতে চাই। যদি লাহোরের গাড়ি না পাই, তাহলে অন্য কোনো শহরের গাড়িতে উঠে পড়ব। পরে ওখান থেকে লাহোর যাব।'

'তুমি বসো তো আগে।' সালার ওকে আবার বলে।

ইমামা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সোফায় বসে।

সালার বিছানার সাইডে বসল। 'লাহোর কোথায় যাবে?'

'জালালের কাছে।'

'কিন্তু সে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি না।'

'তবুও তার কাছে যাব, ভালোবাসে আমাকে। এভাবে
অসহায়, একা ছাড়বে না। তার কাছে, তার পরিবারের কাছে
অনুরোধ করব। আমি জানি তারা আমার কথা রাখবে, আমার
অবস্থা বুঝবে।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে বিয়ে করে ফেলেছ।'

ইমামা চমকে তাকায়। 'পেপার ম্যারেজ ওটা। তোমাকে
বলেছি বাধ্য হয়ে করছি এসব, বিয়ে না এটা।'

সালার গভীর চোখে তাকিয়ে রইল। 'তুমি জানো আমি
আজকে লাহোর গিয়েছি জালালের কাছে।'

ইমামার চেহারায় একটা রং এসে চলে যায়। 'তাকে আমার
সমস্যা আর পরিস্থিতির কথা বলেছ?'

'না।' সালার না-বোধক মাথা নাড়ে।

'কেন?'

'জালাল বিয়ে করে ফেলেছে।' সালার নির্বিকার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকিয়ে বলল।

ইমামা শ্বাস নিতে ভুলে যায়। পলকহীন মূর্তির মতো সালারের দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

'তিনদিন হয়ে গেছে বিয়ের। কাল-পরশুর মধ্যে ঘোরার জন্য মন্ত্রি এরিয়ার দিকে যাবে। আমার কোনো কথা শোনার আগেই সে এসব বলতে শুরু করে। হয়তো চায়নি তোমার ব্যাপারে আমি কিছু বলি। তার স্ত্রীও ডাক্তার।' সালার বলতে বলতে থামে। 'আমার মনে হয় তোমাকে নিয়ে সমস্যার কারণেই তার পরিবার এমন হঠাৎ করে বিয়ে সেরে ফেলেছে।' অনায়াসে একের পর এক মিথ্যে বলে যায় ও।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' ইমামার আওয়াজ যেন কোনো গভীর কুয়া থেকে এলো।

'হ্যাঁ, আমারও বিশ্বাস হচ্ছিল না। জানতাম তুমিও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটা সত্য। ফোন করে তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারো।'

ইমামা অনুভব করল সত্যিকার অর্থেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। আলোর যে রশ্মিতে এতদূর এসেছিল, তা হঠাৎ হারিয়ে গেছে। পথ তো দূরের কথা নিজের অস্তিত্বকেই দেখতে পাচ্ছিল না ও।

'এখন ভেবে দেখো লাহোর গিয়ে কী করবে?' জালাল না তোমাকে বিয়ে করতে পারবে, না তার পরিবার তোমাকে আশ্রয় দেবে। ভালো হয় যদি তুমি ফিরে যাও। এখনো তোমার বাড়ির মানুষ টের পায়নি।'

ইমামার কানে দূরে কোথাও থেকে সালারের আওয়াজ ভেসে আসে, অবোধ্য ভঙ্গিতে তাকায়। 'আমাকে লাহোর দিয়ে আসো।' বিড়বিড় করে ও।

'জালালের কাছে যাবে?'

'না, তার কাছে যাব না। কিন্তু নিজের বাড়িতেও থাকতে পারব না।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

সালার একটা শ্বাস ফেলে বিভ্রান্ত চোখে ইমামার দিকে তাকাল।

'নাহলে গোট পর্যন্ত ছেড়ে আসো, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। দারোয়ানকে বলো বের হতে দিতে।' ইমামা ব্যাগ তুলে নেয়।

'তোমার কোনো আন্দাজ আছে এখান থেকে বাসস্ট্যান্ড কত দূরে। কুয়াশা আর ঠান্ডার মধ্যে তুমি ওই পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবে?'

'যখন কিছুই অবশিষ্ট নেই আমার, তখন কুয়াশা আর ঠান্ডা কী ছিনিয়ে নেবে?'

সালার ওকে ভেজা চোখে হাসতে দেখল। ইমামা হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে নেয়।

ইমামার সাথে কোথাও যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না ওর, লাহোর তো অনেক দূরের কথা। ঘুম পাচ্ছে। তাছাড়া সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটাকে পছন্দ না ওর। 'দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সাথে।' তবুও জানে না মুখ থেকে এই বাক্য কেন বা কীভাবে বের হলো।

সালারকে ড্রেসিং রুমের দিকে যেতে দেখে ইমামা। কিছুক্ষণ পর রাতের পোশাক পাল্টে জিন্স আর সোয়েটার পরে বের হয়। বেডসাইড টেবিল থেকে চাবির রিং, ঘড়ি আর ওয়ালেট তুলে নেয়। ইমামার কাছে এসে ব্যাগ নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়।

'না, আমি নিজেই নিচ্ছি।' ইমামা বলল।

'নিচ্ছি আমি।' ব্যাগ তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নেয় সালার।

দু'জন আগে-পিছে হেঁটে পোর্চে আসে। ব্যাগ পেছনের সিটে রেখে ইমামার জন্য ফ্রন্ট সিটের দরজা খুলে দেয় সালার। গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখে দারোয়ান গেট খোলে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দারোয়ানের চোখের সেই বিস্ময় ধরে ফেলে ও, যা রাতের ওই মুহূর্তে ফ্রন্ট সিটে বসা ইমামাকে দেখে ভেসে উঠেছিল। নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছে এই মেয়ে কীভাবে এই সময় এ বাড়িতে?

"তুমি আমাকে বাসষ্ট্যান্ডে নামিয়ে দেবে?" মেইন রোডে আসতেই ইমামা জিজ্ঞেস করল।

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে একনজর তাকায়। 'না, আমি তোমাকে লাহোর নিয়ে যাচ্ছি।' চোখ রাস্তার দিকে স্থির করে বলল।

ঢ়চারঢ়

গাড়ি প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে ছুটছিল। যা প্রায় নির্জন। ট্রাফিক না থাকার সমান। স্টিয়ারিং হুইলে ডান হাত রেখে বাঁ-হাত মুখের উপর দিয়ে হাই আটকায় সালার। ঘুমের ভাব দূর করার চেষ্টায়। পাশের সিটে বসে থাকা ইমামা নিঃশব্দে কাঁদছে। যা টের পাচ্ছিল ও। মেয়েটা একটু পরপর হাতে থাকা রুমাল দিয়ে চোখ মুছবে, একটু ঘষবে, এরপর উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আবার কাঁদতে থাকবে। সময়ে-অসময়ে আড়চোখে তাকিয়ে এসব কাজ দেখে সালার। কিন্তু ইমামাকে সান্তনা দেওয়ার বা চুপ করানোর চেষ্টা করেনি। ভেবেছিল কিছুক্ষণ চোখের পানি ফেলে নিজেই থেমে যাবো। কিন্তু আধা ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ইমামাকে একই গতিতে কাঁদতে দেখে কিছুটা নড়েচড়ে ওঠে।

‘বাড়ি থেকে এসে যদি পস্তাতে হয়, তাহলে পালানোই উচিত হয়নি তোমার।’ সালার নীরবতা ভেঙে বলল।

সালারের কথার কোনো উত্তর দেয় না ইমামা।

'এখনো কোনো গন্ডগোল হয়নি। বাড়ির কেউ হয়তো তুমি নেই টেরও পানি।' কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে পরামর্শ দেয়।

'আমি পস্তাচ্ছি না।' এবার ভরাট গলায় দৃঢ়ভাবে বলে ইমামা।

'তাহলে কাঁদছ কেন এত?' সালার সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল।

'তোমাকে বলার কোনো ফায়দা নেই।' ইমামা আবার চোখ মোছে।

সালার ঘাড় বাঁকিয়ে ইমামার দিকে তাকায়। 'লাহোর কার কাছে যাবে?'

'জানি না।'

উত্তরে সালার চমকায়। 'মানে কী? কোথায় যাচ্ছ তুমি
নিজেই জানো না?'

'এই মুহূর্তে তো অজানাই।'

'তাহলে লাহোর কেন যাচ্ছ?'

'নাহলে আর কোথায় যাব?'

'ইসলামাবাদ থাকতে পারতে।'

'কার কাছে?'

'লাহোরেও তো এমন কেউ নেই, যার কাছে থাকতে পারবে:
তাও স্থায়ীভাবে। এমনকি জালালও নেই।' শেষের তিন
শব্দের ওপর জোর দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ইমামার দিকে তাকায়
সালার। 'তার কাছে যাচ্ছ তুমি?' কিছুক্ষণ পর তীক্ষ্ণ সুরে
জিজ্ঞেস করল।

'না। জালাল আমার জীবন থেকে বেরিয়ে গেছে।'

সালার ধরতে পারল না ইমামার কণ্ঠে হতাশা নাকি বিষণ্ণতা।

'তার কাছে কীভাবে যাব আমি?'

'তাহলে কোথায় যাবে?' সালার আবারও কৌতুহলবশত জিজ্ঞেস করে।

'এটা লাহোর গিয়ে ঠিক করতে হবে কোথায় যাব বা কার কাছে যাব।' ইমামা বলল।

সালার অবিশ্বাস্য চোখে ইমামাকে দেখে। সত্যি কি মেয়েটা জানে না কোথায় যাচ্ছে নাকি ওকে বলতে চাইছে না? গাড়িতে আবার নীরবতা নেমে আসে।

'তোমার ফিয়সে, কী যেন নাম তার...? ওহ হ্যাঁ, আসজাদ। বেশ হ্যান্ডসাম একজন পুরুষ।' আরও একবার সালারই সেই

নীরবতা ভাঙে। 'আর যে অন্য লোকটা ছিল জালাল, তার সামনে তো এ কিছুই না। তুমি অন্যায় করে ফেললে না আসজাদের সাথে?'

ইমামা কিছু না বলে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সালার কিছুক্ষণ ঘাড় এপাশ-ওপাশ করে উত্তরের অপেক্ষা করে। কিন্তু বুঝতে পারে ইমামা উত্তর দিতে চায় না। 'আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না, এমনকি যা কিছু করছ সেসবও। তোমার কার্যকলাপ বড্ড অদ্ভুত, আর তুমি নিজের কার্যকলাপের চেয়েও বেশি!'

এবার ইমামা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। 'তোমার কার্যকলাপের চেয়েও বেশি অদ্ভুত আমার কার্যকলাপ? আর আমি কি তোমার চেয়েও বেশি অদ্ভুত।'

খুব ধীরে কিন্তু শক্ত সুরে জিজ্ঞেস করা এই প্রশ্ন কয়েক মূহর্তের জন্য সালারকে উত্তরহীন করে দেয়। 'আমার কোন

কার্যকলাপ অদ্ভুত? আর আমি কোন দিক থেকে অদ্ভুত?"
কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি জানো তোমার কোন কার্যকলাপ অদ্ভুত।' ইমামা আবার
উত্তর দিয়ে বাইরে তাকায়।

'নিশ্চয় আমার আত্মহত্যার কথা বলছ।' নিজেই নিজের
প্রশ্নের উত্তর দেয় সালার। 'যদিও আমি আত্মহত্যা করতে
চাই না, চেষ্টাও করি না। শুধু একটা অভিজ্ঞতা নিতে চাই।'

'কেমন অভিজ্ঞতা?'

'আমি সবসময় মানুষকে একটা প্রশ্ন করি, কিন্তু কেউ
আমাকে এর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। তাই
নিজেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি।' সালার বলল।

'কী জিজ্ঞেস করো তুমি মানুষকে?'

‘খুব সহজ প্রশ্ন কিন্তু সবার কঠিন লাগে। What is next to ecstasy?’ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল সালার।

ইমামা কিছুক্ষণ সালারকে দেখল। এরপর মৃদু আওয়াজে বলল। 'Pain.'

‘What is next to Pain?’ সালার দেরি না করে আরেকটা প্রশ্ন করল।

'Nothingness.'

‘What is next to Nothingness?’ সালার একই ভঙ্গিতে অপর প্রশ্ন করে।

'Hell.' ইমামা বলল।

'And what is next to Hell?'



এবার নীরবে একদৃষ্টিতে সালারের দিকে তাকিয়ে থাকে ইমামা।

"What is next to Hell?" সালার নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে।

'তুমি ভয় পাও না?'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে ইমামাকে জিজ্ঞেস করতে শোনে সালার।
'কী?' জিজ্ঞেস করল।

'দোজখকে... যে স্থানের আগে বলতে কিছু নেই, সবকিছু এর পেছনেই শেষ হয়ে যায়। লাঞ্চিত ও গর্হিত হওয়ার পর মানুষের জন্য কী বাকি থাকে, যা জানার প্রতি তোমার এত আগ্রহ?' ইমামা খানিক আফসোসের সুরে বলল। 'তোমার কথা বুঝলাম না আমি। সব আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে।' সালার গা-ছাড়া ভঙ্গিতে বলল।

‘চিন্তা করো না, বুঝে যাবে। একটা সময় আসবে, যখন সবকিছু বুঝতে পারবে। তোমার এই হাসি বিলীন হয়ে যাবে। তখন ভয় পাবে মৃত্যুকেও, দোজখকেও। আল্লাহ সবকিছু দেখাবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন তোমাকে। তখন আর কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। What is next to ecstasy?’ ইমামা বেশ ধীরভাবে বলল।

‘এটা কি তোমার ভবিষ্যদ্বাণী?’ খোঁচা মেরে বলল সালার।

‘না।’ ইমামাও একই সুরে বলল।

‘অভিজ্ঞতা? হ্যাঁ, এটা তোমার অভিজ্ঞতার ফলাফল। তুমিও আত্মহত্যা করছ, মানে করতে যাচ্ছ। আমি এই চেষ্টা নিজস্ব পন্থায় করেছি, তুমি কর তোমার পন্থায়।’ শীতল কণ্ঠে বলল সালার।

ইমামার চোখে আবার পানি চলে আসে। ঘুরে সালারের দিকে তাকিয়ে বলে। ‘আমি কোনো আত্মহত্যা করছি না।’

'কোনো ছেলের জন্য বাড়ি থেকে পালানো একটা মেয়ের জন্য আত্মহত্যার সমান। তাও এমন অবস্থায়, যখন সেই ছেলে বিয়ের জন্য প্রস্তুতই না। দেখো! আমি নিজেও একটা ছেলে, অনেক ব্রড মাইন্ডেড ও লিবারেল। আমি মোটেও খারাপ মনে করি না বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজের পছন্দে ছেলের সাথে কোর্ট ম্যারেজ বা বিয়ে করাকে। কিন্তু সেই ছেলের সঙ্গে দরকার। এমন এক ছেলের জন্য বাড়ি ছাড়া, যে বিয়ে করে নিয়েছে। আমার মাথায় ঢোকে না। তাও তোমার বয়সে... পুরোই বোকামি।'

'আমি কোনো ছেলের জন্য পালাচ্ছি না।'

'জালাল আনসার।' নাম মনে করিয়ে দেয় সালার।

'আমি তার জন্য পালাচ্ছি না।' না চাইতেও চিৎকার করে ওঠে ইমামা।

সালারের পা অটোমেটিক ব্রেকে গিয়ে লাগে। বিমূঢ় হয়ে ইমামার দিকে তাকায়। 'আমার ওপর চিৎকার করছ কেন? আমার সাথে চিৎকারের দরকার নেই।' রেগে যায় ও।

ইমামা মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়।

'এই যে তোমাদের মাজহাবি থিওরি, ফিলোসোফি, পয়েন্ট বা যাইহোক না কেন, I don't get it. কেউ যদি অন্য কোনো নবীকে মানে তাতে কী আসে-যায়? জীবনে এমন অর্থহীন তর্কের বাইরেও অনেককিছু আছে। এই আকিদা বা মাজহাব নিয়ে লড়াই করা What rubbish!'

ইমামা ক্রুদ্ধ চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। 'জরুরি না সবার কাছে তা অর্থহীন হবে। আমি নিজের মাজহাবের ওপর কায়েম থাকতে চাই না, না সেই মাজহাবের কাউকে বিয়ে করতে চাই। আমার হক আছে এটা করার। আমি এ ধরনের বিষয় নিয়ে তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না, কারণ তুমি বুঝবে না। সুতরাং এসব বিষয়ে নিজের রায় দিতে এসো না।'

‘আমারও হক আছে কথা বলার Freedom of expression! (বাকস্বাধীনতা)’ সালার কাঁধ উঁচিয়ে বলল।

ইমামা কোনো প্রতিক্রিয়া জানানোর পরিবর্তে চুপ হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে। সালারও নীরবে গাড়ি ড্রাইভ করছিল।

‘এই যে জালাল আনসার, আমি তার কথা বলতে চাইছিলাম।’ একটু চুপ থেকে সালার প্রসঙ্গ তোলে। ‘তার মধ্যে বিশেষ কী আছে?’

ইমামা উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল।

‘জালাল আনসার আর তোমার কোনো জোড় নেই। একটুও হ্যান্ডসাম না সে। তুমি তো সুন্দরী। আমি অবাক হচ্ছি তুমি কীভাবে তার প্রতি ঝুঁকলে এটা ভেবে! সে কি খুব intelligent?’ জিজ্ঞেস করে সালার।

অবাক হয়ে তাকায় ইমামা। 'Intelligent বলতে কী বোঝাতে চাইছ?'

'দেখো, হয়তো কারো চেহারা ভালো লাগে। কিন্তু আমার মনে হয় না জালালের চেহারা তোমার ভালো লেগেছে। নয়তো কারো ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বা টাকা-পয়সার কারণে আগ্রহ জন্মায়। যদিও জালালের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বা টাকা-পয়সা কত আমি জানি না। কিন্তু তোমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড যতটা উঁচু, তাতে এসবও তোমার আগ্রহের কারণ হতে পারে না। একমাত্র অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া পথ হচ্ছে কারো বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা ইত্যাদি। সেজন্যই জিজ্ঞেস করছি সে কি খুব intelligent, নাকি খুব brilliant বা outstanding?'

'না।' নিচু আওয়াজে মৃদু গলায় বলল ইমামা।

সালার হতাশ হয়। 'তাহলে তুমি তার প্রতি ঝুঁকলে কীভাবে?'

ইমামা হেডলাইটের আলোয় উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে রাস্তা দেখছিল। সালার কিছুটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড্রাইভিংয়ে মনোযোগ দেয়। গাড়িতে আবার নীরবতা নেমে আসে।

'সে খুব ভালো নাত আবৃত্তি করে।' প্রায় পাঁচ মিনিট পর নীরবতা ভাঙে। ইমামা নিচু আওয়াজে এমনভাবে বিড়বিড় করছিল, যেন নিজের সাথে কথা বলছে।

ইমামার বাক্য সালারের কানে পৌঁছায়। কিন্তু ওর কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। 'কী...?' নিশ্চিত হতে চাইল।

'জালাল খুব ভালো নাত আবৃত্তি করে।' এবার একটু জোরে বলল ইমামা। 'শুধু কণ্ঠের কারণে... কোনো singer নাকি?' সালার জিজ্ঞেস করে।

ইমামা না-বোধক মাথা নাড়ল।

'তাহলে?'

'শুধু নাত। খুব সুন্দর আবৃত্তি করে।'

সালার হাসে। 'শুধু নাত আবৃত্তি শুনে প্রেমে পড়ে গেছ, অন্তত আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তাহলে করো না। তোমার বিশ্বাস কে চায়?' ইমামার কণ্ঠে শীতলতা ছিল।

গাড়িতে আবার নীরবতা নেমে আসে।

'ধরে নেওয়া যাক, তুমি সত্যিই তার নাত আবৃত্তি শুনে কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছিলে। কিন্তু এতদূর... এটা তো প্র্যাকটিক্যাল কিছু না, বারবারা কাটলান্ডের নভেলের রোমান্স হয়ে গেল। তুমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট হয়ে এমন ইমম্যাচিউর মানসিকতা নিয়ে চলো?' সালার তির্যক কণ্ঠে বলে।

'আমি যথেষ্ট ম্যাচিউর। অনেক বেশি। অন্তত গত দুই-চার বছরে আমার মতো প্র্যাকটিক্যাল হয়ে কেউ হয়তো জীবনকে দেখেনি।'

'আমার রায় আগের জায়গায়। হতে পারে তোমার প্র্যাকটিক্যাল হওয়া আমার প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। এনিওয়ে, আমি জালালের কথা বলছিলাম। ওই-যে তুমি নাত আবৃত্তির কথা বলছিলে ওগুলো।'

'কিছু বিষয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না...আমারও নেই।' এবার ইমামার কণ্ঠে পরাজয়ের সুর ছিল।

'আবারও আমি তোমার সাথে একমত হতে পারছি না, সবকিছুর ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্তত নিজের ফিলিংস, ইমোশন এবং অ্যাকশনের ওপর। আমরা জানি কার জন্য কোন ফিলিংস ডেভেলপ হচ্ছে এবং কেন করছি সেটাও জানি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জেনেশুনে সেসব ফিলিংস ডেভেলপ হতে দেই, ততক্ষণ পর্যন্ত তা

বাড়ে না। তাই এসব বিষয়ে আমাদের কন্ট্রোল না থাকাটা মানতে পারছি না।" কথা বলতে বলতে ইমামার দিকে তাকায় সালার। অনুভব করে ইমামা ওর কথা শুনছে না। একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে। চোখগুলো ফোলা, যার মাঝে তখনো আর্দ্রতা। মানসিকভাবে অন্য কোথাও। কোথায় তা সালারের জানা নেই। ওর কাছে ইমামাকে অস্বাভাবিক মনে হলো। অনেকক্ষণ নীরবে গাড়ি ড্রাইভ করার পর একটু বিরক্ত হয়ে ইমামাকে সম্বোধন করল।

‘নাত আবৃত্তি ছাড়া আর কী কোয়ালিটি আছে?’ জোরে বলে।

ইমামা একটু চমকায়।

‘নাত আবৃত্তি ছাড়া আর কী কোয়ালিটি আছে?’ নিজের প্রশ্ন আবার করে সালার।

‘সেই সব কোয়ালিটি, যা একজন ভালো মানুষ এবং ভালো মুসলমানের মাঝে থাকে।’ ইমামা বলল।

'যেমন?' সালার ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করে।

'কিছু না থাকলেও হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে এত ভালোবাসে যে, আমি শুধু এই এক কোয়ালিটির খাতিরে অন্য যেকোনো মানুষের ওপর প্রাধান্য দেবো তাকে।'

সালার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে। 'What a logic! এসব কথাবার্তা আমি আসলেই বুঝব না।'

'তুমি তোমার পছন্দে বিয়ে করবে নাকি তোমার বাবা-মায়ের পছন্দে?' ইমামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

সালার অবাক। 'অফকোর্স, নিজের পছন্দে। বাবা-মায়ের পছন্দে বিয়ে করার যুগ কই?' বেপরোয়াভাবে বলল।

'তুমিও তো কোনো কোয়ালিটির কারণে একটা মেয়েকে পছন্দ করবে। যাকে ভালো লাগবে বা যার সাথে তোমার

আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবো। এমনটাই, তাই না?" ইমামা জিজ্ঞেস করছে।

'অবশ্যই।' সালার বলে।

'আমিও সেটাই করছি। কে কোন কোয়ালিটিকে গুরুত্ব দেবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। তুমি এসব কারণে কাউকে বিয়ে করবে, আমিও তোমায় বলা সেই এক কারণে জালাল আনসারকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম।' ইমামা থামে। 'আমার ইচ্ছে ছিল এমন কারো সাথে বিয়ে হোক, যে হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে। জালাল নবী সা.-কে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে জানে, তাই আমার মনে হয়েছিল তাকেই বিয়ে করা উচিত। ইচ্ছে এমন থাকে, যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না।'

'যেহেতু সে বিয়ে করে নিয়েছে, এখন তুমি কী করবে?'

'জানি না আমি।'

'এক কাজ করো, অন্য কোনো নাত আবৃত্তিকার খুঁজে বের করে নাও তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।' সালার হাসে।

ইমামা পলকহীন সালারের দিকে তাকিয়ে রইল। সামনে থাকা এই মানুষটার বাস আসলেই নিষ্ঠুরতার শীর্ষে।

'এভাবে কেন তাকিয়ে আছো? আমি মজা করছিলাম।' সালার হাসি নিয়ন্ত্রণ করে।

ইমামা কিছু বলার পরিবর্তে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'তোমার বাবা তোমাকে মেরেছে?' সালার আগের মতো কিছুক্ষণ চুপ থেকে কথার স্রোত জারি রাখে।

'তোমাকে কে বলল?' সালারের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল ইমামা।

'কাজের মহিলা।' সালার উত্তর দেয়। 'বেচারি মনে করেছে
তুমি বিয়েতে আমার জন্য অমত করছ। তাই সে আমার
কাছে এসে তোমার অবস্থা খুব করুণভাবে উপস্থাপন
করেছে। মেরেছে তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ।' সহজ গলায় উত্তর দেয় ইমামা।

'কেন?'

'জিজ্ঞেস করিনি... হয়তো রেগেছিলেন, তাই।'

'তুমি তাকে মারতে কেন দিলে?'

'তিনি আমার বাবা, তার হক আছে আমাকে মারার।'

সালার অবাক হয়ে ইমামার দিকে তাকায়।

'তার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও এমন পরিস্থিতিতে একই কাজ করত। আমার কাছে এটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি।' ইমামা খুব সাবলীল কণ্ঠে বলল।

'যদি মারার হক থাকে, তাহলে বিয়ে দেওয়ারও হক আছে। তাতে এত বড় হাঙামা কেন করছ?' সালার তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করল।

'কোনো মুসলমানের সাথে দিত, যেখানে ইচ্ছে দিত, আমি করে ফেলতাম।'

'সে জালাল আনসার না হলেও?' সালার বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ.. এখনই বা তার সাথে কোথায় হয়েছে?' ইমামার চোখে আর্দ্রতা সাঁতার কাটে।

'তাহলে তাদেরকে এটা বলতে তুমি।'

‘বলেছি, তোমার মনে হয় এখনো না বলে বসে আছি?’

‘আমি সত্যিই একটা বিষয়ে খুব অবাক।’ সালার বলল। ‘তুমি কেন আমার কাছে সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে? বা বলতে গেলে কীভাবে এই সিদ্ধান্তে এলে? তুমি আমাকে যথেষ্ট অপছন্দ করো।’

‘তোমার বাইরে আমার কাছে অপশন ছিল না।’ ইমামা মৃদু আওয়াজে বলে। আমার কোনো ফ্রেন্ড এই পরিস্থিতিতে তেমন সাহায্য করতে পারবে না, যা একটা ছেলে পারবে। আসজাদ ছাড়া আমি শুধু জালাল আর তোমাকে চিনি। সবচেয়ে কাছাকাছি তুমি ছিলে যার সাথে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করা যাবে, ব্যাস আমি সেটাই করেছি।’

‘তোমার বিশ্বাস ছিল আমি তোমাকে সাহায্য করব?’

‘না, আমি শুধু একটা রিস্ক নিয়েছি। বিশ্বাস কোথা থেকে আসবে? বললাম না আমার কোনো অপশন ছিল না।’

'মানে প্রয়োজনের স্বার্থে তুমি গাধাকে বাপ বানিয়ে নিয়েছ।' খুব অদ্ভুত সুরে সালারের বলা এই বাক্য ইমামাকে চুপ করিয়ে দেয়। এই মানুষ মুখের ওপর কথা বলায় ওস্তাদ, যদিও ভুল বলেনি। 'Very interesting!' ইমামার তরফ থেকে কিছু বলার অপেক্ষা না করেই বলে সালার। মনে হলো নিজের অনুমানে বেশ সন্তুষ্ট।

'কিছুক্ষণের জন্য এখানে গাড়ি থামাব।' রাস্তার পাশে থাকা একটা সস্তা ধরনের হোটেল আর সার্ভিস স্টেশনের দিকে তাকিয়ে বলল সালার। 'একটু টায়ার চেক করাতে হবে, গাড়িতে অতিরিক্ত টায়ার নেই। মাঝ রাস্তায় কোথাও টায়ার ফ্ল্যাট হয়ে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে।'

ইমামা মাথা নেড়ে সায় জানায়। গাড়ি ঘুরিয়ে ভেতরে ঢোকে সালার। তখন দূরে কোথাও ফজরের আজান দিচ্ছে। হোটেলের কাজ করা দু'চারজন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ ছিল

না ওখানে। গাড়ি ভেতরে ঢুকতে দেখে একজন লোক
বেরিয়ে আসে, হয়তো গাড়ির শব্দ শুনেছিল। গাড়ির দরজা
খুলে বাইতে বের হয় সালার। ইমামা সিটের পেছনে মাথা
ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়। আজানের আওয়াজ বাড়ছে।
চোখ খুলে ফেলো। গাড়ির দরজা খুলে নিজেও বের হয়।
দরজা খোলার শব্দে সালার মাথা ঘুরিয়ে তাকায়।

'এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে?' জিজ্ঞেস করল ইমামা।

'দশ-পনেরো মিনিট, একবার ইঞ্জিনও চেক করিয়ে নেব।'

'আমি নামাজ পড়ব, অজু করা লাগবে আমার।'

সালার কিছু বলার আগে হোটেলের লোকটা ডেকে বলল।

'আপা! অজু করলে এই ড্রাম থেকে পানি নেন।'

'আর নামাজ কই পড়বে?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করল সালার।

'এই তো সামনের রুমে। আমি জায়নামাজ দেই।' সে পাইপ বের করছিল। 'আগে জায়নামাজ দেই এরপর এসে ইঞ্জিন চেক করছি।' লোকটা রুমের দিকে যেতে যেতে বলল।

সালার দূর থেকে ইমামাকে ড্রামের পাশে উশখুশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। অনিচ্ছাকৃতই সামনে এগিয়ে যায়। ওটা আলকাতরার বিশাল এক খালি ড্রাম, যা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা।

'ভেতর থেকে পানি কীভাবে বের করব?' পায়ের শব্দ টের পেয়ে পেছনে ফেরে ইমামা।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু দূরে খালি একটা বালতি পড়ে থাকতে দেখে সালার। ওটা নিয়ে আসে ও। 'আমার মনে হয় এই বালতি দিয়েই পানি বের করে।' বলতে বলতে ড্রামের ঢাকনা গলে বালতি দিয়ে পানি তোলে 'আমি করিয়ে দিচ্ছি অজু।' ইমামার চেহারার অস্বস্তি দেখেছিল ও।

ইমামা কিছু না বলে জামার হাতা উপরে তুলতে থাকে। ঘড়ি খুলে সালারের দিকে বাড়িয়ে দেয়। এরপর হাঁটু উচিয়ে নিচে বসল। সালার বাড়িয়ে রাখা হাতের উপর পানি ঢালে। ইমামা কেঁপে উঠে সাথে সাথে হাত পেছনে সরিয়ে নেয়।

'কী হয়েছে?' সালার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না, পানি খুব ঠান্ডা। তুমি পানি ঢালো।' আবার হাত বাড়ায় ইমামা।

সালার পানি ঢালতে থাকে। ইমামা অজু করতে লাগল। এই প্রথম ওর হাত কনুই পর্যন্ত দেখে সালার। কিছুক্ষণের জন্য ওর কনুই থেকে চোখ ফেরতে পারল না। এরপর সালারের চোখ ওর কনুই থেকে চেহারায় গিয়ে আটকায়। চাদর না সরিয়ে খুব সাবধানে মাথা, কান ও ঘাড় মাসেহ করছে ইমামা। আর সালারের চোখ ওর হাতের নড়াচড়ার সাথে সফর করছে। ওর গলার স্বর্ণের চেইন এবং চেইনের সাথে ঝুলতে থাকা মুক্তাও এই প্রথম আবিষ্কার করে। এর আগে যতবার

দেখেছে, চাদর জড়ানো দেখেছিল। চাদরের রং আলাদা হতো, কিন্তু ইমামা সবসময় একইভাবে তা জড়িয়ে রাখত। তাই ওর শারীরিক অবকাঠামোর দিকে কখনো খেয়াল করার সুযোগ পায়নি সালার।

‘পায়ে আমি পানি ঢেলে নিচ্ছি।’ ইমামা দাঁড়িয়ে সালারের হাত থেকে বালতিটা নেয়। যা প্রায় খালি হওয়ার দিকে। সালার কয়েক পা পিছিয়ে আবিষ্টতা নিয়ে তাকিয়ে রইল। ইমামার অজু শেষ হলে সালারের আবিষ্টতাও ভেঙে যায়। ঘড়ি ইমামার দিকে বাড়ায়। সামনে-পেছনে হেঁটে ওরা সেই রুমে আসে, যেখানে সার্ভিস স্টেশনের লোক ঢুকেছিল। সে ততক্ষণে একপাশে জায়নামাজ বিছিয়ে রেখেছে। ইমামা নিঃশব্দে জায়নামাজের দিকে এগিয়ে যায়। রুমে কিছু চেয়ার ও ছোট্ট একটা টুল ছিল। রুমটা কোন কাজে ব্যবহার হয়, তাৎক্ষণিকভাবে অনুমান করতে পারল না সালার। সামনে এগিয়ে জানালার মতো কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায়।

'আমাদের দুই কাপ চা দিও।' ওইখানে থাকা ছেলেটাকে বলে সালার। ছেলেটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে মাথা নেড়ে সেটাভ জ্বালাতে যায়। রুমে ফিরে আসে ও। ইমামা তখনো নামাজে। একটা চেয়ার টেনে বসে টেবিলের দিকে পা বাড়িয়ে ইমামাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ওর ধারণা ছিল নামাজ শেষ করে ইমামা মোনাজাতে নিজের অবস্থার কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়বে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু ওর অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়। ইমামা মোনাজাতের জন্য হাত তুললেও যেমনটা ও ভেবেছিল তেমন কিছু হলো না। সাধারণভাবে মোনাজাত শেষে দুই হাত মুখের উপর দিয়ে আমিন বলে উঠে যায় ইমামা। গোপনে একটা শ্বাস ফেলে চোখ সরিয়ে নেয় সালার।

লাহোর চত্বরে প্রবেশ করতেই ইমামা বলল। 'তুমি এখন আমাকে যেকোনো জায়গায় নামিয়ে দিতে পারো, আমি চলে যেতে পারব।'

'তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানে নামিয়ে দিচ্ছি। এত কুয়াশার মধ্যে কোনো ট্রান্সপোর্টের অপেক্ষা করতে অনেক সময় লাগবে।'

রাস্তা তখনো প্রায় সুনসান। যদিও সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যাশ সবকিছুকে ঢেকে রেখেছে নিজের চাদর জড়িয়ে।

'জানা নেই আমার কোথায় যাওয়া উচিত, কীসের ঠিকানা বলব? এখন হয়তো হোস্টেলে যাব, তারপর ওখান থেকে...'

'তাহলে আমি তোমাকে হোস্টেলে দিয়ে আসছি।'

কিছু রাস্তা এভাবেই নীরবতায় কাটে।

হোস্টেল থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই ইমামা বলল। 'ব্যস! এখানেই গাড়ি থামাও, বাকিটা চলে যাব। আমি তোমার সাথে হোস্টেলে যেতে চাই না।' সালার রাস্তার পাশে গাড়ি থামায়।

‘গত কয়েক সপ্তাহ অনেক সাহায্য করেছ তুমি আমার। এজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তোমার সাহায্য না পেলে আজ আমি এখানে থাকতাম না।’ একটু থেমে আবার বলে ইমামা। ‘তোমার মোবাইল আমার কাছে। এটা এখনো আমার দরকার। তবে কিছুদিন পর পাঠিয়ে দেবো।’

‘দরকার নেই, তুমি এটা রাখতে পারো।’

‘কিছুদিন পর আমি যোগাযোগ করব। তখন ডিভোর্সের পেপার পাঠিয়ে দিও। আশা করি, আমার বাবা-মাকে কিছু বলবে না।’

‘এটা বলার দরকার ছিল?’ সালারের ভ্রু কুঁচকে যায়। ‘কিছু বলার হলে অনেক আগেই বলে দিতাম।’ শীতল কণ্ঠে বলল। ‘তুমি আমাকে ভীষণ বাজে ছেলে মনে করতে, এখনো কি আমার ব্যাপারে তোমার রায় একই আছে নাকি নিজের রায়ে

কোনো পরিবর্তন এনেছ?' বাঁকা হেসে জিজ্ঞেস করল। 'এখন তোমার মনে হয় না আমি আসলে একটা ভালো ছেলে?'

'হতে পারে।' ইমামা মৃদু আওয়াজে বলল।

ওর কথায় ধাক্কা খায় সালার। 'হতে পারে?' অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে হাসল। 'এখনো শুধু হতে পারে... তুমি খুব অকৃতজ্ঞ ইমামা! তোমার জন্য আমি এতকিছু করলাম, যা এই যুগের কোনো ছেলে করবে না। এরপরও তুমি আমাকে ভালো মেনে নিতে প্রস্তুত নও?'

'আমি অকৃতজ্ঞ না। স্বীকার করি তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। হয়তো অন্য কেউ তা করত না।'

সালার ওকে থামিয়ে বলল। 'তার মানে আমি ভালো, তাই-না?'

ইমামা কিছু বলল না, শুধু তাকিয়ে রইল।

‘না, আমি জানি তুমি এটাই বলতে চাও। যদিও প্রাচ্যের মেয়েদের নীরবতাকে সম্মতি বলে ধরা হয়, কিন্তু তোমার নীরবতা তোমার অসম্মতি। ঠিক বলছি না?’

‘আমরা অহেতুক তর্ক করছি।’

‘হতে পারে।’ সালার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে। ‘কিন্তু আমি অবাক যে তুমি...’

এবার ইমামা ওকে থামিয়ে বলল। ‘তুমি অবশ্যই আমার জন্য অনেক কিছু করেছ। যদি আমি তোমাকে না চিনতাম তাহলে বিনা দ্বিধায় তোমাকে একজন ভালো মানুষ মনে করতাম, এমনকি বলেও দিতাম। কিন্তু আমি তোমাকে এত ভালো করে চিনি যে, আমার জন্য এটা বলা কঠিন।’

সালার একদৃষ্টে ইমামার দিকে তাকিয়ে ছিল।

'যে মানুষটা আত্মহত্যার চেষ্টা করে, মদ খায়, নিজের রুম মেয়েদের নগ্ন ছবি দিয়ে ভরে রাখে; সে ভালো মানুষ হতে পারে না।' ইমামা সহজ গলায় বলল।

'আচ্ছা, যদি এমন কারো কাছে যেতে, যে এই তিন কাজের কোনোটা করে না। তোমাকে সাহায্যও করল না, তবু সে তোমার জন্য ভালো মানুষ হতো?' সালার জোরে বলল।
'যেমন জালাল আনসার?'

ইমামার চেহারার রং বদলায়। 'হ্যাঁ, সে আমাকে সাহায্য করেনি। আমাকে বিয়ে করেনি। কিন্তু এর মানে এই না সে খারাপ হয়ে গেছে। সে একজন ভালো মানুষ এবং আমার কাছে এখনো ভালোই আছে।'

"আমি সাহায্য করেছি, বিয়ে করেছি তোমাকে। কিন্তু তবু এর মানে এই না, আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি এখনো তোমার কাছে খারাপ রয়ে গেছি।" সালার বিদ্রূপের হাসি হাসে।
'তোমার নিজের ব্যাপারে কী রায় ইমামা! তুমি একটা ভালো

মেয়ে?' আচমকা তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল। এরপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে লাগল। 'আমার কাছে তুমিও ভালো মেয়ে না। তুমিও একটা ছেলের জন্য বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছ, নিজের বাগদতাকে ধোঁকা দিয়েছ ফ্যামিলির মান-সম্মান নষ্ট করেছ।' কোনোরকম সৌজন্যতাবোধ না রেখে একের পর এক বলে যাচ্ছিল।

ইমামার চোখে হালকা আর্দ্রতা আসে। 'তুমি ঠিক বলছ, আমি সত্যিই ভালো মেয়ে না। এই বাক্য এখন আমার অনেকের কাছ থেকে শুনতে হবে। তোমাকে আমি এ বিষয়ে অনেক লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যা দিতে পারি। কিন্তু কোনো ফায়দা নেই, তুমি বুঝবে না।'

'ধরো আমি তোমাকে লাহোর না এনে যদি অন্য কোথাও নিয়ে যেতাম, তাহলে? কিন্তু আমি নিরাপদে এখানে নিয়ে এসেছি। এটা তোমার প্রতি আমার কত বড় এহসান, কোনো আন্দাজ আছে?'

ইমামা ঘাড় ঘুরিয়ে সালারের দিকে তাকায়। 'আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না।'

সালার ওর কথায় হাসে। 'আমার ওপর বিশ্বাস ছিল, কেন? আমি তো বাজে ছেলে!'

'তোমার ওপরে না। আল্লাহর ওপরে বিশ্বাস ছিল আমার।'

সালারের কপালে কিছু ভাঁজ পড়ে।

'আল্লাহ এবং তাঁর নবী সা.-র জন্য আমি সব ছেড়েছি। তাই এমন কখনো হতে পারে না যে, তিনি আমাকে তোমার মতো মানুষের হাতে হেয় করবেন। এটা সম্ভবই ছিল না।'

'ধরে নাও, যদি এমন কিছু ঘটে যেত।' সালার জোর দেয়।

'আমি এমন কিছু কেন ধরব যা ঘটেনি?' ইমামাও নিজের কথায় অনড়।

'অর্থাৎ, তুমি আমাকে কোনোধরনের ক্রেডিট দিতে রাজি না।' সালার হাসল। 'ধরো এখন যদি আমি তোমাকে যেতে না দেই তাহলে কী করবে? গাড়ির দরজা যতক্ষণ আমি না খুলছি এটা খুলবে না, তুমিও জানো। এখন বলো কী করবে?'

ইমামা শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'নাহলে এটাও করতে পারি।' সালার ড্যাশবোর্ডে পড়ে থাকা মোবাইল তুলে একটা নাম্বার টাইপ করে। 'তোমার বাড়িতে ফোন করি।' মোবাইল স্ক্রিন ইমামার চোখের সামনে নাড়ে, যেখানে ইমামার বাড়ির নাম্বার ছিল। আমি তাদেরকে বলে দেই তুমি কোথায় আছো, কার সাথে আছো। এরপর এখান থেকে সোজা নিয়ে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তাদের হাতে তুলে দেই। তখন তোমার আস্থা-বিশ্বাসের পরিণাম কী দাঁড়াবে?' বিদ্রোপের ভঙ্গিতে বলছিল।

ইমামা চুপচাপ তাকিয়ে আছে। সালার বেশ খুশি হয়। মোবাইল রেখে দেওয়ার আগে আরেকবার ইমামার চোখের সামনে স্ক্রিন নাড়ে।

'কত বড় এহসান করছি এমন না করে।' মোবাইল ড্যাশবোর্ডে রাখতে রাখতে বলল সালার। 'তুমি অসহায়! কিছু করার নেই। এমন অবস্থায় রাতে অন্য কোথাও নিয়ে গেলেও তোমার কিছু করার থাকত না।'

'আমি তোমাকে গুলি করতাম।'

সালার অবাক হয়ে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। 'কী করতে?'

'আমি... তোমাকে... গুলি করতাম।' ইমামা একই ভঙ্গিতে থেমে থেমে বলে।

সালার স্টিয়ারিং হুইলে দুই হাত রেখে হাসে। 'জীবনে কখনো পিস্তল দেখেছ?' ঠাট্টা করে।

ইমামা পায়ের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়ায়। এরপর উঠে সোজা হয়ে সালারকে বলল। 'হয়তো এটাকেই বলে।'

সালার হাসতে ভুলে যায়। ইমামার ডান হাতে ছোট সাইজের সুন্দর একটা দামি লেডিস পিস্তল। এবং ধরার স্টাইল দেখেই বুঝে যায় তা কোনো আনাড়ির হাতে না। অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে থাকে। 'তুমি আমাকে গুলি করতে পারতে?'

'হ্যাঁ, দরকার হলে। কিন্তু আমি তা করিনি, কারণ তুমি কোনো ছল করোনি।' স্থির কণ্ঠে বলল ইমামা। পিস্তল ওর দিকে তাক করেনি, শুধু হাতে ধরে রেখেছিল। 'গাড়ির লক...' কথা অসমাপ্ত রেখেই সালারকে ইশারা করে বলল।

সালার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের পাশে থাকা বাটন প্রেস করে দরজা আনলক করে। ইমামা দরজা খুলে পিস্তলটা কোলে

থাকা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। দু'জনের মাঝে আর কোনো কথা হয় না। গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে দেয় ইমামা। সালার ওকে দ্রুত পায়ে আসন্ন একটা ওয়াগনের দিকে গিয়ে তাতে উঠে যেতে দেখল। ওর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা খুব প্রখর। যেকোনো মানুষের চেহারা পড়ে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে নিজেকে নিয়ে সালারের বেশ গর্ব ছিল। কিন্তু সে কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তার মাঝে গাড়িতে বসে স্বীকার করে নেয়, ইমামা হাশিমকে পড়তে পারেনি ও। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অবিশ্বাস নিয়ে ওখানেই বসে রইল অনেকক্ষণ। ইমামার প্রতি ওর অপছন্দভাব আরও কিছুটা বেড়ে যায়।

ফেরার পথে কুয়াশা উপেক্ষা করে দ্বিগুণ গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসে। পুরো রাস্তা মস্তিষ্ক শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল। 'ইমামা পিস্তল কোথেকে বের করল?' ও পুরো বিশ্বাসের সাথে বলতে পারে, যখন ইমামা অজুর জন্য পা ধুচ্ছিল তখন পিস্তল গোড়ালিতে ছিল না। নাহলে নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়ত। এমনকি নামাজ পড়ার সময়ও ইমামাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্য করেছে। পিস্তলটা তখনো

ইমামার গোড়ালিতে বাঁধা ছিল না। বার্গার খেয়ে, চা শেষ করে ইমামা গাড়িতে এসে বসে। কিন্তু ও কিছুক্ষণ পর আসে। তার মানে নিশ্চয়ই পিস্তল ব্যাগে ছিল। আন্দাজ করতে থাকে ও। যখন বাড়িতে পৌঁছায়, তখন ওর মুড বেশ খারাপ। গেট দিয়ে গাড়ি ভেতরে ঢোকানোর সময় দারোয়ানকে নিজের দিকে ডাকে।

'রাতে আমি যে মেয়ের সাথে গিয়েছি, কাউকে এ ব্যাপারে বলবে না। বরং রাতে আমি কোথাও যাইনি, বুঝেছ?' সালার হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

'জি, কাউকে বলব না।' দারোয়ান বিশ্বস্ততার সাথে মাথা নাড়ে। সে আহাম্মক না যে, এ ধরনের কথা অন্যদের সাথে বলে বেড়াবে।

নিজের রুমে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না ওর।

সালার তখন গভীর ঘুমে, যখন রুমের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ কানে আসে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। দরজা থেকে সত্যিই শব্দ আসছে। আধখোলা চোখে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়, চারটা বাজছে। চোখ ঘষতে ঘষতে বিছানা ছেড়ে উঠল। দরজার ওপাশে থাকা মানুষটার ওপর ভীষণ রাগ লাগছে। রাগে বিড়বিড় করতে করতে ঝট করে দরজা খোলে। বাইরে কাজের লোক দাঁড়ানো।

'কী সমস্যা তোমার? এভাবে দরজা কেন ধাক্কাচ্ছ? ভাঙতে চাও নাকি?' কাজের লোকের ওপর চিৎকার করে ও।

'সলার সাহেব। বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।' কাজের লোক ঘাবড়ানো অবস্থায় বলল।

রাগ আর ঘুম মিনিটের ব্যবধানে উধাও হয়ে যায় ওর। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে পুলিশ আসার কারণ বুঝে ফেলল। কিন্তু ইমামার পরিবার আর পুলিশের তৎপরতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে এরা কীভাবে ওর কাছে পৌঁছে

গেল? 'পুলিশ কেন এসেছে?' নিজের কণ্ঠ স্থির রেখে, ভাবলেশহীন মুখে জিজ্ঞেস করল।

‘জি। সেটা তো বলেনি, শুধু বলছে আপনার সাথে দেখা করতে চায়। কিন্তু দারোয়ান গেট খোলেনি। তাদেরকে বলেছে আপনি বাড়ি নেই। কিন্তু তাদের কাছে আপনার ওয়ারেন্ট আছে। তারা বলছে এমনিতে ভেতরে ঢুকতে না দিলে জোর করে ঢুকে সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবো।’

সালার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, দারোয়ান বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছে। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছে পুলিশ কাল রাতের ঘটনা নিয়ে তদন্ত করতে এসেছে। তাই পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি, এমনকি ও যে আছে সেটাও জানায়নি।

‘তুমি চিন্তা করো না, আমি কিছু করছি।’ সালার কাজের লোককে বলল।

এটা কোনো সাধারণ লোকজনের বাড়ি হলে এতক্ষণে পুলিশ দেয়াল টপকে ঢুকে পড়ত। কিন্তু এখন ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বেও বাড়ির আকার এবং এলাকার অবস্থান তাদেরকে দোটানায় ফেলে দিয়েছে। যদি ইমামার পরিবার সেই পরিমাণ নাম-ডাকওয়ালা না হতো, তাহলে পুলিশ এই সেক্টরে আসার; বিশেষ করে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসার সাহসই করত না। কিন্তু এই মুহূর্তে পুলিশের জন্য জলে কুমির-ডাঙায় বাঘ এর মতো অবস্থা ছিল।

সালার রুমে এসে ফোন তুলে করাচিতে সিকান্দার উসমানের কাছে কল করে। 'পাপা। একটা ছোট্ট ঝামেলা হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাছে আমাকে গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট।'

সিকান্দার উসমানের হাত ফসকে মোবাইল পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। 'কেন?'

'জানি না পাপা! ঘুমাচ্ছিলাম আমি, কাজের লোক এসে জাগিয়ে বলল। আমি কী পুলিশের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব তারা কেন আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে?' সালার খুব নির্দোষভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না, বাইরে বের হওয়ার বা পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার দরকার নেই। নিজের রুমেই থাকো। আমি কিছুক্ষণ পর ফোন করছি।' সিকান্দার উসমান তড়িঘড়ি করে ফোন রাখলেন।

সালার নিশ্চিত হয়ে ফোন রেখে দেয়। জানত একটু পর পুলিশ আর থাকবে না। ঠিক তা-ই হলো। ১০-১৫ মিনিট পর কাজের লোক এসে পুলিশের চলে যাওয়ার খবর জানায়। কাজের লোক ওর সাথে কথা বলছিল, এর মাঝেই সিকান্দার উসমানের কল আসে।

'পুলিশ চলে গেছে?' সিকান্দার ওর গলা শুনেই জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, চলে গেছে।' সালার খুব স্বস্তির ভঙ্গিতে উত্তর দেয়।

'এখন তুমি আমার কথা শোনো, আমি আর তোমার মা রাতে করাচি থেকে ইসলামাবাদে আসছি। ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের হবে না। শুনেছ তুমি?'

তার কথা বলার ধরন সালারের কাছে অদ্ভুত লাগে। সিকান্দার উসমান ওর সাথে খুব রাগী কণ্ঠে কথা বলছিল। 'শুনেছি।'

অপরপাশ থেকে সিকান্দার উসমান কল কেটে দিলেন। সালারও ফোন রেখে দিচ্ছিল, যখন ওর চোখ রুমের কার্পেটের উপর পড়ে। ওখানে জুতার ছাপ। কাজের লোকও অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছে। যা জানালা থেকে সারিবদ্ধ আকারে রুমের ভেতরের দিকে এসেছে। 'জুতার দাগগুলো পরিষ্কার করো।' নির্দেশের সুরে বলল ও।

কাজের লোক রুম থেকে বেরিয়ে যায়। সালার জানালার কাছে এসে স্লাইডিং উইন্ডো পুরো খুলে দেয়। ওর অনুমান

ঠিক, জুতার সেই কাদামাথা ছাপ বারান্দায়ও আছে। ইমামা নিজেদের কেয়ারি থেকে দেয়াল টপকে ওদের কেয়ারিতে ঢুকেছে। যার কারণে জুতার তলায় কাদা ছিল। শিশিরের কারণে ওখানে মাটি কম, কাদা বেশি ছিল। বারান্দার সাদা মার্বেলের মেঝেতে সেই ছাপগুলো নিখুঁত লাইনের মতো দেখাচ্ছে। ও লম্বা একটা শ্বাস টেনে রুমে চলে আসে। কাজের লোক রুমের দাগগুলো পরিষ্কার করছিল তখন।

সালার তাকে বলল। 'বাইরে বারান্দায়ও কিছু ছাপ আছে, সেগুলোও পরিষ্কার করে দিও।'

'এগুলো কার ছাপ?' কাজের লোক কৌতুহল দমিয়ে রাখতে পারল না।

'আমার।' সালার মেজাজ দেখিয়ে বলল।

তখন রাতের খাবার খাচ্ছিল সালার। যখন সিকান্দার উসমান আর তায়িবা বাড়িতে এসে পৌঁছায়। তাদের চেহারা

দুশ্চিন্তার ছাপ। ও তৃপ্তি নিয়ে খাওয়ায় ব্যস্ত। তারা ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে যায়।

‘খাওয়া শেষ করে আমার রুমে এসো।’ সিকান্দার উসমান যেতে যেতে বসলেন।

সালার একটু ফুট ট্রাইফেল নিজের প্লেটে তুলে নেয়। পনেরো মিনিট পর তাদের রুমে আসে। সিকান্দার তখন রুমে পায়চারি করছিলেন। আর তায়িবা চিন্তিত অবস্থায় সোফায় বসেছিলেন।

‘পাপা! কেন ডেকেছেন?’ ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে সালার।

‘বসো, তারপর বলছি।’ সিকান্দার উসমান ওকে দেখে পায়চারি বন্ধ করেন।

সালার খুব শান্ত ভঙ্গিতে মায়ের পাশে গিয়ে বসে।

'ইমামা কোথায়?' সিকান্দার সময় নষ্ট না করে জিজ্ঞেস করলেন।

'ইমামা কে?' ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে চেহারা একটু হলেও আতঙ্ক থাকত। কিন্তু ও নিজের নামের মতো শুধু একপিসই ছিল।

সিকান্দার উসমানের চেহারা রাগে লাল হয়। 'তোমার বোন...' তিনি গর্জে ওঠেন।

'আমার বোনের নাম আনিতা, পাপা!' সালারের নিশ্চিত ভঙ্গিতে একটুও কমতি এলো না।

'শুধু একটা কথা বলো, কতবার আর কতভাবে অপমান করবে?' সিকান্দার উসমান অন্য সোফায় বসলেন।

'আপনি কীসব বলছেন পাপা? আমার কিছুই বুঝে আসছে না।' সালার বিস্মিত হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

'কী বলছি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছ।' তিনি ঠেস মেরে বললেন। 'দেখো, আমাকে ভালোয় ভালোয় বলে দাও ইমামা কোথায়? ব্যাপারটা ততখানি সহজ না যতখানি তুমি ভেবে বসে আছ।'

'পাপা! আপনি কোন ইমামার কথা বলছেন? আমি কোনো ইমামাকে চিনি না।'

'ওয়াসিমের বোনের কথা বলছি।' সিকান্দার উসমান চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

'ওয়াসিমের বোন?' চিন্তা করার ভান করে। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমাকে ফার্স্ট এইড দিয়েছিল লাস্ট ইয়ার।'

'হ্যাঁ, সেই মেয়েটা। যেহেতু তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে, এখন আমাকে এটা বলে দাও মেয়েটা কোথায়?'

'হয়তো নিজের বাড়িতে, নাহলে মেডিকেল কলেজের
হোস্টেলে। আমার সাথে ওর কী সম্পর্ক পাপা?'

'মেয়ের বাবা তোমার বিরুদ্ধে তার মেয়েকে অপহরণের
কেস দিয়েছে।'

'আমার বিরুদ্ধে? I don't believe it! ইমামার সাথে আমার
কী সম্পর্ক?' ভাবলেশহীন চেহারায় বলে সালার।

'এটা তো আমিও জানতে চাইছি ওর সাথে তোমার কী
সম্পর্ক?'

'পাপা! আমি মেয়েটাকে চিনি না। দুয়েকবার ছাড়া দেখাও
হয়নি। তাহলে ওর অপহরণের সাথে আমার কী সম্পর্ক?
আমি তো এটাও জানি না ওকে অপহরণ করা হয়েছে।'

'সালার! এখন ভণিতা বন্ধ করো। বলো মেয়েটা কোথায় আছে? আমি হাশিম মুবীনকে কথা দিয়েছি তার মেয়ে পৌঁছে দেবো।'

'নিজের কথা রাখুন। যদি মেয়েকে তার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন, অবশ্যই পৌঁছান। কিন্তু আমাকে কেন ডিস্টার্ব করছেন?' বিরক্ত হয়ে বলে সালার।

'দেখো সালার যদি তোমার আর ইমামার মধ্যে কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, আমরা সেই বিষয়টা সমাধান করব। দরকার হলে আমি নিজে তোমার সাথে ওর বিয়ে দেবো। কিন্তু আপাতত বলো ইমামা কোথায়?' সিকান্দার উসমান এবার সুর পাল্টে বললেন।

'For god's sake পাপা, stop it! কোন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কীসের বিয়ে? যার সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাকে আমি অপহরণ করব? আর আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ

করতে যাব ইমামার মতো মেয়ের সঙ্গে? ও আমার টাইপের...?' এইবার সালার উঁচু আওয়াজে বলে।

'তাহলে তারা কেন ওর অপহরণের অভিযোগ তোমার ওপর দিচ্ছে?'

‘এটা গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করুন, আমাকে কেন করছেন? অ্যান্ড হাশিম মুরীন বলছে, কাল আরেকজন বলবে। আপনিও সত্য না জেনে আমার ওপর চিল্লানো শুরু করবেন। আপনাকে বলেছি যখন পুলিশ এসেছে তখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। আর আপনি এসে আমার ওপর... ওয়াসিমের বোন যে অপহরণ হয়েছে, সেটাও তো জানি না। তারা কেন আমাকে অভিযুক্ত করছে? তাদের কাছে কী প্রমাণ আছে তাদের মেয়ে অপহরণ করেছি? যদি আমি ওকে অপহরণ করতাম, তবে এখন বাড়িতে বসে কী করছি? আমার তো সেই মেয়েটার সাথে থাকার কথা।’ সালার তিক্ত কণ্ঠে বলে।

'এসপির কাছে তোমার কেসের বিবরণ শুনেছি আমি। এরপর করাচি থেকে হাশিম মুবীনকে কল করেছি। সে আমার সাথে কথা বলতেই প্রস্তুত না। কথা বলার জন্য অনেক অনুরোধ করতে হয়েছে। সে আমাকে তোমার ব্যাপারে বলল। তার মেয়ে রাতে নিখোঁজ হয়েছে। তুমিও রাতে কোথাও গিয়েছ এবং সকালে ফিরেছ।'

'তাহলে পাপা! এর মাঝে অপহরণ কোথা থেকে এলো? প্রথম কথা হচ্ছে, রাতে আমি কোথাও যাইনি। দ্বিতীয় কথা, অপহরণ করার জন্য কারো বাড়িতে গিয়ে জোর করে মেয়ে তুলে আনতে হয়। কিন্তু আমি তো কারো বাড়িতে যাইনি।'

'হাশিম মুবীনের দারোয়ান তোমাকে রাতে যেতে, সকালে আসতে দেখেছে।'

'তার দারোয়ান মিথ্যুক।' সালার আওয়াজ করে বলল।

'আমাদের দারোয়ানও রাতে মেয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে তোমাকে।' সিকান্দার উসমান দাঁতে দাঁত চেপে বললেন।

সালার কিছু বলল না। সিকান্দার উসমান নিশ্চয়ই বাড়িতে এসে দারোয়ানের সাথে কথা বলেছেন। 'ওটা আমার ফ্রেন্ড ছিল। ওকে বাড়িতে দিয়ে এসেছি।' এবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল।

'কে সেই ফ্রেন্ড? ওর নাম-ঠিকানা দাও।'

'সরি পাপা, এটা বলতে পারব না, it's personal.'

‘লাহোরে দিয়ে আসতে গিয়েছিলে? তুমি ওকে লাহোর রেখে এসেছ। এসপি নিজে আমাকে বলেছে। তুমি চারটা চেকপোস্ট পেরিয়েছ, চারটাতেই তোমার নাম্বার নোট করা হয়েছে। মাঝপথে এক সার্ভিস স্টেশনে থেমে গাড়ি চেক করিয়েছ। মেয়েটার সঙ্গে ওখানে খাবার খেয়েছ।’ সিকান্দার উসমান সেই সার্ভিস স্টেশন আর হোটেলের নাম বললেন।

সালার চুপচাপ বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলে না।

'এসপি নিজে আমাকে এসব বলেছে। এখনো হাশিম মুবীনকে কিছু বলেনি সে। আমাকে তোমার সাথে কথা বলে চুপচাপ মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিতে বলেছে। অথবা ওর পরিবারকে ঠিকানা জানিয়ে দিতে বলেছে। যাতে এই ঝামেলা চুপচাপ বাড়াবাড়ি ছাড়া শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এসপি কতক্ষণ হাশিম মুবীনকে এসব না বলে থাকবে? বন্ধুত্বের খাতিরে সে সব চাপিয়ে গেলেও হাশিম মুবীনের আরও অনেক পথ আছে, ওখান থেকে জেনে যাবে। এরপর পুরো জীবন জেলে কাটবে তোমার।' সিকান্দার ভয় দেখান।

সালার তার কথায় প্রভাবিত না হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল।

'তাই মিথ্যে না বলে সত্য বলো মেয়েটা কোথায়?'

'মেয়েটা রেড লাইট এরিয়ায় আছে।'

সিকান্দার ওর কথা শুনে আঁতকে ওঠেন। 'হোয়াট?'

'যেখান থেকে এনেছিলাম এখন সেখানেই রেখে এসেছি।'

তিনি বিবর্ণ চেহারা নিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ওটা ইমামা ছিল না। আমি পরশু লাহোর গিয়েছি, সেখান থেকে রাত কাটানোর জন্য মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিলাম। আজকে গিয়ে রেখে এসেছি। আমার কাছে মেয়েটার কন্টাক্ট নাম্বার নেই। কিন্তু আমার সাথে লাহোর গেলে মেয়েটার কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব। নাহলে ঠিকানা বলে দিচ্ছি, আপনি পুলিশকে বলে দিন মেয়েটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত করতে।'

রুমে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সিকান্দার উসমান আর তায়িবা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অথচ সালার বেশ নিশ্চিন্ত নামিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

দীর্ঘ এক নীরবতার পর সিকান্দার উসমান বললেন। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি এইধরনের কাজ, এসব জায়গায়ও যেতে পারো।'

'আ'ম সরি পাপা! কিন্তু আমি যাই, ইমামার ভাই ওয়াসিমও জানে। উইকেন্ডে বন্ধুদের সাথে ওখানে যাওয়া-আসা করি। ওয়াসিম জানে। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'এড্রেস দাও ওই মেয়ের।' সিকান্দার উসমান দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললেন।

'আমার রুম থেকে নিয়ে আসছি।' সালার উঠতে উঠতে বলল।

নিজের রুমে এসে মোবাইল তুলে লাহোর থাকা এক বন্ধুর কাছে ফোন করে। পুরো পরিস্থিতি জানিয়ে বলল। 'আকমল! বাবাকে আমি রেড লাইট এরিয়ার সেই বাড়ির ঠিকানা দিচ্ছি, যেখানে আমরা যাওয়া-আসা করি। ওখানে আমাকে চেনে

এমন একটা মেয়ে ম্যানেজ করো। একটু পর আবার ফোন করবা।" বলতে বলতে দ্রুত কাগজে ঠিকানা লিখছিল। সেটা বাবা-মায়ের রুমে নিয়ে আসে। কাগজের টুকরো সিকান্দার উসমানের সামনে ধরতেই তিনি একপ্রকার তা ছিনিয়ে নিলেন।

একনজর কাগজে চোখ ঘুরিয়ে ওর দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বললেন। 'বিদায় হও এখান থেকে।'

সালার শান্ত ভঙ্গিতে ওখান থেকে চলে এলো। রুমে এসে আকমলকে আবার ফোন করে।

'আমি ওখানে পৌঁছে তোমাকে কল করছি।' আকমল বলল।

বিছানায় শুয়ে বন্ধুর কলের অপেক্ষা করে ও। পনেরো মিনিট পর আকমল কল দেয়।

'সালার! সানিয়াকে রেডি করেছি, পুরো ব্যাপার বুঝিয়ে বলে দিয়েছি।' আকমল বলল।

সানিয়াকে চেনে ও। 'এখন একটা কাগজ-কলম নিয়ে আমি যা বলছি তা লেখো।' আকমলকে দিয়ে বাড়ির বাইরের এবং ভেতরের বিবরণ লেখাতে শুরু করে।

'এসব কী? আমি দেখেছি তোমাদের বাড়ি।' আকমল খানিকটা অবাক হয়ে বলল।

তুমি দেখলেও সানিয়া দেখেনি। এগুলো আমি সানিয়ার জন্য লেখাচ্ছি। পুলিশ তদন্ত করতে গেলে ও সত্যিই আমার সাথে ইসলামাবাদে এসেছিল কিনা, তা নিশ্চিত হতে এসব জিজ্ঞেস করবে। পুলিশকে যাতে বলে, ও গাড়িতে লুকিয়ে এসেছিল। রাত ছিল বলে বেশিকিছু দেখতে পারেনি। তবে বাড়িতে ঢুকতে ডানে-বামে দুইপাশে লন। আমার গাড়ির রং লাল, স্পোর্ট কার নাম্বার' সালার লেখাতে থাকে। 'আমরা চারটা চেকপোস্ট পার করেছি। তার পরনে ছিল সাদা

সালোয়ার-কামিজ, সাদা চাদর আর কালো সোয়েটার। রাস্তায় একটা সার্ভিস স্টেশনে থেমেছি।" সার্ভিস স্টেশনের নামও বলে। 'সার্ভিস স্টেশন আর হোটেল কোন জায়গায় তা কুয়াশার জন্য স্পষ্ট দেখতে পারেনি ও।' একের পর এক সব বিষয় বিস্তারিত লেখিয়ে যায়। সার্ভিস স্টেশনে টায়ার চেক করা লোক থেকে শুরু করে চা বানানো ছেলেটার বেশভূষা এবং যে রুমে বসেছিল তার খুঁটিনাটি। কী খেয়েছে, ওদের মাঝে কী কথা হয়েছে, সে বিষয়গুলোও। বাড়ির পোর্ট থেকে শুরু করে, নিজের রুমের দিক-নির্দেশ এবং রুমের জিনিসপত্র কোনটা কোথায়। 'সানিয়াকে বলবে এসব মনে রাখতে।' আকমলকে শেষ নসিহত করে ফোন কেটে দেয় ও।

ফোন রেখে বিছানায় বসে কিছু ভাবছিল। এমন সময় হঠাৎ সিকান্দর উসমান রুমে এলেন।

'মেয়েটার নাম কী?'

'সানিয়া।'

সিকান্দার উসমান আর কিছু না বলে রুম থেকে বেরিয়ে যান।

সিকান্দার উসমান চলে গেলে সেই উকিলের কথা মনে পড়ে সালারের, যার মাধ্যমে হাশিম মুবীনের সাথে যোগযোগ করেছে ওরা। উকিল হাসান হায়ার করেছিল। তাই সালার সিকান্দারের নাম উকিলও জানে না। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় এর মাঝে হাসানের ইনভলভড থাকা। হাশিম মুবীন সে উকিলের মাধ্যমে হাসান এবং হাসান থেকে ওর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। তাই পরবর্তী ফোন হাসানকে করল। বন্ধুকে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলে।

'আগেই তোমাকে এসব থেকে নিষেধ করেছিলাম।' সালার কথা শেষ করতেই হাসান বলল। 'আমি ওয়াসিম আর ওর পরিবারকে খুব ভালো করে চিনি। তাদের প্রভাব সম্পর্কেও বেশ ভালো জানি।' বলতেই থাকে।

সালার বিরক্ত হয়ে ওকে থামায়। 'তোমার ভবিষ্যদ্বাণী শোনার জন্য ফোন করিনি। আমি শুধু আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করছি।'

‘কীসের বিপদ?’ হাসান চমকে ওঠে।

‘তুমি যে উকিল হায়ার করেছিলে তার মাধ্যমে ইমামার বাবা তোমার পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আমার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।’

‘না, আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।’ হাসান বন্ধুর কথায় বেশ ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে বলল।

‘কেন...?’

‘কারণ আমি সব কাজ শুরু থেকেই খুব সাবধান হয়ে করেছি। উকিল আমার আসল নাম-ঠিকানা জানে না। তাকে যে ঠিকানা আর ফোন নাম্বার নিয়েছি তা ভুয়া।’

সালার নিঃশব্দে হাসে। বন্ধুর তরফ থেকে এমন বিচক্ষণতার ভরসা রাখা উচিত ছিল ওর। হাসান যেকোনো কাজ খুব সূক্ষ্মভাবে শেষ করায় পারদর্শী।

'আমি শুধু তার কাছে একবার গেছি। এরপর ফোনেই যোগাযোগ হয়েছে। আর সেই সাক্ষাতে আমার বেশভূষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাই মনে হয় না শুধু বেশভূষার ওপর ভিত্তি করে হাশিম মুবীন আহমেদ আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে।'

'আর যদি পৌঁছে যায়, তাহলে?'

'তাহলে... জানি না। এখনো ভেবে দেখিনি।'

'এটা কি ভালো হয় না, যদি তুমি কয়েকদিনের জন্য গায়েব হয়ে যাও? এমনটা উপস্থাপন করো তোমার এই অনুপস্থিতি জরুরি কাজে।' সালার বুদ্ধি দেয়।

'আমার কাছে এরচেয়ে ভালো বুদ্ধি আছে। উকিলকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেই হাশিম মুবীন বা পুলিশ তার কাছে গেলে যেন আমার ভুল বর্ণনা দেয়। অন্তত এতে সাময়িকভাবে আমাকে কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না। তাছাড়া এর মধ্যে সপ্তাহখানেকের জন্য ইংল্যান্ডে যাচ্ছি।' হাসান বলল। 'পুলিশ পৌঁছে গেলেও নাগালের বাইরে থাকবে। কিন্তু আমার মনে হয় না তারা আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। সুতরাং তুমি নিশ্চিত্তে থাকতে পারো।'

'সত্যিই যদি তুমি এতটা কনফিডেন্ট আর রিল্যাক্সড থাকো, তাহলে ঠিক আছে। হতে পারে তারা আদৌ তোমার কাছে পৌঁছালই না। তবু আমি ভেবেছি তোমাকে জানিয়ে রাখি।'

'বাই দ্য ওয়ে, তুমি মেয়েটাকে লাহোর কোথায় রেখে এসেছ?'

'রাস্তায় রেখে এসেছি। আর কই রেখে আসতাম? কোথায় যাচ্ছে, যাবে কিছু বলেনি।'

'অদ্ভুতরকমের বোকা তুমি। মেয়েটার কাছে ঠিকানা জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না তোমার মাঝে?'

'ছিল, কিন্তু দরকার নেই আমার।' ইমামার সাথে হওয়া শেষ কথা চেপে যায় সালার।

"আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি ইদানীং কোন ধরনের ব্যাপারে ইনভলভ হচ্ছ। নিজের টাইপের মেয়েদের সাথে ইনভলভ হওয়া আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ওয়াসিমের বোনের মতো মেয়েদের সাথে ইনভলভ হওয়া... তোমার টেস্ট দিন দিন নিচে নামছে।"

'ইনভলভ হয়েছি? তোমার মস্তিষ্ক আসলেই ঘাস খেতে গেছে। নাহলে এরকম কথাবার্তা আমার সাথে বলতে পারতে না। অ্যাডভেঞ্চার আর ইনভলভমেন্টের মাঝে আসমান-জমিনের তফাত, হাসান সাহেব!' সালার বিদ্রূপের সুরে বলে।

'আর আপনি সেই দূরত্ব এক লাফে পাড়ি দিয়েছেন, সালার সাহেব!' হাসানও একই ভঙ্গিতে জবাব দেয়।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর কিছুই না।'

'তোমার মাথা আমার চেয়েও বেশি খারাপ হয়েছে, নাহলে এমন বোকামিকে অ্যাডভেঞ্চার বলতে না।' হাসান বেশ বিরক্ত।

'তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, কিন্তু এর মানে এই না মুখে যা আসবে সেটাই বলতে পারো।' সালারের রাগ উঠে যায়।

'আমি এখনো তেমন কিছু বলিনি। কোনদিকে ইঙ্গিত করছ, টেস্টের ব্যাপার না মাথা খারাপ হওয়ার দিকে?' হাসান আগের সুরেই জিজ্ঞেস করল।

'মুখ বন্ধ করো, অহেতুক তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। এখন এসব কথা বলার মানে, কবর খুঁড়ে লাশ তোলা।'

হাসান সিরিয়াস হয়। 'ধরো পুলিশ কোনোভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে গেল, এসে ইমামার ঠিকানা জিজ্ঞেস করল; তখন কী বলব? আমার মনে হয় না তারা মানবে ইমামা কোথায়, সেই সম্পর্কে তুমি কিছু জানো না। করবে?'

‘কিছুই না। তোমাকে যা বলেছি, তাদেরকেও সেটা বলবা’
সালার জোর গলায় বলল।

‘এন্ড আর সব ঝামেলা তোমার এই বয়ান থেকে শুরু হবে যে, ইমামা কোথায় আমি জানি না।’ হাসান ওর বাক্য পুনরাবৃত্তি করে। ‘তোমার ভালো করেই জানার কথা তারা যেকোনো মূল্যে ইমামা পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইবে।’

‘এসব অনেক পরের কথা। আমি হাইপোথিসিস আর পসিবিলিটিজ বিবেচনা করে দুশ্চিন্তা করি না। যখন সময় আসবে দেখা যাবে।’ সালার বেপরোয়াভাবে বলল। ‘তোমার কাছে শুধু এটুকু সাহায্য দরকার, বিষয়টা গোপন রাখো আর পুলিশের খপ্পরে না পড়ো।’

'তুমি না বললেও আমি এটাই করতাম। আর যাইহোক ধরা পড়লে ওয়াসিমকে মুখ দেখানোর অবস্থায় থাকব না। এবার তুমি সত্যিই আমাকে ভীষণ ইমব্যারেসিং পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছ।'

'ওকে, আমি ফোন রাখছি। কারণ তোমার মধ্যে আবার কখন মৃগী রোগ শুরু হয়ে যাবে উপদেশ দেওয়ার, আফসোস করার। You are acting like my father.' সালার খট করে ফোন কেটে দিলো। ওর মস্তিষ্ক গত রাতের ব্যাপারে ভাবে। কপালের ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

'আমি কখনো ভাবতে পারিনি ছেলেটা এত নীচে নামতে পারে। রেড লাইট এরিয়া, মাই ফুট! আমার বংশের বিগত সাত প্রজন্মের কেউ ওখানে যায়নি, আর এই ছেলে...? কী বাকি আছে যা আমি ওকে দেইনি? কীসের অভাব রয়ে গেছে ওর জীবনে? অথচ ওকে দেখো, কখনো আত্মহত্যার চেষ্টা

করে বেড়ায়, আবার কখনো রেড লাইট এরিয়ায়... আমার আল্লাহ! আর কতদূর নামবে এই ছেলে?' সিকান্দার উসমান দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলেন।

'আমার তো কাজের লোকদের ওপরও রাগ উঠছে। ওরা কেন মেয়েটাকে ঢুকতে দিলো? বাড়ির ব্যাপারে নজর রাখা উচিত ওদের।' তায়িবা সিকান্দার বললেন।

'বাড়ির দিকে নজর রাখা আর বাড়ির মালিকের দিকে নজর রাখার মাঝে আসমান-জমিনের ব্যবধান। এখানে সমস্যা বাড়ির না, বাড়ির মালিকের।' সিকান্দার বিদ্রূপের সুরে বললেন। 'তাছাড়া ওদের মধ্যে কেউ কোনো মেয়েকে এখানে আসতে দেখেনি। তোমার ছেলে বলছে ঐদিন মেয়েকে এনেছিল। কিন্তু দারোয়ান বলল এমন কিছু না। দারোয়ান ওর সাথে কোন মেয়ে আসতে দেখেনি। তবে যেতে দেখেছে। কাজের লোকদের কথা হচ্ছে কোনো মেয়ে আসতে-যেতে কিছুই দেখেনি।'

'এর মানে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই মেয়েটাকে খুব ভালো করে লুকিয়ে এনেছিল।'

'শয়তানি একটা মস্তিষ্ক আছে ওর, তুমিও জানো। শুধু দোয়া করো এই ঝামেলা যেন এখানেই মিটে যায়। হাশিম মুবীন মেয়েকে খুঁজে পাক আর আমাদের প্রাণ বেঁচে যাক। যাতে ওকে নিয়ে কিছু ভাবতে পারি।' সিকান্দার উসমান বললেন। 'আমার তো বুঝে আসে না আমাকে দিয়ে কী এমন ভুল হয়েছে, যার জন্য এই শাস্তি পাচ্ছি আমি... জানি না আমার কী করা উচিত।' তাকে খুব অসহায় লাগছিল।

পরদিন সকালে যথারীতি ঘুম থেকে উঠে কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হয় সালার। নাস্তা করতে ডাইনিং টেবিলে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে বাবা সিকান্দার উসমানকে দেখতে পায়। সাধারণত তিনি এই সময় নাস্তা করেন না। একটু দেরি করে ফ্যাক্টরিতে যান, তখনই নাস্তা করেন। তাই তাকে এখানে

দেখে কিছুটা অবাক হয়। তার মলিন হয়ে থাকা চেহারা আর লাল চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। সকাল সকাল ছেলেকে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি দেখে তিনি কড়া গলায় বলে ওঠেন। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কলেজে।'

'মাথা ঠিক আছে তোমার? আমার গলায় এত বড় বিপদ ঝুলিয়ে তুমি যাচ্ছো কলেজে? যতদিনে এই ঝামেলা শেষ না হবে, ততদিন কোথাও যেয়ে পারবে না। তোমার কোনো আন্দাজ আছে কত বড় বিপদের মধ্যে আছো?'

'কীসের বিপদ?' সালার থমকায়।

'আমি চাই না হাশিম মুবীন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারুক তাই আপাতত বাড়িতে থাকাই তোমার জন্য ভালো।' সিকান্দার উসমান তির্যক কণ্ঠে বললেন। 'তার মেয়ে পেয়ে গেলে তুমি আবার কলেজে যাওয়া শুরু করো।'

‘তার মেয়ে যদি এক বছরেও খুঁজে না পায়, তাহলে কি আমি সেই এক বছর বাড়িতে বসে থাকব? আপনি তাকে আমার বয়ানের কথা বলেননি?’ সালার তেজি আওয়াজে বলল।

‘বলেছি। সানিয়াও তোমার কথা নিশ্চিত করেছে।’ সানিয়ার নাম উচ্চারণ করার সময় তার মুখে তিক্ততা ছিল। ‘কিন্তু হাশিম মুবীন এখনো নিজের কথায় অনড় যে, তার মেয়েকে তুমিই অপহরণ করেছ।’

‘তাহলে আমার কী করা উচিত? বিশ্বাস না করলে না করুক। তাতে আমার কী যায়-আসে?’ সালার বেপরোয়াভাবে বলে নাস্তার দিকে হাত বাড়ায়।

‘কিন্তু আমার অনেককিছু আসে-যায়। তুমি হাশিম মুবীন আহমেদকে চেনো না। কত প্রভাবশালী এবং কতদূর যেতে পারে এর আন্দাজ শুধু আমার আছে। আমি চাই না সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারুক। তাই আপাতত তুমি বাড়িতেই থাকবো।’ সিকান্দার উসমান এবার কিছুটা নরম

সুরে বললেন। বুঝেছিলেন কড়া গলায় কাজ হবে না, ছেলে তার কথা শুনবে না।

'পাপা! আমার পড়ালেখার ক্ষতি হবে। সরি! আমি বাড়িতে বসে থাকতে পারব না।' তার নরম সুরে মোটেও প্রভাবিত হলো না সালার।

'তোমার পড়ালেখার ক্ষতিতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি শুধু তোমাকে বাড়িতে দেখতে চাই, বুঝেছ?' এবার তিনিও রেগে বললেন।

'অন্তত আজকের জন্য যেতে দিন। আজ আমার জরুরি কাজ আছে।' সালার তার রাগ দেখে পাজেলড হয়ে যায়।

'ড্রাইভারকে বলো, ও তোমার কাজ করে দেবে। নাহলে কোনো বন্ধুকে ফোন করো।' সিকান্দার উসমান হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন।

'কিন্তু পাপা...! আপনি আমাকে এভাবে...'

সিকান্দার উসমান ছেলের কোনো কথা না শুনে ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। সালার কতক্ষণ জোরে জোরে চিল্লাচিল্লি করল। এরপর বিরক্ত হয়ে চুপ করে যায়। ও জানত সিকান্দার উসমান চলাফেরা কমিয়ে দেবেন, কিন্তু আশা করেনি এভাবে আটকে রাখবেন। ভেবেছিল সামিয়াকে সামনে আনলে নিজের পরিবারসহ হাশিম মুবীনও তা মেনে নেবে। এতে ঝামেলা ওর কাঁধ থেকে নেমে যাবে। কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় ছিল হাশিম মুবীন এখনো ওর কথা বিশ্বাস করেনি। নাস্তা শেষ করতে করতে পুরো বিষয় নিয়ে ভাবল। কলেজে না যাওয়া মানে বাড়িতে আটকে থাকা, ও বাড়িতে আটকে থাকতে চায় না। মুড অফ হয়ে গেল। নাস্তা শেষ না করেই খাবারের প্লেট ঠেলে উঠে নিজের রুমে চলে যায়।

'সিকান্দার সাহেব! আমি কিছু বলতে চাই আপনাকে।'

তিনি লাউঞ্জে বসে ছিলেন। তখন কাজের মহিলা ইতস্ততা নিয়ে তার কাছে আসে।

'হ্যাঁ বলো। টাকা দরকার?' সিকান্দার উসমান খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বললেন। এ ব্যাপারে তিনি খুব উদারমনা।

'না সাহেব জি! তেমন কিছু না, অন্যকিছু বলতে চাই।'

'বলো।' তার মনোযোগ তখনো পত্রিকার দিকে।

নাসেরা খুব ভেবেচিন্তে সালার আর ইমামার ব্যাপারে সিকান্দার উসমানকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ সবকিছু দিন দিন জটিল হচ্ছে। সে চায় না আগে-পরে এটা জানাজানি হয়ে যাক যে, ওদের দু'জনের যোগাযোগের মাধ্যম সে ছিল এবং নিজের পরিবারসহ তাকে পুলিশের সামনে যেতে হোক। এজন্য স্বামীর সাথে পরামর্শ করে সিকান্দার উসমানকে সব বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে অন্তত দুই পরিবারের এক পরিবারের দয়া পাশে থাকবে।

'চুপ করে আছো কেন? বলো।' সিকান্দার উসমান কাজের মহিলার চুপ থাকায় বললেন।

'সিকান্দার সাহেব, আমি সালার সাহেবের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই।' নাসেরা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলে ফেলল।

সিকান্দার উসমান খবরের কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে কাজের মহিলার দিকে তাকান। 'সালারের ব্যাপারে? কী বলবে?' খবরের কাগজ সামনের সেন্টার টেবিলের উপর ছুঁড়ে গম্ভীর হয়ে বললেন।

'আমি সালার সাহেব আর ইমামা বিবির ব্যাপারে কিছু বলতে চাই।'

সিকান্দার উসমানের হৃৎপিণ্ড ধক করে লাফিয়ে ওঠে। 'কী?'

‘কিছুদিন আগে সালার সাহেব একদিন আমাকে বলে তার মোবাইল আমার মেয়েকে দিয়ে ইমামা বিবির কাছে পৌঁছে দিতে।’

সিকান্দার উসমানের মনে হলো তিনি আর কখনো নড়তে পারবে না। এর মানে হাশিম মুবীন আহমেদের আন্দাজ, জোরাজুরি ঠিক। ‘তারপর...?’ তার আওয়াজ যেন কোনো গভীর খাদের মধ্য থেকে আসছিল।

‘আমি মানা করি এই কাজ করতে পারব না। কিন্তু সে আমাকে হুমকি দেয়। বলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। এজন্য বাধ্য হয়ে আমি মোবাইল ইমামা বিবির কাছে পৌঁছে দেই।’ নিজের অবস্থান সুরক্ষিত রাখতে নাসেরা কথায় মিথ্যে টানো। ‘এর কিছুদিন পর একদিন সালার সাহেব বলল কিছু কাগজপত্র ইমামার বিবির কাছে পৌঁছে তখনই ফিরিয়ে আনতে। মেয়ে দিয়ে সেই কাগজপত্রও আমি ইমামা বিবির কাছে পৌঁছে আবার ফিরিয়ে আনাই। কাগজপত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলেনি। আমার সন্দেহ ওটা

কাবিননামা ছিল। কারণ তখন সালার সাহেবের রুমে আরও পাঁচজন লোক ছিল, যাদের মধ্যে একজন মৌলভি।

সিকান্দার উসমান বসে বসে ঘামতে শুরু করেন। 'এটা কবের ঘটনা?'

'ইমামা বিবি চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগের।' নাসেরা বলল।

'এসব আগে কেন জানাওনি?' সিকান্দার উসমান বললেন।

'আমি ভয়ে ছিলাম সাহেব! সালার সাহেব হুমকি দিয়েছিল, যদি আপনাকে বা অন্য কাউকে আমি এসব বলি, তাহলে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।' নাসেরা বলল।

'যারা এসেছিল তাদের কাউকে চেনো?' সিকান্দার উসমান চরম উৎকণ্ঠায় ছিলেন।

'শুধু একজনকে, হাসান সাহেব।' সালারের বন্ধুর নাম বলল সে। 'বাকি কাউকে চিনি না। আমি অনেক পেরেশান ছিলাম। আপনাকে বলতে চাইতাম। কিন্তু ভয়ে ছিলাম আপনি কী ভাববেন। এখন আর নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখতে পারিনি।'

'আর কে কে জানে এই ব্যাপারে?'

'কেউ না। শুধু আমি, মেয়ে, আমার স্বামী।'

'কাজের লোকদের মধ্যে অন্য কেউ কিছু জানে?'

'তওবা জি! আমি কেন কাউকে এসব বলব? কাউকে কিছু বলিনি।'

'তুমি যা করেছ সেই ব্যাপারে পরে ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপাতত একটা কথা ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে রাখো, তুমি কারো সাথে এই ব্যাপারে উ-শব্দও করবে না। নিজের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে নাও। নাহলে আমি শুধু তোমাকে

বাড়ি থেকে বের করব না: বরং হাশিম মুবীন আর পুলিশকে বলব এসব তুমি করিয়েছ। ওদের বিপথে নেওয়ায় তোমার হাত ছিল। তুমি ওদের কথাবার্তা একে-অপরের কাছে পৌঁছে দিতে। এরপর পুলিশ তোমার এবং তোমার পরিবারের সাথে কী করতে পারে, ভেবে দেখো। জীবন জেলে কাটাতে হবে। সিকান্দার কাজের মহিলাকে হুমকি দেন।

'না সাহেব জি! আমি কেন কাউকে কিছু বলতে যাব? দরকার হলে আমার জিহবা কেটে দিয়েন, যদি আমার মুখ থেকে এই সম্পর্কে দ্বিতীয়বার কিছু শোনেন।' নাসেরা ঘাবড়ে যায়।

'এখন যাও। তোমার সাথে পরে কথা বলব।' কাজের মহিলাকে চলে যাওয়ার ইশারা করলেন।

সিকান্দার উসমান উদ্বিগ্ন অবস্থায় এদিক-সেদিক পায়চারি করছেন। এই মুহূর্তে তার মাথায় সত্যিকার অর্থেই আকাশ

ভেঙে পড়েছে। এই প্রথম ছেলের হাতে এভাবে বোকা হওয়ার তিক্ত অনুভূতি টের পাচ্ছিলেন। কেমন ঘাড়ত্যাড়ার মতো, নিখুঁতভাবে একের পর এক মিথ্যে বলে তাদের বোকা বানিয়ে গেছে ও। অথচ তারা বিন্দুমাত্র টেরও পায়নি। কাজের মহিলা যদি এসব না বলত, তাহলে এখনো তিনি পায়ের উপর পা ফেলে নিশ্চিত্তে বসে থাকতেন এটা ভেবে, ইমামার সাথে সালার ইনভলভ না। ইমামার হারিয়ে যাওয়ায় সালারের কোনো হাত নেই।

সালার কয়েকদিন বাড়িতে থেকে কলেজে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে। সিকান্দার উসমান জানেন ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। আর হাশিম মুবীনের এসব সত্য জেনে যাওয়ার ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে, খুব ভালো করেই বোঝেন তিনি। কিছুক্ষণ আগের নিশ্চিত্তভাব এক ঝটকায় উড়ে যায়। আন্দাজ করতে পারছিলেন সেই কাগজপত্র কীসের হতে পারে। পাঁচজন মানুষের উপস্থিতির মানে কী। সালার ও ইমামার মাঝে এখন কী সম্পর্ক। তখন মন বলছিল গিয়ে ছেলের গলা টিপে ধরতে বা গুলি করে মারতে। কিন্তু এই

কোনোটা করা তার পক্ষে সম্ভব না। সালার সিকান্দার তার সেই ছেলে, যাকে সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু এভাবে ছেলের হাতে বোকা হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, এরপর থেকে ওর কোনো কথায় বিশ্বাস করবেন না। পরবর্তী সব পদক্ষেপ লুকিয়ে রাখবেন, যেমন ও করে যাচ্ছিল।

‘ইমামার সাথে ওর পরিচয় কী করে হলো?’ সিকান্দার উসমান অস্থির হয়ে স্ত্রী তায়্যিবাকে বললেন।

"আমি কী করে বলব ইমামার সাথে পরিচয় কীভাবে? আমার আঙুল ধরে হাঁটা কোনো বাচ্চা না ও।" তায়্যিবা বিরক্ত হয়ে বললেন।

‘আমি তোমাকে বারবার বলেছি ওর ওপর নজর রাখো, কিন্তু তুমি...? নিজের এক্টিভিটি থেকে অবসর মিললে না অন্য কাউকে নিয়ে ভাববো।’

'ওর ওপর নজর রাখা শুধু আমার একার দায়িত্ব ছিল?'
তায়িবা রেগে ওঠেন। 'আপনারও তো উচিত ছিল নিজের
এক্টিভিটি ছেড়ে ওকে সময় দেওয়া। সব দোষ আমার মাথায়
কেন আসে?'

'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। এই তর্ক শেষ করো।
ইমামার সাথে বিয়ে... তুমি আন্দাজ করতে পারছ হাশিম
মুবীন এ ব্যাপারে জানলে কী তামাশা দাঁড় করাবে? আমি তো
এটা ভেবেই কূল পাচ্ছি না তোমার ছেলে এইসব করার বুদ্ধি
কোথায় পায়? একবারও ভেবে দেখে না সোসাইটিতে
আমাদের পরিবারের সম্মানের কী হবে।' সিকান্দার উসমান
সোফায় স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন। 'একটা সমস্যা শেষ হতে
না-হতেই আরেকটা সমস্যা এনে দাঁড় করায়। এই চক্রের
নিশ্চয়ই গত বছর শুরু হয়েছে, যখন ও আত্মহত্যার চেষ্টার
পর মেয়েটা জীবন বাঁচিয়েছিল। আমরা আহান্মক ছিলাম যে,
এই বিষয়টা নজরে রাখিনি। নাহলে হয়তো এসব অনেক
আগেই সামনে এসে পড়ত।' সিকান্দার উসমান কপাল
ঘষতে ঘষতে বলছিলেন।

'আর নিশ্চয়ই মেয়েটা নিজের ইচ্ছেতে ওর সাথে জড়িয়েছে। নাহলে কেউ কাউকে জোর করে এভাবে বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু হাশিম মুবীন তো এমনভাবে হুংকার দিচ্ছে যেন এতে তার মেয়ের কোনো দোষ নেই, যা করার সব সালার করেছে। এমনকি গিয়ে অপহরণের কেসও দিয়ে এসেছে।' তায়িবা সিকান্দার নতুন করে ফুঁসে ওঠেন।

'সেটা যাইহোক, দোষ তোমার ছেলেরই। না এমন কাজে জড়াত, না এভাবে ফাঁসত। এখন শুধু ভাবো কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া যায়।'

'আমরা এখনো তেমন বাজেভাবে ফেঁসে যাইনি, যেমনটা আপনি ভাবছেন। এখনো দোষ প্রমাণিত হয়নি। পুলিশ বা হাশিম মুবীন আহমেদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ ছাড়া তারা কিছু করতে পারবে না।'

'যেদিন কোনো প্রমাণ তাদের হাতে লেগে যাবে তখন কী হবে? এটা ভেবেছ?'

‘আপনি সম্ভাবনার কথা বলছেন। এমনটা হয়নি, হতে পারে এমন কিছু হবেও না। ও যদি আমাদেরকে বড় ধোঁকা দিতে পারে, তবে আরেকটা ধোঁকা এটাও হতে পারে, মেয়েটার সাথে এখন সত্যিই ওর কোনো যোগাযোগ নেই।’

‘আর যদি যোগাযোগ রয়ে যায়? ওর সাথে কথা বলা মানে পাথরের সাথে মাথা ঠোকা। আবার মিথ্যে বলবো। মিথ্যে বলায় তো বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে।’ সিকান্দার উসমান বিতৃষ্ণার সুরে বললেন। ‘ব্যস, কয়েক মাস। বি.এ শেষ হয়ে গেলে বিদেশ পাঠিয়ে দেবো। অন্তত সারাক্ষণ হাশিম মুবীনের কারণে ওকে নিয়ে যে আশঙ্কায় ভুগি, তা কেটে যাবো।’ তিনি সিগারেটে টান দিলেন।

‘কিন্তু আপনি একটা বিষয় ভুলে যাচ্ছেন সিকান্দার!’ তায়িবা খুব গম্ভীর হয়ে বললেন।

‘সেটা আবার কী?’ সিকান্দার উসমান চমকে গিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকান।

'ইমামার সাথে ওর গোপন বিয়ে। এ ব্যাপারে যা করার আপনাকেই করতে হবে। কী করবেন?'

'তালাক ছাড়া এই বিয়ের আর কী করা যাবে?' সিকান্দার উসমান চূড়ান্ত ভঙ্গিতে বলেন।

'ছেলে বিয়ে স্বীকার করছে না, তালাকের কথা কীভাবে রাজি করাবেন।'

'যখন প্রমাণ সামনে আনব, তখন স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকবে না ওর।'

'বিয়ে স্বীকার করার পরও যদি ইমামাকে তালাক দিতে না চায়, তাহলে।'

'অন্য কোনো পথ বের করতে হবে, তা আমি বের করে নেব। নিজের ইচ্ছেতে হোক বা আমাকে জোর করতে হোক, আমি এই ঝামেলা শেষ করে ফেলব। এ ধরনের বিয়ে

মানুষকে সারা জীবন ভোগায়, এর পরিত্রাণ তো করতেই হবে। নাহলে এবার আমি পুরোপুরি ওকে নিজের সম্পত্তি যেতে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" সিকান্দার উসমান সোজাসাপটা বললেন।

হাসান কিছুক্ষণ আগে ইসলামাবাদের এক হোটেলে ছিল। যখন হঠাৎ করে ওর বাবার কল আসে। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে বাড়ি ফিরতে বলছেন। তার কণ্ঠস্বর বেশ অদ্ভুত ছিল, কিন্তু হাসান তাতে মাথা ঘামায়নি। তবে পনোরো মিনিট পর যখন বাড়িতে পৌঁছে পোর্টে সিকান্দার উসমানের গাড়ি দেখে, তখন সতর্ক হয়ে যায়। সালারদের বাড়ির সব গাড়ি আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার খুব ভালো করে চিনত ও। এই ব্যাপারে আমার জড়িয়ে থাকার কোনো প্রমাণ সিকান্দার আঙ্কেলের হাতে নেই, তাই আমার চিন্তা করার দরকার নেই। খুব বেশি হলে সালারের বন্ধু হিসেবে টুকটাক জিজ্ঞেস করতে এসেছে হয়তো। আমি খুব ঠান্ডা মাথায় উত্তর দেবো এবং কোনো অভিযোগ স্বীকার করব না। নার্ভাসনেস বাবার সামনে আমার পজিশন সন্দেহজনক করে তুলবে, তাই

আফ্কেলকে দেখে আমার অস্বাভাবিক আচরণ করা উচিত না। হাসান প্রথমে নিজের পরবর্তী আচরণ ঠিক করে এরপর নিশ্চিত ভঙ্গিতে ষ্টাডিরুমে ঢোকে। ওর বাবা কাসেম ফারুকীর সাথে সিকান্দার উসমান কফি খাচ্ছেন। কিন্তু তাদের চেহারার গান্ধীর্ষ আর দুশ্চিন্তা এক মুহূর্তেই পরিমাপ করে ফেলে ও।

'কেমন আছেন সিকান্দার আফ্কেল? এবার অনেকদিন পর আমাদের বাড়িতে এলেন।'

কাসেম বা সিকান্দার কেউ ওর কথায় সাড়া দিলেন না। তবু ও স্বাভাবিকভাবে কথা এগিয়ে নেয়। কোনো উত্তর আসে না। সিকান্দার উসমান মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখছিলেন।

'বসো।' কাসেম ফারুকী কঠিন গলায় বলে। 'সিকান্দার তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছে, সবকিছু সত্য সত্য বলবে। যদি কিছু মিথ্যে বলো, তাহলে আমি সিকান্দারকে বলে রেখেছি তোমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে। আমার

তরফ থেকে তুমি জাহান্নামে যাও, আমি বাঁচানোর চেষ্টা করব না।" ছেলেকে বসতে দেখেই কোনোরকম সূচনা ছাড়া জানিয়ে দেন তিনি।

'বাবা! কী বলছেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' হাসান অবাক হওয়ার ভান করে, যদিও মনে খড়ফড় করা শুরু হয়ে গেছে। পরিস্থিতি অত সহজ না, যতটা ভেবেছিল।

'ওভারস্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো না। সিকান্দার জিজ্ঞেস করো যা জানতে চাও, আমিও দেখি কীভাবে মিথ্যে বলে।'

'ইমামার সাথে সালারের বিয়ের সময় তুমি ছিলে?'

'আফ্কেল। আপনি কীসের বিয়ে কথা বলছেন? কোন বিয়ে? কার বিয়ে?'

'সেই বিয়ে, যা আমার অনুপস্থিতিতে, আমার বাড়িতে হয়েছে। যার জন্য ইমামার কাছে পেপার'স পাঠিয়েছিলো।'

'প্লিজ আফ্লেল! আপনি খামোখা দোষ চাপাচ্ছেন আমার ওপর। আপনাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করি কিন্তু সালারের কোনো বিয়ে সম্পর্কে জানা নেই। না আমার জানামতে ও বিয়ে করেছে। আমি তো সেই মেয়েকেও চিনি না, যার নাম বলছেন। থাকতে পারে কোনো মেয়ের সাথে সালারের সম্পর্ক, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। ও আমাকে সব কথা বলে না।'

সিকান্দার উসমান আর কাসেম ফারুকী নীরবে ওর কথা শুনলেন। ও বলা শেষ করলে সিকান্দার উসমান সামনে থাকা একটা খাম তুলে কিছু কাগজপত্র বের করে ওর সামনে রাখলেন। হাসানের চেহারার রং এইবার উড়ে যায়। এটা সালাার আর ইমামার নিকাহনামা।

'এদিকে তাকাও, তোমার সিগনেচার না?' সিকান্দার উসমান শীতল গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

যদি এই প্রশ্ন কাসেম ফারুকীর সামনে না করতেন, তাহলে ও এই সিগনেচারকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করত। কিন্তু এখন এমন কিছু করা সম্ভব না। 'হ্যাঁ, এটা আমার সিগনেচার। কিন্তু আমি করিনি।' বলতে গিয়ে তোতলায়।

'তাহলে কে করেছে, তোমার সাথে থাকা ফেরেশতা নাকি সালার।' কাসেম ফারুকী বিদ্রূপের সুরে বললেন।

হাসান কিছু বলতে পারল না, ঘাবড়ে গিয়ে পালাক্রমে তাদের দিকে তাকায়। ওর কল্পনার জগতেও ছিল না সিকান্দার উসমান এভাবে নিকাহনামা সামনে এনে রাখবেন। এটাও বুঝছে না তিনি এই নিকাহনামা কোথেকে জোগাড় করেছেন সালারের কাছ থেকে, নাকি...? ওর সমস্ত বিচক্ষণতা, তীক্ষ্ণতা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কোথাও অনেক দূরে পড়ে রইল।

'এরপরও স্বীকার করবে না ইমামার সাথে সালারের বিয়ে তোমার উপস্থিতিতে হয়েছিল? কাসেম ফারুকী রেগে বললেন।

'বাবা। এতে আমার কোনো দোষ নেই। যা হয়েছে সালারের জেদের কারণে, ও আমাকে বাধ্য করেছে।' হাসান হঠাৎ করে সত্য বলার সিদ্ধান্ত নেয়।

'এখন কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। যত মিথ্যে বলবে, তত অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে।'

'আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু...'

কাসেম ফারুকী ছেলের কথায় বাধা দিয়ে বললেন। 'এখানে তোমাকে সাফাই দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি। শুধু বলো মেয়েটাকে কোথায় রেখেছে সালার?'

'বাবা। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।' হাসান দ্রুত বলল।



‘তুমি আবার মিথ্যে বলছ।’

‘আই সোয়্যার বাবা! আমি সত্যিই কিছু জানি না। সালার মেয়েটাকে লাহোর রেখে এসেছে।’

‘এসব মিথ্যে অন্য কাউকে বলো, আমি সত্য শুনতে চাই।’
কাসেম ফারুকী কড়া গলায় বললেন।

‘আমি মিথ্যে বলছি না বাবা।’ হাসান প্রতিবাদ করল।

‘লাহোরে কোথায় রেখে এসেছে?’

‘রাস্তায়, মেয়েটা বলেছে নিজেই চলে যাবে।’

‘তুমি সিকান্দার আর আমাকে বোকা ভাবছ? সালার মেয়েটাকে বিয়ে করেছে, এরপর রাস্তায় নিয়ে রেখে এসেছে? বোকা বানানো বন্ধ করো আমাদের।’ কাসেম ফারুকী খেপে উঠলেন।

'আমি সত্যি বলছি বাবা! অন্তত আমাকে এটাই বলেছে, মেয়েটাকে রাস্তায় রেখে এসেছে ও।'

'তাহলে তুমি ওকে জিজ্ঞেস করোনি মেয়েটাকে বিয়ে কেন করল? যদি শেষে এমন কিছু করবো।'

'বাবা! এই বিয়ে সালার মেয়েটাকে সাহায্য করার জন্য করেছে। মেয়ের পরিবার জোর করে একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাইছিল। মেয়েটা সালারের সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য চায়। সালার সাহায্য করতে রাজি হয়ে যায়। মেয়েটা চেয়েছে সালার ওকে সাময়িক সময়ের জন্য বিয়ে করুক, যাতে ওর বাবা-মা জোর করে বিয়ে দিতে চাইলে এই বিয়ের কথা জানিয়ে প্রয়োজনে তাদেরকে থামাতে পারে।' হাসান এই পর্যায়ে এসে সত্যকে আর ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারে না। বরং সব সত্য বলার সিদ্ধান্ত নেয়। 'আর যেন সালারের সাহায্যে মেয়েটাকে ছাড়ানো হয়। এটা কোনো প্রেম-ভালোবাসার বিয়ে ছিল না। তাছাড়া মেয়েটা অন্য এক ছেলেকে পছন্দ করে।'

‘আপনারা নিকাহনামা দেখুন, মেয়েটা তালাকের হক নিয়ে রেখেছে। যাতে প্রয়োজন হলে সালারের সাথে যোগাযোগ না করেই তালাক নিতে পারে।’

‘আর কিছু আছে?’ কাসেম ফারুকী ছেলেকে বললেন।

হাসান কিছু বলল না, চুপ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

‘আমি তোমার কোনো কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই। তুমি অনেক সুন্দর গল্প সাজিয়েছ। কিন্তু আমরা কোনো বাচ্চা না যে, এই গল্পে বিশ্বাস করব। এখন তোমাকে ইমামা পর্যন্ত পৌঁছাতে সিকান্দারকে সাহায্য করতে হবে।’ কাসেম ফারুকী কড়া সুরে বললেন।

‘বাবা... আমি এটা কীভাবে করব? আমি জানি না তো।’ হাসান প্রতিবাদ জানায়।

'কীভাবে করবে সেটা খুঁজে বের করা তোমার কাজ। আমার কাজ শুধু তোমাকে বলে দেওয়া।'

'বাবা প্লিজ! বিশ্বাস করুন, আমি ইমামার ব্যাপারে কিছু জানি না। বিয়ে করানো ছাড়া, কিছুতে ছিলাম না।'

'তুমি সালারের এত কাছের। নিজের গোপন বিয়েতে তোমাকে সাক্ষী রেখেছে, কিন্তু তুমি জানো না তোমার বন্ধুর স্ত্রী বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় গেছে? আমি এটা মেনে নিতে প্রস্তুত না হাসান, কোনো অবস্থাতেই না।' কাসেম ফারুকী সোজাসাপটা বললেন। 'যদি না জানো তাহলে জানার চেষ্টা করো কোথায় সেই মেয়ে। সালার তোমার কাছ থেকে কিছু লুকাবে না।'

'বাবা। অনেককিছুই সালার আমাকে বলে না।'

'সালার তোমাকে সব বলুক, বা না বলুক: আমি এখন শুধু একটা বিষয় জানতে আগ্রহী। তা হচ্ছে ইমামার খোঁজ।'

যেভাবেই হোক সালারের কাছ থেকে ঠিকানা বের করো। আর হ্যাঁ, সালার যাতে কোনোভাবে জানতে না পারে সিকান্দার এই বিয়ে সম্পর্কে জেনে গেছে বা এই ব্যাপারে তোমার সাথে দেখা করেছে। যদি আমার কানে আসে সালার এই ব্যাপারে জেনে গেছে তাহলে আমি তোমার কী অবস্থা করব ভেবে দেখো। আমি সিকান্দারকে অনুমতি দিয়ে রেখেছি হাশিম মুবীনকে তোমার নাম বলার। এরপর হাশিম মুবীন তোমার সাথে পুলিশ বা অন্য মাধ্যমে মুখোমুখি হবে, আমি সেটা মোটেও পরোয়া করব না। এখন তোমাকে ঠিক করতে হবে সালারের সাথে বন্ধুত্ব রাখা নাকি এই বাড়িতে থাকা।" কাসেম ফারুকী চূড়ান্ত কণ্ঠে বলেন।

‘বাবা! আমি যেকোনোভাবে হোক ইমামার ঠিকানা জানার চেষ্টা করব। সালারের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলব। জানাব না সিকান্দার আফ্কেল পুরো ব্যাপারটা জেনে গেছেন।’ হাসান যান্ত্রিকভাবে বলছিল। এবার সত্যি সত্যিই খুব বাজেভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ফেঁসে গেছে।

সালার কয়েকদিন ঘরবন্দি থেকে জোর করে কলেজে যাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। হাশিম মুবীন এবং তার পরিবার ইমামার খোঁজে আকাশ-পাতাল এক করে ফেলছে। যদিও তা অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। তবু তার বাড়ির কাজের লোক এবং পুলিশের মাধ্যমে সিকান্দার উসমানের কানে খবর আসে। তারা লাহোরে ইমামার সব ফ্রেন্ডের সাথেও যোগাযোগ করেছে, যারা জানাশোনার মধ্যে ছিল।

একদিন পত্রিকায় বাবর জাভেদ নামক এক লোকের নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি দেখে সালার। যার খোঁজ দিতে পারলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেওয়া হবে। এই নামের সাথে ভালো করে পরিচিত ছিল ও। কারণ এটা সেই ছদ্মনাম, যা হাসান ইমামার স্বামীর নাম হিসেবে উকিলকে দিয়েছে। তাই সন্দেহ নেই এই বিজ্ঞপ্তি ইমামার পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া। যদিও নিচে দেওয়া ফোন নাম্বার ইমামার বাড়ির না। আন্দাজ করতে পারছিল পুলিশ উকিল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং উকিল নাম বলে দিয়েছে। এখন এই সত্য শুধু হাসান আর ও জানে, আদতে বাবর জাভেদের কোনো অস্তিত্ব নেই। স্বস্তি পায়,

কিছুটা হলেও হাশিম মুবীনকে ধাঁধায় ফেলতে পেরেছে। পুরোটা সময়জুড়ে ইমামার কলের অপেক্ষা করে ও। কয়েকবার নিজে কল করে মোবাইল বন্ধ পেয়েছে। ওর মাঝে কৌতূহল ইমামা কোথায় গেল? এই কৌতূহল বাড়িয়ে তোলায় কিছুটা হাসানের হাত আছে, যে বারবার ইমামার কথা জিজ্ঞেস করে। মাঝেমধ্যে সালার বিরক্ত হয়ে ওঠে। 'আমি কী করে জানব কোথায় ও? কেন যোগাযোগ করছে না? এখন তো মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে তোমার বেশি আগ্রহ ওর প্রতি।'

সালারের বিন্দুমাত্রও আন্দাজ ছিল না, হাসানের এই আগ্রহ চাপের কারণে। হাসান বাজেভাবে ফেঁসে ছিল। সালারের অনুমান জালালের কাছে চলে গেছে ইমামা। হতে পারে বিয়েও করে নিয়েছে। জালালের বিয়ের ব্যাপারে মিথ্যে বললেও জানে ইমামা ওর কথায় বিশ্বাস করেনি। তাই নিশ্চয়ই জালালের কাছে যাবে। সালারের ইচ্ছে ছিল জালালের সাথে যোগাযোগ করার বা একবার গিয়ে দেখা করার, যাতে জানতে পারে ইমামা তার সাথে আছে।

সিকান্দার উসমান সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখছেন। জানে এই কাজ করা মানুষ তিনি একা নন কিনা। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনোটা সম্ভব না। বরং হাশিম মুবীন আহমেদও একই কাজ করছে। তাই যদি লাহোর যেতে চায়, প্রথমত সিকান্দার উসমান যেতেই দেবে না। আর ধরে নেওয়া যাক অনুমতি দিলো। তাহলে নিজেও সাথে যেতে চাইবে, যা চায় না ও।

সময় গড়ানোর সাথে সাথে বিষয়টার প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। এখন সবকিছু বোকামি মনে হয় ওর। এমন বোকামি, যার জন্য চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। সিকান্দার আর তায়িবা এখন সারাক্ষণ বাড়িতে থাকে। কোথাও যেতে দেয় না। কোথাও যাওয়ার হলে খুব খাতির করে অনুমতি নেওয়া লাগে। হাসানও এখন কম-কম দেখা করে। কারণ জানে না ও। সবকিছু মিলিয়ে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

রাতে কম্পিউটারে বসে থাকা অবস্থায় কল আসে সালারের। কী-বোর্ডে হাত রেখে উদাসীন ভঙ্গিতে মোবাইল তোলে।

কিন্তু মোবাইলের স্ক্রিন দেখে ধাক্কা খায়, নাম্বার ওর নিজের মোবাইলের। তার মানে ইমামা ফোন করেছে।

'অবশেষে আপনার মনে পড়ল আমাকে।' সালার শিস বাজায়। ওর মুড ফ্রেশ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগের একঘেয়েমি এখন আর নেই। 'আমি তো ধরে নিয়েছি তুমি আর কখনো কল করবে না। এত সময় লাগিয়ে দিলে।'

ইমামা বলল। 'অনেকদিন ধরেই তোমাকে কল করতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না।'

'কোনো ঝামেলা হয়েছে? ফোন তো তোমার কাছেই ছিল।' সালার বলে।

'হয়েছিল কিছু ঝামেলা।' ইমামা সংক্ষেপে বলল।

'তুমি এখন কোথায়?' সালার কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'বাচ্চাদের মতো প্রশ্ন করো না সালার! যেহেতু জানো বলব না, অযথা কেন জিজ্ঞেস করছ? আমার বাড়ির লোক কেমন আছে?'

সালার অবাক হয়। এই প্রশ্ন আশা করেনি। 'একদম ঠিক আছে, আনন্দে আছে, মজা করছে।' টিটকারি মেরে বলল। 'তুমি সত্যিই আদর্শ মেয়ে। পালিয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি আর বাড়ির লোকদের নিয়ে তোমার কত চিন্তা. how nice!'

অপরপাশ কিছুক্ষণ নীরব রইল। এরপর ইমামা বলল। 'ওয়াসিম কেমন আছে?'

'খারাপ থাকবে?' সালারের সুরে কোনো পরিবর্তন নেই। 'তারা জেনে যায়নি তো তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে?'

'শুধু জেনেছে? মাই ডিয়ার ইমামা! পুলিশ সেই দিনই আমার বাড়িতে পৌঁছে গেছে, যেদিন তোমাকে আমি লাহোর রেখে এসেছি।' সালার উপহাসের সুরে বলল।

'তোমার বাবা আমার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে তোমাকে অপহরণের দায়ে' হাসল। 'একটু ভাবো, আমার মতো মানুষ কাউকে অপহরণ করতে পারে, সেটাও তোমাকে? যে কিনা যেকোনো সময় মানুষকে গুলি করতে প্রস্তুত থাকে।' ওর কণ্ঠে এবার বিদ্রূপ ছিল। 'তোমার বাবা পুরো চেষ্টা করেছে আমাকে জেলে ঢোকানোর এবং বাকি জীবন সেখানে কাটানোর। কিন্তু আমি হয়তো ভাগ্যবান হয়ে জন্মেছি, যার ফলে বেঁচে গেছি। বাড়ি থেকে কলেজ, সব জায়গায় আমার ওপর নজর রাখা হয়। হুমকির কল আসে, আরও অনেক কিছু। তোমাকে কত কী বলব... যাইহোক বলা চলে, তোমার ফ্যামিলি আমাদেরকে নিয়ে ভালোই টানা হেঁচড়া করেছে।'

'আমি বুঝতে পারিনি তারা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।' ইমামা ক্ষমাপ্রার্থী সুরে বলল। 'আমি ভেবেছিলাম আর যাইহোক তাদের সন্দেহ তোমার ওপর যাবে না। আমার জন্য এত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, আমি দুঃখিত!'

'আসলেই তোমার জন্য আমাকে অনেক সমস্যা সামলাতে হচ্ছে। তোমার কী খবর?'

'আমার চেষ্টা ছিল আগে নিজেকে নিরাপদ করা, এরপর তোমাকে কল দেওয়া। এখন নিরাপদে আছি।'

সালার কৌতূহলী হয়ে মনোযোগের সাথে শুনছিল।

'তোমার মোবাইল এখন আর ব্যবহার করব না। এটা ফেরত পাঠাতে চাইলেও সম্ভব না।' ইমামা বলছে। 'টাকা পাঠিয়ে দেবো, যা তুমি খরচ করেছিলে।'

সালার বাধা দিয়ে বলল। 'টাকার হিসাব বাদ দাও। দরকার নেই। মোবাইলও লাগবে না। আমার কাছে আরেকটা আছে। চাইলে ওটা ব্যবহারও করতে পারো।'

'না, এখন আর এটা ব্যবহার করব না। প্রয়োজন শেষ আমার।' একটু চুপ হয়ে ইমামা বলল। 'এখন আমাকে তালাকের

কাগজ পাঠিয়ে দাও। তালাকের কাগজের সাথে নিকাহনামার একটা কপি। যা আমি আগে নিতে পারিনি।

'কোথায় পাঠাব?' সালার বলল। ওর মাথায় কাজ করে ইমামা যেহেতু তালাকের কথা বলছে, এর মানে এখনো কাউকে বিয়ে করেনি। না তালাকের সেই হক ব্যবহার করেছে, যা নিকাহনামায় দিয়ে রাখা।

'সেই উকিলের কাছে পাঠাও, যাকে হায়ার করেছিলে। আর আমাকে ওর নাম-ঠিকানা বলো। তার কাছ থেকে নিয়ে নেবা।'

সালার হাসে। ইমামার সতর্কতা দেখে। 'কিন্তু সেই উকিলের সাথে আমার তো সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই, আমি চিনিও না। তাহলে পেপার'স কী করে তার পর্যন্ত পৌঁছাব?'

'যেই বন্ধুর মাধ্যমে উকিল হায়ার করেছিলে, সেই বন্ধুকে দিয়ে পাঠাও।'

এটা নিশ্চিত যে, ইমামা কোনোভাবেই সালারকে নিজের ঠিকানা দিতে প্রস্তুত না এবং এর ওপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'তুমি তালাক নিতে চাইছ কেন?' সালার তখন খুব ফুরফুরে মেজাজে।

অপরপাশে নীরবতা নেমে আসে। হয়তো ইমামা এই প্রশ্ন আশা করেনি। 'তালাক নিতে কেন চাইছি...এই কথা জিজ্ঞেস করার মানে কী? এটা তো আগে থেকেই ঠিক করা, আমি তালাক নেব। তাহলে এই প্রশ্ন?' ওর কণ্ঠে বিস্ময়।

'কিন্তু এটা তখনের কথা ছিল, এখন তো অনেক সময় কেটে গেছে। এখন আমি তোমাকে তালাক দিতে চাই না।' সালার খুব গম্ভীর হয়ে বলল। আন্দাজ করতে পারছিল অপরপাশে ইমামার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। 'কী বলছ তুমি...?'

'এটা বলছি ইমামা ডিয়ার। আমি তোমাকে তালাক দিতে চাই না।' সালার আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটায়।

'তুমি... তুমি তালাকের হক আগেই আমাকে দিয়ে রেখেছ।' ইমামা নিরুত্তাপ গলায় বলল।

'কখন, কোথায়, কোন সময়... কোন শতাব্দীতে?' সালার শান্তভাবে বলে।

'তোমার মনে থাকা উচিত, বিয়ের আগে পরিষ্কার বলেছিলাম নিকাহনামায় আমি তালাকের হক চাই। তুমি এখন তালাক দিতে না চাইলেও আমি সেই হক ব্যবহার করতে পারি।'

'যদি আমি হক দিতাম তাহলে তুমি ব্যবহার করতে পারতে। কিন্তু আমি এমন কোনো হক দেইনি। তুমি নিকাহনামা দেখোনি? ওখানে এমন কিছু ছিল না। যাইহোক দেখেছ নিশ্চয়ই, নাহলে আজ তালাকের কথা কেন বলছ?'

অপরপাশে আবার নীরবতা নেমে আসে। সালার বাতাসে তীর ছুঁড়লেও তা লক্ষ্যে গিয়ে লেগেছে। ইমামা হয়তো সাইন করার সময় পেপার'স চেক করার সময় পায়নি। সালার এপাশে বেশ নিরাপদবোধ করে।

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিলে?'

অনেকক্ষণ পর ইমামাকে বলতে শোনে সালার। 'হ্যাঁ ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তুমি পিস্তল দেখিয়ে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলো।' শক্ত কণ্ঠে বলল। 'আমার মনে হয় তুমি-আমি একসাথে মিলে একটা দুর্দান্ত জীবন কাটাতে পারব। আমাদের দু'জনের মাঝে এত খামতি আর ত্রুটি আছে যে, বেশ সুন্দরভাবে একে-অপরের পরিপূরক হয়ে যাব।'

'সালার! জীবন আর তোমার সাথে কাটানো... এটা অসম্ভব।' ইমামা তেজি গলায় বলল।

'এখন তো নেপোলিয়নের বাণী পুনরাবৃত্তি করতে হয়, আমার অভিধানে সম্ভব নয় বলতে কোনো শব্দ নেই। অথবা অনুরোধ করা উচিত, আসো দু'জন মিলে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলি।' সালার টিটকারি মারছে।

"তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, একটা শেষ উপকার করো; তালাক দিয়ে দাও।"

'আমি তোমার উপকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, এখন আর পারব না। তাছাড়া এই উপকার তো অসম্ভব।'

"আমি তোমার টাইপের মেয়ে নই সালার! তোমার-আমার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নাহলে হয়তো তোমার প্রস্তাব ভেবে দেখতাম। কিন্তু এমন সময় এই পরিস্থিতিতে মোটেও তা সম্ভব না। প্লিজ! তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও।" ইমামা এখন নরম গলায় বলছিল।

সালারের মন চাইছিল জোরে হেসে উঠতে। 'যদি তুমি আমার প্রস্তাব ভেবে দেখার প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে আমি আমার জীবনযাত্রা বদলে নেব।'

‘বুঝতে চেষ্টা করো, তোমার-আমার সবকিছু আলাদা। জীবনের ফিলোসোফিই ভিন্ন। আমরা দু'জন একসাথে থাকতে পারব না।’ ইমামা বিরক্ত হয়।

'না তো, তোমার-আমার ফিলোসোফি অফ লাইফ অনেক মেলে। তোমাকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। যদি না-ও মেলে, তবে একটু মানিয়ে নিলেই মিলতে শুরু করবে।' সালার এমনভাবে বলছিল, যেন সব ঠিক করে রেখেছে। 'তাছাড়া আমার মাঝে কমতি কীসের? আমি তোমার পুরনো ফিয়ন্সের মতো সুদর্শন না হলেও, জালাল আনসারের মতো সাধারণ চেহারার না। আমার ফ্যামিলিকেও ভালোভাবে চেনো তুমি। ক্যারিয়ার আমার কত হিট হবে তোমার আন্দাজ নেই। আমি সবদিক থেকে জালালের চেয়ে ভালো।' নিজের

প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলে। চোখে চমক আর ঠোঁটে হাসি। ও ইচ্ছেমতো দাবাচ্ছে, ইমামাও দাবছিল।

"আমার জন্য কেউ জালাল হতে পারবে না। আর তুমি... তুমি তো কোনো অবস্থাতেই না।" ইমামার কণ্ঠ এবার লক্ষন করার মতো কর্কশ ছিল।

'কেন?' সালার অবুঝ হওয়ার ভান ধরে জিজ্ঞেস করে।

'তোমাকে আমার ভালো লাগে না। কেন বুঝতে চাইছ না? দেখো, তুমি তালাক না দিলে আমি কোটে যাব।' ইমামা এবার হুমকি দেয়।

সালার হুমকি শুনে হাসে। 'You're most welcome. যখন খুশি যেতে পারো। দেখা করার জন্য কোর্টের চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায়। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা বলার মজাই আলাদা।' তচ্ছিল্যের সাথে বলে। 'কিন্তু তোমার মনে

রাখা উচিত কোটে আমি একা আসব না: তোমার বাবা-মা'ও আসবে।"

'সালার! আমার জীবন ইতিমধ্যে অনেক সমস্যায় জর্জরিত, তুমি আর তা বাড়িয়ে না। আমার জীবন এমনিতেই অনেক কঠিন। প্রতিটি দিনের সাথে আরও কঠিনতর হয়ে উঠছে। তুমি অন্তত আমার জন্য নতুন ঝামেলা তৈরি করো না।' ইমামার কণ্ঠে দুঃখ ও অসহায়ত্ববোধ ছিল।

সালার আরও সুযোগ পায়। 'আমি তোমার সমস্যা বাড়াচ্ছি? মাই ডিয়ার। তোমার জীবন সহজ করতে গিয়ে নিজে নষ্ট হচ্ছি। ভেবে দেখো, আমার সাথে থাকলে কত ভালো ও নিরাপদ জীবন কাটাতে পারবে।' বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

'তোমার জানা আছে আমি এত কষ্ট কেন সহ্য করছি। তারপরও তোমার মনে হয় আমি এমন একজনের সাথে জীবন কাটাতে রাজি হয়ে যাব, যে সেই সব কবির গুনাহ

করে, যা আমার নবী অপছন্দ করতেন? নেক নারীরা নেক পুরুষের জন্য এবং বদ নারীরা বদ পুরুষের জন্য। আমি জীবনে অসংখ্য ভুল করেছি, কিন্তু আমি এত খারাপ না যে, তোমার মতো মানুষ আমার জীবনে আসবে। জালালকে হয়তো আমি পাইনি, তাই বলে তোমার সাথে জীবন কাটাব? অসম্ভব!" ইমামা কোনোরকম ভদ্রতার তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ তিক্ত গলায় বলল।

'হয়তো এজন্যই জালাল তোমাকে বিয়ে করেনি। কারণ নেক পুরুষের জন্য নেক নারী, তোমার মতো না।' সালারও কোনো অংশে ছেড়ে বলল না।

অপরপাশ নীরব হয়ে যায়। নীরবতা এত লম্বা ছিল যে, সালারকে আবার হ্যালো বলতে হয়। 'হ্যালো! শুনছ তুমি?'

'সালার আমাকে তালাক দিয়ে দাও।' ইমামার কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে আসছে। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সুখ পায় সালার। 'কোটে গিয়ে নাও, যা একটু আগে বললো।'

অপরপাশ থেকে ফোন কেটে দেওয়া হয়।

হাসান এই কয়েক মাসে সালারের কাছ থেকে ইমামার ব্যাপারে জানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। তবে হাসানের বয়ান অনুসারে ব্যর্থ ও। কিন্তু সিকান্দার আর কাসেম সাহেব এই কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত না যে, সালারের সাথে ইমামার যোগাযোগ নেই। তারা নিজেদের মতো করে ইমামার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু ফলাফল ব্যর্থতাই আসে। সিকান্দার উসমান ইউএস'র বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ছেলেকে অ্যাপ্লাই করে রাখতে বলেছিলেন। জানতেন ওর

একাডেমিক রেকর্ড দেখে যেকোনো ইউনিভার্সিটি একে
চান্স দিতে পেরে খুশি হবে।

ইমামা আর ফোন করেনি। যদিও সালার ভেবে রেখেছিল
ইমামা আবার ফোন করলে বলবে নিকাহনামায় তালাকের
হুক দেওয়া। নিকাহনামার একটা কপিও পাঠিয়ে দেবে।
এটাও স্বীকার করবে যে, এগুলো মজা ছিল। কিন্তু ফোন
করলেও ইমামা আর কোনো যোগাযোগ করেনি। সালারও
নিজের কাগজপত্রের ভিড়ে নিকাহনামায় চোখ বোলানোর
কষ্ট করেনি। নাহলে অনেক আগেই টের পেয়ে যেত ওটা
ড্রয়ারে নেই। শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখতে পায়
সিকান্দার উসমান ওর অপেক্ষা করছে।

'নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আজ রাতের ফ্লাইটে তুমি আমেরিকা যাচ্ছ কামরানের কাছে।'

'কেন পাপা! এমন হঠাৎ? সবকিছু ঠিক আছে?'

'সব ঠিক আছে, তুমি ছাড়া।' সিকান্দার বললেন।

'তাহলে এমন হঠাৎ করে কেন পাঠাচ্ছেন?'

'রাতে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে বলব। আপাতত গিয়ে জিনিসপত্র প্যাক করো।'

'পাপা প্লিজ! আমাকে বলুন, এভাবে হঠাৎ করে কেন পাঠাচ্ছেন?' সালার ক্ষীণ প্রতিবাদ করে।

'বললাম তো বলব। এখন গিয়ে প্যাকিং করো। নাহলে খালি হাতেই এয়ারপোর্ট রেখে আসব।' সিকান্দার উসমান হুমকি দেন।

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে রুমে চলে আসে ও। জিনিসপত্র প্যাক করতে করতে অশান্ত মন নিয়ে তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভাবতে থাকে। হঠাৎ ওর মাথায় কাজ করল। ড্রয়ার খুলে নিজের সব পেপার'স বের করে। ওখানে নিকাহনামা নেই। তার নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণ বুঝে যায়। পস্তাচ্ছিল নিকাহনামাটা এমন অসর্তকভাবে ফেলে রাখার জন্য। নিকাহনামা সিকান্দার উসমান ছাড়া অন্য কারো কাছে থাকা সম্ভব না। কারণ তিনি ছাড়া অন্য কেউ ওর রুমে এসে ড্রয়ারের কাগজপত্রে হাত দেওয়ার সাহস করবে না। কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না। চুপচাপ জিনিসপত্র প্যাক করে নেয়। তাও ভাবছিল এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে কী বলবেন তিনি। রাতে ওকে এয়ারপোর্ট ছেড়ে আসার জন্য শুধু সিকান্দার যান, তায়িবা আসেন না। তার আচরণ-কথাবার্তা খুব রুক্ষ ছিল। এবার কোনো প্রশ্নও তোলেনি।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে সিকান্দার উসমান ব্রিফকেস খুলে একটা সাদা কাগজ, সাথে কলম বের করেন। তারপর ব্রিফকেসের উপর ওগুলো রেখে সালারের দিকে বাড়িয়ে বললেন। 'এটায় সাইন করো।'

'এটা কী?' সালার অবাক হয়ে সাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে বলে।

'তুমি শুধু সাইন করো, প্রশ্ন করো না।' তিনি রুম্ম আওয়াজে বলেন।

কথা না বাড়িয়ে কাগজে সাইন করে দেয় সালার। কাগজটা ভাঁজ করে ব্রিফকেসে রাখেন সিকান্দার।

'যেসব তুমি করেছ, এরপর তোমার সাথে কিছু বলা বৃথা। ক্রমাগত মিথ্যে বলে গেছ আমাকে। এটা ভেবে যে, সত্য আমি কখনো জানতেই পারব না। মন তো বলছে তোমাকে

আমেরিকা পাঠানোর বদলে হাশিম মুবীনের হাতে তুলে দেই। যেন নিজের বোকামির পরিমাণ টের পাও। কিন্তু সমস্যা হলো আমি তোমার বাবা। তোমাকে বাঁচাতেই হবে। আমার এই দুর্বলতার আজ পর্যন্ত তুমি সুযোগ নিয়েছ, কিন্তু আর তা হবে না। নিকাহনামা ইমামাকে পাঠিয়ে দেবো আমি। যদি খবর পাই তুমি ওর সাথে যোগাযোগ করেছ বা চেষ্টা করছ, তাহলে এবার আমি যা করব, কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি আমার জন্য যথেষ্ট ঝামেলা দাঁড় করিয়েছ, এখন সেই ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়া উচিত; বুঝেছ?' তিনি কড়া গলায় বললেন।

উত্তরে কিছু না বলে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে সালার। অদ্ভুত ধরনের উদাসীনতা আর আত্মতুষ্টি নিয়ে। সিকান্দার উসমান মনে মনে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। এটা তার সেই ছেলে, যার আইকিউ ১৫০+। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ বলতে পারবে, ওর মাঝে আদৌ কোনো আইকিউ আছে কিনা...?

১ পাঁচ ১

পরবর্তী কয়েক মাস যা আমেরিকাতে কাটায়, তা সালারের জীবনের সবচেয়ে কঠিনতর দিন ছিল। এর আগেও বহুবার ফ্যামিলির সাথে বা তাদেরকে ছাড়া একা ছুটি কাটাতে আমেরিকা, ইউরোপ এসেছে ও। কিন্তু এবার সিকান্দার উসমান যেভাবে পাঠিয়েছেন, তা একদিকে ওকে ডিস্টার্ব করেছিল, অন্যদিকে আলাদা অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ওর যে বন্ধুরা এ-লেভেলের পর আমেরিকায় এসেছে, সব আলাদা আলাদা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কোনো এক এস্টেটে ছিল না কেউ। আত্মীয়-স্বজন এবং কাজিনদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এমনকি ওর নিজের ভাইবোনও সবাই এক জায়গায় ছিল না। পরিবারের সাথে ও এত অ্যাটাচ না যে, তাদের কমতি অনুভব করবে, হোমসিকনেসের শিকার হবে। এটা শুধু হঠাৎ জোর করে পাঠানোর ফলাফল, যা ওকে অস্থিরতায় ফেলেছে।

কামরান সারা দিন ইউনিভার্সিটিতে কাটায়। বাসায় ফিরলেও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সামনেই পরীক্ষা। অন্যদিকে সালার দিনভর আপার্টমেন্টে হয়তো মুভি দেখে, নাহলে চ্যানেল বদলে সময় কাটায়। আর যখন এই দুই কাজে বিরক্ত হয়ে পড়ে, তখন ঘুরতে বাইরে বেরিয়ে যায়। কামরান নিউইয়র্কের যে এলাকায় ছিল, ওখানের কোণায় কোণায় অভিযান চালায় ও। কোনো নাইট ক্লাব, ডিস্কো, পাব, বার, থিয়েটার, সিনেমা, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি বাকি নেই যেখানে যায়নি। একাডেমিক রেকর্ডের কারণে যে তিন আইভি লিগ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিল, সেখানে রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই ওর অ্যাডমিশন দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। এই ইউনিভার্সিটিগুলো এমন ছিল, যেখানে ওদের দূরের বা কাছেই জানাশোনা বলতে কেউ নেই। এটা ইচ্ছেকৃত করে ও। জানত সিকান্দার উসমান পুরো চেষ্টা করবে ওকে এমন কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করানোর, যেখানে ওর ভাইবোনের মধ্যে কেউ না হলেও, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ যাতে থাকে। এতে খোঁজখবর নিতে পারবে। সালারের পরিবর্তে তার অন্য কোনো ছেলে

যদি আইভি লিগের যেকোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেওয়ায় সফল হয়ে, তাহলে তিনি গর্ববোধ করতেন। বিষয়টাকে নিজের এবং পুরো পরিবারের সম্মান মনে করতেন। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে এই চিন্তায় দিশেহারা ছিল, এখন কীভাবে নজর রাখবেন।

ইউনিভার্সিটি ইয়েলকে বেছে নেয় ও। কারণ ছিল সেখানে সিকান্দার উসমানের জানাশোনা কেউ বা নিউ হ্যাভেনের মধ্যেও কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই ওদের। রেজাল্ট আসার পর ইউনিভার্সিটি থেকে মেরিট স্কলারশিপও পেয়ে যায়। অন্য সবার মতো হোস্টেলে না থেকে জেদ করে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়। সিকান্দার উসমান ওকে একা অ্যাপার্টমেন্টে রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু স্কলারশিপের কারণে এই পরিমাণ টাকা এসে পড়ে, যা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের খরচ মেটাতে পারবে ও। তাছাড়া ইউনিভার্সিটির খরচের জন্য সিকান্দার আগে থেকেই ছেলের অ্যাকাউন্টে একটা বড় অঙ্কের টাকা ট্রান্সফার করে রেখেছিলেন। যদিও তার ছোট ছেলে স্কলারশিপ পাবে বলে

খরচ বহন করে দিয়েছেন। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে তা হয়নি। সালার সিকান্দারকে আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষভাবে পাঠিয়েছেন তাকে দিয়ে সেই সব কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য, যা অন্য কেউ তার কাছ থেকে কখনো আদায় করতে পারেনি। ওকে আলাদাভাবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য। তার অন্য ছেলেমেয়েরা যেই দিককে পূর্ব বলে, সেটাকে পশ্চিম বলবে ও। অন্যরা যাকে পৃথিবী বলে, সেটাকে মহাকাশ বলে তর্ক শুরু করে দেবে। এই ছেলের কথা, কাজ এবং জেদের সামনে খুব বেশি হলে তিনি নিজের স্নায়ু প্রেশার ও কোলেস্টেরল লেভেল হাই করতে পারেন, এর বেশি কিছু না।

নিউ হ্যাভেনে শিফট হওয়ার আগে সিকান্দার আর তায়িবা ওর জন্য পাকিস্তান থেকে আমেরিকায় আসেন। যে কয়েকদিন সুযোগ ছিল ওকে বোঝাতে থাকেন। যা এক কান দিয়ে শুনে আরামসে অন্য কান দিয়ে বের করে ফেলত ও। বহু বছর ধরে এসব উপদেশ শুনে আসছে। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো হদিস থাকে না। পাকিস্তান ফেরার

সময় তারা খুব চিন্তিত, বলতে গেলে অনেকাংশে ভয়ের মাঝে ছিলেন।

সালার ফাইন্যান্সে এমবিএ করার জন্য ইয়েল এসেছে। আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিজের অসাধারণ মেধার বহিঃপ্রকাশ শুরু করে দেয়। পাকিস্তানে যেসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছিল তা খুব উঁচুমানের হলেও সেখানের পড়াশোনা ওর জন্য এক কথায় কেক ওয়ার্ক ছিল। কিন্তু ইয়েলে প্রতিযোগিতা কঠিন। এখানের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্টুডেন্টই অতি যোগ্য ও মেধাবীর পর্যায়ে। তারপরও খুব শীঘ্রই সবার নজরে চলে আসে ও। একদিকে এর পেছনে যেমন ওর ব্যতিক্রমী মেধার দখল, অন্যদিকে এর সাথে ওর আচরণ জড়ানো। এশিয়ান স্টুডেন্টদের ঐতিহ্যগত সামাজিকতা ও ভদ্রতা ওর মাঝে ছিল না এবং না সেই হীনম্মন্যতা, যা এসব স্টুডেন্ট আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসার সময় স্বভাবজাত নিয়ে আসে। ছোটবেলা থেকেই সেরা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছে ও। এমন সব প্রতিষ্ঠান, যেখানের অধিকাংশ শিক্ষকই দেশের বাইরের।

তাই খুব ভালো করে জানত এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো শিক্ষকরাও জ্ঞানের প্রবাহিত কোনো বর্ণা না। এটাও জানা কথা ইয়েল স্কলারশিপ দিয়ে এর ওপর অনুগ্রহ করেনি। ভাসিটির কোনো একটাকে বেছে নিলে ওখান থেকেও স্কলারশিপ দেওয়া হতো ওকে। এমন কিছু না হলেও ওর বাবা-মায়ের এই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ছিল, যা দিয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে অ্যাডমিশন নিতে পারার ক্ষমতা আছে।

ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, স্ট্যাটাস বা অ্যাবিলিটির গর্ব না থাকলে হয়তো সালার সিকান্দারের তিন্তু চলন-বলনের কারণে কেউই ওর দ্বারা প্রভাবিত হতো না। কিন্তু সেই অপূর্ণতা ওর আইকিউ পূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রফেসর এবং ক্লাসফেলোদের মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। এটাও প্রথমবার ঘটেনি। ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় এই ধরনের ছাপ ফেলে এসেছে। ও এমন স্টুডেন্ট না যে অহেতুক বিষয় নিয়ে তর্কে জড়াবে। ওর প্রশ্নই এমন হতো, তাৎক্ষণিকভাবে যার উত্তর দিতে প্রফেসরদের অসুবিধা হতো। উত্তর অন্তোষজনক হলেও

কিছু বলত না, চুপ থাকত। তবে সন্তুষ্টির আভাসও দিত না যে, উত্তর মনমতো হয়েছে। তর্ক শুধু সেইসব প্রফেসরের সঙ্গে করত, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকত, তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারবে অথবা তাদের সাথে যারা ঐতিহ্য বা একাডেমিক জ্ঞান থেকে শূন্য একবারে।

পড়াশোনা এখানেও সালারের জন্য খুব একটা কঠিন ছিল না। তাই পুরো সময় পড়াশোনায় কাটত না। আগের তুলনায় কিছুটা সময় বেশি দিতে হলেও নিজের জন্য এবং অকাজ করার মতো সময় বের করে ফেলত। হোমসিকনেসের শিকার মানুষ না ও, যে চব্বিশ ঘন্টা পাকিস্তান মিস করবে। তাছাড়া পাকিস্তানের সাথে এমন কোনো মায়া জড়ানো নেই যে, ওখানের সংস্কৃতি বা আবহাওয়া টানবে ওকে। আমেরিকা ওর জন্য নতুন বা অপরিচিত ছিল না। ওখানে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের খুঁজে তাদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করেনি ও। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ওখানকার বেশ কয়েকজন পাকিস্তানির সাথে আলাপ হয়ে যায়। ইউনিভার্সিটির সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন ও ক্লাবের প্রতি

ওর আগ্রহ ছিল, ওর কাছে সেগুলোর মেম্বারশিপও ছিল। পড়ালেখা শেষ করে বেশিরভাগ সময় অলস বিচরণে কাটাত। বিশেষ করে উইকেন্ড'স। সিনেমা, ক্লাব, ডিস্কো, থিয়েটার; ওর জীবন এই চারের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। কোনো নতুন ফিল্ম, স্টেজ প্লে, নতুন কনসার্ট, ইন্সট্রুমেন্টাল পারফরম্যান্স ছাড়ত না। এমনকি ছোট-বড় সবধরনের রেষ্টুরেন্ট, সবচেয়ে দামি থেকে কমদামি সব তথ্য ছিল ওর কাছে। সবকিছুর মাঝেও সেই অ্যাডভেঞ্চার মস্তিষ্কে গোঁথে ছিল, যার কারণে এখন ও আমেরিকায়।

সিকান্দার উসমান বিয়ের কথা কখন, কীভাবে এবং কার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, খোঁজার চেষ্টা করেনি ও। আন্দাজ করে নিয়েছিল কীভাবে জেনেছেন। হাসান বা নাসেরা বলেনি ওর বিশ্বাস। সুতরাং ইমামা হতে পারে। এটা ইমামার কাজ ওর বিশ্বাস ছিল। এ কারণেই যে ওর সাথে ফোনে কথা বলার পর ভেবেছে এর পরিবর্তে সিকান্দার উসমানের সাথে কথা হোক। হয়তো আর যোগাযোগ করেনি। সিকান্দার উসমান নিশ্চয়ই ইমামার সাথে কথা বলে

ওর রুম খুঁজে নিকাহনামা বের করেছে। কিন্তু এগুলো কখন হলো? এটা সেই প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজে পায়নি। তা যাইহোক না কেন, পাকিস্তান থেকে আমেরিকা এসে ইমামার প্রতি এর বিতৃষ্ণা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একের পর এক মেয়েটার জন্য বিপদ মাথায় নিয়ে এখন পস্তাচ্ছিল। এসব বিষয়ে ইমামার সাহায্য করতে কেন গিয়েছিল? মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে ভাবে, ইমামার মতো মেয়ের সাহায্য করতে রাজি কীভাবে হয়েছিল ও? সেটাও এই পর্যন্ত সাহায্য যে... এখন তা মনে পড়লেও বিরক্ত লাগে।

'আমি কেন ওকে সাহায্য করতে গেলাম? উচিত ছিল আমার সাথে যোগাযোগ করার পরই ওয়াসিমকে, ওর বাবা-মাকে বা নিজের বাবা-মাকে বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া কিংবা জালালের ব্যাপারে তাদেরকে বলে দেওয়া। উচিত হয়নি ওর অনুরোধে বিয়ে করা, ওকে এভাবে বাড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করা।' মাঝে মাঝে মনে হয় ছোট্ট একটা বাচ্চার মতো ইমামার হাতে ব্যবহার হয়েছে ও। এত আনুগত্য, এত ধৈর্য আদতে কীসের? যেখানে মেয়েটার সাথে ওর কোনো সংযোগ-

সম্পর্ক ছিল না। কোনোভাবে ইমামাকে সাহায্য করায় বাধ্য ছিল না। এখন তা অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে বেশি বোকামি মনে হচ্ছিল। সাইকোলজিস্টের মতো ইমামার প্রতি নিজের করা আচরণ বিশ্লেষণ করে নিজেই তৃপ্ত হয়ে যেত।

'সময় গেলে ইমামাও আমার মন থেকে চলে যাবে, পুরোপুরি। যদি না যায়, তাতেই-বা আমার কী যায়-আসে?' নিজেকে বোঝায় ও।

সময়ের সাথে সাথে এখানে সালারের ফ্রেন্ড সার্কেল বাড়তে থাকে। সেই সার্কেলের মধ্যে একটা নাম ছিল সাদ জাফর। সাদও করাচির বাসিন্দা। সালারের মতো উচ্চবংশীয় ও ধনী পরিবারের ছেলে। কিন্তু সালারের পরিবারের বিপরীতে সাদের পরিবার বেশ মাজহাবি। এটা সালারের অনুমান ছিল। সাদ খুব হাস্যরসিক মানুষ, দেখতেও ভালো। নিউ হ্যাভেনে একজন বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। তবে সেই বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে সময় নেয় সালার। কারণ এসেছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি জব করে। বেশভূষায় ধর্মের প্রতি সংযুক্তি ওর মনে হয়েছে

ওদের মাঝে কোনো মিল নেই। সাদ এমফিল করতে জানান দেয়। দাড়ি রাখে এবং ধর্ম সম্পর্কে অনেক জানে। ও জীবনে প্রথমবার এমন কারো সাথে বন্ধুত্ব করেছে, যে কিনা ধর্মভীরু। সাদ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এবং অন্যদেরকে নসিহত করে। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন ও ক্লাবে বেশ এক্টিভ। সালারের মতো আমেরিকায় সাদের কোনো নিকটাত্মীয় ছিল না। কেবল একজন দূরসম্পর্কের চাচা ছিল, যিনি অন্য এস্টেটে থাকতেন। হয়তো তাই সাদ নিজের একাকিত্ব দূর করার জন্য এত সোশ্যাল থাকত। ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আর এটা আদরের ফল যে, সাদের বাবা-মা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ পাঠাতে রাজি হয়েছেন। নাহলে সাদের অন্য দুই ভাই স্নাতক শেষ করে বাবার সাথে ব্যবসায় যোগ দিয়েছে। সাদও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকত। তবে সেই অ্যাপার্টমেন্টে আরও চারজন ছিল। চারজনের দুজন আরব, একজন বাংলাদেশি এবং আরেকজন পাকিস্তানি। সবাই স্টুডেন্ট।

প্রথম সাক্ষাতেই সালারের সাথে খুব আন্তরিক হয়ে মেশে সাদ। সালারের আমেরিকান বন্ধু জেফ যখন সালারের একাডেমিক রেকর্ডের কথা বলে, তখন অন্য সবার মতো সাদও মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। সাদের চেহারা দেখলে, বিশেষ করে দাড়ির দিকে তাকালে জালালের কথা মনে পড়ে যায়। দাড়ির কারণে দু'জনকে অদ্ভুতভাবে ঠিক একইরকম লাগে ওর কাছে। অনেক সময় সাদও অন্যসব বন্ধুর মতো উইকেন্ড সালারের সাথে কাটাত।

'তুমি একজন মুসলিম, অথচ ধর্ম মোটেই মানো না।' সাদ একবার বলল।

'আর তুমিও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানো।' সালার উত্তরে বলে।

'মানে কী?'

'মানে তুমি যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো। সারাক্ষণ ইসলামের কথা বলাতে থাকো, এসব ওভারঅ্যাক্টিং হয়ে যায়।' সালার পরিস্কার বলে। 'তুমি ক্লান্ত হও না সারাক্ষণ নামাজ পড়ে?'

'এটা ফরজ। আল্লাহর তরফ থেকে আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাঁর ইবাদত করতে এবং তাঁকে সবসময় মনে রাখতে।' সাদ বলল।

সালার অলস ভঙ্গিতে হাই তোলো।

'তোমারও ইবাদত করা উচিত, কারণ তুমিও মুসলমান।' সাদ ওকে বলল।

'আমি জানি, কিন্তু ইবাদত না করলে কি আমি মুসলমান থাকব না।' সালার তিক্ত সুরে বলে।

'শুধু নামে মুসলমান হয়ে জীবন কাটাতে চাও তুমি?'

'সাদ প্লিজ। এ ধরনের অহেতুক বিষয় নিয়ে তর্ক করবে না। আমি জানি তুমি ধর্মে আগ্রহী, কিন্তু আমি না, তা তুমিও জানো। ভালো হবে যদি আমরা একে-অপরের মতামত ও অনুভূতির খেয়াল রাখি এবং কেউ কাউকে কিছু চাপানোর চেষ্টা না করি। আমি যেমন তোমাকে বলি না নামাজ পড়া ছেড়ে দাও, তেমনি তুমিও আমাকে নামাজ পড়া বলতে এসো না।' সালার এত রূঢ়ভাবে বলল যে, সাদ চুপ হয়ে যায়।

কয়েকদিন পরের কথা। সালারের অ্যাপার্টমেন্টে আসে সাদ। আপ্যায়নের জন্য সালার কিচেনে এলে সাদও পেছন পেছন আসে। কথা বলতে বলতে ফ্রিজ খুলে খাবারের জিনিসের ওপর নজর বোলায়। সালার গতরাতে একটা ফাস্টফুড আউটলেট থেকে নিজের পছন্দের বার্গার নিয়ে এসেছে। ওটা ফ্রিজে ছিল, সাদ ওটাকে বের করে।

'এটা রেখে দাও, তোমার খাওয়ার মতো জিনিস না।' সালার দ্রুত বলল। মাইক্রোওয়েভের দিকে যাওয়ার সময় সাদ জিজ্ঞেস করল। 'কেন?'

'ওটায় শুয়োরের মাংস আছে।' সালার নির্বিকারভাবে বলল।

'ইয়ার্কি করো না তো।' সাদ থমকে দাঁড়ায়।

'এখানে ইয়ার্কির কী আছে?' সালার অবাক হয়ে তাকায়।

সাদ থ্রোয়িং স্টাইলে প্লেট শেলফের উপর রাখে। 'তুমি পোর্ক খাও?'

'আমি পোর্ক খাই না, শুধু এই বার্গার খাই। এটা আমার পছন্দের।' সালার বার্নার জ্বালায়।

'তুমি জানো না ইসলামে এটা হারাম?'

‘হ্যাঁ।’

"তারপরও?"

'এখন তুমি তাবলিগ শুরু করে দিও না। আমি শুধু পোর্ক না, সব ধরনের মাংস খাই।' সালার নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে ফ্রিজের দিকে যায়।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কিন্তু এতে অবিশ্বাস করার কী আছে? এটা খাওয়ার জন্যই তৈরি।' সালার ফ্রিজে থাকা দুধের বোতল বের করছিল।

'সবকিছু খাওয়ার জন্য না।' সাদ বলল। 'ঠিক আছে তুমি ধার্মিক না, কিন্তু মুসলমান তো। এটুকু তো জানো পোর্ক খাওয়া ইসলামে হারাম, অন্তত একজন মুসলমানের জন্য।'

সালার চুপচাপ নিজের কাজে মগ্ন ছিল।

'আমার জন্য কিছু বানিয়ে না, খাব না।' সাদ কিচেন থেকে বেরিয়ে যায়।

'কেন?' সালার ঘুরে সাদের দিকে তাকায়।

সাদ ওয়াশ বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছে।

'কী হয়েছে?' সালার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

সাদ জবাবে কিছু না বলে কালিমা পড়ে হাত ধুতে থাকে।
সালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠোঁট চেপে তাকিয়ে ছিল।

হাত ধোয়া শেষ করে সাদ বলল। 'আমি এই ফ্রিজে রাখা
কিছুই খেতে পারব না। এমনকি তোমার প্লেটেও না। যেহেতু
তুমি এই বার্গার খাও, তাহলে আরও কতকিছুই না খাও।
চলো বাইরে গিয়ে কিছু খাই।'

'এটা খুব ইসাল্টিং।' সালার কিছুটা রাগ হয়ে বলল।

'এখানে ইসাল্টিংয়ের কিছু নেই। আমি শুধু হারাম মাংস
খেতে চাইছি না, আর তুমি এসব বিষয়ে সতর্ক না।'

'আমি এই মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করিনি তোমাকে। খাবে না বলেই বাগার হাতে নিতেই নিষেধ করেছি।' সালার বলল।
'কিন্তু তোমার মনে হয় কোনো ফোবিয়া আছে। এমনভাবে রিঅ্যাক্ট করছ, যেন আমি ওই প্রাণী পুরো ফ্ল্যাটে পোষা শুরু করেছি এবং রাতদিন ওটার সাথেই থাকি।'

'চলো বাইরে যাই।' সাদ ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

'বাইরে গেলে বিল আমি পে করব না, তুমি করবে।' সালার বলে।

'ঠিক আছে আমি করব, সমস্যা নেই। চলো তুমি।' সাদ স্বস্তির শ্বাস ফেলে।

'আর হ্যাঁ, পরেরবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে এলে নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসবে।' সালারের সুরে ইয়ার্কি।

সাদ বলল। 'আচ্ছা নিয়ে আসব।'

উইকেন্ডে লেকের পাশে ঘুরতে আসে সালার। অনেক মানুষ এখানে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটা বেঞ্চে বসে খুব অলস ভঙ্গিতে আইসক্রিম স্টিক খেতে খেতে এদিক-ওদিক দেখছিল। তখন তিন বছরের একটা বাচ্চা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফুটবলের পেছনে দৌড়াচ্ছিল বাচ্চাটা। একটু দূরে কালো হিজাব পরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ে ওই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওখানে থাকা এশিয়ানদের মধ্যে একজন। তবে হিজাব পরিহিতা একমাত্র মেয়ে। অসাড়তা নিয়ে তাকে দেখছিল ও। বাচ্চাটা ফুটবলে লাথি দিয়ে ধীরে ধীরে বেঞ্চার দিকে আসে। আরেকটা লাথিতে বলটা সোজা ওর কাছে চলে আসে। অনিচ্ছাকৃতই বসে থাকা অবস্থায় ডান পা দিয়ে বলটা আটকে পা না সরিয়ে বসে রইল। এইবার ওর চোখ মেয়েটার পরিবর্তে বাচ্চাটার দিকে, যে দ্রুত বলের পেছনে ছুটে ওর দিকে আসছে। বাচ্চাটা ওর কাছে না এসে একটু দূরে থেমে যায়। হয়তো আশা করেছে মানুষটা ওর দিকে বল ছুঁড়বে। কিন্তু সালার আগের মতোই পা দিয়ে বল আটকে রেখে আইসক্রিম খাচ্ছিল। জানে এমন করলে

মেয়েটা ওর কাছে আসবে। সেটাই হয়, কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওকে ফুটবল ছাড়তে না দেখে মেয়েটা অবাক হয়ে এগিয়ে আসে।

'ফুটবলটা ছেড়ে দিন।' কাছে এসে খুব বিনয়ের সাথে বলল।

কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে পা সরিয়ে ফুটবলে জোরে একটা লাথি মারল ও। ফুটবল উড়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। নিজের কাজে আত্মতৃপ্তি পেয়ে মেয়েটার দিকে তাকায়, যার চেহারা লাল হয়ে গেছে। বাচ্চাটা দৌড়ে ফুটবলের পিছু নেয়। আশেপাশে বাচ্চাটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। মেয়ে বিড়বিড়িয়ে কিছু বলে ঘুরে চলে যায়। কী বলেছে তা শুনতে না পেলেও লাল হয়ে ওঠা চেহারা এবং বলার ধরনে আন্দাজ করতে পারছিল, তা সুখকর বাক্য ছিল না ওর জন্য। নিজের কাজে লজ্জা পায়। শীঘ্রই বুঝতে পারে কাজটা কেন করেছে। মেয়েটাকে ইমামার মতো দেখতে লাগে। তার পরনে লম্বা কালো কোট সাথে কালো হিজাব। উচ্চতায় লম্বা এবং হালকা-পাতলা গড়নের ঠিক ইমামার মতো। শুভ্র বর্ণ এবং কালো চোখও ইমামার মতোই ছিল।

যদিও ইমামা লম্বা-চওড়া চাদরে নিজেকে লুকিয়ে রাখত, হিজাব পরত না। মেয়েটাকে দেখে ইমামার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় অবচেতন মন তা করেনি, যা সে চেয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে এটা ভেবে হয়তো তৃপ্তি অনুভব করেছে, ও ইমামার কথা শোনেনি। অথচ...সেটা ইমামা ছিলই না।

‘কী হয়েছে আমার? এভাবে তো...! হতভম্ব হয়ে ভাবো। পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরায়। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবারও মেয়েটার দিকে চোখ যায়। যে নিজের বাচ্চাকে ফুটবল নিয়ে খেলতে দেখে হাসছে। ও তাকিয়ে রইল তার দিকে, অন্য সবকিছুর প্রতি উদাসীন হয়ে।

রাতে অনেকক্ষণ ইমামাকে নিয়ে ভাবো। ইমামা আর জালালের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল এতদিনে বিয়ে করে নিয়েছে ওরা। কারণ সিকান্দার উসমানের কাছ থেকে নিকাহনামা পাওয়ার পর ইমামা জেনে গেছে তালাকের হুক আগে থেকেই দেওয়া। এই ব্যাপারে ওর সাহায্য দরকার নেই। জালাল, যে শত অনুরোধেও বিয়ে করতে রাজি হয়নি;

একবার দেখা হয়ে গেলে ইমামা আর তাকে না করতে পারবে না। এটা সালারের বিশ্বাস। জালালের সাথে ইমামাকে মানায় না। ইমামা সুন্দরী! তাছাড়া ইমামার পরিবার নামকরা পরিবারের মধ্যে একটি। কোনো আহম্মকই হবে, যে জালাল আনসারের অবস্থানে থেকে ইমামাকে সোনার পাখি না ভাবে। যাইহোক, এতদিনে হয়তো বিয়ে করে নিয়েছে। আর না জানি কীভাবে হাশিম মুবীন এর চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে... এটাও তো হতে পারে হাশিম মুবীন ওদের খুঁজে বের করে ফেলেছে...

আমার খোঁজ নেওয়া উচিত এই বিষয়ে। ভাবে সালার। পরের মুহূর্তেই নিজেকে ধমকে ওঠে। For God's sake Salar! বাদ দাও, কেন অযথা এর পেছনে পড়ছ? এটা জেনে আদতে কী হবে হাশিম মুবীন ওকে খুঁজে পেয়েছেন কিনা?' নিজেকে শাসাল। কিন্তু ওর কৌতূহল শেষ হয় না। 'আমি এখানে আসার পর কেন জানার চেষ্টা করলাম না, হাশিম মুবীন এখনো ইমামার কাছে পৌঁছেছে কিনা?'

'আমার নাম ভিনেস এডওয়ার্ড।' সালারের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল মেয়েটা।

সালার লাইব্রেরির বুকশেলফ থেকে বই বের করছিল, যখন মেয়েটা আসে। 'সালার সিকান্দার।' ভিনেসের হাতে হাত মিলিয়ে নিজের পরিচয় নেয়।

'আমি জানি। তোমার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।' উষ্ণভাবে বলল ভিনেস।

সালার যদিও ভিনেসকে বলল না তারও পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ক্লাসের পঞ্চাশ জনের সবার নাম এবং পরিচয় জানে ও। এমনকি প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বায়োডাটাও কোনোরকম না আটকে বলতে পারবে। যেমন এখন এটা বলে অবাক করে দিতে পারত যে, ভিনেস নিউ জার্সি থেকে এসেছে। ওখানে এক বছর বেভারেজ কোম্পানিতে কাজ

করেছিল। তার কাছে মার্কেটিংয়ের একটা ডিগ্রি আছে, এখানে অপর ডিগ্রির জন্য এসেছে। ওর চেয়ে কমপক্ষে ছয়-সাত বছরের বড় সে। যদিও নিজের উচ্চতা এবং দৌহিক গঠনের জন্য ওকেই বড় মনে হয়। কিন্তু নিজের ব্যাচে সবচেয়ে কমবয়সী ও। ব্যাচে একমাত্র ও-ই কোনো ধরনের জব না করে সোজা এমবিএ করতে এসেছে। অন্য সবার কাছে কোথাও না-কোথাও কয়েক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু এই সময় ভিনেসকে এসব বলে নিজেকে কুল দেখানোর ইচ্ছে নেই ওর।

'আমি যদি আপনাকে কফির আমন্ত্রণ জানাই?' পরিচিত হয়ে বলল ভিনেস।

'তাহলে আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব।'

ভিনেস হাসে। 'তাহলে চলুন কফি খেতে যাই।'

সালার হাত উঁচিয়ে বইটা শেলফে রেখে দেয়।
ক্যাফেটেরিয়ায় বসে দুজন আধা ঘণ্টার মতো কথা বলে।
এটা ছিল সালারের সাথে ভিনেসের পরিচয়ের সূচনা। ওর
জন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন কাজ ছিল
না। এই কাজ খুব দক্ষ হাতে করতে জানে। এবার ব্যাপারটা
আরও সহজ ছিল ভিনেসের পক্ষ থেকে পা বাড়ানোর
কারণে। তিন-চারবার দেখা করে এক রাতে ভিনেসকে
নিজের ফ্ল্যাটে আমন্ত্রণ জানায়। ভিনেস বিনা দ্বিধায় সেই
আমন্ত্রণ লুফে নেয়। ওরা ক্লাস শেষে একসাথে অনেক
জায়গায় ঘোরাঘারি করে। ফ্ল্যাটে ফিরতে অনেক রাত হয়ে
যায়।

সালার কিচেনে ড্রিকংস তৈরি করছিল। ভিনেস এদিক-
ওদিক পায়চারি করে অ্যাপার্টমেন্ট দেখে। কিছুক্ষণ পর
কিচেন কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়।

‘খুব গোছানো অ্যাপার্টমেন্ট! আমি ভেবেছিলাম একা
থাকো, অ্যাপার্টমেন্টের অবস্থা জগাখিচুড়ি হবে। কিন্তু তুমি

তো দেখছি বেশ সুন্দর গুছিয়ে রেখেছ। এভাবেই থাকো নাকি এই গোছগাছ বিশেষ করে আমার জন্য?"

একটা গ্লাস ভিনেসের দিকে বাড়িয়ে দেয় সালার। 'আমি এভাবেই থাকি, সুশৃঙ্খল স্টাইলো।' নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ওটা কাউন্টারে রাখে। ভিনেসের কাছাকাছি এসে কাঁধে হাত দেয়। ভিনেস চোখে হাসল। আরেকটু কাছে টানো। কিন্তু হঠাৎ থেমে যায়। ওর চোখ ভিনেসের গলার চেইনে ঝুলতে থাকা মুক্তার দিকে, যা আজকেই প্রথম দেখেছে। ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে ভিনেস সবসময় ভারী সোয়েটার, জ্যাকেট পরে চলাফেরা করত। কয়েকবার খোলা কলারে চেইনটা দেখলেও সাথে ঝুলতে থাকা মুক্তা এই প্রথম ওর নজরে এসেছে। কারণ আজ ভিনেস একটা ডিপ গলার শাট পরেছে, উপরে সোয়েটার ছিল; যা অ্যাপার্টমেন্টে এসে খুলে রেখেছে। ওর চেহারার রং বদলে যায়। আচমকা সেই মুক্তা ওকে অন্য কোথাও, অনেক পেছনে, অন্য কারো কাছে নিয়ে গেল। অজু করতে থাকা হাত, আঙুল। কজি থেকে হাত, হাত থেকে কনুই পর্যন্ত সফর করা আঙুল। চোখ থেকে

কপাল, কপাল থেকে সাদা চাদরের নিচে কালো চুলে পিছলে যাওয়া হাত। ইমামার গলার চেইনটা ছোট ছিল। তাই চেইনের সাথে ঝুলতে থাকা মুক্তা ঠিক গলার হাড়ের সাথে ঝুলছিল। চেইনটা আরেকটু লম্বা হলেই হয়তো মুক্তাটা দেখতে পেত। সেই রাতে ইমামা ছোট গলার কামিজ পরেছিল, সাথে সোয়েটার। মুক্তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অতীতে হারিয়ে থাকে ও।

ইমামাকে এ কোন সময়ে মনে পড়েছে ওর? মুক্তা থেকে চোখ সরানোর চেষ্টা করে। নিজের রাত নষ্ট করতে চায় না। ভিনেসের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে। ভিনেস ওকে বলছিল। 'তোমার চোখগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে!'

'তোমার চোখ দেখলে আমার ঘৃণা লাগে।' একটা কণ্ঠ এসে চাবুক মারল যেন। মুখের হাসি উধাও হয়ে যায় সালারের। ভিনেসের শরীর থেকে হাত সরিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

কিচেন কাউন্টার থেকে গ্লাসটা তুলে নেয়। ভিনেস অবাক চোখে তাকায়।

'কী হয়েছে?' কিছুটা এগিয়ে সালারের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল।

সালার কিছু না বলে এক টানে গ্লাস খালি করে ফেলো। ভিনেস উত্তর না পেয়ে আরও চিন্তিত হয়। ভিনেসের প্রতি ওর আগ্রহ শেষ হতে শুধুমাত্র কয়েক মিনিট লেগেছে। জানে না কেন ভিনেসের উপস্থিতি এখন ওকে বিরক্তি করছে। কিছুক্ষণ আগে, দুই ঘন্টা ধরে এই মেয়ের সাথে নাইট ক্লাবে ডান্স করেছে, ভালো সময় কাটিয়েছে। কিন্তু এখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই...? কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিন্কে গিয়ে নিজের গ্লাস ধুতে থাকে। ভিনেস অপর গ্লাস হাতে নিয়ে ওর কাছে আসে। সালার হাত বাড়িয়ে গ্লাস নেয়। ভিনেস বুকের উপর হাত ভাঁজ করে পাশে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল। এই তাকিয়ে থাকাও বিরক্ত লাগে ওর।

'আমি... আমার শরীর ভালো লাগছে না।' গ্লাস শেলফে রেখে
ভিনেসকে বলল।

ভিনেস অবাক হয়। পরোক্ষভাবে সালার তাকে চলে যেতে
বলছে। চেহারার রং বদলে যায়। সালারের এই আচরণ তার
জন্য অপমানের। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে ব্যাগ
আর সোয়েটার তুলে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা ঠাস করে
লাগিয়ে চলে যায়। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে সোফায় বসল
ও। ভিনেস আর ইমামার মাঝে কোথাও কোনো মিল নেই।
এমনকি দু'জনার গলায় ঝুলতে থাকা মুক্তাও এক রকম
দেখতে না। তবু ভিনেসের গলায় ঝুলতে থাকা মুক্তা দেখে
ইমামাকে মনে পড়ে গেছে ওর।

'কেন...? এখন আবার কেন? এই সময়ই-বা কেন?' রাগ
বাড়ে। ইমামার জন্য ওর রাত নষ্ট হয়েছে। সেন্টার টেবিলে
থাকা ক্রিস্টেলের ফুলদানি তুলে সর্বশক্তি দিয়ে দেয়ালে
ছুঁড়ে মারল।

উইকেন্ডের পর ভিনেসের সাথে আবার দেখা হয়। কিন্তু খুব খাপছাড়া আচরণ করে সালার। ভিনেসের সাথে সম্পর্ক শুরু হওয়ার আগেই শেষ করার এটাই উপায়। প্রতিটি সেই মেয়েকে ওর বিরক্ত লাগে, যারা কোনোভাবে ওকে ইমামার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভিনেস সেই মেয়েদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। যদিও সালারের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া বা পুনরায় আমন্ত্রণের প্রত্যাশায় ছিল ভিনেস। ওর এমন আচরণে গভীরভাবে হতাশ হয় সে। ইয়েলে এটা প্রথম অ্যাফেয়ার ছিল সালার সিকান্দারের।

পরের কয়েক মাস পড়ালেখা নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকে সালার। ইমামাকে মনে করা বা খোঁজ নেওয়ার বিষয়টা কালকের জন্য ফেলে রেখেছিল। হয়তো এই ধারাবাহিকতা এখনো চলত, যদি সেই সন্ধ্যায় হঠাৎ করে ওর সাক্ষাৎ জালাল আনসারের সাথে না হয়ে যেত। উইকেন্ডে বোষ্টনে এসেছিল। এখানে এক চাচা থাকে। কাজিনের বিয়েতে এটেন্ড করতে এসেছে। কাজিনের সাথে তার রেস্টুরেন্টে ছিল, ডিনারের জন্য। অর্ডার দেওয়ার পর সন্ধ্যায় ওর এর

কাজিন কোনো কাজে হঠাৎ উঠে যায়। ও খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন কেউ পেছন থেকে ডাক দেয়।

'হ্যালো!'

সালার ঘুরে তাকায়।

'আপনি সালার না?' জিজ্ঞেস করল।

লোকটা জালাল আনসার। চিনতে দেরি হওয়ার কারণ তার মুখে দাড়ি ছিল না। সালার দাঁড়িয়ে হাত মেলায়। এক বছর আগের সেই অ্যাডভেঞ্চার চোখের সামনে তাজা হয়ে ওঠে। আলাপচারিতা শেষে জালালকে খাবারের আমন্ত্রণ জানায় ও।

‘না, আমার একটু তাড়া আছে। আপনার ওপর হঠাৎ চোখ পড়ায়, চলে এসেছি।’ জালাল হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। ‘ইমামা কেমন আছে?’ কথা বলতে বলতে জিজ্ঞেস করে।

সালার ভাবল প্রশ্ন ঠিকমতো শুনতে পায়নি। 'সরি! আমি বুঝতে পারিনি আপনি কী জিজ্ঞেস করেছেন।'

জালাল নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। 'আমি ইমামার কথা জিজ্ঞেস করছি, ও কেমন আছে?'

সালার পলকহীন তাকিয়ে রইল। জালাল ওর কাছে কেন ইমামার কথা জানতে চায়? 'আমি জানি না, এটা তো আপনার জানার কথা।' কিছুটা বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

এবার জালাল অবাক হয়। 'আমি কেন?'

'কারণ আপনার স্ত্রী ও।'

'আমার স্ত্রী?' জালাল যেন আকাশ থেকে পড়ে। 'কী বলছেন? আমার স্ত্রী কীভাবে হবে? আমি ওকে বিয়ে করতে অসম্মতি জানিয়েছি আপনার ভালো করে জানা। এক বছর আগে

আপনিই তো এসেছিলেন আমার সাথে কথা বলতে।' মনে করানোর চেষ্টা করল। 'আমি তো আপনাকে এটাও বলেছিলাম যে আপনি ওকে বিয়ে করে নিন।'

সালরে অবিশ্বাস্য চোখে জালালকে দেখে।

'আমি তো এটা ভেবে এসেছি হয়তো আপনি ওকে বিয়ে করেছেন।'

'তার মানে আপনি ওকে বিয়ে করেননি?' সালার জিজ্ঞেস করে জালালকে।

'না। আপনার সাথেই তো সব কথা হয়েছিল, আমি না বলে দিয়েছিলাম। তাহলে ওর সাথে আমার বিয়ে কীভাবে হবে? শুনেছিলাম বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, আমি মনে করেছি আপনার সাথে গেছে; তাই আপনাকে দেখে জানতে এসেছি।'

'আমি জানি না ইমামা কোথায়। গত সাত-আট মাস ধরে নিজেই এখানে।' সালার বলল।

'আর আমি এখানে এসেছি দুই মাস হলো।' জালাল বলল।

'আমাদের দেখা হওয়ার পর, ইমামা আপনার সাথে যোগাযোগ বা দেখা করার চেষ্টা করেনি?'

'না, আমার সাথে আর কোনো দেখা বা যোগাযোগ করেনি।'

'এটা কীভাবে সম্ভব লাহোর গিয়ে আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি ও?'

'আমার সাথে যোগাযোগ করলেই-বা কী হতো?'

'ইমামা আপনার জন্য বাড়ি ছেড়েছে, আপনার কাছেই যাওয়ার কথা ওর।'

'আমার জন্য বাড়ি ছাড়েনি ও। আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমি বলে দিয়েছি আমার পক্ষে ওকে বিয়ে করার সম্ভব না। তাই এটা বলবেন না, আমার জন্য বাড়ি ছেড়েছে ও।' জালালের কথার ধরন পাণ্টে গেল। 'সব কথা আপনার সাথেই তো হয়েছে আমার।'

'আপনি সত্যি বলছেন ইমামা আপনার কাছে আর ফিরে যাননি?'

'মিথ্যে কেন বলব? যদি আমার সাথেই থাকত তাহলে আপনার কাছে খবর নিতে আসতাম? যাইহোক আমার দেরি হচ্ছে।' জালালের সুরে উদাসীনতা।

'আপনার কন্টাক্ট নাম্বারটা আমাকে দেওয়া যাবে?' সালার বলল।

‘না। আমার মনে হয় না আপনার সাথে আমার কিংবা আমার সাথে আপনার দ্বিতীয়বার যোগাযোগের কোনো প্রয়োজন আছে।’ জালাল খুব স্পষ্টভাবে বলে চলে যায়।

দোটানা নিয়ে জালালের চলে যাওয়া দেখল ও। জালালের সাথে ইমামা দেখা করেনি এটা অবিশ্বাস্য। ‘কেন...? সত্যিই কি ও আমার বলা কথা বিশ্বাস করেছে যে, জালাল বিয়ে করে ফেলেছে?’ নিজের বলা মিথ্যে মনে পড়ল। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব...? কীভাবে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারে, যেখানে নিজেই বলত আমার কোনো কথা বিশ্বাস করে না ও।’ চেয়ার টেনে আবার বসে সালার। ‘যদি জালালের কাছে না যেয়ে থাকে, তাহলে কোথায় গেছে? অন্য কারো কাছে? যার ব্যাপারে আমাকে অজানায় রেখেছিল?’ কিন্তু এটা সম্ভব না। অন্য কেউ থাকলে তার সাথেও যোগাযোগ করতে বলত। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে না গেলেও সিকান্দার উসমানের কাছ থেকে নিকাহনামা পাওয়ার পর তালাকের হক সম্পর্কে জেনে অন্তত যাওয়ার কথা। ও জানে না জালালের মিথ্যে বিয়ের গল্প কেন বলেছিল। হয়তো

ইমামাকে আরেকটু চিন্তায় ফেলতে অথবা পরবর্তীতে কী করে তা দেখতে। নাহলে ইমামার অনুরোধে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল বলে। 'আবার জালালের কাছে যাও... আবার দেখা করো।' যাইহোক, ওর বিশ্বাস ছিল জালালের কাছে যাবেই ইমামা।

কিন্তু এখন জানতে পারল ওর প্রত্যাশা বা আন্দাজ অনুসারে জালালের কাছে যায়নি ইমামা। ওয়েটার খাবার সার্ভ করছিল। ওর কাজিন এসে পড়েছে। দু'জন কথা বলতে বলতে খাবার খায়। কিন্তু খাওয়া এবং কথার ফাঁকেও ক্রমাগত ইমামা আর জালালকে নিয়ে ভাবছিল। অনেক মাস পর হঠাৎ করে ইমামা আবারও মস্তিষ্কে তাজা হয়ে ওঠে।

'এমন তো নয় আবার বাড়ি ফিরে এসেছে?' খাওয়ার খরকে মাথায় আসে। 'হ্যাঁ, এটা সম্ভব।' কিন্তু মস্তিষ্ক এক জায়গায় আটকে ছিল। 'বাবার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে জানেন।' সিকান্দার উসমানও বিয়েতে

যোগ দিতে ওখানে এসেছিলেন। বাড়ি ফিরে ঢুকে একা পেয়ে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে।

‘পাপা! ইমামা কি বাড়ি ফিরে এসেছে?’ সরাসরি প্রশ্ন করল সালার। ওর প্রশ্ন কিছুক্ষণের জন্য সিকান্দার উসমানকে নীরব রাখে। ‘তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ?’ কড়া গলায় বললেন।

‘ব্যস, এমনিতেই।’

‘ইমামার ব্যাপারে এত ভাবার দরকার নেই। নিজের পড়াশোনায় মন দাও , সেটা তোমার জন্য ভালো।’

‘পাপা প্লিজ! আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।’

‘কেন উত্তর দেবো? ওর সাথে তোমার কী সম্পর্ক?’ সিকান্দার উসমান রেগে ওঠেন।

'পাপা! ওর বয়স্ফেণ্ডের সাথে আজকে আমার দেখা হয়েছে, যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।'

'তারপর...?'

'ওরা দু'জন বিয়ে করেনি। বলল তার কাছে যায়নি ও। অথচ আমি ভেবেছি লাহোর যাওয়ার পর ইমামা তার কাছেই গেছে।'

সিকান্দার ছেলেকে থামান। 'ইমামা ছেলেটার কাছে গেছে কিনা, ওরা বিয়ে করেছে কিনা, এটা তোমার সমস্যা না। এসবে জড়ানোর দরকার নেই আরা।'

'হ্যাঁ, আমার সমস্যা না। কিন্তু আমি জানতে চাই ইমামা কি আপনার কাছে এসেছিল? আপনি বিয়ের পেপার'স কীভাবে পাঠালেন? মানে কাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন?'

'তোমাকে কে বলল ইমামা আমার সাথে যোগাযোগ করেছে?'

সালার তার প্রশ্নে অবাক হয়। 'আমি আন্দাজ করেছি।'

'ও আমার সাথে যোগাযোগ করেনি। করলে হাশিম মুবীনকে জানিয়ে দিতাম।'

সালার তার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোমার রুম খোঁজার পর নিকাহনামা আমার হাতে আসে।'

'আমাকে এখানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন ইমামার কাছে পেপার'স পাঠিয়ে দেবেন।'

'হ্যাঁ, এটা তখন সম্ভব হতো, যদি ইমামা আমার সাথে যোগাযোগ করত। কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ করেনি ও। কিন্তু তুমি এত নিশ্চিত কী করে যে, ইমামা আমার সাথে

যোগাযোগ করেছে?' এবার সিকান্দার উসমান পাল্টা প্রশ্ন করলেন। 'নিশ্চিত হয়ে আবার যোগাযোগ করবে, যাতে দু'জনের জন্য একটা কবর খুঁড়লেই হয়ে যায়।'

'আপনি অযথা ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। প্রথম কথা হচ্ছে, আমি এটা মানতে প্রস্তুত না এখানে আমেরিকায় কেউ আমার ওপর নজর রাখছে; তাও এতদিন কেটে যাওয়ার পর। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইমামার সাথে আমি কোনো যোগাযোগ করছি না। কারণ সত্যিই জানি না ও কোথায়, সুতরাং যোগাযোগের প্রশ্নই ওঠে না।'

"তাহলে এত কনশাস হওয়ার কী দরকার? ইমামা যেখানে আছে, যেভাবে আছে; থাকতে দাও।" সিকান্দার কিছুটা স্বস্তি পেলেন।

'আমার মোবাইল বিল চেক করুন, ওটা ইমামার কাছে। আগে বাদ দিলেও এখন হয়তো আবার ব্যবহার করছে।'

'ব্যবহার করছে না। মোবাইল স্থায়ীভাবে বন্ধ। কিছু কল করেছিল মেডিকেলে পড়া ওর ফ্রেন্ডদের কাছে। পুলিশ ইতিমধ্যে সেই মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। লাহোর গিয়ে এক মেয়ের বাড়িতে যায়, কিন্তু মেয়েটা পেশোয়ারে ছিল। মেয়েটা বাড়ি ফেরার আগেই ওখান থেকে চলে গেছে। কোথায় গিয়েছে, পুলিশ এখনো জানতে পারেনি।'

সালার তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল। 'হাসান আপনাকে আমার আর ইমামার ব্যাপারে বলেছিল?'

সিকান্দার কিছু বলতে পারলেন না। ইমামার কাছে মোবাইল থাকার ব্যাপারটা শুধু হাসান জানে। অন্তত এটা রুম খুঁজে জানার কথা না। তার সাথে কথা বলতে গিয়ে হুট করে হাসানের ওপর সন্দেহ তৈরি হয়। কারণ সিকান্দার উসমান সেই সব ছোটখাটো বিষয়ও জানেন, যা কেবল ওর আর হাসানের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। যেহেতু ও জানায়নি তাই নিঃসন্দেহে হাসানই তাকে পুরো বিষয় জানিয়েছিল।

'আমাকে হাসান বলুক বা অন্য কেউ, তাতে কী আসে-যায়?
এমন তো হওয়ার ছিল না যে, আমি কখনো এ ব্যাপারে
জানতে পারতাম না। আমার বোকামি ছিল হাশিম মুরীনের
কথায় সিরিয়াস না হয়ে তোমার মিথ্যে বিশ্বাস করা।'

সালার কিছুই বলল না। কপালে ভাঁজ নিয়ে শুধু তাকে
দেখছিল এবং শুনছিল।

‘একবার এই পরিস্থিতি থেকে টেনে বের করেছি, সুতরাং
আগামীতে এমন কিছু করবে না যে...’ সিকান্দার উসমান
নরম সুরে বলতে শুরু করেন।

কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই এক ঝটকায় উঠে রুম থেকে
বেরিয়ে যায় ও।

সিকান্দার উসমানের সাথে কথা বলার পর সারা রাত পুরো
বিষয়টা নিয়ে ভাবে সালার। এই প্রথম হালকা আফসোস ও
অনুশোচনা কাজ করে। ওর উচিত ছিল ইমামা হাশিমের

অনুরোধ মেনে তখনই তালাক দিয়ে দেওয়া। তাহলে হয়তো ইমামা জালালের কাছে গিয়ে বিয়ে করে স্থায়ী হতে পারত। ইমামার প্রতি গভীর অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম নিজের দোষ স্বীকার করে।

'আমার সাথে আর যোগাযোগ করেনি। তালাক নেওয়ার জন্য কোটেও যায়নি। ওর পরিবার এখনো খুঁজছে। জালাল আনসারের কাছেও আসেনি। তাহলে গেল কোথায়? ওর সাথে কোনো দুর্ঘটনা...?'

খুব গভীর হয়ে কোনোরকম বিরক্তি আর রাগ ছাড়া ইমামাকে নিয়ে ভাবে। 'এটা সম্ভব না, আমার প্রতি এত ঘৃণা ও অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী হয়ে কোথাও নীরবে জীবনযাপন করছে ও। তাহলে কেন কারো সাথে যোগাযোগ করেনি? এক বছরের বেশি হয়ে গেছে, তাহলে কি সত্যিই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? কী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ওর সাথে?' ভাবতে ভাবতে ভাবনার মোড় ঘুরে যায়।

'দুর্ঘটনা ঘটলেও আমার কী? ও নিজের রিস্কে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। দুর্ঘটনা যেকোনো সময়, যে-কারো সাথে ঘটতে পারে। তাই আমার ওকে নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে? পাপা ঠিক বলেছে, যেহেতু ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার এত আগ্রহ রাখা উচিত না। বিশেষ করে এমন একটা মেয়ের ক্ষেত্রে, যে উপকারের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ। যে নিজেকে অন্যদের চেয়ে ভালো এবং আমাকে সবচেয়ে খারাপ মনে করে। ওর সাথে যা-ই ঘটুক, ভালো হয়েছে। ও সেটারই প্রাপ্য।'

মাথা থেকে ইমামার চিন্তা ঝেড়ে ফেলল। কিছুক্ষণ আগের আফসোস হারিয়ে যায়। কোনো অনুশোচনা অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া ছোটখাটো বিষয়ে আফসোস করায় অভ্যস্ত ছিল না ও। আরামসে চোখ বন্ধ করে নেয়। এখন আর মস্তিষ্কের কোথাও দূরদূরান্তে ইমামা হাশিমকে নিয়ে কোনো চিন্তার ছিটাফোঁটা ছিল না।

'কখনো ভেডোম গেছ?' সেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে
বেরিয়ে সালারকে জিজ্ঞেস করল মাইক।

'একবার।'

'কেমন জায়গা?' মাইক জানতে চায়।

'থারাপ না।' সালার মতামত জানায়।

'চলো এই উইকেন্ডে ওখানে যাই।'

'কেন?'

'আমার গার্লফ্রেন্ডের খুব পছন্দ জায়গাটা, প্রায়ই যায়
ওখানে।'

'তাহলে তোমাদের যাওয়া উচিত।' সালার বলল।

'না সবাই চলো, বেশি মজা হবে।' মাইক বলল।

'সবাই বলতে কারা?' এবার দানিশ কথায় যোগ দেয়।

'আমরা সব বন্ধুরা। আমি, সালার, তুমি, শেঠি আর সাদা।'

'সাদকে বাদ দাও। নাইট ক্লাবের নাম শুনলে হাত দিয়ে কান চেপে ধরবে ও, নাহলে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেবে।'

'আচ্ছা তাহলে চলো আমরা যাই।' দানিশ বলল।

'স্যান্ড্রাকেও বলো।' গার্লফ্রেন্ডের নাম নেয় সালার।

উইকেন্ডে সবাই মিলে ভেভোম যায় ওরা। তিন-চার ঘন্টা ইনজয় করে রাতে ফেরে। পরদিন সকালে সালার দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। লাঞ্চ তৈরি করছিল যখন সাদের কল আসে।

'এখন উঠেছ?' সাদ ওর কণ্ঠ শুনে বলল।

'হ্যাঁ, দশ মিনিট আগে।'

'রাতে বাইরে ছিলে নিশ্চয়ই?' সাদ অনুমান করে।

'হ্যাঁ, আমরা ছিলাম।' সালার নাইট ক্লাব শব্দটা এড়িয়ে যায়।

'আমরা কারা? তুমি আর স্যাড্রা?'

'না, পুরো গ্রুপ।'

'পুরো গ্রুপ! আমাকে নিলে না... মরে গেছিলাম আমি?' সাদ জ্বলে ওঠে। 'তোমার কথা মনেই পড়েনি আমাদের।' সালার ইয়ার্কির সুরে বলে।

'তুমি খুব বাজে মানুষ সালার... খুব বেশিই বাজে। দানিশও ছিল?'

'আমরা সবাই ডিয়ার... সবাই।' সালার আগের সুরেই বলল।

'তোমরা আমাকে নিয়ে যাওনি কেন?' সাদের রাগ বাড়ে।

"তুমি এখনো বাচ্চা, বাচ্চাদের সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না...'

'আমি এসে তোমার পা ভাঙলে বুঝবে এই বাচ্চা কত বড়!'

'মজা করছি না ইয়ার! তোমাকে নেইনি কারণ তুমি যেতেই না।' সালার স্বাভাবিক হয়ে বলল।

'কেন তোমরা কি জাহান্নামে যাচ্ছিলে যে, আমি সাথে যেতাম না?' সাদের রাগ কমেনি।

'অন্তত তোমার জন্য জাহান্নামই। আমরা নাইট ক্লাবে গেছি, তুমি যেতে?'

'তোমাকে কে বলল আমি যেতাম না?'

সাদের উত্তর সালারকে অবাক করে। 'তুমি যেতে?'

'অফকোর্স।'

'তুমি গিয়ে কী করতে? না ড্রিংক, না ডান্স। আমাদেরকে নসিহত দেওয়া শুরু করতে?'

'ড্রিংক বা ডান্স না করলেও আউটিং হয়ে যেত, আমি ইনজয় করতাম।' সাদ বলল।

‘কিন্তু ওসব জায়গায় যাওয়া ইসলামে জায়েজ নেই।' সালার তীক্ষ্ণ সুরে বলে।

সাদ কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না। ‘আমি ওখানে খারাপ কিছু করতে যেতাম না। শুধু আউটিংয়ের জন্য যেতাম।' কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে বলল।

'ঠিক আছে, পরেরবার প্ল্যান হলে তোমাকেও নিয়ে যাব। আগে জানালে কালকে রাতেও নিয়ে যেতাম। আমরা সবাই খুব ইনজয় করেছি।' সালার বলে।

'যাইহোক, এখন আর কী করার। আজকের কী প্ল্যান?' সাদ প্রসঙ্গ বদলে ফেলল।

দশ-পনেরো মিনিট ওদের মাঝে কথা হয়। এরপর সালার ফোন রেখে দেয়।

'উইকেন্ডে কী করবে?' সালারকে জিজ্ঞেস করল সাদ। ওরা ইউনিভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়ায় ছিল।

'নিউইয়র্কে যাচ্ছি, স্যান্ড্রার সাথে।'

'কেন?'

'ওর ভাইয়ের বিয়ে, ইনভাইট করেছে।'

'কবে ফিরবে?'

'রবিবার রাতে।'

'তাহলে এক কাজ করো, তোমার অ্যাপার্টমেন্টের চাবি আমাকে দিয়ে যাও। দুদিন থাকব। কিছু অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করতে হবে। এই উইকেন্ডে এরা চারজনই ফ্ল্যাটে থাকবে, গাদাগাদি হবে। আমি বরং তোমার অ্যাপার্টমেন্টে শান্তিতে পড়ব।' সাদ বলল।

'ঠিক আছে, রেখে দিও অ্যাপার্টমেন্টের চাবি।' সালার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে।

স্যান্ড্রার সাথে সালারের শুক্রবার রাতে বের হওয়ার কথা ছিল। ব্যাগ গাড়ির ডিকিতেই রাখা। কিন্তু ঘটনাক্রমে শেষ মুহূর্তে স্যান্ড্রার কিছু কাজ এসে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় বের

হওয়ার প্ল্যান পরদিন সকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।। স্যান্ড্রা পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকত, তাই রাতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরা ছাড়া ওর উপায় ছিল না।

রাত ১১টার দিকে স্যান্ড্রাকে ড্রপ করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসে সালার। একটা চাবি দিয়েছিল সাদকে, অন্যটা ওর কাছে। এই সময় সাদ পড়ছে ভেবে বিরক্ত করতে চায়নি। নিজের কাছে থাকা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। লিভিংরুমের লাইট জ্বলছিল কিন্তু খালি। ভেতরে ঢুকতেই অদ্ভুত কিছু অনুভব করে ও। বেডরুমের সামনে গিয়ে দরজায় থেমে যায়। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ওপাশ থেকে হাসি আর কথার শব্দ আসছে। সাদের সঙ্গে কোনো মেয়ে ছিল। সালার জমে যায়। গ্রুপের মধ্যে একমাত্র সাদের ব্যাপারে ওর বিশ্বাস ছিল, এর কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্ক নেই। সাদ যে পরিমাণ ধার্মিক, তাতে এমন কিছু আশাও করা যায় না। সালার আগ বাড়ায় না। অবিশ্বাস নিয়ে পিছিয়ে আসে। লিভিংরুমের বোতল আর গ্লাসের উপর চোখ পড়ে, সেখান থেকে কিচেন কাউন্টারে; যেখানে খাবারের প্লেট এখনো

পড়ে আছে। আর একটুও দেরি না করে নিঃশব্দে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। এটা বিশ্বাস করার মতো না যে, সাদ একটা মেয়ের সাথে থাকতে এসেছে। একেবারেই অবিশ্বাস্য! যে মানুষ হারাম মাংস খায় না, মদ খায় না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, সারাক্ষণ ধর্মের কথা বলে, সবাইকে নসিহত করে; সে একটা মেয়ে নিয়ে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় সালার। বোতল আর গ্লাস ইঙ্গিত দিচ্ছিল ড্রিংক করেছে। হয়তো খাবার এনেও খেয়েছে। সেই ফ্রিজার আর কিচেনের... যেখানের পানি পর্যন্ত খেতে প্রস্তুত ছিল না। হাসি আসে। যে নিজেকে যত ভালো আর সত্যিকার মুসলমান প্রমাণ করার বা দেখানোর চেষ্টা করে, সে তত বড় ভণ্ড। এক হচ্ছে এই মানুষ, যে এমন ভান করে পুরো আমেরিকায় একজনই মুসলমান আর সেটা ইনি। আরেকজন ছিল ইমামা হাশিম, যে তাঁবুর মতো চাদর জড়িয়ে ঘুরত। আর চরিত্র হচ্ছে, এক ছেলের জন্য বাড়ি থেকে পালালো। অথচ সেজে বেড়ায় সত্যিকার মুসলমান। নিচে এসে গাড়িতে বসে ঘৃণাভরে ভাবে সালার। মুনাফিকি ও মিথ্যের সীমা এদের কাছে এসে শেষ হয়ে যায়। পার্কিং

থেকে গাড়ি বের করার সময় বিড়বিড় করে। স্যান্ড্রার কাছে যাওয়া সম্ভব না। তাই দানিশের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সালারকে দেখে অবাক হয় দানিশ। অজুহাত দেখায় বোর হচ্ছিল বলে রাত কাটাতে চলে এসেছে। দানিশ নিশ্চিত হয়ে যায়।

রবিবার রাতে যখন ও অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল, তখন সাদ ছিল না। কোথাও এমন কোনো চিহ্নও পাওয়া যায় না, যা দেখে বোঝা যাবে এখানে কোনো মেয়ে এসেছিল। ওয়াইনের বোতলও কোথাও ছিল না। ঠোঁট চেপে হেসে পুরো অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায় ও। সবকিছু তেমনই আছে, যেভাবে রেখে গেছে। নিজের জিনিসপত্র রেখে সাদকে ফোন করে। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিকের কথা বলে আসল কথায় চলে আসে।

'তোমার পড়াশোনা ভালো হয়েছে, অ্যাসাইনমেন্ট শেষ?'

'হ্যাঁ ইয়ার! দুদিন খুব ভালো পড়েছি। অ্যাসাইনমেন্ট প্রায় শেষ। তোমার ট্রিপ কেমন গেল?'

'খুব ভালো...'

'কতক্ষণ লেগেছে যেতে, রাতের জার্নিতে সমস্যা হয়নি?'

'না, রাতে জার্নি করতে হয়নি।'

'মানে কী?'

'মানে শুক্রবার রাতে না, শনিবার সকালে গিয়েছি আমরা।'

'তাহলে রাতে কি স্যান্ড্রার সাথে ছিলে?'

'না, দানিশের সাথে।'

'অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসতো।'

'এসেছিলাম।'

অপরপাশ নীরব হয়ে যায়। সালার মনে মনে হাসে। সাদের
পায়ের নিচ থেকে নির্ঘাত মাটি সরে গেছে।

'এসেছিলে? কখন?' সাদ কোনোরকম আটকে আটকে
জিজ্ঞেস করল।

'১১টার দিকে। তুমি কোনো মেয়ের সাথে ব্যস্ত ছিলে। আমি
ডিষ্টার্ব করা ঠিক মনে করিনি। তাই চলে এসেছি।' আন্দাজ
করতে পারছিল সাদের ওপর দিয়ে তখন কী যাচ্ছে। সাদের
কল্পনার জগতেও হয়তো ছিল না সালার এভাবে হাটে হাঁড়ি
ভাঙবো। 'যাইহোক, তুমি কখনো তোমার গার্লফ্রেন্ডের
পরিচয় করাওনি কেন?' সাদের শ্বাস নিতেও যে কষ্ট হচ্ছিল,
ও তা টের পায়।

'হ্যাঁ, করাবা।' বিড়বিড় করে বলল সাদ। 'কিন্তু তুমি কাউকে
বলবে না।'

'আমি কেন বলতে যাব? ভয় পাওয়ার দরকার নেই।' সালার বন্ধুর অবস্থা বুঝতে পারছিল। ওর করুণা হয়।

সেই রাতে কয়েক মিনিট পরই ফোন রেখে দেয় সালার। বন্ধুর বিব্রতকর অবস্থা ভালো করেই বুঝতে পারে ও। এই ঘটনার পর মনে করেছিল সাদ আর কখনো ওর সামনে ধর্মের ভক্তি নিয়ে কথা বলবে না। কিন্তু সাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে না পেয়ে অবাক হয়। সাদ এরপরও একই গতিতে ধর্ম নিয়ে কথা বলে। নামাজ পড়ার নসিহত করে, দান-সদকা করতে বলে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা তৈরি থাকে। ধর্ম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আয়াত বা হাদিসের উদ্ধৃতি এলে চোখে পানিও চলে আসে। ওদের গ্রুপ ছাড়াও অনেকেই সাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সাদের একজন আদর্শ মুসলিম- যৌবনের ব্যস্ত জীবনেও ফেলো। এতে কোনো সন্দেহ নেই পরিচিতদের মধ্যে শুধু সালার ছিল, যার ওপর সাদের কোনো নসিহত কাজ করত না। সাদ কথা বলতে জানে। বর্ণনার ধরণই এমন, যা অন্যকে প্রভাবিত করে যে সাদকে দেখে

বিন্দু পরিমাণ প্রভাবিত বা ঈর্ষার শিকার হতো না। সালার মানে না সাদের মুখের দাড়ি সাদের বিশ্বাস আর ভদ্রতার প্রমাণ। সাদের করা অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালো আচার-আচরণও সালারকে রোকাতে সফল হয়নি। ইমামার মাধ্যমে ধার্মিক মানুষদের প্রতি অপছন্দ শুরু হয়েছিল ওর। জালাল সেই অনুভূতি এগিয়ে নেয় এবং সাদ তা চরমে পৌঁছে দিয়েছে। ওর মতে ধার্মিকদের চেয়ে বেশি ভল্ড আর ধোঁকাবাজ অন্য কেউ হয় না। দাড়িওয়ালা পুরুষ এবং পর্দাশীল নারী যেকোনো ধরনের বরং সব ধরনের মন্দের বশীভূত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশি, যারা নিজেদেরকে ধার্মিক দাবি করে না।

ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যাওয়া এই তিনজন মানুষ ওর সেই মতকে দৃঢ় করে তোলে। ইমামা হাশিম পর্দা করা এক মেয়ে। যে এক ছেলের জন্য নিজের দ্বীনকে, ফ্যামিলি এমনকি বাড়ি-ঘর ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়েছে। জালাল আনসার দাড়িওয়ালা ছেলে, হুজুর সা.-কে ভালোবেসে নাত আবৃত্তি করে। এক মেয়ের সাথে অ্যাফেয়ার চালিয়ে সেই

মেয়েকে মাঝরাস্তায় একা ফেলে পাশ কেটে পড়েছে। এরপর দ্বীন আলাদা, দুনিয়া আলাদা বলতে থাকা আরেক মানুষ। সাদ জাফরের সম্পর্কে ওর রায় আরেকটা ঘটনার কারণে তিক্ত ছিল।

একদিন সাদ ওর অ্যাপার্টমেন্টে আসে। সালার কম্পিউটারের সামনে বসে কথা বলছিল। কিছু জিনিসপত্র আনার জন্য উঠে পাশের মার্কেটে যায়। পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা এবং কেনাকাটা করতে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো লাগে। সাদ ওর সাথে আসেনি। ফিরে দেখল কম্পিউটারে চ্যাটিং-এ ব্যস্ত। মাত্র কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে চলে যায়। সাদ চলে গেলে লাঞ্চ করে কম্পিউটারে বসে সালার। নিজেও কিছুক্ষণ চ্যাটিং করবে। কম্পিউটার চালাতে চালাতে অনিচ্ছাকৃত হিষ্টি চেক করে। কিছু ওয়েবসাইট এবং পেইজের নাম আসে, যা সাদ বা ও ভিজিট করেছে। ও করেনি। তার মানে সাদ...! ওয়েবসাইটগুলো পর্নোগ্রাফির। ও নিজে বা অন্য কোনো বন্ধু এগুলো ডিজিট করলে এত অবাক হওয়া বা আপত্তির কিছু ছিল না। কারণ এ ধরনের ওয়েবসাইট ভিজিট করে ওরা। কিন্তু

সাদ এই কাজ করেছে দেখাটা অবিশ্বাস্য । ওর চোখে সাদ আরও নীচে নেমেছিল সেদিন।

'তোমার প্ল্যান কী, পাকিস্তান আসার ইচ্ছে আছে?'

ফোনে সিকান্দার উসমানের সাথে কথা বলছিল সালার। ছেলেকে জানায় তারা পাকিস্তান থাকবেন না, কয়েক সপ্তাহের জন্য তায়্যিবাকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। এক আত্মীয়ের বিয়ের দাওয়াতে ওখানে থাকতে হবে তাদের।

'আপনারা দু'জন না থাকলে আমি পাকিস্তান গিয়ে কী করব?'

সালার নিরাশ হয়।

'তাতে কী, ভাই-বোনের সাথে দেখা করবে। আনিতা তোমাকে অনেক মিস করে।' সিকান্দার বললেন।

'পাপা! আমি এখানেই ছুটি কাটাব। পাকিস্তান যাওয়ার কোনো মানে নেই।'

'তাহলে আমাদের সাথে অস্ট্রেলিয়া চলো, মুয়িজও যাচ্ছে।'
তিনি ওর বড় ভাইয়ের নাম বললেন।

'আমার মাথাখারাপ না বিনা দাওয়াতে এভাবে আপনাদের
সাথে অস্ট্রেলিয়া চলে যাব। তাছাড়া মুয়িজের সাথে আমার
আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোথায়, যে আপনি ওর সাথে আমাকে
যাওয়ার কথা বলছেন?' সালার বেশ বিরক্ত হয়ে বলল।

'জোর নেই। ওখানে থাকতে চাইলে থাকো। কিন্তু নিজের
খেয়াল রাখবো। দেখো সালার। উল্টোপাল্টা কিছু যাতে না
করো।' তিনি ছেলেকে সতর্ক করেন।

এসব শোনার অভ্যাস আছে। কখনো ফোন রাখার সময় যদি
সিকান্দার উল্টোপাল্টা কিছু বলতে তার ইশারা কোনদিকে,
ও ভালো করেই জানে। যদি উসমান ওকে এই লাইন না
বলে, তাহলে অবাক হবে ও। তার সাথে কথা শেষ করে
ফ্লাইটের সিট ক্যান্সেল করে দেয়। ফোন রেখে সোফায়
আরামে বসা অবস্থায় উপরের দিকে তাকিয়ে ভাসিটি বন্ধ

হলে ছুটির সপ্তাহগুলো কীভাবে কাটাবে, তা নিয়ে ভাবতে থাকে। 'আমার কয়েকদিন ফ্রিইং করা উচিত... বা অন্য এষ্টেটে ঘুরে দেখা।' প্ল্যান তৈরি করে। 'ঠিক আছে, কাল ভাসিটি থেকে ফিরে কোনো অপারেটরের সাথে দেখা করব। বাকি প্রোগ্রাম সেখানেই ঠিক করা যাবে।' সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিন এক বন্ধুর সাথে মিলে ফ্রিইংয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। সিকান্দার উসমান আর বড় ভাইকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেয়।

ছুটি শুরু হওয়ার আগের দিন। এক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে খাবার খায় ও। খেয়ে কিছুক্ষণ পর উঠে পাশের এক পাবে চলে যায়। ওখানে গিয়ে কয়েক পেগ ড্রিংক করল। রাত ১০টার দিকে ফেরার পথে ড্রাইভিং করা অবস্থায় ওর বমি পায়। গাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় হাঁটে। ঠান্ডা-ঠান্ডা বাতাস, চারপাশের আবহাওয়া সাময়িক সময়ের জন্য ওকে স্বাভাবিক করে তোলে। কিন্তু কয়েক মিনিট পর আবার বমি আসে ওর। এবার বুকে-পেটে হালকা ব্যথা টের পায়। এগুলো খাবার না পেগের প্রভাব, তাৎক্ষণিকভাবে আন্দাজ করতে

পারল না। মাথা ঘুরছে। নিচু হয়ে বমি করে দেয়। পেট খালি হলেও নিজের অবস্থা ভালো অনুভব করল না। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় পা টলমল করে। গাড়ির দিকে যেতে হবে। কিন্তু ওর মাথা এখন আগের চেয়ে বেশি ঘুরছে। কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি ঝাপসা দেখছে। কষ্ট করে কয়েক পা সামনে বাড়ালেও গাড়ির কাছে পৌঁছানোর আগেই নিচে পড়ে যায়। ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর মস্তিষ্ক অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। পুরোপুরি হুঁশ হারিয়ে ফেলার আগে অনুভব করল কেউ নাড়াচ্ছে ওকে। পাশে জোরে জোরে কিছু বলছে। আওয়াজ একাধিক। নড়ার চেষ্টা করে ও, কিন্তু পারে না। চোখ খোলার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যায়।

দুইদিন হসপিটালে কাটাতে হয় সালারকে। রাস্তা দিয়ে যাওয়া এক দম্পতি ওকে পড়ে যেতে দেখে হসপিটালে নিয়ে আসে। ডাক্তার বলেছে ফুড পয়জনিং হয়েছে। ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘন্টা পর জ্ঞান ফেরে। হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হতে চাইলেও শারীরিকভাবে দুর্বল অনুভব করায়

ইচ্ছে বদলাতে হয় ওকে। পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ অবস্থা আরও কিছুটা ভালো হয়। তবে ডাক্তারের পরামর্শে সেই রাতটাও হাসপিটালে কাটিয়ে রবিবার দুপুরে বাসায় ফিরল। এসে তার অপারেটরের সাথে কথা বলে প্রোগ্রাম কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দেয়। সোমবার সকালে বের হওয়ার কথা ছিল। ভেবে রেখেছিল খাওয়ার আগে স্যান্ড্রাকে কল করে বলবে। কিন্তু প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হওয়ায় স্যান্ড্রা বা অন্য কাউকে কল করার ইচ্ছে বাদ দেয়।

খাবারে হালকা স্যান্ডউইচের সাথে এক কাপ কফি খেয়ে একটা ট্রানকুইলাইজার ট্যাবলেট নিয়ে ঘুমাতে চলে যায়। পরদিন যখন ওর চোখ খোলে, তখন ১১টা বাজছিল। ঘুম থেকে উঠে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুচর করে। হাত দিয়ে কপাল ছুঁয়ে দেখল খুব গরম। 'Come on!' বিরক্ত হয়ে বিড়বিড়ায়। গত দুদিনের অসুস্থতার পর আগামী দুদিনও বিছানায় কাটানোর ইচ্ছে নেই ওর। তবে এমন কিছু হওয়ার ইঙ্গিতই টের পাচ্ছে। কোনোরকম বিছানা থেকে উঠে হাত-মুখ না ধুয়ে কিচেনে চলে যায়। কফি তৈরি হতে রেখে

মোবাইলের আনসারফোন রেকর্ড শোনে। কিছু কল সাদের।
যে পাকিস্তান যাওয়ার আগে দেখা করার জন্য বারবার কল
করে এবং শেষ কলে ওর এভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ায়
ইচ্ছেমতো বকে মন হালকা করেছিল।

স্যান্ড্রা হয়তো ধরে নিয়েছে ও না বলেই স্কিইংয়ে চলে
গেছে। সিকান্দার উসমান, কামরানও এটাই ভেবেছিল
হয়তো। তাদের কিছু কল, কিছু কল ক্লাসফেলোদের। সব
কলই ছুটি শুরু হওয়ার আগে করা। সবাই ওকে বলে
রেখেছে কল ব্যাক করতে। কিন্তু ও জানে এখন সবাই যে
যার মতো ছুটি কাটাচ্ছে। যদিও কামরান, সিকান্দার উসমান
বা সাদকে পাকিস্তান কল করতে পারত। তবে ওর মন চাইল
না। কফি হয়ে গেলে এক কাপ কফির সাথে দুই টুকরো রুটি
খায়। ঘরে থাকা কিছু মেডিসিন নিয়ে বিছানায় এসে আবার
শুয়ে পড়ে। ভাবল জ্বরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। সন্ধ্যা পর্যন্ত
পুরো না হলেও অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু অনুমান সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ হয়। সন্ধ্যায় ওষুধের ঘোর কেটে যখন ঘুম ভাঙে, তখন টের পায় শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। জিভ আর ঠোঁট শুকনো। অনুভব করে গলায় কাঁটার মতো কিছু আটকে আছে। পুরো শরীর এমনকি মাথাও প্রচুর ব্যথা করছে। হয়তো হুট করে ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণে এমন মাথাব্যথা। উপুড় হয়ে শুয়ে দুই হাতে কপাল চেপে ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে ম্যাসেজ করে মাথাব্যথা কমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু লাভ হয় না। বালিশে মুখ গুঁজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ে, টের পায় না।

পরেরবার যখন চোখ খোলে, তখন রুম অন্ধকারে ডুবে ছিল। হয়তো রাত হয়ে গেছে। পুরো বাসাজুড়ে অন্ধকার। আগের চেয়েও বেশি অসুস্থবোধ করছে এখন। কয়েক মিনিট বিছানা থেকে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেয়। টের পায় মস্তিষ্ক অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এবার ঘুম না তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। নিজের গোঙানির আওয়াজ শুনতে পায়। সেই

আওয়াজের কথা চেপে ধরতে চায়, পারে না। সেন্ট্রাল হিটিংয়ের পরও ভীষণ ঠান্ডা লাগে তাই।

পুরো শরীর খরখর করে কাঁপে। কম্বল সেই কাঁপুনি থামাতে ব্যর্থ। উঠতে গিয়ে বুকে আর পেটে ব্যথা অনুভব করে।

গোঙানি তীব্র হতে থাকে। বমির উদ্রেক হওয়ায় উঠে ওয়াশরুম পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু চেষ্টা বিফলে যায়। কিছুক্ষণ লড়াই করে উঠে বসতে পারলেও বিছানা থেকে নামার আগেই ভেতর থেকে গত চব্বিশ ঘন্টায় যতটুকু যা পেটে পড়েছিল, সব বেরিয়ে আসে। অর্ধচেতন হলেও শরীরের রূপ আর কম্বলের ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিল না ও। নোংরায় লেপেট পড়ে থাকে অসহায়ের মতো। সমস্ত সত্তা অবশ্য হয়ে আসে। প্রাণহীন হয়ে বিছানায় ঢলে পড়ে। অনুভব করে ওর হৃদয় ডুবে যাচ্ছে, আশেপাশের সবকিছু থেকে চেতনা হারিয়ে। মূর্ছা যেতে যেতে মুখে গোঙানির সাথে যা আসে, তা-ই বলে। এই অবস্থা কত দীর্ঘ ছিল, জানে না। তবে হ্যাঁ এটুকু মনে আছে, এর মাঝে একবার অনুভব করেছিল

মারা যাচ্ছে। সেই প্রথম জীবনে মৃত্যু নিয়ে ভয় কাজ করে। তখন কোনোভাবে ফোন পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছিল, কাউকে কল করতে ওয়েছিল। কিন্তু বিছানা থেকে নামতে পারেনি। প্রচণ্ড জ্বর ওকে পঙ্গু করে রেখেছিল।

অবশেষে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন রাতের শেষ প্রহর ছিল, যখন ওর সত্তা সচল হয়। চোখ খোলার পর রুম আগের মতো অন্ধকারে অবিষ্কার করে। তবে শরীর আগের মতো গরম নেই। কাঁপুনি ঠিক হয়ে গেছে। শরীর, মাথাব্যথা হালকা এখন। রুমের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে পাশ দি়ে বেডসাইট টেবিল ল্যাম্প জ্বালায়। আলোর ঝলকে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে নেয়। হাত দিয়ে বন্ধ চোখের পাতা স্পর্শ করে। ওগুলো ফুলে আছে, ব্যথাও করছে। ফোলা চোখ বহু কষ্টে খুলে রুমের চারপাশে তাকিয়ে মনে মনে নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করে। টুকরো টুকরো হয়ে সব মনে পড়তে থাকে।

চলতে চলতে বিছানা থেকে নেমে কম্বল-বেডশিট অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিচে ছুড়ে ফেলো। নিজের ওপর অভুক্তি জাগো। উঠে বসে শার্টের বোতাম খুলে মেঝেতে ফেলো। দুর্বল পায়ে গিয়ে বাথরুমে ঢোকো। বাথরুমের বড় আয়নাতে নিজের চেহারা চোখ পড়তেই চমকে ওঠো। চোখগুলো ভেতরে ডেবে গেছে। চারপাশে পড়া কালি খুব স্পষ্ট। মুখটা একদম পাংশুটে আর চোঁটগুলো শুকনো। এই সময় কেউ দেখলে নিশ্চয়ই ভাবত দীর্ঘ কোনো অসুস্থতা থেকে উঠেছে ও।

দুর্বলতা ছিল না। তাহলে কী ওর শরীরে কাঁপুনি তৈরি করেছে? উঠে সোফার দিকে চলে আসে।

নুডুলসের বাটি হাতে নিয়ে আবার খাওয়া শুরু করল। কিন্তু এখন আর নুডুলসে কয়েক মিনিট আগের সেই স্বাদ খুঁজে পায় না। মনে হচ্ছিল স্বাদহীন রবারের কিছু নরম টুকরো চিবুচ্ছে। কয়েক চামচ মুখে দিয়ে বাটি টেবিলের উপর রেখে দেয়। অদ্ভুত এক অবিশ্বাসের মধ্যে ছিল। 'সত্যিই কি পাঁচ দিন

এভাবে, একা, এখানে পড়েছিল ও? না নিজে কিছু টের পেয়েছে, না অন্য কেউ জানতে পেরেছে?

আবার উঠে ওয়াশরুমে যায় ও। চেহারা কিছুক্ষণ আগের মতো লাগছে না। গোসলের কারণে কিছুটা ভালো দেখাচ্ছে। কিন্তু দাড়ি আর চোখের কালি এখনো আগের মতো দৃশ্যমান। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের চারপাশে হাত বোলায়। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সামনে ও দাঁড়ানো... কোনো বিভ্রম না। হঠাৎ করে দাড়ির দিকে চোখ গেলে বিরক্ত লাগা শুরু করে। শেভিং কিট বের করে শেভ করতে লাগল। শেভ করার সময় টের পায় ওর হাত কাঁপছে। একের পর এক চেহারার তিন জায়গা কাটে। শেভ করার পর মুখ ধুয়ে আয়নায় তাকিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে থাকে। তখন টের পায় ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, তাই মুখ মোছা বন্ধ করে দেয়। শূন্য মস্তিষ্কে আয়নায় এক ধ্যানে নিজের দিকে তাকিয়ে রইল। চেহারার উপর রক্তের ফোঁটার পরিমাণ বাড়ছে, গাঢ় লাল রং...। পলকহীন সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনটা ছোট ছোট লাল ফোঁটা।

"What is next to ecstasy?"

'Pain.' শীতল কণ্ঠ ভেসে আসে।

ও পাথরের মূর্তির মতো শুষ্ক হয়ে রইল।

'What is next to pain?'

'Nothingness.'

ওর একেকটা শব্দ মনে আছে।

'Nothingness!' আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে।

নড়াচড়ার কারণে গালের রক্ত নিচে পড়ছে।

"And what comes next to nothingness?"

'Hell.'

বমি পাচ্ছে ওর। বেসিনে নুয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট আগে খাওয়া সব বেরিয়ে আসে পেট থেকে। পানির ট্যাপ ছেড়ে দেয়। এরপর কী রিপ্পে করেছিল এবং উত্তরে কী বলা হয়েছিল, মনে আছে ওর।

একটা সময় 'এখন তোমার বুঝে কিছুই আসছে না, আসবেও না। কিন্তু আসবে... যখন সব বুঝে যাবো। প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সব বুঝতে শুরু করে। তখন কোনো প্রহেলিকা আর প্রহেলিকা থাকে না। আমি সেই সময় পার করছি। সেই সময়টা তোমার কাছেও আগামীতে কখনো না-কখনো আসবে। তখন দেখো তোমার এই হাসি থাকে কিনা।'

ওর অস্থির লাগে, অনুভব করে চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

'জীবনের কোনো না-কোনো সময় আমরা এমন একপর্যায়ে চলে আসি, যেখানে দাঁড়িয়ে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। সেখানে শুধু আমরা থাকি এবং আল্লাহ থাকেন। মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব কেউ থাকে না। তখন আমরা টের পাই, না আমাদের পায়ের নিচে মাটি আছে: না মাথার উপর আকাশ। আছেন শুধু আল্লাহ, যিনি এমন শূন্যতার মাঝেও আমাদেরকে আগলে রেখেছেন। তখন আমরা বুঝতে পারি, পৃথিবীতে আমাদের মূল্য বালির ভূপের মধ্যে থাকা একটা বালির কণা অথবা গাছে ঝুলতে থাকা একটা পাতার চেয়ে বেশি কিছু না। তখন জানতে পারি, আমাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে শুধু আমাদেরই যায়-আসে। কেবল আমাদের চরিত্র শেষ হয়ে যায়। পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তন আসে না। কিছুর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।'

বুকে অদ্ভুতরকম ব্যথা অনুভব করে ও। হাত ভরে পানি নিয়ে মুখে ছিটায়। আবার বমি আসছে।

'তখন আমাদের মস্তিষ্ক গন্তব্য খুঁজে পায়।'

আওয়াজটা মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। অবাক হয়ে ভাবে 'ওকে কেন এই সময় মনে পড়ছে?' ক্রমাগত মুখে পানি দিতে থাকে। মুখ মুছে আফটার শেভের বোতল খুলে গালের ঘাগুলোতে লাগায়। ওগুলোয় এই প্রথম বাথা অনুভব করে। বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় টের পায় এর হাত এখনো কাঁপছে। 'আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত।' হাত মুঠ করে নেয়। 'আমার সাহায্য দরকার, চেক-আপ করানো দরকার।' জানে না হঠাৎ কীসের আতঙ্ক ঘিরে ধরল। রুমে দম বন্ধ লাগা শুরু করে। যেন কেউ ওর গলায় হাত রেখে আস্তে আস্তে চেপে ধরছে।

'আমাকে সবাই ভুলে যাবে, এটা সম্ভব? এমনভাবে...?'

ওয়ারড্রব থেকে কাপড় বের করে কিছুক্ষণ আগে পরা কাপড় আবার চেইঞ্জ করতে থাকে। যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে যেতে চায়। কারণ হুট করে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে ভয় লাগছে ওর।

রাতে বাসায় ফিরে প্রায় সারা রাতই জেগে ছিল। অজানা শঙ্কা ওকে গ্রাস করে রাখে। ওর মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না, ওকে এভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছে। বাবা-মায়ের প্রয়োজন ও, তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পেয়ে এসেছে। ওর কাজের কারণেই হোক। সিকান্দার উসমান আর তায়িরা সিকান্দার খুব সতর্ক থাকতেন ওকে নিয়ে। সবসময় চিন্তা করতেন ওর ব্যাপারে। কিন্তু এই কয়েকদিনে... সবার জীবন থেকে ছিটকে গেল- বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোন, বাবা-মা? এই অসুস্থতায় অ্যাপার্টমেন্টে মরে পড়ে রইলে কেউ জানতেও পারত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না লাশ পচে-গলে গন্ধ বের হতো। আর এই আবহাওয়ায় তা হতে কতদিন লাগত?

সেই রাতে প্রতি ঘন্টায় আনসারফোন চেক করে ও। পরের সপ্তাহটাও অবিশ্বাস নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে কাটায়। পুরো সপ্তাহে কোথাও থেকে ওর জন্য কোনো কল আসে না। 'সব মানুষ কি আমাকে ভুলে গেছে?' ও আতঙ্কিত হয়। এক সপ্তাহ বোকার মতো সবার কলের অপেক্ষা করে

নিজেই সবার সাথে যোগাযোগে করে। সবাইকে জানাতে চায় ওর সাথে কী ঘটেছে, কোন পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে গেছে। তাদের কাছে অভিযোগ করতে চায়। কিন্তু প্রত্যেকের সাথে কথা বলে অনুভব করে, কেউ ওর কথায় আগ্রহী না। সবার নিজস্ব ব্যস্ততা রয়েছে।

সিকান্দার আর তায়িবা ওকে অস্ট্রেলিয়ায় তাদের কাটানো সময়ের ব্যাপারে বলতে থাকেন। তারা সেখানে কী করেছেন, কতটা ইনজয় করেছেন। ফাঁকা মস্তিষ্কে তাদের কথা শুনছিল ও।

'তুমি ইনজয় করছ তোমার ছুটি?' দীর্ঘ আলাপচারিতার পর অবশেষে তায়িবা সিকান্দার জিজ্ঞেস করলেন।

মায়ের সাথে কী বলা উচিত, কী জানানো উচিত। 'আমি! হ্যা... অনেক।' শুধু তিনটা শব্দই বলল। সত্যিই বুঝতে পারছে না সবার সাথে পালাক্রমে কথা বলে এই প্রথম এমন পরিস্থিতি ও অনুভূতির মুখোমুখি হয়। প্রাথমিকভাবে

প্রত্যেকেই নিজের জীবনে ব্যস্ত। হয়তো তাদরকে নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা বললে তারা ওর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করত, চিন্তিত হয়ে পড়ত। কিন্তু সেসব পরে হতো, বলার পরে। কিন্তু এর আগে তাদের জীবনবৃত্তে ওর অবস্থান কোথায়? কার আগ্রহ ছিল এটা শোনায়, এর এই কয়দিন কীভাবে কেটেছে?

সেই প্রথম ভাবতে বাধ্য হলো। 'আমার জীবন যদি শেষ হয়ে যায়, তাতে অন্যদের কী যায়-আসে? পৃথিবীতে কী এমন পরিবর্তন আসবে? আমার পরিবারের অনুভূতি কেমন হবে? তেমন কিছু না...। কয়েকদিনের শোক ছাড়া কিছু হবে না। পৃথিবীতে হয়তো কয়েক মুহূর্তেরও পরিবর্তন আসবে না। সালার সিকান্দার যদি নিখোঁজ হয়ে যায়, তাতে অন্য কার কী? এতে তার আইকিউ ১৫০+ হোক।' নিজের চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু এমন হতাশা, এই ধরনের মনের অবস্থা থেকে পিছু ছাড়ানো...

'কী হয়েছে? যদি সবাই আমাকে কিছু দিনের জন্য ভুলেও যায়, তাতেই-বা কী? মাঝেমধ্যে এমন হয়ে যায়। আমিও তো বহুবার বহুজনের সাথে যোগাযোগ করি না। আমার সাথেও এমন কিছু ঘটেছে...। কিন্তু আমার সাথে কেন এমন হবে? আর যদি সত্যিই আমি জ্ঞান ফিরে না পেতাম... জ্বর না কমত...বুক আর পেটের ব্যথা না কমত...?' মাথা থেকে সব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবার ব্যর্থ হয়। কষ্টের চেয়ে বেশি ভয় ছিল। যার শিকার হঠাৎ করে হওয়া অসুস্থতার কারণে হয়েছে। 'আমি একটু বেশি আবেগ নিয়ে ভাবছি। নাহলে সাময়িক সময়ের অচেতন হওয়াকে কেন মাথায় চাপাচ্ছি!' বিরক্তবোধ করে।

'অন্তত এখন তো সুস্থ। তাহলে আমার সমস্যা কী? কেন মৃত্যু নিয়ে এত ভাবছি? এর আগেও তো বহুবার অসুস্থ হয়েছি। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। তখন যদি কোনো ভয় আমাকে বিচলিত করতে না পারে, তাহলে এখন কেন আমাকে এ ধরনের ভয় বিচলিত করছে?' ওর উদ্বেগ বাড়তে থাকে। 'জ্বরের সেই যন্ত্রণাও ঠিকমতো মনে নেই আমার। স্বপ্ন বা

কোমার মতো ছিল, এর চেয়ে বেশি কিছু না।" ও হাসতে চেষ্টা করে। 'কী আমাকে এমন জ্বালাচ্ছে? কোনো রোগ নাকি এই উপলব্ধি যে, কারো আমাকে প্রয়োজন নেই? কেউ আমাকে মনে করেনি। আমার আপন মানুষেরা... আমার পরিবার... আমরা বন্ধুরা কেউ ভাবেনি আমাকে নিয়ে।'

'My God! কী হয়েছে সালার?' ইউনিভার্সিটি খুলতেই ওকে প্রথমদিন দেখে জিজ্ঞেস করল স্যাড্রা।

'কিছু হয়নি আমার।' সালার হাসতে চেষ্টা করে।

'অসুস্থ ছিলে?' স্যাড্রার সন্দেহ হয়।

'হ্যাঁ, একটু।'

'মনে তো হচ্ছে না একটু অসুস্থ ছিলে। শুকিয়ে গেছ। চোখের নিচে কালি। কী হয়েছিল?'

'কিছুই না, সামান্য জ্বর আর ফুড পয়জনিং।' সালার হাসে।

'তুমি পাকিস্তান গিয়েছিলে?'

'না, এখানে ছিলাম।'

'নিউইয়র্ক যাওয়ার আগে কল করে বারবার আনসারফোন পেয়েছি। রেকর্ড করে রাখতে পাকিস্তান যাওনি।'

'Just stop it!' সালার বিরক্ত হয়। 'একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছ।'

স্যাড্রা অবাক হয়ে সালারের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি আমার স্ত্রী নও যে এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।'

'সালার! কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। থামো এখন। কী হয়েছে, কেন হয়েছে, কোথায় ছিলে, কেন ছিলে rubbish!'

স্যাড্রা কিছু বলতে পারল না। সালার এমন আচরণ কেন করছে বুঝতে পারছে না।

সেদিন এই প্রশ্ন করা মানুষ স্যাড্রা একা ছিল না। ওকে দেখার পর বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত সবাই এই প্রশ্ন আর এমন প্রতিক্রিয়া দেখায়। দিনটা শেষ হওয়ার জন্য ভীষণরকম ছটফট করে। তাদের এসব প্রশ্ন শুনতে ভাসিটিতে আসেনি ও। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ আরও মনে করিয়ে দিচ্ছিল, ওর সাথে সত্যিই খারাপ কিছু হয়েছে। কিন্তু সেই উপলব্ধি থেকে মুক্তি চায় ও।

'মুভি দেখার প্রোগ্রাম আছে এই উইকেন্ডে, যাবে?' দানিশ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, যাব।" সালার রাজি হয়ে যায়।

'তাহলে রেডি থেকো, আমি তোমাকে পিক করব।' দানিশ প্রোগ্রাম ফাইনাল করে।

কথা অনুযায়ী ওকে নিতে আসে দানিশ। অনেক সপ্তাহ পর সিনেমা হলে মুভি দেখতে যাচ্ছিল ও। ভেবেছে অন্তত আজকের রাত সবার মাঝে কিছুটা ভালো সময় কাটাবে। কিন্তু মুভি শুরু হওয়ার দশ মিনিট পর হঠাৎ একধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। সামনের স্ক্রিনে দেখানো চরিএদের ওর কাছে কাঠের পুতুল মনে হয়। যাদের নড়াচড়া আর আওয়াজ বুঝতে অক্ষম ও। কিছু না বলে খুব ধীরে উঠে হল থেকে বেরিয়ে আসে। পার্কিং লটে এসে অনেকক্ষণ দানিশের গাড়ির বনেটে বসে রইল। এরপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসে।

প্রফেসর রবিনসন লেকচার শুরু করেছেন। পেপারে তারিখ আর টপিক লিখল সালার। তিনি ইকোনমিক রিসেশন নিয়ে কথা বলছিলেন। যথারীতি তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ওর মস্তিষ্ক অন্যত্র। জীবনে এমনটা এই প্রথমবার হচ্ছে। প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ওর বিচরণ অন্য কোথাও। কিন্তু কোথায়... নিজেরও জানা নেই। এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্য, সেই দৃশ্য থেকে আবার নতুন দৃশ্য। এক কণ্ঠ থেকে অন্য কণ্ঠ, সেই কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠ। যাত্রা কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় যাচ্ছে... জানে না ও।

'সালার! বের হবে না?' স্যান্ড্রা ওর কাঁধ নেড়ে বলল।

সালার চমকে ওঠে। ক্লাস খালি। শুধু স্যান্ড্রা ওর পাশে। অবিশ্বাস্য চোখে ফাঁকা ক্লাসরুমে নজর বোলায়। এরপর দেয়াল ঘড়ি থেকে হাতে থাকা রিষ্ট ওয়াচের দিকে। 'প্রফেসর রবিনসন কোথায়?' মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

'ক্লাস শেষ, তিনি চলে গেছেন।' স্যাড্রা অবাক চোখে তাকায়।

'ক্লাস শেষ?' যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সালার।

সালার দুই হাত দিয়ে চোখ ঘষে সিটের সাথে হেলান দেয়।
প্রফেসর রবিনসনের লেকচারের শুধু টপিক মনে আছে ওর।
এরপর কী বলেছেন, কিছু শোনেনি।

'তুমি কি আপসেট?' স্যাড্রা জিজ্ঞেস করল।

'না, কিছু না। আমি এখানে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই।'

'ওকে।' স্যাড্রা নিজের জিনিসপত্র তুলে বাইরে চলে যায়।

বুকের উপর হাত ভাঁজ করে সামনের রাইটিং বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা আজকের তৃতীয় ক্লাস ছিল, যেখানে ওর সাথে আবার এমন হয়েছে। ভেবেছিল ইউনিভার্সিটিতে

আসা-যাওয়া শুরু করলে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ডিপ্রেশনের সেই ফেইস থেকে বেরিয়ে আসবে, যার মাঝে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ইউনিভার্সিটিতে এলেও মানসিক অশান্তি পিছু ছাড়ছে না। যার ফলে পড়াশোনার ওপর থেকে মন উঠে যাচ্ছে। সবকিছু লৌকিক লাগছিল। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার অর্থেই ডিপ্রেশনের শিকার হয়। স্টাডি, ইউনিভার্সিটি, ফ্রেন্ড'স, ক্লাব, পার্টি, রেস্টুরেন্ট, আউটিং সবকিছু অর্থহীন হয়ে পড়ে ওর জন্য। বন্ধুদের সাথে দেখা করা বন্ধ করে দেয়। আনসারফোনে প্রায়ই রেকর্ড করে রাখে বাসায় নেই। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করেও শেষ মুহূর্তে এসে না করে দিত। চলে গেলে হুট করে কাউকে না বলে ফিরে আসত। ভার্সিটির বেলায়ও এমন করছিল, একদিন গেলে দুদিন অনুপস্থিত। এক পিরিয়ড করলে পরের দুই পিরিয়ড বাদ।

অ্যাপার্টমেন্টে এমনও দিন যায়, সারা দিন বিছানায় শুয়ে কাটায় ও। মুভি দেখা শুরু করলে দেড়-দুই ঘন্টা যাওয়ার পরও বুঝত না কী দেখছে। টিভি চ্যানেল পাল্টাতে গিয়েও

একই অবস্থার শিকার ছিল। ওর ক্ষুধা মরে যায়। খাওয়া শুরু করে হঠাৎ মনখারাপ লাগে, খাবার ঠেলে রাখে। মাঝেমধ্যে সারা দিন না খেয়েই কাটিয়ে দেয়। শুধু একের পর এক কফির কাপ নিজের ভেতরে ঢালে। ও চেইন স্মোকার ছিল না। কিন্তু তখন হয়ে যায়। নিজের সবকিছু পরিপাটি রাখায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সেই দিনগুলোতে ওর অ্যাপার্টমেন্ট আবর্জনার প্রতীক হয়ে ওঠে। এমন বিশৃঙ্খলা দেখার পরও আগের মতো বিরক্ত লাগে না ওর। ভাই-বোন, বাবা-মায়ের সাথেও কথা কমিয়ে দিয়েছিল। তারা ফোনের ওপাশ থেকে বলত, এপাশ থেকে শুধু নীরবে শুনত। বড়জোর হ্যাঁ-তে উত্তর দিত। ওর কাছে তাদেরকে বলার মতো, তাদের সাথে শেয়ার করার মতো সবকিছু যেন ছুট করে ফুরিয়ে গিয়েছিল। এসব কেন হচ্ছে কিছুই জানে না ও।

যা জানত তা ছিল এসব চিন্তা ও পরিস্থিতির সাথে ইমামা হাশিম জড়ানো। সেই মেয়ে না ওর জীবনে আসত, না ওর সাথে এসব ঘটনা ঘটত। আগে শুধু ইমামা অপছন্দের ছিল, কিন্তু এমন মানসিক অবস্থার পর থেকে ইমামাকে ঘৃণা করতে

শুরু করে ও। ক্ষীণ অনুশোচনার যে অনুভূতি সামান্য সময়ের জন্য উদয় হয়েছিল, তা অদৃশ্য হয়ে যায়। 'ওর সাথে যা হয়েছে, ঠিক হয়েছে। আমি যা করেছি, ঠিক করেছি। ওর সাথে এরচেয়ে বেশি খারাপ হওয়া উচিত ছিল।' নিজেকে বলে ও। ইমামা হাশিমের মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি বাক্য, শব্দ, অক্ষরকে ঘৃণা লাগে ওর। ইমামার কথা মনে পড়লে ঘুম নাই হয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে আতঙ্ক কাজ করে। সেই রাতে যা নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, তা সারাক্ষণ ওর কানে বাজে এখন।

'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? ধীরে ধীরে জ্ঞান-বুদ্ধি হারাচ্ছি? সিজোফ্রেনিয়ার শিকার হচ্ছি?' মাঝেমধ্যে বসে বসে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ও। সবকিছু অর্থহীন লাগে। সবকিছুর অর্থহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর কাছে। 'সালার কে, কোথায় আছে, কেন আছে?' এসব প্রশ্ন ওকে সারাক্ষণ জ্বালাতন করছিল। 'কী এমন হবে, যদি আমি ইয়েল থেকে এমবিএ ডিগ্রি নিয়ে বের হই? খুব ভালো জব পাবো, নাহলে একটা ফ্যাক্টরি খুলব আর তারপর? কিন্তু এগুলো কি সেই কাজ,

যার জন্য আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে...? ১৫০+ আইকিউ নিয়ে হয়তো আমি আরও কিছু ডিগ্রি অর্জন করব, দুর্দান্ত একটা বিজনেস করব, বিয়ে করব, সন্তান জন্ম দেবো, বিলাসিতা করব, তারপর মরে যাব, ব্যস...?"

জীবনে চারবার শুধুমাত্র নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ও। কিন্তু এখন তীব্র ডিপ্রেশনের মাঝে থেকেও আত্মহত্যার কথা ভাবছিল না। চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যু নিয়ে ভাবলেও সেটাকে ছুঁতে চাইছিল না। তবে যদি কেউ ওকে জিজ্ঞেস করে 'ও কি বেঁচে থাকতে চায়?' তাহলে উত্তর দিতে সময় লাগবে। ও বেঁচে থাকতে চায় না, কারণ জীবনের মানে জানে না। মরতেও চায় না, কারণ মরার অর্থও অজানা ওর। শূন্যতায় আটকে ছিল... কোনো গোলকধাঁধার মাঝে... কোনো মধ্যবর্তী অবস্থায়। জীবিত থেকেও মৃত বা মৃত হয়েও জীবিত। ক্ষণে ক্ষণে উৎসর্গের শিখরে পৌঁছোচ্ছিল। ১৫০+ স্তরের আইকিউ রাখা সেই মানুষটা, যে তার সামনে বলা বা শোনা কিছু ভুলত না। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে, বিয়ারে চুমুক দিয়ে, নাইট ক্লাবে

ডান্স করে, দামি রেস্টুরেন্টে খেয়ে, গার্লফ্রেন্ডদের সাথে রাত কাটিয়ে এখন তার মনে প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, জীবনের উদ্দেশ্য কী এগুলো? বিলাসিতা ও আমোদপ্রমোদ? সেরা পোশাক, চমৎকার খাবার, সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা, ঘাট-সত্তর বছরের একটা জীবন, তারপর? তারপরের উত্তর ওর কাছে নেই। কিন্তু এই তারপর-র কারণে ওর জীবনের কঠিন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ অনিদ্রায় ভুগছিল। এই দিনগুলিতেই হঠাৎ ধর্মের প্রতি আগ্রহ নেওয়া শুরু করে ও। ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক মানুষকে এই কাজ করতে দেখেছিল। তাই নিজেও শুরু করে ধর্ম সম্পর্কিত বই পড়ার চেষ্টা। কিন্তু সব ওর মাথার ওপর দিয়ে যায়। কোনো আয়াত, কোনো হাদিস ওকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে পারছিল না। জোর করে কয়েক পাতা পড়ে বই বন্ধ করে রাখত। কিছুক্ষণ পর আবার খুলত, আবার রেখে দিত।

'এভাবে না, হয়তো আমার আমল শুরু করা উচিত। এতে উপকার হবে।' নিজেকে বোঝায়। একদিন যখন সাদের সাথে ছিল, তখন এটাই করল।

'আমিও যাব তোমার সাথে।' সাদকে বের হতে দেখে বলল ও।

'কিন্তু আমি তো এশার নামাজ পড়তে যাচ্ছি।' সাদ ওকে বলল।

'জানি আমি।' জগার্সের ফিতা টাইট করতে করতে বলল ও।

'আমার সাথে মসজিদে যাবে?' সাদ অবাক হয়।

'হ্যাঁ।' সালার উঠে দাঁড়াল।

'নামাজ পড়তে?'

'হ্যাঁ। এভাবে তাকানোর কী আছে, আমি কাফের তো না।'

'কাফের না কিন্তু... আচ্ছা চলো।' সাদ কিছু বলতে গিয়ে প্রসঙ্গ বদলে ফেলে। 'আমি এমনিতেও তোমাকে কতবার সঙ্গে আসতে বলেছি।'

সালার প্রত্যুত্তর করে না। চুপ করে সাদের সাথে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'যেহেতু আজকে মসজিদে যাচ্ছ, সামনেও যেতে থেকো। এমন যাতে না হয়, এটাই প্রথম ও শেষ দর্শন তোমার।'

বাইরে তুষার পড়ছিল। মসজিদ আবাসিক ভবনগুলো থেকে কিছুটা দূরে। ওটা মূলত একটা মিশরীয় পরিবারের বাড়ি। নিচতলা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার হয়, উপরতলায় তারা থাকে। অধিকাংশ সময় ওখানে নামাজিদের সংখ্যা দশ থেকে পনেরোর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। সাদ মসজিদে পৌঁছানো অব্দি সালারকে সবকিছু বলছিল। ও নীরবে, কিছুটা অনুপস্থিত মস্তিষ্ক নিয়ে রাস্তা দিয়ে সাবধানে স্লাইডিং গাড়ি আর চারপাশের বরফের ভূপের দিকে তাকিয়ে সাদের সঙ্গে

হাঁটছিল। পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটার পর মোড় ঘুরে সাদ এক বাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু লক করা না। সাদ দরজায় নক করেনি, কারো কাছ থেকে অনুমতিও চায়নি। খুব পরিচিত ভঙ্গিতে দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢোকে। সালার বন্ধুকে অনুসরণ করে।

'তুমি অজু করে নাও।' ওকে ডেকে বাথরুমের দিকে আসে সাদ।

সাদের নজরদারি ওর অজু শেষ হওয়া পর্যন্ত চলে। ততক্ষণে ঠান্ডা পানি গরম হয়ে গেছে। মাথা মাসেহ করতে গিয়ে থেমে যায়। সাদ মনে করে ও হয়তো সঠিক নিয়ম জানে না, তাই ওকে বুঝিয়ে দেয়। ও শূন্য মস্তিষ্কে হাত নড়াচড়া করতে থাকে। ঘাড়ের কাছে এসে ওর হাত গলায় থাকা চেইনের সাথে ধাক্কা লাগে। চোখ তুলে সামনের আয়নায় তাকিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়। সাদ কিছু বলছিল। কিন্তু শুনছে না ও। রুমে উপস্থিত দশজন মানুষ দুই কাতারে দাঁড়ায়। সাদের

সঙ্গে পেছনের কাতারে ছিল ও। ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করে। সবার মতো হাত বাঁধে ও।

'নামাজ কি আসলেই শান্তি দেয়?' সপ্তাহ দুয়েক আগে নামাজের ইস্যুতে এক ছেলেকে সাদের সঙ্গে তর্ক করতে দেখেছিল।

'আমি তো পাই।' সাদ বলেছিল।

'আমি তোমার কথা বলছি না, সবার কথা বলছি। সবাই পায়?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করেছিল।

'এটা নির্ভর করে মানুষের ওপর, কে কতটা মন দিয়ে নামাজ পড়ে সেটার ওপর।'

খুব বিরক্ত হয়ে কোনোরকম হস্তক্ষেপ ছাড়া ওদের কথা শুনেছিল সাদার। তাই নিজের বেলায় সচেতনভাবে নামাজে মনোযোগ তৈরি করার চেষ্টা করে। 'শান্তি? আমিও দেখতে

চাই নামাজ কীভাবে শান্তি দেয়।' রুকুতে যাওয়ার সময় মনে মনে ভাবল। প্রথম সেজদা করে। ওর অস্থিরতা বেড়ে যায়। যে আয়াতগুলো ইমাম সাহেব পাঠ করছে, ওর কানে তা খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইকে অপরিচিত লাগছে। যে পরিবেশে রয়েছে, সেটাকে অপ্রাকৃতিক মনে হচ্ছে। যা করছে ওর কাছে তা মুনাফিকি লাগছে। প্রতিটি সেজদার সাথে ওর মস্তিষ্ক আর মনের ভার বাড়তে থাকে। প্রথম চার রাকাত অনেক কষ্টে শেষ করে। সালাম ফেরানোর সময় ডানদিকের মাঝের লোকটার গালে অশ্রু দেখে ওর মন ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বলে।

নিজেকে আরেক দফা বুঝিয়ে নামাজে দাঁড়ায়। পুরোপুরি মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করে।

‘এবার পাঠ করা প্রতিটি আয়াতের ওপর আমি মনোযোগ দেবো। তাহলে হয়তো...’ ভাবনার শেকল ভেঙে যায়।

নিয়ত করা হচ্ছিল। ওর হৃদয় ডুবতে থাকে। মাথার বোঝা বাড়ে। আয়াতের অর্থের দিকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল।

‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।’ সুরা ফাতিহার তেলাওয়াত শুরু হয়।

‘আর রাহমানির রাহিম।’ মনোযোগী থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

‘মালিকি ইয়াওমিদ্দিন।’ মনোযোগ সরে যায় ওর।

‘ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়িন।’ সুরা ফাতিহার অর্থ জানে ও, কয়েকদিন আগেই পড়েছে।

‘ইহদিনাস সিরতল মুস্তাকিম।’ সরল পথ, মনে মনে আওড়ায়। ‘সিরতল মুস্তাকিম, সরল পথ?’ ওর মন চাইল ওখান থেকে পালিয়ে যেতে। নামাজ চালিয়ে যাওয়ার একটা শেষ চেষ্টা করে তবুও।

'সিরতল্লাযিনা আনআমতা...' ওর মস্তিষ্ক আবার পেছনে চলে যায়।

'আলাইহিম, গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম; ওয়ালাদল্লিনা' বুকে বাঁধা হাত খুলে ফেলো। শেষের কাতারে ছিল ও, তাই খুব আন্তে কয়েক পা পিছিয়ে আসে। 'এই কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, আমি নামাজ পড়তে পারব না।' যেন স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল। খুব নিঃশব্দে পেছাতে থাকে। অন্যরা রুকুতে যাচ্ছে তখন। ঘুরে ভারী পায়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে। জগার্স ওর হাতে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ফাঁকা মস্তিষ্কে এদিক-সেদিক তাকায়। এরপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। পায়ে মোজা আর হাতে জুতা নিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে আসে। ওখানে আরেকটা দরজা আর কিছু সিঁড়ি দেখাচ্ছিল। কিন্তু সিঁড়িগুলো বরফে ঢাকা। দরজার সামনের লাইট জ্বালানো নেই। নিচু হয়ে সবচেয়ে উপরের সিঁড়িটা জুতা দিয়ে পরিষ্কার করে সেখানে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ আগে হওয়া তুষারপাত এখন বন্ধ। সিঁড়িতে বসে জুতা পরে নেয়। ফিতা টাইট করে আবার সোজা হয়ে দরজার সাথে হেলান দিয়ে বসে। দুই হাত

জ্যাকেটের পকেটে। হুড টেনে মাথায় দেওয়া। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা-দুইটা গাড়ি চলছে। সিঁড়িতে পা বিছিয়ে পিঠ দরজার সাথে লাগিয়ে আসা-যাওয়া করা দুয়েকটা গাড়ি আর ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকা লোকজন দেখতে থাকে। সেই ঠান্ডা-কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে কিছুক্ষণ আগের মসজিদের উত্তম আরামদায়ক জায়গার চেয়ে বেশি শান্তি অনুভব করছিল। অন্তত অস্বস্তি লাগছে না এখানে ওরা।

পকেট থেকে লাইটার বের করল। ওটা জালিয়ে সিঁড়ির উপরে থাকা পায়ের কাছের বরফ গলাতে থাকে। কিছুক্ষণ এই ধ্যানে মগ্ন থাকার পর বিরক্ত হয়ে লাইটার বন্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। উঠে সোজা হয়ে নিজের সামনে একজন মহিলাকে দাঁড়ানো দেখে। সে নিশ্চয়ই তখন এসেছে, যখন ও সিঁড়িতে ঝুঁকে বরফ গলাচ্ছিল। আবছা অন্ধকারেও তার হাসি দেখতে অসুবিধা হলো না ওরা। মিনি স্কাট, স্কিমপি ব্লাউজ, উপরে একটি পশমি কোট পরে আছে সে। কোটের উপর দিক ইচ্ছাকৃত খুলে রাখা। মহিলা কোটের

দুই পকেটে হাত রেখে ওর সামনে খুব স্টাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল তাকে। এমন ঠান্ডার মধ্যেও তার পা খোলা। আশেপাশের দোকানের নিয়ন আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার পা খুব সুন্দর। কিছুক্ষণের জন্য চোখ ফেরায় না ও। পায়ে হাই-হিল বুট। ভারতে থাকে বরফের এই ঝুপের মধ্যে কীভাবে এই জুতা পরে হাঁটে উনি?

"I charge 50 for one hour." মহিলা খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল।

তার পায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে চেহারার দিকে তাকায় সালার। ওর চোখ আবার তার পায়ের দিকে যায়। অনেক বছর পর এই প্রথম কারো জন্য ওর খারাপ লাগছিল। কী এমন অসহায়ত্বের কারণে তাকে এই ঠান্ডার মধ্যে উন্মুক্ত পায়ে হাঁটতে হচ্ছে? যেখানে মোটা জিন্স পরেও শীতকে নিজের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়া অনুভব করছিল ও।

'Ok 40 dollars.' ওকে চুপ থাকতে দেখে মহিলার মনে হলো দাম হয়তো মনমতো হয়নি, তাই কমিয়ে বলল।

সালার জানে চল্লিশ ডলারও বেশি। এই রাস্তায় বিশ ডলার দিলেই যেকোনো মেয়েকে এক ঘন্টার জন্য পাওয়া যাবে। আর উনি তো পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের মহিলা। সে কথা বলার সময় সতর্ক চোখে রাস্তার এপাশ-ওপাশে তাকাচ্ছিল। সালার জানে এই সতর্কতা পুলিশের জন্য।

'Ok 30... no more bargaining.'

"Take it or leave it." জ্যাকেটের পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে বাড়িয়ে দেয় সালার। তখন ওর কাছে ওয়ালেট ছিল না।

মহিলা অবাক চোখে তাকিয়ে ওর হাত থেকে নোটগুলো ছিনিয়ে নেয়। এটা তার প্রথম, যে এডভান্স পেমেন্ট করছে।

তাও 50 ডলার পুরো। যেখানে সে এতক্ষণে দাম কমিয়ে ফেলেছিল।

‘তুমি আমার সাথে আসবে না আমি তোমার সাথে যাব?’
মহিলা খোলামেলা জিজ্ঞেস করল।

‘না আমি তোমার সাথে যাব, না তুমি আমার সাথে আসবে।
শুধু এখান থেকে সরে যাও।’ রাস্তার অপরপাশের
দোকানগুলোর দিকে চোখ স্থির করে বলে ও।

মহিলা অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকায়। ‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ।’ সালার অভিব্যক্তিহীন সুরে বলে।

‘তাহলে এগুলো কেন?’ হাতে থাকা নোটের দিকে ইশারা
করে বলল মহিলা।

‘যাতে সামনে থেকে সরো এবং আমি রাস্তার অন্যপাশের দোকান দেখতে পারি। যার মাঝে তুমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছ।’
সালার শীতল কণ্ঠে বলে।

মহিলার হাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। ‘ভালো মজা করতে পারো তো! আমি কি সত্যিই চলে যাব?’

মহিলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ‘Ok, thank you honey’ বলে চলে যায়। সালার তাকে রাস্তা পার হতে দেখে। আগ্রহ ছাড়াই তার চলে যাওয়া দেখছিল। রাস্তা পার করে মহিলা অন্য কোণার দিকে যাচ্ছে, সেখানে আরেকজন পুরুষ দাঁড়ানো। চোখ ফিরিয়ে দোকানের দিকে চাহনি স্থির করে। আবার বরফ পড়া শুরু হয়েছে। তবু তৃপ্তি নিয়ে বসে রইল ও। বরফ ওর উপরেও পড়ছে এখন। রাত আড়াইটা পর্যন্ত ওখানেই রইল। যখন দেখল রাস্তার পাশের লাইটগুলো একে-একে নিভে যাচ্ছে, তখন জ্যাকেট আর কেডসের উপরের বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ায়। ফাঁকে ফাঁকে নড়াচড়া না করলে এতক্ষণে পায়ের ওপর ভর দিয়ে

দাঁড়ানোর অবস্থায় থাকত না। তবুও উঠে হাঁটতে কিছুটা অসুবিধা হয়। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে পা নাড়ে-চাড়ে। এরপর জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটা শুরু করে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। সাদ মসজিদ থেকে বেরিয়ে ওকে খুঁজে না পেয়ে চলে যাবে।

‘কোথায় চলে গেছিলে?’ সাদ ওকে দেখে চিৎকার করে।

সালার কিছু না বলে ভেতরে ঢুকল।

‘আমি কিছু জিজ্ঞেস করছি।’ সাদ দরজা বন্ধ করে ওর পেছনে আসে।

সালার জ্যাকেট খুলছিল। ‘কোথাও যাইনি।’

‘তুমি জানো আমি কত খুঁজেছি? কোথায় কোথায় ফোন করেছি? এখন তো এত দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে, পুলিশকে ফোন

করার কথা ভাবছিলাম। এভাবে নামাজ ছেড়ে কোথায় গেছ?'

সালার এবারও কিছু না বলে জগার্স খুলতে থাকে। 'বললাম তো কোথাওনা।'

'তাহলে এতক্ষণ ছিলে কোথায়?' সাদ ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

'মসজিদের পেছনের ফুটপাতে।' সালার নরম কণ্ঠে বলে।

'হোয়াট! এতক্ষণ ফুটপাতের বরফে বসে ছিলে?' সাদ হতম্বব।

'হ্যাঁ।'

'এমন আচরণের পেছনে কোনো যুক্তি আছে?' সাদ বিরক্ত হয়।

'না, নেই।' সালার বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল।

'কিছু খেয়েছ?'

'না।'

'তাহলে খেয়ে নাও।'

'ক্ষুধা নেই।' সালার এখন সিলিংয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাদ ওর পাশে এসে বিছানায় বসল। 'তোমার সমস্যা কী বলতে পারো আমাকে?'

সালার হালকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। 'কোনো সমস্যা নেই।' ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে উত্তর দেয়।

'ভেবেছিলাম অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছ। কিন্তু বারবার কল করেও পাইনি।' সাদ বিড়বিড় করে। সালারের চোখ সিলিংয়ের দিকে স্থির।

'এরচেয়ে ভালো ছিল তোমাকে নামাজে না নিয়ে যাওয়া।
আর কখনো আমার সাথে যাবে না।' সাদ রুষ্ট হয়ে বলে
বিছানা থেকে উঠে যায়।

টুকটাক কাজ শেষ করে নাইট বাল্ব অন করে নিজেও এসে
বিছানায় শুয়ে পড়ে। মাত্রই চোখ বন্ধ করেছিল, যখন
সালারের গলা শুনতে পায়।

‘সাদ?’

‘হ্যাঁ।’ সাদ চোখ মেলে।

‘এই সিরাতে মুস্তাকিম কী?’

সালারের পক্ষ থেকে আসা এই প্রশ্ন সাদকে ভ্রঙ্ক করে। ঘাড়
ঘুরিয়ে বাঁ-দিকে ফিরল। 'সিরাতে মুস্তাকিম সরল পথকে
বলে।'

‘আমি জানি, কিন্তু এই সরল পথ কোনটা?’

আরেকটা প্রশ্ন। সাদ ওর দিকে ঘুরল। ‘সরল পথ মানে নেকির পথ।’

‘নেকি কী?’ সালারের কণ্ঠ এখনো নির্জীব ছিল।

‘ভালো কাজকে নেকি বলে। ভালো কাজ, যা অন্যের জন্য করা হয় এমন কাজ। কাউকে সাহায্য করা, কারো ওপর দয়া করা; এগুলো ভালো কাজ এবং প্রতিটি ভালো কাজের জন্য নেকি রয়েছে।’

‘কয়েক ঘন্টা আগে ফুটপাতে আমি এক হুকারকে ৫০ ডলার দিয়েছি, যেখানে শুধু ৩০ ডলার চেয়েছিল মহিলা। এর মানে এটাও নেকির কাজ?’

সাদের ইচ্ছে করছিল ওর মুখ বরাবর ঘুষি মারতে। অদ্ভুত মানুষ! 'অহেতুক কথা বন্ধ করে ঘুমাও, আমাকেও ঘুমাতে দাও।' কন্মল মুড়ে নেয়।

সালার বুঝতে পারল না সাদ কোন কথার ওপর রাগ করেছে। 'তার মানে এটা নেকির কাজ ছিল না?'

'তোমাকে বললাম তো নিজের মুখ বন্ধ করো এবং ঘুমিয়ে পড়ো।' সাদ দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

'এত রাগের তো কিছু নেই। আমি সহজ একটা প্রশ্ন করেছি।' সালার খুব ধৈর্য নিয়ে বলে।

সাদ ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। ল্যাম্প অন করে বিছানায় বসল। 'তোমার মতো মানুষকে আমি কীভাবে সিরাতে মুস্তাকিম বোঝাব বলো? না তুমি পাগল, না মুর্থ, না অমুসলিম: এসবের কিছু না। তোমার নিজের জানা উচিত সিরাতে মুস্তাকিম কী। কিন্তু তোমার মতো মানুষ, যে কিনা মসজিদে গিয়ে নামাজ

মাঝপথে রেখে বেরিয়ে যায়; তার জানার কথাও না সिरাতে মুস্তাকিম কী।’

‘আমি নামাজ ছেড়ে এসেছি, কারণ তুমি বলো নামাজে শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু আমি শান্তি পাইনি; তাই।’

সালারের শান্ত ভঙ্গিতে বলা বাক্য সাদকে আরও রাগিয়ে তোলে। ‘তুমি নামাজে শান্তি পাওনি, কারণ মসজিদ তোমার জায়গা না। তোমার শান্তির জায়গা হলো সিনেমা থিয়েটার, বার, নাইট ক্লাব। মসজিদ তোমার জন্য না। সুতরাং তুমি নামাজে শান্তি কোথেকে পাবে? অথচ এখন চাইছ তোমাকে বোঝানো হোক সিরাতে মুস্তাকিম কী?’

সালার বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে পলকহীন সাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোমার মতো মানুষ, যে নামাজ ছেড়ে যায়, মদ খায়, জিনা করে; সে কখনো না সিরাতে মুস্তাকিমের অর্থ বুঝবে এবং না সেই পথে চলতে পারবে।'

'তোমার কথার মানে হচ্ছে যে মদ খায়, যিনা করে কিন্তু নামাজ ছেড়ে যায় না; বরং নামাজও পড়ে। সে সিরাতে মুস্তাকিমের মানে বোঝে এবং সেই পথে আছে, তাই তো?'

সাদ চুপ হয়ে যায়। নিচু কণ্ঠ ও ভাবলেশহীন সুরে করা এই প্রশ্নের উত্তর নেই। তাকিয়ে আছে সালার।

'তুমি এসব বিষয় বুঝবে না, সালার! 'কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সাদ বলল।

সালারের কানে আরেকটা কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়। 'হ্যাঁ, আমি সত্যিই বুঝব না। লাইট অফ করো, আমার ঘুম পাচ্ছে।' বলে চোখ বন্ধ করে নেয় ও।

"জানতাম অ্যাপার্টমেন্টেই আছো। ইচ্ছে করে আনসারফোন অফ করা।" সাদ পরদিন সকাল দশটার দিকে সালারের অ্যাপার্টমেন্টে আসে। ঘুমের ঘোরে উঠে দরজা খুলল ও।

'না বলে এভাবে পালিয়ে এলে কেন আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে?' সাদ ভেতরে ঢুকে ঝাড়ল ওকে।

'পালিয়ে আসিনি। তুমি ঘুমাচ্ছিলে, তাই বিরক্ত করিনি।' সালার চোখ ঘষতে ঘষতে বলে।

'কয়টায় এসেছ?'

'চারটা-পাঁচটার দিকে।'

'আসার এটা কেমন সময়?' সাদ সরু গলায় বলল। 'আর এভাবে এসে পড়লে কেন?'

সালার কিছু বলার পরিবর্তে লিভিং রুমের সোফায় গিয়ে
উপুড় হয়ে শোয়।

‘হয়তো আমার কথায় রাগ করেছ, আমি এক্সকিউস করতে
এসেছি।’ সাদ অন্য সোফায় বসে বলল।

‘কোন কথায়?’ সালার ঘাড় হালকা বাঁকিয়ে একইভাবে
শোয়া অবস্থায় সাদকে জিজ্ঞেস করে।

‘ওইসব, যা রাতে রাগের মাথায় বলে ফেলেছি।’ সাদ
ক্ষমাপ্রার্থী সুরে বলল।

‘আরে না, আমি ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করি না। তাছাড়া
এমন কিছু বলোনি, যার জন্য এক্সকিউস করত এখানে
আসতে হবে।’ সালার নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল।

‘তাহলে হঠাৎ করে এভাবে আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চলে
আসার কারণ?’ সাদ জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ভালো লাগছিল না। আর যেহেতু ঘুমাব, তাই আনসারফোন লাগিয়ে রেখেছি।' সালার শান্ত কণ্ঠে বলল।

'তবুও তোমার সাথে এভাবে কথা বলা উচিত হয়নি আমার। সকাল থেকে এজন্য খুব পস্তাচ্ছি।'

'বাদ দাও এই বিষয়টা।' সোফায় আগের মতো মুখ গুঁজে বলল সালার।

'সালার! তোমার ইদানীং কী সমস্যা হচ্ছে?'

'কই...কিছু না তো।'

'কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে তুমি।'

এবার সালার সোজা হয়ে সাদের দিকে তাকায়। 'যেমন? আমার মধ্যে কী অদ্ভুত ঘটেছে?'

‘অনেক কিছু। চুপচাপ থাকো। ছোট ছোট বিষয়ে দ্বিধায় পড়ো। ইবাদ বলছিল ইউনিভার্সিটিতেও যাও না। সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছ।’

সাদের শেষ কথায় সালারের কপালে ভাঁজ পড়ল। ‘ধর্মে আগ্রহ? তোমার ভুল হচ্ছে। আমি ধর্মে আগ্রহ দেখাচ্ছি না, আমি শুধু শান্তি খোঁজার চেষ্টা করছি। কারণ আমি ডিপ্রেসড। আগে কখনো এইরকম বা এই পর্যায়ে ডিপ্রেসনে ভুগিনি, যার শিকার ইদানীং হচ্ছে। আমি শুধু এই ডিপ্রেসন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য রাতে তোমার সাথে মসজিদে গিয়েছিলাম।’ সালার বেশ খসখসে গলায় বলে।

‘ডিপ্রেসন কেন তোমার?’ সাদ জিজ্ঞেস করল।

‘যদি জানতাম, তাহলে নিশ্চয়ই ডিপ্রেসনে ভুগতাম না। এতক্ষণে কিছু করে ফেলতাম।’

'তারপরও কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে। এভাবে শুয়ে-বসে ডিপ্রেসন আসে না।' সাদ বলল।

সালার জানে সাদ ঠিক বলছে। কিন্তু কারণ বলে নিজেকে হাসির পাত্র বানাতে চায় না। 'অন্য কারো ব্যাপারে জানি না, কিন্তু শুয়ে-বসেই ডিপ্রেসনে ভুগছি।'

'কোনো অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট নিয়ে দেখেছ?' সাদ বলল।

'অনেকগুলো নিয়ে দেখেছি, কোনো কাজ হয় না।'

'তাহলে তুমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও।'

'এটা সম্ভব না। আমি ক্লান্ত এদের সাথে দেখা করতে করতে। অন্তত আর না...'

'আগে কী কারণে দেখিয়েছ?' সাদ কিছুটা কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'অনেক কারণে, থাকুক।' সালার সোজা হয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকায়।

'তাহলে এক কাজ করো ইবাদত করা শুরু করো, নামাজ পড়ো।'

'চেপ্টা করেছি। কিন্তু নামাজে কী পড়ছি, কেন পড়ছি জানিই না।'

"তাহলে জানার চেপ্টা করো যে..."

সালার বন্ধুকে থামায়। 'আবার রাতের মতো সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর তর্ক শুরু হয়ে যাবে। এরপর তুমি রেগে যাবে। যেহেতু আমি জানিই না সিরাতে মুস্তাকিম কী, তাহলে নামাজ কীভাবে পড়ব?'

‘নামাজ পড়া শুরু করলে জেনে যাবে সিরাতে মুস্তাকিম কী।’

‘কীভাবে?’

‘খারাপ কাজ এড়িয়ে চলবে, ভালো কাজ করবো’ সাদ বোঝানো শুরু করল ওকে।

‘আমি খারাপ কাজ করি না, না ভালো কাজ করতে চাই।
আমার জীবন এমন।’

‘কোন কাজটা খারাপ কোনটা ভালো, তুমি ঠিক ততক্ষণ বুঝতে পারবে...’

সালার বাধা দেয়। ‘ভুল-ঠিক আমার সমস্যা না। আমি শুধু অস্থিরবোধ করছি, এর সাথে আমার কাজের সম্পর্ক নেই।’

‘তুমি সেসব কাজ করো, যা মানুষের জীবনকে অশান্ত করে তোলে।’

‘যেমন?’ সালার তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি পোর্ক খাও।'

'Come on! পোর্ক এখানে কোথেকে এল?' সালার উঠে বসে। 'আমাকে একটা কথা বলো, তুমি তো নিয়মিত নামাজ পড়ো। অনেক ইবাদত করো। নামাজ তোমার জীবনে এমন কী পরিবর্তন এনেছে?'

'আমি অস্থির না।'

'তোমার যুক্তি অনুসারে তোমারও অস্থির থাকার কথা। কারণ তুমিও অনেক খারাপ কাজ করো।'

'সেমন, আমি কী কী খারাপ কাজ করি?'

'তোমার জানা, আমার পুনরাবৃত্তির দরকার নেই।'

'আমি? না, আমি জানি না। তুমি বলো।' সাদ চ্যালেঞ্জ করল।

কিছুক্ষণ সাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'সাদ! আমার মনে হয় না শুধুমাত্র ইবাদত মানুষের জীবনে বিশাল কোনো পরিবর্তন আনে। ভালো কাজ বা ভালো চরিত্রের সম্পর্ক ইবাদত করার সাথে সম্পৃক্ত না।'

সাদ এবার ওকে থামিয়ে বলল। 'আমি এজন্যই বলি ধর্মের প্রতি একটু আগ্রহী হও। ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানো। যাতে নিজের এই ফিলোসোফি এবং চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে পারো।'

'আমার চিন্তাধারা ভুল না, সাদ! আমি ধার্মিক মানুষদের চেয়ে বেশি মিথ্যুক, মুনাফিক আর প্রতারক কাউকে দেখিনি। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, তবে সত্যি বলছি। এখন পর্যন্ত আমার এমন তিনজন মানুষের সাথে দেখা হয়েছে, যারা সাজে খুব মুসলমান, বলে ইসলামের কথা; কিন্তু তিনজনই মুনাফিক।' সালার খুব তিক্ততা নিয়ে বলতে থাকে। 'প্রথম এক মেয়ের সাথে দেখা হয় আমার। যে খুব ধার্মিক আর পর্দা করে। এমন পবিত্র সেজে এক ছেলের সাথে অ্যাফেয়ার

চালাচ্ছিল। নিজের ফিয়সে থাকতে ওই ছেলের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। যখন প্রয়োজন হলো তখন এমন এক মানুষের সাহায্য নিলো, যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ ভাবে। মানে নিজের সুবিধার জন্য অন্যকে ব্যবহার করতে কোনো দ্বিধা নেই সেই মহোদয়া পারসা খাতুনের!" ঠোঁটজুড়ে বিদ্রূপের হাসি খেলে যায়।

'এরপর দেখা হয় আরেকজন এমন পুরুষের সাথে, যে দাড়ি রাখত। একদম পরিপক্ক ও সত্যবাদী মুসলমান। কিন্তু সেই পুরুষ এমন এক মেয়ের সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যে তার কাছে সাহায্যের ভিক্ষা পর্যন্ত চেয়েছিল। সেই মেয়েটাকে বিয়ে করেনি, যাকে দিনের পর দিন ভালোবাসার নামে বোকা বানিয়েছে। কিছুদিন আগে আমেরিকায় তার সাথে আমার দেখা। এখন তার দাড়ি উধাও, হয়তো তার ইসলামও।' হাসল।

'আর তৃতীয়জন তুমি। যে পোর্ক খায় না। শুধু এটাই একমাত্র হারাম, যা তুমি করো না। বাকি সব তোমার জন্য জায়েজ।

মিথ্যে কথা বলা, মদ খাওয়া, যিনা করা, ক্লাবে যাওয়া, গিবত করা, অন্যকে নিয়ে মজা করা। এমনিতে তুমি খুব নেক, কারণ তোমার দাড়ি আছে। আমাদের মাথা খেয়ে ফেলতে পারো দাবি কথা বলে বলে। জোর করে নামাজে নেওয়ার জন্য লেগে থাকো। সব কথায় ধর্ম টানো। এই আয়াত..সেই হাদিস এই হাদিস সেই আয়াত। এর বাইরে তোমার মুখ থেকে কিছু বের হয় না। আমি তোমার আমল দেখে বিন্দু পরিমাণও প্রভাবিত হই না। কতটা বিরক্তির নিয়ে তোমার লেকচার শোনা, বলে বোঝানো যাবে না। তোমার-আমার মাঝে খুব-একটা পার্থক্য নেই। তুমি দাড়ি রেখে, ধর্মচর্চা করে সেই সব কাজ করো, যা আমি দাড়ি ছাড়া, ধর্মের কথা না বলে করি। ইবাদত কী ইনকিলাব এনেছে তোমার জীবনে? কেবল এই ভুল বিশ্বাস ছাড়া যে, তুমি সরাসরি বেহেশতে যাবে আর আমরা সবাই দোজখে। তোমার কথা আর কাজে এত বৈপরীতা না থাকলে আমি এখনো তোমাকে এসব বলতাম না। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, অন্যদেরকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা তোমার করতে হবে না। কারণ আমার ধারণা তুমি নিজেই ধর্মের প্রকৃত অর্থের সাথে

অপরিচিত। এসব কথায় মাইন্ড করো না।' টেবিলে রাখা একটা সিগারেট ধরায় ও। প্রায় বোবা হয়ে বসে ছিল সাদ।

‘ঠিক আছে আমাকে দিয়ে ভুল হয়, কিন্তু আল্লাহ মানুষকে মাফ করে দেন। কখনো বলি না যে, আমি খুব ভালো মুসলমান বা নিশ্চিত বেহেশতে যাব। তবে ভালো কাজ করা এবং অন্যকে সেই কাজের উপদেশ দেওয়া আল্লাহর তরফ থেকে মানুষ হিসেবে আমার দায়িত্ব।' সাদ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল।

‘সাদ! তুমি অযথা অন্যের দায়িত্ব নিজের মাথায় নিও না। আগে নিজেকে ঠিক করো, তারপর অন্যকে ঠিক করার চেষ্টা করবে। যাতে কেউ তোমাকে মুনাফিক বলতে না পারে। যতদূর প্রসঙ্গ রইল, আল্লাহ তায়ালার মাফ করে দেওয়ার তবে তিনি যদি তোমার ভুল মাফ করেন; আমাদের গুনাহও মাফ করবেন। কিন্তু তুমি যদি ভাবো অন্যকে ইসলামের দিকে ঠেলে দিলেই তোমার নেকি বেড়ে যাবে এবং তুমি নিজের গুনাহসহ আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে যাবে, তেমনটা

হবে না। ভালো হয় যদি আগে তুমি নিজের ট্র্যাক রেকর্ড ঠিক
করো। শুধু নিজেকে দেখো। অন্যদেরকে নেক বানানোর
চেষ্টার দরকার নেই। আমাদের খারাপই থাকতে দাও।' সালার
রুঢ় কণ্ঠে বলে। সেই মুহূর্তে মনে যা এসেছিল তা-ই বলে
দেয়। যখন ও চুপ হয়, তখন সাদ উঠে চলে যায়। সেদিনের
পর থেকে আর কখনো সালারের সামনে ধর্ম নিয়ে কথা
বলেনি সাদ।

এই উইকেন্ডে অনেকদিন পর রেস্টুরেন্টে আসে সালার।
ওয়েটারকে দিয়ে অর্ডার নোট করিয়ে জানালার বাইরে
তাকিয়ে থাকে। জানালার পাশের টেবিলে বসেছিল। কাঁচের
জানালা হওয়ায় মনে হচ্ছিল বাইরের ফুটপাথেই বসা।

মেয়েলি কান্নার আওয়াজে ওর মনোযোগ ভাঙে। ঘুরে
তাকায়। পেছনের টেবিলে একজোড়া যুগল বসে আছে।
মেয়েটা কোনো বিষয় নিয়ে হেঁচকি তুলে কাঁদছে আর ফাঁকে

ফাঁকে টিস্যু দিয়ে চোখের পানি মোছে। ছেলেটা হাতে হাত রাখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল মেয়েটাকে। রেস্টুরেন্টটা ছোট ছিল, যার কারণে টেবিলগুলো এত কাছাকাছি যে খুব সহজেই তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু এখানে এই কাজে আসেনি ও। তাই সোজা হয়ে বসে। বিতৃষ্ণার ঢেউ বয়ে যায় ভেতর দিয়ে। এ ধরনের নাটক ভালো লাগে না ওর। এখানে শান্তিতে সময় কাটানোর জন্য এসেছিল, কিন্তু এসব... ওর মেজাজ খারাপ হতে থাকে। ছেলে-মেয়ে দুটো রাশিয়ান, নিজেদের ভাষাতেই কথা বলছে। আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় ও। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনোযোগ সেই কান্নার আওয়াজের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে মেয়েটার দিকে তাকাল। মেয়েটাও ওকে ঘুরতে দেখে মুখ তুলে তাকায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওদের চোখাচোখি হয়ে যায়। সেই কয়েক মুহূর্ত অনেক ভারী কাটে ওর। মেয়েটার চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। আরেকটা চেহারা মনে পড়ে যায়, ইমামা হাশিমের চেহারা... সেই ফোলা চোখ।

ওয়েটার খাবার এনে সার্ভ করছিল। কয়েক ঢোক পানি খেয়ে
মন থেকে সেই চেহারাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে ও। লম্বা
লম্বা কয়েকটা শ্বাস নেয়। ওয়েটার নিজের কাজ করতে
করতে কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছিল। সালারের চোখ
জানালার বাইরে ব্যস্ত। 'আজকের আবহাওয়া সুন্দর! এখানে
একটা ভালো সময় কাটাতে এসেছি আমি, ভালো কিছু
খাবার খেতে এসেছি। এখান থেকে খেয়ে একটা ফিল্ম
দেখতে যাব। ওই মেয়েকে নিয়ে ভাবা উচিত না আমার,
কিছুতেই না। ওই মেয়ে পাগল ছিল, আবোল-তাবোল বলত।
ওর কথা ভেবে আমার পস্তানোর দরকার নেই। আমি কী
জানি কই গেছে, কই মরেছে? সব নিজে করেছে। আমি শুধু
মজা করেছিলাম। যদি আরেকবার যোগাযোগ করত, তাহলে
তালুক পাঠিয়ে দিতাম।' অজ্ঞাতসারে নিজেকে বোঝাতে
গিয়ে অনুশোচনাগুলো আবার সামনে ভেসে ওঠে। পেছনে
থাকা মেয়েটার হেঁচকির আওয়াজ মনে গিয়ে তীরের মতো
লাগছিল।

'আমি টেবিল চেইঞ্জ করতে চাই।' খুব রুক্ষভাবে ওয়েটারকে বলল।

ওয়েটার বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'কেন স্যার?'

'হয়তো এদের টেবিল চেঞ্জ করো নাহলে আমার।' হাত দিয়ে ইশারা করে বলল।

ওয়েটার একনজর সেই যুগলকে দেখল। তার কাছে সমস্যা স্পষ্ট না হলেও, কোণার এক টেবিলে এনে ওকে বসিয়ে দেয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য সালার জায়গা বদলে স্বস্তি অনুভব করে। হেঁচকির শব্দ এই পর্যন্ত আসছিল না। কিন্তু মেয়েটার চেহারা এখন ঠিক ওর সামনে। এক চামচ খাবার মুখে দিতেই মেয়েটার ওপর চোখ পড়ে সবকিছু বিশ্বাদ হয়ে যায়। স্বাদহীন লাগে। এটা নিশ্চয়ই ওর মানসিক অবস্থার কারণে, নাহলে এখানকার খাবার খুব ভালো হয়।

'মানুষ মূলত নিয়ামতের শুরুরিয়া আদায় করতেই জানে না। জিভের মাধ্যমে স্বাদ নেওয়ার অনুভূতিই হোক, এটা কত বড় নিয়ামত! কিছু খেলে সেটার স্বাদ নিতে পারা, ভালো খাবার খেয়ে খুশি হওয়া: অনেক মানুষ এই নিয়ামত থেকেও বঞ্চিত।' কানে একটা আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। ওর ধৈর্যের শেষ সীমা ভেঙে যায়। আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে, পুরো শক্তি দিয়ে চামচ প্লেটে ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল। 'Shut up, just shut up!'

রেস্টুরেন্টে হঠাৎ নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

"You bitch! You bastard! Just shut up!" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠছিল ওর। 'তুমি আমার মস্তিষ্ক থেকে কেন বের হয়ে যাও না?' দুই কান চেপে ধরে চিৎকার করে। 'আমি তোমাকে মেরে ফেলব যদি আর কখনো চোখের সামনে পড়ো।' আবার চিল্লায় কিছুক্ষণ। গলা শুকিয়ে এলে পানির গ্লাস তুলে খাওয়া শুরু করে। তখন রেস্টুরেন্টে থাকা মানুষ এবং তাদের দৃষ্টি সম্পর্কে টের পায়।

সবাই ওকেই দেখছিল। একজন ওয়েটার ছুটে আসে, তার চেহারায় উদ্ভিগ্নতার ছাপ।

'স্যার! আপনি শরীর ঠিক আছে তো?'

কিছু বলল না ও। ওয়ালেট থেকে কয়েকটা কারেন্সি নোট বের করে টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে যায় রেস্টুরেন্ট থেকে।

ওখানে ইমামা ছিল না। কোনো ভূত ছিল, যা ওকে তাড়া করে বেড়ায়। যেখানে যায় সেখানেই পিছু নেয়। কোথাও ইমামার চেহারা হয়ে, কোথাও কণ্ঠ হয়ে। যেখানে এ দুটোর কিছু থাকে না, সেখানে থাকে ওর অনুশোচনা। একটা বিষয় ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে গেলে আরেকটা বিষয় সামনে এসে উপস্থিত হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে-মাঝে ওর এত রাগ ওঠে যে, ইচ্ছে করে আরেকবার ইমামার সাথে দেখা হলে গলা টিপে ধরবে, নাহলে গুলি করবে। ইমামার সবকিছু ঘৃণা লাগে।

সেই রাতে যাত্রাপথে কাটানো কয়েক ঘন্টা পুরো জীবন
ধবংস করে দিচ্ছিল ওর।

'কিন্তু তুমি আসবে কেন...?'

ফোনে কথা বলছিল সালার। কামরান কয়েকদিন পর নিউ
হ্যাভেনে আসবে বলে জানায়। রুটিনের জীবন থাকলে এই
খবর পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হতো। কিন্তু বর্তমানে যে মানসিক
অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার মতে বড় ভাইয়ের
আসা ওর জন্য বেশ অপ্রীতিকর। এই অপ্রীতিকরতা লুকাতে
পারল না।

'মানে কী, কেন আসছ?'

'তোমার সাথে দেখা করতে।' কামরান অবাক হয়। 'পাপাও
বলল।'

ঠোঁট চেপে ভাইয়ের কথা শুনল ও।

'আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে পিক করবে। ফ্লাইটের টাইমিং জানিয়ে দেবো।'

কিছুক্ষণ এদিক-সেদিকের কথা বলে ফোন রেখে দেওয়া হয় দুই পাশ থেকে। চারদিন পর কামরানকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্ট যায় ও। ছোট ভাইকে দেখে চমকে ওঠে কামরান।

'তুমি অসুস্থ?' ফাঁকা হতেই কামরান জিজ্ঞেস করল।

'না, একদম ঠিক আছি।' সালার হাসতে চেষ্টা করে।

'মনে তো হচ্ছে না।' কামরানের দুশ্চিন্তা হয়। সালার চোখে চোখ রেখে কথা বলা মানুষ। কিন্তু আজ স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে চোখ আড়াল করে কথা বলছে। গাড়ি ড্রাইভ করার সময়ও খুব মনোযোগ দিয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করে। খুব

সাবধানে গাড়ি চালাতে দেখে কামরানের অদ্ভুত লাগে। ও এত পরিমাণ রাশ ড্রাইভ করা মানুষ যে ওর পাশে বসতে বড়-বড় কলিজার লোকজনও ভয় পেত। এটাই একমাত্র ইতিবাচক পরিবর্তন ছিল বাকি সব পরিবর্তন তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে।

'পড়াশোনা কেমন চলছে তোমার?'

'ঠিকঠাক।'

যাত্রাপথ ছোটখাটো প্রশ্ন-উত্তরে শেষ হয়। আসার পরে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকতেই চৈঁচিয়ে ওঠে অবস্থা দেখে কামরান নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না। 'এটাই তোমার অ্যাপার্টমেন্ট সালার? মাই গড!।'

সালার নিজের জিনিসপত্র যেভাবে গুছিয়ে রাখায় অভ্যস্ত মানুষ, এখানে তার কোনো প্রমাণ নেই। চারপাশের সবকিছুর বেহাল অবস্থা। জায়গায় জায়গায় কাপড়, মোজা, জুতা

ছড়ানো। বই, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিনের একই অবস্থা।
কিচেনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বাথরুমের অবস্থা
তারচেয়েও বেশি। কামরান হতভম্ব হয়ে পুরো অ্যাপার্টমেন্ট
ঘুরে ঘুরে দেখে।

‘কয় মাস ধরে এসব পরিষ্কার করো না?’

‘এখনই করছি।’ সালার জিনিসপত্র তুলতে তুলতে বলল।

‘তুমি তো এভাবে জীবনযাপন করায় অভ্যস্ত না, তাহলে
এসব কী?’ কামরান বেশ চিত্তিত হয়। হঠাৎ চোখ পড়ে
টেবিলে থাকা সিগারেটের আশট্রের উপর। কাছে গিয়ে
অ্যাশট্রে হাতে নিয়ে সিগারেটের গুড়া শুঁকতে লাগল সে।
সালার সুচালো চোখে বড় ভাইয়ের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলেও
চুপ থাকে। কিছুক্ষণ পর কামরান অ্যাশট্রে নিচে ছুঁড়ে মারে।

‘সালার! What are you up to this time? আমাকে
সোজাসুজি বলো সমস্যা কী? ড্রাগস নিচ্ছ?’

'না, আমি কিছু নিচ্ছি না।'

ওর উত্তর কামরানকে আরও রাগিয়ে তোলে। কাঁধ চেপে ধরে টেনে বাথরুমের আয়নার সামনে নিয়ে যায়। 'চেহারা দেখো নিজের, ড্রাগ অ্যাডিক্টের মতো চেহারা। চালচলন তো ঠিক তেমনই। দেখো, চোখ তুলে তাকিয়ে চেহারা দেখো নিজের।' ওর কলার ধরে টেনে টেনে বলছিল।

সালার আয়নায় চোখ তুলে না তাকালেও জানত ওকে কেমন দেখাচ্ছে। ডার্ক সার্কেল, বড় হওয়া দাড়িতে কেমন দেখাবে... এসবের পর যা কমতি ছিল, তা পূরণ করেছে ব্রণ, ঠোঁটের কালো দাগ; যা কফি আর অগণিত সিগারেটের ফলাফল। ব্রণের কারণে রোজ শেভ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিছুটা রেগে বড় ভাইয়ের হাত থেকে কলার ছাড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

'লানত পড়ছে তোমার চেহায়া।' লানত শব্দটা কামরান প্রায়শই ব্যবহার করত। কিন্তু এর আগে কখনো এই শব্দকে

উপলব্ধি করেনি সালার। তবে বর্তমানে এই শব্দ শুনে
আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

সামনে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে ও। 'যখন বলছি যে ড্রাগস
নিচ্ছি না, মানে আপনার বিশ্বাস করা উচিত আমাকে।' 'হ্যাঁ,
লানত পড়েছে আমার চেহারার ওপর। আর কি ছু?'

'তোমার ওপর বিশ্বাস?' কামরান বিদ্রোপের সুরে বাথরুম
থেকে বেরিয়ে বলল।

দাঁতে দাঁত চেপে রুম গোছানোর কাজ জারি রাখে সালার।

'ইউনিভার্সিটি যাও?' কামরানের মনে আরেকটা সন্দেহ
জাগে।

'যাচ্ছি।' সালার জিনিসপত্র তুলছিল।

কামরান নিশ্চিত হতে পারল না। 'আমার সাথে হসপিটাল চলো, চেক আপ করাব তোমার।'

'এসব করার জন্য এসে থাকলে ভালো হয় যদি চলে যান। আমি কিভারগাটেনের বাচ্চা না, নিজের খেয়াল রাখতে পারি।'

কামরান কিছু বলার পরিবর্তে ওর হাতের কাজে সাহায্য করতে লাগল। সালার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলো। ভেবেছিল বিষয়টা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি হবে না। কিন্তু এই আন্দাজ ভুল প্রমাণ হয়। কামরান দু-তিন দিন থাকার পরিবর্তে পুরো এক সপ্তাহ থাকে। ভাইয়ের উপস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে নিয়মিত ইউনিভার্সিটি যেতে হয় ওকে। এর ফাঁকে কামরান গিয়ে ওর প্রফেসর আর বন্ধুদের সাথে দেখা করে। সেমিষ্টার ফেল করার খবর সেখান থেকেই জানতে পারে। এটা কামরানের জন্য আরেকটা বড়োসড়ো ধাক্কা ছিল। সালারের কাছ থেকে সবকিছু আশা করা গেলেও সেমিষ্টারে ফেল! তাও এত

বাজেভাবে! যেখানে কিছুদিন আগ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির পেছনের রেকর্ড ভেঙে টপ করছিল?

কিন্তু কামরান বিষয়টা নিয়ে ওর সাথে আর কথা বলেনি। বরং পাকিস্তান ফোন করে সিকান্দার উসমানকে পুরো বিষয় জানায়। সিকান্দার উসমানের পায়ের নিচের মাটি আবার সরে যায়। সালার নিজের রেকর্ড বজায় রেখেছে। প্রতি এক-দেড় বছর পর তাদের জন্য নতুন কোনো সমস্যা দাঁড় করাবেই। হাশিম মুবীনের সাথে ঝামেলারও প্রায় একই সময় কেটে গেছে।

‘এখন এর সাথে এসব নিয়ে কথা বলার দরকার নেই। ইউনিভার্সিটিতে সামনে ছুটি শুরু আপনি ওকে পাকিস্তান নিয়ে যান। কিছুদিন ওখানে থাকুক। এরপর মাস্মিকে ওর সাথে পাঠিয়ে দেবেন। পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাস্মি এর সাথেই থাকবে।’ সিকান্দার উসমানকে বুঝিয়ে বলে কামরান।

সিকান্দার উসমান বড় ছেলের পরামর্শমতো কাজ করলেন এবার। কিছু না বলে ছুটি শুরু হওয়ার আগে নিউ হ্যাভেন চলে আসেন। ছেলের অবস্থা দেখে তার পেটে গিট পড়তে শুরু করে। কিন্তু কামরানের মতো তর্ক করলেন না। শুধু তাদের সঙ্গে পাকিস্তান আসার কথা বলেন। ওর প্রতিবাদ আর পড়াশোনার অজুহাত না মেনে জোর করে সিট বুক করিয়ে ওকে পাকিস্তান নিয়ে আসেন।

রাত একটায় পাকিস্তান পৌঁছায় সবাই। সিকান্দার আর তায়িবা ঘুমানোর জন্য চলে গেলেন। সালার রুমে আসে। প্রায় দেড় বছর পর নিজের রুম দেখছিল। সবকিছু তেমনই আছে, যেমন রেখে গেছে। কাপড় পাল্টে লাইট অফ করে বিছানায় এসে শোয়। ফ্লাইটে ঘুমিয়ে ছিল, তাই এখন আর ঘুম আসছে না। অথবা এটা ভৌগোলিক পরিবর্তন, যার কারণে ঘুম আসার নাম নেই।

‘আমি কি ধীরে ধীরে নিদ্রাহীনতার রোগী হয়ে যাচ্ছি?’
অন্ধকারে রুমে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে।

কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে উঠে বসল। জানালার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ায়। জানালার কাছে থাকা লনের অপরপাশে হাশিম মুরীনের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এত বছরে কখনো এই জানালার পর্দা এদিক-ওদিক করতে গিয়ে একবারও বাড়িটার দিকে মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ ধরে আশেপাশের আলোয় দৃশ্যমান বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। অনেককিছু মনে পড়ে যায়। জানালার পর্দা টেনে ঠিক করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

'ওয়াসিমের বাড়ির লোকজন কি ইমামার কোনো খোঁজ পেয়েছে?' পরদিন নাসেরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ও।

নাসেরা অদ্ভুত চোখে তাকায়। 'না, কোথায় পাবে? সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছে। কোনো হদিস নেই। তাদের সন্দেহ এখনো আপনার ওপর। সালমা বিবি অনেক গালি দেয় আপনাকে।'

সালার কাজের মহিলার দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছে।

'বাড়ির কাজের লোকদের অনেক জেরা করেছে পুলিশ। কিন্তু আমি মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করিনি। কাজ থেকেও বের করে দিয়েছিল তারা। আমার মেয়েকেও রাখেনি। কিন্তু আবার রেখেছে। আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে থাকে। হয়তো আবার এজন্যই রেখেছে, যাতে এইখানের খবর গিয়ে ওইখানে নেই। কিন্তু আমি বাম-ডান করে কাটিয়ে যাই।'

মহিলা কথা কই থেকে কই নিচ্ছিল। সালার থামায়। 'পুলিশ এখনো খুঁজছে?'

'হ্যাঁ, বেশিকিছু জানি না। তারা সব লুকায় কাজের লোকদের কাছ থেকে। ইমামা বিবির কথা আমাদের সামনে বলে না। তবু মাঝেমধ্যে কিছু উড়ো খবর এসে পড়ে। সালার সাহেব! আপনিও ইমামা বিবির খবর জানেন না?' নাসেরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

'আমার কীভাবে জানার কথা?' সালার চোখ রাঙায়।

'এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম জি! আপনার সাথে বন্ধুত্ব ছিল, তাই ভাবলাম আপনি জানতে পারেন। ওই যে একবার আমাকে দিয়ে কাগজপত্র পাঠিয়ে ছিলেন, ওগুলো কীসের ছিল?' নাসেরার কৌতূহল এখনো রয়ে গেছে।

'ওগুলো বাড়ির কাগজপত্র ছিল। আমি এই বাড়ি ওর নাম লিখে দিয়েছিলাম।'

নাসেরার মুখ হা হয়ে যায়। কিছুটা সামলে নিয়ে বলল। 'কিন্তু জি! এই বাড়ি তো সিকান্দার সাহেবের নামে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এটা তখন জানতাম না। তুমি এই কথা কি ওই বাড়ির কাউকে বলেছ পেপার'স নিয়ে গিয়েছিলে এই বাড়ি থেকে?'

নাসেরা কানে হাত দিয়ে বলল। 'তওবা জি! আমি কেন বলতে যাব তাদেরকে? আমি তো সিকান্দার সাহেবকেও কিছু বলিনি।'

'এটাই ভালো, নিজের মুখ এভাবেই বন্ধ রাখবে সবসময়। এই কথা কানে গেলে বাবা তোমাকে ব্যাগ-পত্রসহ তুলে বাইরে ফেলবেন। তার রাগ সম্পর্কে ভালো করেই জানো। এখন যাও এখান থেকে।' সালার রুম্ফ গলায় বলল। নাসেরা নিঃশব্দে রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

উইকেন্ডে মাঝেমধ্যে মার্খাল্লা পাহাড়ে হাইকিংয়ের জন্য যাওয়ার অভ্যাস ছিল সালারের। এখন উইকেন্ড না হলেও ছুট করে সেখানে যেতে ইচ্ছে করল ওর। সবসময়ের মতো গাড়ি নিচে পার্ক করে কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে হাইকিং করতে থাকে। ফেরার পথ তখন ধরল, যখন ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে। আন্দাজ করতে পারছিল এভাবে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁচাতে ঘণ্টাদুয়েকের মতো লেগে যাবে। তাই সময় বাঁচাতে একটা রাস্তায় উঠে পড়ে। যেখানে সাধারণত খুব কম মানুষের যাতায়াত ছিল। কিছুটা দূর আসার পর পেছনে দ্রুত পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। একনজর ঘুরে দেখে দু'জন ছেলে পেছনে। যারা ওর অনেক পেছনে, কিন্তু খুব দ্রুত সামনে আগাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার হাঁটা শুরু করল ও।

ছেলেগুলোর বেশভূষা দেখে ওর সন্দেহজনক মনে হয়নি।
জিন্স আর শার্ট পরা ছেলেগুলো অন্য সবার মতোই। হাঁটতে
হাঁটতে নিজের ঠিক পেছনে কাউকে অনুভব করে বিদ্যুতের
গতিতে গেছন ঘুরতেই জমে যায় ও। দু'জনের হাতেই
রিভলবার এবং ছেলেগুলো এখন ঠিক ওর সামনে।

'হাত উপরে তোল, নাহলে গুলি করব।' ওদের একজন উঁচু
আওয়াজে বলল।

সালার হাত উপরে তোলে। অন্যজন ওর পেছনে গিয়ে
জোরে ধাক্কা দেয়।

পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয় ও।

'এদিকে চল।'

সালার কোনোরকম বাড়াবাড়ি ছাড়া সেদিকে যাওয়া শুরু
করে, যেখানে ছেলেগুলো রাস্তা থেকে সরিয়ে ওকে নিতে

চাইছিল। রাস্তা থেকে সরানোর কারণ, যাতে কেউ এসে দেখে না ফেলে ওদেরকে। ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তা থেকে সরিয়ে ঝোপঝাড় আর গাছপালার অনেক গভীরে নিয়ে যায়।

'হাঁটু গেড়ে বসা' ওদের একজন কড়া গলায় বলল।

সালার নীরবে ওদের কথামতো কাজ করে। জানে এরা জিনিসপত্র নিয়ে ছেড়ে দেবে। তাই এর মাঝে এমন কিছু করতে চাচ্ছিল না, যাতে এরা উত্তেজিত হয়ে ওর কোনো ক্ষতি করে যায়। একজন এসে ওর পিঠ থেকে ব্যাগ নামায়। ব্যাগের মধ্যে একটা ক্যামেরা, কিছু রোল ফিতা, ব্যাটারি, টেলিস্কোপ, ফাস্ট এইড কিট, ওয়ালেট, পানির বোতল আর কিছু খাবারের প্যাকেট ছিল। ব্যাগ খুলে ভেতরের সবকিছু দেখল ছেলেটা। ওয়ালেট খুলে টাকা, ক্রেডিট কার্ডও নড়াচড়া করে। ব্যাগ থেকে টিস্যুর প্যাকেট আর ফাস্ট এইড কিট বের করে রাখল।

'উঠে দাঁড়া।' ছেলেটা কড়াসুরে বলল।

সালার আগের মতোই হাত মাথার উপর রেখে উঠে দাঁড়ায়।

ছেলেটা ওর কাছে এসে প্যাকেট হাতড়ে গাড়ির চাবি বের করে। 'গুড,'

সালার এবার একটু চিন্তায় পড়ে। 'তোমরা ব্যাগ নিয়ে যাও, কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দাও।' ওদেরকে বলল।

'কেন? গাড়ি কেন ছাড়ব? তুই আমাদের খালাতো ভাই নাকি যে গাড়ি রেখে যাব?' ছেলেটা ঠাট্টাচ্ছিলে বলল।

'গাড়ি নেওয়ার চেষ্টা করলে ঝামেলায় পড়বো। শুধু চাবি থাকলে হবে না, আরও অনেক লক আছে।' সালার বলে।

'সেটা আমাদের সমস্যা, তোর না।' এই বলে ছেলেটা সামনে এসে ওর চোখ থেকে চশমা খুলে নেয়। 'জগার্স খুলে দে।'

সালার বড় বড় চোখ করে তাকায়। 'জগার্স কেন?'

উত্তরে ছেলেটা পুরো শক্তি দিয়ে ওর গালে একটা থাপ্পড় মারে। সালার নড়েচড়ে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখে সরষে ফুল দেখে।

'দ্বিতীয়বার আর কোনো প্রশ্ন না। জগার্স খোল।'

সালার হিংস্র চোখে তাকায়। অপর ছেলেটা ওর মাথায় ঠেকিয়ে রাখা রিভলবারের চেম্বার নেড়ে কিছু মনে করায়।

প্রথম ছেলেটা আরেকটা থাপ্পড় মারে। 'এদিকে তাকা আর জগার্স খোল।'

সালার আন্তে আন্তে জগার্স খুলে দেয়। ওর পায়ে এখন শুধু মোজা।

'শাট খোল।'

সালার আপত্তি করতে চাইলেও নতুন করে থাপ্পড় খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই ওর। যদি এদের দু'জনের কাছে রিভলবার না থাকত, তাহলে শারীরিক দিকে থেকে এদের চেয়ে ভালো ও। আর এতক্ষণে আচ্ছামতো খোলাই দিয়ে বুঝিয়ে দিত। কিন্তু রিভলবারের উপস্থিতি এদের সামনে অসহায় করে তুলেছিল ওকে। শাট খুলে এগিয়ে দেয়।

'নিচে রাখ।' আদেশের সুরে বলে ছেলেটা।

সালার শাট নিচে ফেলে দেয়।

বাঁ-হাত পকেটে ঢুকিয়ে পাতলা একটা নাইলনের সুতার রোল বের করে ছেলেটা। সুতার রোল দেখেই সালার বুঝে যায় এরা কী করতে চাচ্ছে। অজানা ভয় জেঁকে ধরে। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে সব ঢেকে যাবে। কিন্তু এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় কী...?

‘দেখো, আমাকে বাঁধার দরকার নেই। আমি কাউকে কিছু বলব না। তোমরা ব্যাগ, গাড়ি সব নিয়ে যাও।’ নিজেকে বাঁচানোর জন্য বলে ও।

ছেলেটা পুরো শক্তি দিয়ে ওর পেটে ঘুষি মারে। সালার ব্যথায় বাঁকা হয়ে যায়, মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসে।

‘কোনো পরামর্শ না।’ ছেলেটা ওকে জোরে একপাশে ধাক্কা মারে।

ব্যথায় কাতর সালার অন্ধের মতো সেদিকে যায়। ওখানে থাকা একটা গাছের সাথে ওকে বসিয়ে ছেলেটা নিপুণভাবে ওর হাতদুটো পেছনে নিয়ে ভালো করে সুতা পেঁচিয়ে কজিগুলো গাছের সাথে বাঁধে। অন্য ছেলেটা রিভলবার তাক করে রেখে এদিক-সেদিক নজর বোলাচ্ছিল। হাত ভালো করে বাধা হয়ে গেলে ছেলেটা সামনে এসে ওর পা থেকে মোজা খুলে ফেলে। ফাস্ট এইড কিট থেকে কেঁচি বের করে ওর খোলা শার্টটা লম্বা লম্বা টুকরোয় কাটে। কয়েকটা টুকরো

মোটা করে পায়ের চারপাশে পেঁচিয়ে গোড়ালিতে গিট দেয়। এরপর টিস্যুর প্যাকেট খুলে সব টিস্যু বের করে বলল। 'মুখ খোল।'

সালার জানে ছেলেটা কী করবে। মনে মনে যত গালি দেওয়া সম্ভব, দিচ্ছিল। একে-একে সব টিস্যু ছেলেটা ওর মুখে ঢোকায়। সবশেষে শাটের অবশিষ্ট থাকা টুকরোটা ওর মুখে ঘোড়ার লাগামের মতো লাগিয়ে টেনে গাছের পেছনে নিয়ে বাঁধল। ছেলেটা নিশ্চিত হয়ে ব্যাগ বন্ধ করে নেয়। পরবর্তী কয়েক মিনিট দু'জন ওখান থেকে কেটে পড়ে। ছেলেগুলো চলে যেতেই সালার নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় লেগে যায়। তবে শীঘ্রই বুঝতে পারে গভীর সমস্যায় ফেঁসে গেছে। খুব দক্ষভাবে বাঁধা হয়েছিল। শুধু নড়েচড়ে মুক্ত হওয়া যাবে না। কারণ দড়ি আলগা হওয়ার মতো না। বরং নড়াচড়ার কারণে আরও মাংসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ওর মানসিক অবস্থাও তখন বেশ করুণ হয়ে যায়। কাউকে আওয়াজ দেওয়ার অবস্থা ছিল না। অন্য কারোও এখানে আসার কথা না।

আশেপাশে শুধু লম্বা ঝোপঝাড়। এই সন্ধ্যার অন্ধকারে এখানে কারো আসার জন্য অপেক্ষা করার মতো না। ওর শরীরে তখন পোশাকের নামে হাঁটুর নিচে বারমুড়া শর্টস ছাড়া কিছুই নেই। সন্ধ্যার সাথে সাথে ঠান্ডা বাড়তে থাকে। বাড়ির কেউ জানে না ও হাইকিং করতে এসেছে। বাড়িতে না জানার কারণে খোঁজাখুঁজি হলেও, কেউ এই গভীর ঝোপঝাড়ে বাঁধা ওর অস্তিত্ব পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

আধা ঘন্টা লড়াইয়ের পর যখন পায়ের বাঁধন আলগা করে খুলে ফেলায় সফল হলো, তখন সূর্য ডুবে গেছে। চাঁদ না উঠলে হাত-পা বা আশপাশ দেখার 'অবস্থা' থাকত না। চলাচল করা একটা-দুইটা গাড়ি, মানুষের আওয়াজ এখন মৃদু, না-এর বরাবর। চারপাশে পোকামাকড়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত গাছের গুড়ির সাথে লাগা ঘষা আর আঁচড় খুব ভালোভাবে টের পাচ্ছিল ও। গাছের উল্টোদিকে বাঁধা হাতের দড়ি মাংস কামড়ে ধরে রেখেছে। হাত নাড়ানোর অবস্থায় ছিল না। যন্ত্রণা এখন অসহনীয় পর্যায়ে। মুখের ভেতরের টিস্যু এতক্ষণে গলতে

শুরু করেছে। এগুলো গলতে থাকার কারণে নড়েচড়ে মুখের লাগাম আলগা করার চেষ্টা করে ও। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের করার পরিস্থিতি তখনো হয়নি। কারণ গলে যাওয়া টিস্যুগুলো না পারছিল ফেলতে, না পারছিল গিলতে। পরিমাণে এত বেশি ছিল যে, চুইংগামের মতো চিবুতেও পারছিল না।

ওর শরীর কাঁপতে শুরু করে। সকাল পর্যন্ত এখানে থাকলে এমনিতেই শক্ত হয়ে মরে যাবো। ভয় বা বিষাক্ত কোনো পোকামাকড়ের কামড়ে না হলেও ঠান্ডার কারণে। শরীরে ছোট-ছোট পোকামাকড় হাঁটা-হাঁটি করছে, জায়গায় জায়গায় কামড় বসাচ্ছে। খোলা পায়ে হাঁটা পোকাগুলো নড়াচড়া করে ঝেড়ে ফেলতে পারলেও, শরীরের বাকি অংশের ব্যাপারে অক্ষম ও। জানে না এসব ছোট-ছোট পোকামাকড়ের পর আর কীসের মুখোমুখি হতে হবে। যদি এখানে সাপ বা বিছু থাকে...? সময় গড়ানোর সাথে সাথে অবস্থা খারাপ হতে থাকে। 'এসব আমার সাথেই কেন হচ্ছে? আমি কী করেছি?' ভাবে ও। 'আমি যদি এখানে মরে যাই,

তাহলে আমার লাশও কেউ খুঁজে পাবে না। পোকামাকড় আর পশুপ্রাণী খেয়ে ফেলবো।" ওর মানসিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়। নতুন এক ভয় জেঁকে ধরে।

"তাহলে আমি এখানে...এভাবে মরব...? এই জঙ্গলে...এই অবস্থায়...! কাপড় ছাড়া... কোনো চিহ্ন ছাড়া... বাড়ির কেউ জানবেও না আমার কথা। তবে কি আমার শেষ পরিণাম এভাবেই লেখা?" ওর হাৎস্পদন থেমে আসে। মৃত্যুভয় গভীরভাবে ঘিরে ধরে। এত ভয় যে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। মনে হতে থাকে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েক পা দূরে। অপেক্ষা করছে, এটা দেখতে ও কীভাবে ছটফট করে নিজের শেষ শ্বাস ত্যাগ করে। যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আবার কজির দড়ি খোলার চেষ্টা করে। একটু আলগা করার পর নিশ্বেজ হয়ে আসছিল। প্রায় পনেরো মিনিট পর আবার লড়াই থামিয়ে দেয়। সেই মুহূর্তে টের পায় ওর মুখের লাগাম আলগা হয়ে গেছে। ঘাড় নেড়ে ওটা সরিয়ে ফেলতে পারবে, সেটাই করল। এরপর মুখ থেকে গলে যাওয়া টিস্যুগুলো ফেলে দেয়। পরের কয়েক মিনিট লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে

স্বাভাবিক হয়ে মাঝে যতটুকু শক্তি ছিল সবটুকু লাগিয়ে
এরপর যত জোরে সম্ভব সাহায্যের জন্য চিৎকার করে।

ওর অনমনা আরও একবার ভুল প্রমাণ হয়। আধা ঘন্টা
একটানা চিৎকার করে সাহস ও গলা, দুটোরই দম ফুরিয়ে
আসে। শ্বাস বেড়ে যায়, যেন মাইলের পর মাইল দৌড়েছে।
কিন্তু আশেপাশে কেউ ছিল না ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে
আসার মতো। সময়ের সাথে বেড়ে-চলা কজির যন্ত্রণা এখন
ওর সাহ্যর বাইরে। পোকামাকড় ওর চেহারা আর ঘাড়ে
কামড় দিচ্ছে। জানে না এটা করে ওর কী হলো... ব্যস!
বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। জীবনে এই
প্রথম এত গভীরভাবে কাঁদছিল। হয়তো জীবনে এই প্রথম
নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পারছিল। এই মুহূর্তে
গাছের সাথে বাঁধা অবস্থায় হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে
বুঝতে পারে, ও মরতে চায় না। মৃত্যুকে ঠিক এমনভাবে ভয়
পাচ্ছে, যেমন নিউ হ্যাভেনে পেয়েছিল। জানে না ঠিক
কতক্ষণ এভাবে অসহায়ের মতো জোরে জোরে কেঁদেছিল।
একপর্যায়ে চোখের পানি শুকিয়ে আসে। এত ক্লান্ত হয়ে

পড়ে যে, কান্না করাও কঠিন হয়ে যায় ওর জন্য। ক্লান্ত শরীরে গাছের সাথে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়। কাঁধ আর কজির ব্যথা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, ওর মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণে এই অঙ্গগুলো চিরতরে অবশ হয়ে যাবে। আর কখনো এগুলো নড়াচড়া করতে পারবে না। 'আমি কারো সাথে এমন করিনি, তাহলে আমার সাথে কেন এমন হচ্ছে?' চোখ বেয়ে আবার পানি পড়তে থাকে।

'সালার! আমার জীবন ইতিমধ্যে অনেক সমস্যায় জর্জরিত, তুমি আর তা বাড়িয়ে না। আমার জীবন এমনিতেই অনেক কঠিন। প্রতিটি দিনের সাথে আরও কঠিনতর হয়ে উঠছে। তুমি অন্তত আমার জন্য নতুন ঝামেলা তৈরি করো না।' চোখ মেলে। গলা শুকিয়ে আসছিল ওর। নিচে, অনেক নিচে, দূরে ইসলামাবাদের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। 'আমি তোমার সমস্যা বাড়চ্ছি? মাই ডিয়ার! তোমার জীবন সহজ করতে গিয়ে নিজে নষ্ট হচ্ছি। ভেবে দেখো, আমার সাথে থাকলে কত ভালো ও নিরাপদ জীবন কাটাতে পারবে...' ঠোঁট চেপে ধরে। 'সালার! আমাকে তালুক দাও।' কান্নায় ভেঙে আসা

ইমামার কণ্ঠ। সুইটহার্ট কোর্টে গিয়ে নাও, যা একটু আগে বললো।"

চুপচাপ দূরের আলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ ওর সামনে যেন আয়না ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। যেখানে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে, সাথে আরেকজনার। 'আমি শুধু ইমামার সাথে মজা করেছিলাম।' বিড়বিড় করে। 'আমি... আমি ওকে কষ্ট দিতে চাইনি।' নিজের অজুহাত ফাঁপা মনে হলো। কবেই-বা অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করছে জানে না। ধীরে ধীরে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। 'আমি স্বীকার করছি আমাকে দিয়ে ভুল হয়েছে।' এবার ওর কণ্ঠে কাতরতা ছিল। 'আমি ইচ্ছে করে ইমামার জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম, ধোঁকা দিয়েছিলাম। আমাকে দিয়ে ভুল হয়ে গেছে। আমি মিথ্যে বলায় অনেক ঝামেলায় পড়েছিল ও। আমি সত্যিই অনুতপ্ত এই জন্য। জানি আমার তালাক না দেওয়ায় এবং জালালের ব্যাপারের সবকিছুর জন্য। কিন্তু এছাড়া আমি কাউকে ঠকাইনি। কারো কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াইনি।' আবার কাঁদতে লাগল ও।

'আমার আল্লাহ! যদি একবার আমি এখান থেকে বেঁচে ফিরি, বের হতে পারি: তাহলে ইমামাকে খুঁজব। ওকে তালাক পাঠিয়ে দেবো। জালালের ব্যাপারে সত্য বলব। শুধু একবার আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে দিন।' হেঁচকি তুলে কাঁদছিল ও। সেই প্রথম উপলব্ধি করে, ইমামা ওর তালাক দিতে অস্বীকার করায় কেমন অনুভব করেছিল। হয়তো এমনই নিজের হাত-পা বাঁধা অনুভব করেছিল। এই প্রথম ইমামার অসহায়ত্ব, ভয়, যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছিল। জালাল আনসারের বিয়ের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিল ও। আর সেই মিথ্যের ওপর ইমামার চেহারার প্রতিক্রিয়া আজও মনে আছে। তখন সেই প্রতিক্রিয়া দেখে খুব মজা পেয়েছিল। ইমামা ইসলামাবাদ থেকে লাহোর পর্যন্ত আসা অবধি প্রায় সারা রাত কেঁদেছিল, আর তা উপভোগ করেছিল ও।

কিন্তু এখন ইমামার সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থা অনুমান করতে পারছিল। সেই অন্ধকার রাতে গাড়ির যাত্রাপথে ইমামাও নিশ্চয়ই আগে-পিছে কিছু দেখতে পায়নি। একমাত্র আশ্রয় জালাল আনসারের বাড়ি, যার ভরসায় বাড়ির বাইরে

পা রেখেছিল। সেখানেও সিকান্দার সালার ওকে পৌঁছাতে দেয়নি। রাতের মধ্য-প্রহরে, বিভূত অন্ধকারে বসে, সেই ভয় ও আতঙ্ক টের পাচ্ছিল, যা সেই রাতে ইমামাকে কাঁদিয়েছিল। 'আমি দুঃখিত! সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু এখন কী করতে পারি...? যদি আমার ওর সাথে আবার দেখা হয়, মাফ চেয়ে নেব। আমাকে দিয়ে যতদূর সম্ভব সাহায্য করব। কিন্তু এই মুহূর্তে...? এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই। যদি। যদি কখনো আমি কোনো নেকি করে থাকি, তাহলে সেই বিনিময়ে আমাকে রেহাই দাও। আল্লাহ প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ!'

প্রবাহিত চোখের পানির সাথে নিজের নেকি খোঁজার চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে ওর কাছে এই ভয়ানক সত্য ধরা দেয় যে, ও জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো নেকির কাজ করেনি। কোনো এমন ভালো কাজ নেই, যা আল্লাহর সামনে পেশ করে বিনিময়ে মুক্তি চাইবে। অন্য আরেকটা ভয় আঁকড়ে ধরল।

টিপ দিলেও ফকির হাত পাতলে ফিরিয়ে দিত। এমনকি স্কুল-কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য যখন ফান্ড সংগ্রহ করা হতো, সেসব দেওয়া-নেওয়ার মাঝেও ও খয়রাত দিত না। দানে বিশ্বাস ছিল না। হোটেল-রেস্টুরেন্টে খুশি মনে থাকত না। 'আমি চ্যারিটিতে বিশ্বাস করি না।' ওর জিভে কর্কশ সুরে একটাই কথা থাকত। 'আমার কাছে অহেতুক বিলানোর মতো টাকা নেই।' ওর এই আচরণ নিউ হ্যাভেন আসার পরও জারি ছিল। এসব শুধু চ্যারিটি পর্যন্ত না, এর বাইরেও কাউকে সাহায্য করায় বিশ্বাসী ছিল না। এমন কোনো মুহূর্ত মনে করেছিল। শুধু ইমামাকে সাহায্য করা নেকি হিসেবে ধরা যায় না। তবে সেই সাহায্যের পর যা করেছে, তাতে সেটাকে আর ভালো বলতে পারল না, যখন কাউকে সাহায্য করেছে।

ইবাদতেও অভ্যস্ত ছিল না। হয়তো ছোটবেলায় বাবা সিকান্দার উসমানের সাথে কয়েকবার ইদের নামাজ পড়তে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা ইবাদতের চেয়ে বেশি আনুষ্ঠানিকতা ছিল। নিউ হ্যাভেনের সেই রাতের কথা মনে পড়ে, যখন ও এশার নামাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে এসেছিল। হুকারকে

দেওয়া সেই ৫০ ডলারের কথাও মনে পড়ে। হয়তো ওটা সেই একমাত্র মুহূর্ত ছিল, যখন কারো জন্য করুণা অনুভব করেছিল। ক্রমাগত নিজের কোনো ভালো কাজ মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়।

এরপর নিজের গুনাহ মনে পড়তে থাকে। কী নেই যা করেনি...? ওর কান্না, আর্তনাদ, মুক্তি চাওয়া সব শেষ হয়ে যায়। হিসাবনিকাশ খুব পরিশ্কার ছিল। যদি আজ ও এই অবস্থায় মরে যায়, তাহলে ওর সাথে কোনো অন্যায় হবে না। বাইশ বছর বয়সী একজন মানুষ, যে এখানে বসে কয়েক ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পরও তার জীবনের কোনো ভালো কাজ মনে করতে না পারে, অথচ তাকে ১৫০+ লেভেল আইকিউ এবং ফটোগ্রাফিক মেমোরি দেওয়া হয়েছে। কীভাবে সেই মানুষটা আশা করতে পারে, আল্লাহ তাকে সেই অগ্নিপরীক্ষা থেকে মুক্ত করবে যেখানে আটকে পড়েছে?

"What is next to ecstasy?" কিশোর বয়সে কোকেনে চুমুক দিতে দিতে এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল।



ওরে বন্ধুর হাতেও কোকেন ছিল। 'More ecstasy.' ওর বন্ধু বলেছিল।

সালার বন্ধুর দিকে তাকায়।

There is no end to ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy, নেশাগ্রস্ত বন্ধু ওকে বলতে থাকে।

কিন্তু সালার তপ্ত হয়নি। 'No. it does end. What happens when it ends? when it really ends?'

ওর বন্ধু অদ্ভুত চোখে ওকে দেখে। "You know it yourself don't you? You have been through it off and on." সালার উত্তর না দিয়ে আবার কোকেন নিতে শুরু করে।



ওর কজির মাংসে কামড়ানো দড়ি এখন সেই উত্তর দিচ্ছিল।
'Pain! যন্ত্রণা!'

"What is next to Pain?" সেই রাতে ঠাট্টার সুরে
ইমামাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

'Nothingness. শূন্যতা!'

কিছু একটা দড়ির মতো উপর থেকে ওর শরীরে পড়ল।
মাথা, মুখ, ঘাড়, বুক, পেট বেয়ে সেটা ওখান থেকে দ্রুত
চলে যায়। সালার কাঁপতে থাকা শরীরে নিজের চিৎকার
আটকায়। ওটা সাপ ছিল। না কামড়ে চলে গেছে ভাগ্য
ভালো। শরীর ঘামে ভিজে উঠল। জ্বরের রোগীর মতো থরথর
করে কাঁপেও।

'Nothingness.' কণ্ঠ খুব স্পষ্ট ছিল।

'And what is next to Nothingness?' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর
ও ঠোঁটে অবজ্ঞার হাসি।

'Hell.' ইমামা এটাই বলেছিল।

গত আট ঘন্টা এখানে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ও। এই
নির্জনতায়, এই গভীর অন্ধকারে, এমন ভয়ানক একাকিত্বের
মাঝে। আবার ঘন্টাখানেক পুরে শক্তি দিয়ে সাহায্যের জন্য
চিৎকার করে। যার ফলে ওর গলা আওয়াজ বের করার
অবস্থায় রইল না। Nothingness থেকে Hell এই দুইয়ের
মাঝখানে কোথাও আটকে ছিল ও। অথবা নাথিংনেসের
দিকে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে হেল-এ প্রবেশের জন্য
তৈরি হচ্ছে। 'তুমি ভয় পাও না, এটা জিজ্ঞেস করতে হেল-
এর পরে কী আসবে? দোজখের পর কী আসতে পারে।
লাঞ্ছিত ও গর্হিত হওয়ার পর মানুষের জন্য কী বাকি থাকে?
যা জানতে তোমার আগ্রহ।'

শুধুই জীবনের একটা দৃশ্য? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসহায়বোধ, একাকিত্ব শরীরে সালার আতঙ্কিত চোখে চারপাশে তাকায়। এটা কবর নাকি দোজখ, না অবশ্য হয়ে আসা হাত-পা, পিঠ এবং কজির বাড়তে থাকা ক্রমাগত ব্যথা। চলাচল করা পোকামাকড়, যেগুলোর কামড় পর্যন্তও আটকাতে পারছে না। নাকি আতঙ্ক, কী ছিল? ব্যস... পাগলের মতো আবার চিৎকার করতে শুরু করে ও। চিৎকার বাতাসের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওর কাছেই ফিরে আসে।

পাগলের মতো অর্থহীন... ভীতিকর... লাগামহীন সেই চিৎকার। এমন ভয় জীবনে এর আগে কখনো অনুভব করেনি... কখনো না। নিজের চারপাশে অশরীরীর বিচরণ অনুভব করে। ভয়ে মস্তিষ্কের শিরা ফেটে আসতে চায়। নার্ভাস ব্রেকডাউন হবে হয়তো। চিৎকারের দম ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসে, গলা বন্ধ হয়ে যায়। এখন শুধু কানাঘুষা চলছে, যা শুনতে পাচ্ছিল ও। হয়তো নিশ্চিত হয়ে গেছে ওর মারা যাওয়া। হাট ফেল করবে অথবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। তখন হঠাৎ গাছের পেছনে বাঁধা হাতের

কজির দড়ি হালকা লাগে। ক্ষতবিক্ষত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে ওঠে। নিচের ঠোঁট কামড়ে হাত নড়াচড়া করতে থাকে। দড়ি আরও আলগা হয়। সম্ভবত বারবার নড়াচড়ার ফলে গাছের সাথে ক্রমাগত ঘষা লেগে দড়ি মাঝ থেকে ছিঁড়ে গেছে। হাতগুলো আরও জোরে খানিকটা নড়াচড়া করে। একসময় টের পায় গাছের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।

অবিশ্বাসের সাথে হাতগুলো সোজা করে সামনে আনে। ব্যথার প্রবল স্রোত ওর কজি দিয়ে বেয়ে যায়। 'আমি কি... আমি সত্যি বেঁচে গেছি? কেন? কীসের জন্য?' অসাড় হয়ে আসা শরীর নিয়ে ঘাড়ের কাপড় সরিয়ে ফেলল, যা প্রথমদিকে ওর মুখে বাঁধা ছিল। বাহু সামান্য নড়াচড়া করতেই মুখ দিয়ে গোঙানি বের হয়। মনে হচ্ছিল এই হাত আর কখনো ব্যবহার করতে পারবে না। পা দুটোও অসাড়। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে টলমল করে নিচে পড়ে যায়। চাপা আর্তনাদ বের হয় মুখ থেকে। পরেরবার হাত আর হাঁটুর সাহায্যে চেষ্টা করে, এবার দাঁড়াতে সফল হয়। ছেলেগুলো ওর জগার্স নিয়ে গেছে। মোজা এখানেই

কোথাও পড়ে আছে। ও চাইলে অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে পরতে পারত। কিন্তু এতে হাত ব্যবহার করা লাগবে। কিন্তু সেই শক্তি ওর মাঝে নেই, শারীরিক-মানসিক কোনোটাই না। ছাড়া পেয়ে শুধু ওখান থেকে বের হতে চাচ্ছিল যেকোনো উপায়ে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে, ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে সেই রাস্তায় পৌঁছায়; যেখান থেকে ছেলেদুটো ওকে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর খালি পায়ে নিচের পথ ধরে হাটা শুরু করে। ওর পায়ের তলায় পাথর, ইটের টুকরো ঢুকছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে যে পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিল, সেসবের সামনে এগুলো কিছুই না।

ও জানে না কয়টা বাজছিল। কিন্তু অনুমান করতে পারছিল রাত অর্ধেকের বেশি পেরিয়ে গেছে। নিচে নামতে কতক্ষণ লেগেছে বা কীভাবে রাস্তা দিয়ে হাটছে, কিছুই জানে না। শুধু জানে সারা রাস্তা জোরে জোরে কেঁদেছে আর সামনে পা বাড়িয়েছে। ইসলামাবাদের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলোয় এসেও নিজের অবস্থা দেখার চেষ্টা করল না।

কোথাও থেমে কারো সাহায্য পাওয়ার অপেক্ষায় রইল না।
ওভাবে কাঁদতে কাঁদতে টলমলে পায়ে রাস্তার ধারের
ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল। পুলিশের একটা টহল গাড়ি ওকে
দেখতে পেয়ে কাছে এসে থামে। ভেতর থেকে কনস্টেবল
বেরিয়ে ওকে আটকায়। ও হুঁশে ফেরে। কিন্তু তখনো চোখের
পানি থামাতে পারল না। তারা কিছু জিজ্ঞেস করছে। কী উত্তর
দেবে...? পরবর্তী পনেরো মিনিটের মাথায় একটা সরকারি
হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। সেখানে প্রাথমিক
চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারা ওর কাছে বাড়ির ঠিকানা জানতে
চায়, কিন্তু ওর গলা বন্ধ। তাদেরকে কিছু বলতে পারে না।
ফুলে যাওয়া হাত নিয়ে একটা কাগজে বাড়ির ফোন নাম্বার
আর ঠিকানা লিখে দেয়।

'আর কতক্ষণ রাখতে হবে এখানে?'

'বেশি না। জ্ঞান ফিরলে আরেকবার চেক-আপ করব। এরপর চাইলে ডিসচার্জ করে নিয়ে যেতে পারেন। গুরুতর তেমন আঘাত নেই, কিন্তু বাড়িতে কয়েকদিন বেডরেস্টে থাকতে হবে।'

সালারের মস্তিষ্ক অচেতনতা থেকে চেতনার পথে ভ্রমণ করছে। আগে যা অর্থহীন শব্দ ছিল, এখন সেগুলোর অর্থ বুঝতে পারছে। কণ্ঠগুলো চিনতে পারছিল। এর মধ্যে একটা কণ্ঠ ওর বাবা সিকান্দার উসমানের। অন্যটা নিশ্চয়ই কোনো ডাক্তারের। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায় ও। চোখ জ্বলে ওঠে, রুমে অনেক আলো: অন্তত ওর কাছে এমনটা মনে হয়েছে। এটা ওদের ফ্যামিলি ডাক্তারের প্রাইভেট ক্লিনিক। এর আগেও একবার এরকম এক কেবিনে থেকে গেছে, তাই চেনার জন্য এক নজরই যথেষ্ট। মুক্তিদানে মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথাগুলো টের পায়। একটা আরামদায়ক নরম বিছানায় শোয়া। শরীরে সেই পোশাক নেই, যা সরকারি হসপিটালে পরনে ছিল। সেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। এখন অন্য পোশাকে।

নিশ্চয়ই ওর শরীরও পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। হাফ-হাতার শাট দিয়ে বেরিয়ে থাকা হাতের কোথাও ময়লা বা দাগ চোখে পড়ল না। কজিতে ব্যান্ডেজ। বাহুজুড়ে ছোট-ছোট অনেক দাগ। হাত ফোলা। আন্দাজ করতে পারছিল এমন অনেক দাগ মুখ এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও রয়েছে। এক চোখও ফোলা অনুভব করে। চোয়াল ব্যথা করছে। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল গলার। হাতে ড্রিপ লাগানো, যা প্রায় শেষের দিকে।

প্রথমবার ডাক্তারই ওকে চেতনায় দেখতে পায়। ইনি ওদের ফ্যামিলি ডাক্তার না। হয়তো তার সাথে কাজ করা কোনো সহকারী। সিকান্দার উসমানকে ওর দিকে ইশারা করলেন ডাক্তার। 'জ্ঞান ফিরেছে।'

মাকে সোফা থেকে উঠে ওর কাছে আসতে দেখল। কিন্তু সিকান্দার উসমান এগিয়ে এলেন না। ডাক্তার এসে পালস চেক করে। 'এখন কেমন লাগছে তোমার?' জানতে চাইলেন।

উত্তরে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হয় না। মুখ হা করে রইল ও।

ডাক্তার আবারও তার প্রশ্ন করেন। সালার বালিশে রাখা মাথা ডানে-বামে নাড়ল।

'বলার চেষ্টা করো।' ডাক্তার হয়তো ইতিমধ্যে ওর গলার অবস্থা জানেন।

সালার না-বোধক মাথা নাড়ে। ডাক্তার নার্সের হাতে থাকা ট্রে থেকে টর্চলাইটের মতো একটা যন্ত্র নেন। 'মুখ খোলো।'

ফোলা চোয়াল নিয়ে কষ্ট করে মুখ খোলে সালার। ডাক্তার কিছুক্ষণ ওর গলা পর্যবেক্ষণ করে টর্চ রেখে দেন। 'গলার বিস্তারিত চেক-আপ করতে হবে।' ঘুরে সিকান্দার উসমানকে বললেন। এরপর একটা রাইটিং প্যাড, কলম ওর দিকে এগিয়ে দিলেন।

নার্স ততক্ষণে ওর হাতের ড্রিপ খুলে ফেলেছে।

'উঠে বসো। তারপর বলো কী হয়েছে গলার?' ডাক্তার বললেন।

উঠে বসতে সমস্যা হলো না। নার্স একটা বালিশ পিঠের পেছনে দিয়ে দেয়। রাইটিং প্যাড হাতে নিয়ে ভাবতে থাকে। কী হয়েছে গলার, শরীরের, মস্তিষ্কের? কিছু লেখার মানসিক অবস্থা নেই ওর। ফোলা আঙুলে ধরে রাখা কলমটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর সাথে কী হয়েছে ওর মনে আছে। নিজের সেই চিৎকার মনে পড়ছে, যা এখন বলার মতো অবস্থায় রাখেনি। 'কী লিখব? এক পাহাড়ের উপর সব ছিনতাই করে আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল নাকি এটা যে কয়েক ঘন্টার জন্য আমাকে জীবন্ত কবরে নামিয়ে রাখা হয়েছিল? যাতে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই. What is next to ecstasy?' সাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। সংক্ষিপ্ত আকারে নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা লিখে দেয়। ডাক্তার রাইটিং প্যাড হাতে নিয়ে একনজর সেই সাত-

আট লাইনের দিকে তাকিয়ে সিকান্দার উসমানের দিকে
বাড়িয়ে দিলেন তা।

'আপনার উচিত দ্রুত পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা। যাতে
গাড়ি উদ্ধার করা যায়। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।
না-জানি গাড়ি এতক্ষণে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া
হয়েছে।' ডাক্তার সহানুভূতির সাথে পরামর্শ দিলেন।

সিকান্দার উসমান রাইটিং প্যাডের লেখাগুলো একনজর
চোখ দেখলেন। 'হ্যাঁ, আমি পুলিশের সাথে যোগাযোগ
করছি।' ঘুরে দু'জনার মাঝে আরও কিছুক্ষণ ওর গলার চেক-
আপ নিয়ে কথা হয়। কথা শেষ করে নার্সকে নিয়ে কেবিন
থেকে চলে যান ডাক্তার।

তারা বেরিয়ে যেতেই সিকান্দার উসমান রাইটিং প্যাড
ছেলের বুকের উপর ছুঁড়ে মারেন। 'এই মিথ্যের নকশা
নিজের কাছে রাখো। তোমার মনে হয় আমি আবার তোমার
কোনো কথায় বিশ্বাস করব? না, মোটেও না।' তিনি প্রচণ্ড

রেগে ছিলেন। 'এটাও তোমার কোনো নতুন অ্যাডভেঞ্চার, আত্মহত্যার নতুন চেষ্টা।'

ও বলতে চাইছিল। 'For God's sake! এমন কিছু না।' কিন্তু বোবার মতো হা হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ডাক্তারকে কী বলতাম, আমার ছেলের অভ্যাসই এমন নাটক-তামাশা করার? ওর জন্মই হয়েছে এই কাজের জন্য।' সিকান্দার উসমানকে এত রেগে যেতে সালার আগে কখনো দেখেনি। হয়তো সত্যিই তিনি ওর ওপর বিরক্ত হয়ে গেছেন। তায়িবা চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'প্রতিবছর এক নতুন নাটক, এক নতুন বিপদ। তোমাকে জন্ম দিয়ে কি গুনাহ করেছি?' সিকান্দার উসমানের বিশ্বাস, এটাও তার ছেলের কোনো নতুন অ্যাডভেঞ্চারের অংশ। যে চারবার নিজেকে মারার চেষ্টা করতে পারে, তাকে দিয়ে এটাও অসম্ভব না। ওর হাতে-পায়ের চিহ্নকে ছিনতাইয়ের

প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় না। তাছাড়া এই ঘটনার কোনো সাক্ষী নেই।

সালারের 'বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে' গল্পের কথা মনে পড়ল। কিছু গল্প আসলেই সত্য। বারবার মিথ্যে বলে নিজের আস্থার জায়গা হারিয়ে ফেলেছে অথবা আজ নিজের সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছে। নিজস্ব সম্মান, আত্মবিশ্বাস, অহংকার, অনুগ্রহ সবকিছু... অপমানে ডুবে অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছিল।

'কোনো নতুন নাটক না করার অনেক দিন কেটে গেছে, তাই ভাবলে বাবা-মাকে কেন নিরাশ করবে? তাদেরকে বিব্রত ও অপমান করার অনেকদিন হয়ে গেছে, এখন নতুন কিছু করা যাক।'

'হতে পারে সিকান্দার সত্যি বলছে ও। আপনি পুলিশকে গাড়ির ব্যাপারে জানিয়ে দেখুন।' তায়িবা সিকান্দার রাইটিং প্যাডের লেখা পড়ে স্বামীকে বললেন।

'ও সত্য বলছে? আজ পর্যন্ত কখনো সত্য বলতে শুনেছ ওকে? এই নতুন নাটকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস নেই আমার। এই ছেলে নিজের কর্মকাণ্ডে একদিন ফাসিতে ঝোলাবে আমাদেরকে। তুমি বলছ পুলিশকে রিপোর্ট করতে, কেন নিজেকে হাসির খোরাক বানানোর জন্য? গাড়ির সাথেও নিশ্চয়ই কিছু করেছে। হয়তো বিক্রি করে এসেছে, নয়তো কোথাও ফেলে দিয়েছে।' ক্ষোভে গালিগালাজ করতে থাকেন।

সালার কখনো তার মুখ থেকে গালি শোনেনি। শুধু ধমক শুনেছে। তিনি ধমক দিলেও রেগে যেত ও। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র ও বাবা-মায়ের ধমক পর্যন্ত সহ্য করত না। ওর সাথে কথা বলার সময় সিকান্দার উসমান সাবধান থাকতেন ওর সামান্যতেই রেগে ওঠার স্বভাবের কারণে। কিন্তু আজ প্রথম তার গালিতে ওর রাগ উঠল না। বুঝতে পারছিল তাদেরকে কী পরিমাণ বিরক্ত করে তুলেছে। সেই প্রথম হসপিটালের বিছানায় শুয়ে ও বাবা-মায়ের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। এমন কী বাকি আছে, যা তারা দেয়নি ওকে? মুখ

দিয়ে কিছু বের করার আগেই তারা ওর শখ পূরণ করে দিত,
কিন্তু বিনিময়ে ও তাদেরকে কী দিয়েছে? কী দিচ্ছে?
মানসিক যন্ত্রণা, দুশ্চিন্তা বা কষ্ট? ও ছাড়া কোনো ভাইবোন
তাদের জন্য এমন ঝামেলা দাঁড় করায়নি। একমাত্র ও...'

'একদিন তোমার জন্য আমাদের দু'জনকে আত্মহত্যা করতে
হবে। তখন তুমি নিশ্চিত হবে, শান্তি পাবে।'

কাল রাতে পাহাড়ে বাঁধা অবস্থায় বাবা-মায়ের কথা খুব মনে
পড়েছে ওর। সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিল, তাদেরকে
নিজের জন্য কতটা দরকার। তাদের বাইরে ওর কী হবে?
তারা ছাড়া ওর জন্য কে দুশ্চিন্তা করবে? জীবনে এই প্রথম
বাবার কথা ওর মনে আঘাত করেনি। ও সবসময় থেকে
সিকান্দারের সবচেয়ে কাছের সন্তান ছিল এবং ওর
বেশিরভাগ ঝগড়া তার সাথেই হতো।

'মন বলছে আর কখনো এই চেহারা না দেখতে। ওখানে ছুঁড়ে ফেলে আসতে ইচ্ছে করছে, যেখানের ব্যাপারে মিথ্যে বলছে।'

'এখন থামুন সিকান্দার।' তায়িবা স্বামীকে বাধা দিলেন।

'আমি থামব? ও কেন থামতে পারে না? আমাদের ওপর করুণা করে হলেও নিজের এসব কাজ ছেড়ে দিতে পারে না? আমাদের জীবনকে আজীব বানানো কি এর জন্য ফরজ করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে?' সিকান্দার উসমান আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'এখন সেই পুলিশ কর্মকর্তারাও জবানবন্দি নিতে এসে পড়বে, যারা রাস্তায় পেয়েছিল। এই অহেতুক কথা বলব তাদের সামনে যে, এই বেচারাকে কেউ ছিনতাই করেছে? ভালো হতো যদি কেউ সত্যিই সব ছিনতাই করে ওকে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিত। কমপক্ষে আমার প্রাণ রক্ষা পেত।'

সালার ফুঁপিয়ে ওঠে। সিকান্দার আর তায়িবা হতভম্ব হয়ে পড়লেন। ও দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। তারা এই প্রথম এভাবে কাঁদতে দেখছিল ওকে, তা-ও এমন অসহায়ের মতো। ও কী করছে? কী চাইছে? কী বলছে? সিকান্দার উসমান ঝুঙ্ক হয়ে গেলেন। তায়িবা ওর কাছে এসে বসলেন। ছেলেকে বুকে লাগিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন। ও ছোট্ট বাচ্চার মতো মাকে জড়িয়ে ধরে। ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সিকান্দার উসমানের হঠাৎ মনে হলো, এবার সম্ভবত তার ছেলে মিথ্যে বলছে না, হয়তো সত্যিই ওর সাথে দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাকে জড়িয়ে ধরে ও একটা ছোট্ট বাচ্চার মতো হেঁচকি তুলে কাঁদছিল। তায়িবা ছেলেকে শান্ত করতে গিয়ে নিজেও কাঁদতে শুরু করেন। ছোটখাটো বিষয়ে দূরের কথা, বড়োসড়ো বিষয়েও কাঁদার অভ্যাস নেই ওর। তাহলে আজ কী হয়েছে যে, ওর চোখের পানি থামছেই না? ছেলের কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সিকান্দার উসমানের মন খচখচ করে উঠল। 'সত্যিই যদি ও সারা রাত জঙ্গলে বাঁধা থাকে, তাহলে...?'

তিনি আর তার স্ত্রী সারা রাত জেগে ছিলেন ছেলের অপেক্ষায়। মেজাজ খারাপ করে ভাবছিলেন গাড়ি নিয়ে আবার লাহোর বা কোথাও ঘুরঘুর করতে চলে গেছে। চিন্তা হচ্ছিল তাদের। কিন্তু ওর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের জানা। তাই চিন্তার চেয়ে বেশি রাগ উঠছিল। প্রায় আড়াইটা বা তিনটার দিকে যখন তারা ঘুমানোর জন্য যাচ্ছিলেন, তখন পুলিশের মাধ্যমে এই খবর পান। সাথে সাথে হাসপিটালে এসে পৌঁছান। সরকারি হাসপিটালে ওকে খুব করুণ অবস্থায় দেখতে পান। তবুও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না যে, ওর সাথে দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভাবেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে ও। যে হাতের শিরা কেটে ফেলে, ওয়ান-ওয়ে ভেঙে ট্রাফিকের ভিড়ে বাইক ঢুকিয়ে দেয়, স্লিপিং পিলস খায়, নিজেকে বেঁধে পানিতে উল্টো ঝাঁপ দেয়, তার জন্য আরও একবার নিজের এই অবস্থা করা কঠিন কিছু না। পোকামাকড়ের কামড়ের চিহ্নে ওর শরীর ভরে ছিল। কোথাও নীলচে ভাবও। পায়ে গুরুতর ক্ষত। হাতের কজি, ঘাড় এবং পিঠেরও একই অবস্থা ছিল। চোয়ালেও আঁচড়ের চিহ্ন। এরপরও সিকান্দার উসমানের বিশ্বাস ছিল এসব নিজের করা কাজই ওর।

যদি তখন সালার বলার মতো অবস্থায় থাকত, কারণ পেশ করতে পারত; তাহলে তিনি কোনোভাবেই ওর কথায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু ওকে ঐভাবে হেঁচকি তুলে কাঁদতে দেখে তার বিশ্বাস হতে থাকে, ও সত্যি বলছে। তিনি রুম ছেড়ে বেরিয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন। এক ঘন্টা পর খবর আসে লাল রঙের একটা স্পোর্টস কার ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে, সাথে দুই ছেলে। সাধারণ চেকিংয়ের সময় পুলিশ ওদের কাছে লাইসেন্স আর কাগজপত্র না থাকায় চেহারার আতঙ্ক দেখে সন্দেহবশত ধরে এনেছে। ছেলেগুলো স্বীকার করেনি ওরা গাড়ি ছিনতাই করে এনেছে। ওদের বয়ান ছিল গাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়ে শখের বশে চালিয়ে দেখছিল। যেহেতু পুলিশের কাছেও গাড়ির এফআইআর জমা হয়নি তাই ওদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা কঠিন ছিল। কিন্তু সিকান্দার উসমানের এফআইআরের কিছুক্ষণ পর পুলিশ গাড়ি সম্পর্কে পরিষ্কার হয়ে যায়। অন্যদিকে সিকান্দার উসমান এখন সত্যিকার অর্থেই ছেলেকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন।

সিকান্দার আর তায়্যিবা রাতে ফিরলেন না। হসপিটালে ছেলের সাথে কাটালেন। পরদিন সালারের শরীরের ব্যথা ও ফোলাভাব অনেকটাই কমে আসে। দু'জন এগারোটার দিকে ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। এর আগে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা এসে ওর কাছ থেকে লম্বা লিখিত বক্তব্য নিয়ে যায়। বাবা-মায়ের সঙ্গে নিজের রুমে ঢুকে এই প্রথম জানালায় লাগানো মডেলদের নগ্ন ছবি দেখে ওর মাঝে লজ্জা কাজ করে। সিকান্দার আর তায়্যিব্যার এই রুমে যাওয়া-আসা বহু বছরের। তাই এসব ছবি তাদের জন্য নতুন বা আপত্তির কিছু ছিল না।

'তুমি এখন বিশ্রাম নাও। তোমার ফ্রিজে ফল আর জুস রাখিয়ে দিয়েছি। ক্ষুধা লাগলে বের করে খেয়ে নিও। নাহলে কাজের মহিলাকে ডেকে পাঠিয়ে, এসে বের করে দেবো' তায়্যিবা ছেলেকে বললেন।

বিছানায় গিয়ে শোয় সালার। কিছুক্ষণ ওর পাশে থাকেন তারা। এরপর জানালার পর্দা ঠিক করে ওকে ঘুমাতে বলে

বেরিয়ে যান। বাবা-মা চলে যেতেই উঠে বসে ও। ভেতর থেকে দরজা লক করে জানালার পর্দা সরিয়ে খুব দ্রুত লাগানো ছবিগুলো টেনে ছিঁড়তে থাকে। পোস্টার, ছবি, কাট আউট সব। কয়েক মিনিটে পুরো রুম পরিষ্কার করে ফেলল। ওয়াশরুমে গিয়ে ওগুলো সব বাথটাবে ভূপ করে। ওয়াশরুমের লাইট জ্বালানোর কারণে নিজের চেহারা চোখ যায়। চেহারা ফুলে নীল হয়ে আছে। এমন কিছুই দেখতে হবে আন্দাজ ছিল। ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আসে। রুমে এখনো পর্নোগ্রাফির অনেক ম্যাগাজিন রয়ে গেছে। সেগুলো এনে বাথটাবে ছুঁড়ে ফেলল। পালানুক্রমে র‍্যাকে থাকা নোংরা ভিডিয়ো ক্যাসেটের টেপ খুলে বের করতে থাকে। আধা ঘন্টার মধ্যে কাপেট টেপের ভূপে ভরে যায়। কেসগুলো ময়লার বুড়িতে রেখে টেপের ভূপ বাথটাবে এনে ফেলো। এরপর লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয় ওগুলোতে। আগুনের ফুলকি একটু একটু করে সবকিছু গ্রাস করে নিতে থাকে। এক্সিষ্ট ফ্যান অন করে বাথরুমের জানালা খুলে দেয় ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। এগুলোর ভূপ এজন্য জ্বালাচ্ছে,

যাতে দোজখের সেই আগুন থেকে বাঁচতে পারে, যা ওকে গ্রাস করার অপেক্ষায় রয়েছে।

আগুনের ফুলকি ছবি আর টেপের ভূপকে এমনভাবে গিলছে, যেন ওগুলো আগুনে জ্বলার জন্যই সৃষ্টি। স্থির চোখে বাথটাবে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছিল তখন কোনো দোজখের কিনারেই দাঁড়িয়ে আছে। আগের রাতে পাহাড়ের উপর বাঁধা অবস্থায় ইসলামাবাদের আলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল এটাই জীবনের শেষ রাত। আর কখনো এই আলোগুলো দেখতে পারবে না। করুণ কণ্ঠে বারবার চিৎকার করে বলেছিল-'একবার, শুধু আরেকবার, আমাকে একটা সুযোগ দাও। একটা সুযোগ... আর কখনো গুনাহের কাছে যাব না আমি।' সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে ওকে। এখন সেই ওয়াদা পূরণ করার সময়। আগুন সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। আগুন নিভে গেলে পানি দিয়ে বাথটাব পরিষ্কার করে নেয়।

ঘুরে ওয়াশ বেসিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। গলার স্বর্ণের চেইন ছেলেগুলো নিয়ে গেছে। কিন্তু কানের লতিতে থাকা ডায়মন্ড টপস রয়ে গেছে। ওটা প্ল্যাটিনামে ঢাকা, তাই হয়তো ছেলেগুলো গুরুত্ব দেয়নি। নয়তো ভেবেছিল সাধারণ পাথর বা জিরকন হবে। নাহলে ওর লম্বা খোলা চুলের পেছনে লুকিয়ে ছিল ওটা। কিছুক্ষণ আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে কানের লতি থেকে টপস খুলে বেসিনের পাশে রাখল। শেভিং কিট থেকে রেজার বের করে চুল ফেলে দিতে থাকে, বড়ই হৃদয়হীনভাবে। বেসিনের পানি চুলগুলোকে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রেজার বের করে শেভ করে। যেন নিজের সমস্ত চিহ্ন থেকে পিছু ছাড়াচ্ছে। কাপড় খুলে, হাতের ব্যান্ডেজ খুলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ায়। পুরো এক ঘন্টা ধরে নিজের শরীরের একেকটা অঙ্গ কালিমা পড়ে পরীক্ষার করতে থাকে। যেন আজ প্রথম ইসলামের সাথে পরিচয় হয়েছে ওর... যেন এই প্রথম মুসলমান হচ্ছে...। ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে ফ্রিজে রাখা কয়েক টুকরো আপেল খেয়ে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়ে। পরেরবার চোখ

অ্যালার্মের শব্দে খোলে, যা ঘুমানোর আগে সেট করে রেখেছিল।

‘মাই গড! সালার চুলের সাথে কী করেছ?’ তায়িবা সিকান্দার কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেলেন ছেলে কথা বলার অবস্থায় নেই।

সালার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মায়ের সামনে রাখে। ‘আমি মার্কেটে যাব’ ওটার ওপর লেখা ছিল।

‘কেন?’ তায়িবা সিকান্দার বাঁকা চোখে তাকান। ‘এখনো সুস্থ হওনি। হসপিটাল থেকে এসেছ মাত্র কয়েক ঘন্টা, এর মধ্যে টইটই করার জন্য বের হতে চাইছ?’ নরম আওয়াজে ধমক দিলেন।

‘মাম্মি! আমি কিছু বই কিনব, টইটই করতে যাচ্ছি না।’ সালার কাগজে লিখল।

তায়িবা সিকান্দার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। 'ড্রাইভারের সাথে যাও।'

সালার মাথা নাড়ে।

সালার যখন মার্কেটের পার্কিংয়ে গাড়ি থেকে নামে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মার্কেটের লাইট চারপাশে রঙের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল। চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে ছেলে-মেয়েরা। যাদের রয়েছে পরনে পশ্চিমা পোশাক। চিন্তামুক্ত জীবনযাপন। বেহায়াপনার হাসি-ঠাট্টা। জীবনে এই প্রথম এসব দেখে অস্বস্তি লাগে ওর। আটচল্লিশ ঘন্টা আগে মার্গাল্লা পাহাড়ের সেই ভয়াবহতা মনে পড়ে যায়। ও নিজেও সেই ছেলেদের একজন ছিল- যারা মেয়েদের উত্যক্ত করে, পেছন থেকে শিস বাজায়, অস্বস্তিকর কথাবার্তা বলে। মাথা নিচু করে কোথাও না তাকিয়ে সামনের বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল।

পকেট থেকে কাগজ বের করে প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা দোকানদারকে জানায়। কুরআন, তরজমা এবং নামাজবিষয়ক কিছু বই নেবে। দোকানদার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়, সালারকে চিনত সে। ওখান থেকে পর্নোগ্রাফির বিদেশি ম্যাগাজিন, সিডনি শেলডন, হ্যারল্ড রবিন্সসহ আরও অনেক ইংরেজ লেখকদের নিত্যনতুন উপন্যাস কিনত ও। দোকানদার কর্মচারীকে বই দিতে বলে ওর দিকে দিকে তাকিয়ে রইল। দোকানদারের বিস্ময় বুঝতে পেরে তার সাথে চোখ না মিলিয়ে কাউন্টারে ফেরে।

‘তুমি অনেকদিন পর এলে। কোথায় ছিলে?’

‘পড়াশোনার জন্য বাইরে ছিলাম।’ সালার সামনে থাকা কাগজে লিখল।

‘আর গলার কী হয়েছে?’

‘বেশি কিছু না, শুধু ব্যথা।’ ও লেখে।

কর্মচারী কুরআন তরজমা এবং অন্যান্য বই নিয়ে আসে।

'হ্যাঁ, আজকাল ইসলামিক বই পড়ার ট্রেন্ড চলছে। মানুষজন পড়ছে, খুব ভালো ব্যাপার। বিশেষ করে যারা বাহিরে যায় তাদের অবশ্যই পড়া উচিত।' দোকানদার বড়োসড়ো ব্যবসায়িক হাসি দিয়ে বলে।

সালার কিছু বলল না। সামনে রাখা বইগুলো দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ডান হাতে ধরে রাখা কুরআন তরজমার ফাঁকা জায়গায় দোকানদার পর্নোগ্রাফির কিছু নতুন ম্যাগাজিন রাখে। বই দেখতে দেখতে ওগুলোর ওপর চোখ পড়লে চমকে মাথা তোলে।

'এগুলো নতুন এসেছে, ভাবলাম তোমাকে দেখাই। হতে পারে কিনতে পছন্দ করবো।'

একনজর কুরআন তরজমার দিকে তাকায় ও, আরেক নজর কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়ে থাকা ম্যাগাজিনের দিকে। রাগের তীব্র

ঢেউ ভেতরে জেগে ওঠে। কেন? উত্তর জানা নেই। বাঁ-
হাতে ম্যাগাজিনগুলো তুলে দোকানের যত ভেতরে সম্ভব,
ছুঁড়ে মারে। কয়েক মুহূর্তের জন্য দোকানে নিস্তব্ধতা নেমে
আসে। কর্মচারী বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 'বিল?' সালার
কাগজে লিখে রেগে যাওয়া লাল চেহারা নিয়ে কর্মচারীর
সামনে ধরে। কর্মচারী কোনো কথা না বলে সামনে থাকা
বইয়ের বিল কম্পিউটারে টাইপ করতে থাকে। কয়েক
মিনিটের মধ্যে বিল মিটিয়ে বই তুলে বাইরের দিকে পা
বাড়ায় ও।

'ইডিয়ট!' দোকান থেকে বেরোনোর সময় কাউন্টারের পাশে
দাঁড়ানো এক মেয়ের গলা শোনে। কাকে উদ্দেশ্য করে
বলছে তা ঘুরে দেখার প্রয়োজন মনে করল না। জানে এই
মন্তব্য ওর উদ্দেশ্যেই করা।

দুই সপ্তাহ পর গলা স্বাভাবিক হয়ে আসে সালারের। যদিও
গলা বসা ছিল। কিন্তু কথা বলার মতো অবস্থা ফিরে পায়। আর
এই দুই সপ্তাহ রুহানি অনুসন্ধানে ছিল ও। জীবনে এই প্রথম

এমন কিছু করেছে। হয়তো জীবনে এই প্রথমই উপলব্ধি করতে পেরেছে রুহ বলতেও কিছুর অস্তিত্ব আছে। রুহের সাথে এই সম্পৃক্ততা লম্বা সময় নীরব থাকার বদৌলতে সম্ভব হয়। বলা না কেবল শোনা। মাঝেমধ্যে কেবল শুনে যাওয়াই অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এই উপলব্ধির সাথে ওর পরিচয় নতুন। আগে কখনো রাতে ভয় পেত না। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে রাত নিয়ে ওর মাঝে চরম আতঙ্ক কাজ করে। রুমের লাইট অন করে ঘুমাত। পুলিশ হেফাজতে ছেলে দুটোকে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু পুলিশের সাথে সেই জায়গায় যেতে রাজি হয়নি, সেই সন্ধ্যায় যেখানে ছেলেগুলো বেঁধে ফেলে এসেছিল ওকে। আবারও মানসিক ভাঙনের শিকার হতে রাজি ছিল না। জীবনে এর আগে কখনো ভয়ে এমন কাবু হয়ে রাত কাটায়নি। কিন্তু এখন হচ্ছে। স্লিপিং পিল ছাড়া ঘুমাতে পারে না। পিল না নিলে সারা রাত নিঃশ্বাস কাটাতে হয়। নিউ হ্যাভেনেও এমন কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিল। এমন যন্ত্রণায়, অস্থিরতায়। কিন্তু তখন শুধু চিন্তা, অস্থিরতা বা সমান্য অনুশোচনা ছিল।

এখন তৃতীয় এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ভয়ের মধ্য দিয়ে।
ও জানে না সেই রাতে সবচেয়ে বেশি কীসের ভয়
পেয়েছিল-মৃত্যুর, কবরের না দোজখের? ইমামা বলেছিল
এক্সটেনসিভের পর পেইন আসে। মৃত্যুই সেই যন্ত্রণা। ইমামা
আরও বলেছিল পেইনের পর নাথিংনেস আসে। কবর হলো
সেই শূন্যতা। ইমামা বলেছিল নাথিংনেসের পর হেল আসে।
সেই পর্যন্ত পৌঁছাতে চায় না ও। সেই এক্সটেনসি থেকে
বাঁচতে চায়, যা ওকে পেইন থেকে হেল পর্যন্ত নিয়ে যাবে।
'যদি এসব আমার জানা না থাকে, তাহলে ইমামা কীভাবে
জানত? ও আমার বয়সী ছিল, আমার মতো পরিবারের সাথে
সম্পৃক্ত, তাহলে ওর কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর কীভাবে
এল?' বিস্ময় নিয়ে ভাবে। 'একই বিলাসিতা ইমামার কাছেও
ছিল, যা আমার কাছে আছে। তাহলে ওর-আমার মাঝে কী
পার্থক্য? ও যেভাবে চিন্তা করত তা কোথা থেকে আসত?
আর ও কেনই-বা সেই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়নি?'
এই প্রথম ইমামাকে নিয়ে এত গভীরভাবে ভাবছিল। ওর
অস্থিরতা বাড়তে থাকে। 'খতমে নবুওয়াত নিয়ে মতবাদ কী

এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, একটা মেয়ে এভাবে নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে?'

'আসজাদকে বিয়ে করিনি, কারণ সে খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস করে না। আর তুমি মনে করো আমি তোমার মতো মানুষের সাথে জীবন কাটাতে রাজি হয়ে যাব? এমন একজনের সাথে, যে খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু গুনাহ করে? সেসব গুনাহ করে, যা নবী সা. নিষেধ করেছেন। যেহেতু আমি নবী সা.-কে বিশ্বাস না-করা মানুষকে বিয়ে করিনি, সুতরাং এমন কারো সাথেও জীবন কাটাব না, যে তাঁর অবাধ্য।' ইমামা হাশিমের প্রতিটি বাক্য ওর মনে আছে। এই প্রথম সেগুলোর মানে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। 'তুমি এসব কথা বুঝবে না।' ইমামা অনেকবার এই বাক্য বলেছে। এতবার যে, এই কথা ওর বিরক্ত লাগত প্রচুর। 'ভাবত ইমামা এ কথা বলে কী বোঝাতে চায়- নিজে খুব বড় পণ্ডিত, পবিত্র আর ও নীচু মনের?' কিন্তু এখন বোঝে ইমামা ঠিক বলত, তখন কিছু বোঝার মতো যোগ্যতা ছিল না ওর। 'ময়লায় বসবাসকারী কীট কীভাবে মানবে ও ময়লায় বাস

করে? এরা নিজের পরিবর্তে অন্যদের ময়লায় লেপ্টে থাকতে দেখে।" তখন ময়লার মাঝেই ছিল সালার সিকান্দার।

'তোমার তাকানো, বোতামহীন শাট দেখলে ঘৃণা লাগে আমার।' এই প্রথম ওরও এই দুটো বিষয়ে ঘৃণা জন্মায়।
আয়নার সামনে দাঁড়ালে ইমামার বলা এই বাক্য গুঞ্জনের মতো ওর কানে বাজতে থাকে। প্রতিবার আওয়াজটা মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে, কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু লাভ হয় না। অনুভব করে নিজের প্রতি ওর ঘৃণা জন্মাচ্ছে। শাটের বোতাম লাগিয়ে রাখতে শুরু করে। চোখ নামিয়ে চলতে শুরু করে।
আয়নার সামনেও নিজের মুখোমুখি হতে লজ্জা পায় এখন। কখনো কারো কাছে শোনেনি ওর চোখ দেখলে বা ওর চাহনি কারো ঘৃণা লাগে; বিশেষ করে কোনো মেয়ের কাছ থেকে কখনো না। তবে এটা চোখ না সেই চাহনি চিনতে পারার প্রতিক্রিয়া, যা ইমামা হাশিমের মাঝে ঘৃণা জন্ম দিয়েছিল। ইমামা হাশিমের আগে কোনো মেয়ে সেই চাহনি চিনতে পারেনি। ও চোখে চোখ রেখে কথা বলা মেয়েদের

মাঝে থাকত আর এমন মেয়েদেরকেই পছন্দ করত। ইমামা হাশিম কখনো ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলত না। ওর দিকে তাকিয়ে যখন ওকে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখত, চোখ নামিয়ে নিত বা অন্যকিছুর দিকে তাকাত। ওর ভুল ধারণা ছিল ইমামা ওর চোখে চোখ রাখত না মুগ্ধ হওয়ার ভয়ে। তাই প্রথমবার যখন ফোনে এই কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ে যে, ওর চোখ দেখলে ইমামার ঘৃণা লাগে!

'চোখ হচ্ছে আত্মার জানালা।' সালার কোথাও পড়েছিল। 'তাহলে কী আমার চোখ আমার ভেতরের নোংরামি দেখাত?' অবাক হয় না। কারণ নোংরাই ছিল তখন। তবে সেই নোংরামি দেখতে হলে সামনে থাকা ব্যক্তির পাক হওয়া জরুরি। সুতরাং ইমামা হাশিম পাক ছিল।

‘আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না, এখন থেকে আমার বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ থাকবে না।’ বাবার সাথে চোখ না মিলিয়ে বলল সালার। আবার ইয়েল যাচ্ছে ও।

যাওয়ার আগে সিকান্দার উসমান সবসময়ের মতো ওকে বোঝাতে বসেন। সেই পুরনো নসিহত ক্ষীণ আশা নিয়ে আরও একবার সবকিছু কানে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু এবার তিনি কথা শুরু করার আগেই জীবনে প্রথমবার তাকে আশ্বস্ত করে সালার এবং এই প্রথম সিকান্দার উসমানও ছেলের কথায় ভরসা পান। দুর্ঘটনার পর ওর মাঝে আসা পরিবর্তনগুলো দেখেছেন তিনি। ও আর আগের সালার নেই। ওর জীবন বদলে গেছে, পোশাক থেকে আচরণ সবকিছু। ওর ভেতরের আগুনের শিখা যেন কেউ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। এটা ঠিক নাকি ভুল, এই পরিবর্তন ভালো না খারাপ; নিজেও এ ব্যাপারে কোনো রায়ে উপনীত হতে পারছিলেন না। কিন্তু তার জন্য এটুকু স্পষ্ট ছিল, তার ছেলের মাঝে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তিনি জানেন না ও জীবনে এই প্রথমবার আঘাত পেয়েছে। জীবনে আসা প্রথম আঘাত বড়-বড় মানুষকেও কাঁদিয়ে ছাড়ে। আর সেখানে তো ও একুশ-বাইশ বছরের একটা ছেলেমাত্র!

জীবনে মাঝেমধ্যে বুঝে আসে না, আমরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছি নাকি নতুন অন্ধকারে প্রবেশ করছি। অন্ধকারের মাঝে দিক চেনা যায় না। কিন্তু আকাশ আর জমিনের পার্থক্য করা যায়, সর্বাবস্থায়। মাথা তুললে আকাশ আর নত করলে পৃথিবী। দৃশ্যমান হোক বা না-হোক, জীবনে এগিয়ে যেতে শুধু চারটা দিকের প্রয়োজন। ডান-বাম, সামন-পেছন। পঞ্চম দিক পায়ের নিচ। ওখানে মাটির পর অতল গহবর। গহবরে হারিয়ে যাওয়ার পর দিকের প্রয়োজন হয় না। ষষ্ঠ দিক মাথার উপর। যেখানে যাওয়া যায় না। সেখানে আল্লাহ বিরাজমান। যাঁকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের প্রতিটি হৃৎস্পন্দন, রক্তের প্রতিটি ফোঁটা, প্রতিটি আগত-নির্গত শ্বাস, গলা দিয়ে নামা প্রতিটি লোকমার সাথে তিনি অনুভূত হন। নিজের ফটোগ্রাফিক মেমোরি, ১৫০+ আইকিউ আজাব মনে হচ্ছিল। সবকিছু ভুলতে চায় ও। যা এতদিন করেছে, তা সব। কিন্তু কিছু ভুলতে পারছিল না। 'কেউ যদি ওকে ওর যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞেস করত...'

ঢ় ছয়

নিউ হ্যাভেনে ফিরে এসে জীবনের এক নতুন যাত্রা শুরু করে সালার।

সেই রাত, জঙ্গলের ভয়ংকর অন্ধকার, একা গাছের সাথে বাঁধা অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে করা সব ওয়াদা মনে আছে ওর। সবার কাছ থেকে বিছিন্ন থাকতে শুরু করল। সামান্য যোগাযোগ বা কোনোরকম সম্পর্ক ছাড়া। ‘আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই না।’ স্পষ্টবাদী তো সবসময়ই ছিল ও। কিন্তু এত পরিমাণ হয়ে যেতে পারে, বন্ধু-বান্ধবদের কেউ আশা করেনি। কয়েক সপ্তাহ গ্রুপ ওকে নিয়ে ফুসুর-ফাসুর করতে থাকে। একসময় তা আপত্তি আর সমালোচনায় রূপ নেয়। সবশেষে ব্যঙ্গাত্মক বাক্য আর বিতৃষ্ণায় বদলে যায়। এরপর সবাই যে যার জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সালার সিকান্দার কারো জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না, না অন্য কেউ ওর জীবনের।

নিউ হ্যাভেনে ফেরার পর যেসব কাজ করেছিল, তার মধ্যে জালাল আনসারের সাথে দেখা করার চেষ্টাও রয়েছে। পাকিস্তান থেকে আসার সময় জালালের পরিবারের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আসে। এটা কাকতালীয় ছিল যে, ওর এক কাজিন সেই একই হসপিটালে কাজ করত। বাকি কাজ তাই সহজ হয়ে যায়, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সহজ। দেখা করে মাফ চাইবো। সেই সব মিথ্যে স্বীকার করবে, যা ইমামাকে তার ব্যাপারে এবং তাকে ইমামার ব্যাপারে বলেছিল। ওদের দু'জনার সম্পর্কে নিজের ভূমিকার জন্য লজ্জিত ছিল ও। সেই ক্ষতিপূরণ করতে চায়। জালাল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এরপর ইমামা পর্যন্ত পৌঁছানো ওর লক্ষ্য ছিল। জালালের সাথে হসপিটালের ক্যাফেটেরিয়ায় বসে আছে এখন। তার চেহারায় গম্ভীরভাব। কপালের ভাঁজ জানান দিচ্ছে কতটা বিরক্ত। সালার কিছুক্ষণ আগে এসেছে। জালাল এখানে ওকে দেখে থমকে যায়। শুধু কয়েক মিনিট চেয়েছে ও। দুই ঘন্টা অপেক্ষা করিয়ে অবশেষে ক্যাফেটেরিয়ায় আসে।

'প্রথমত আমি জানতে চাই তুমি আমাকে খুঁজে বের করলে কীভাবে?' আপনি-জনাব এসব আনুষ্ঠানিকতা একপাশে রেখে টেবিলে বসেই জিজ্ঞেস করল।

'এটা গুরুত্বপূর্ণ না।'

'এটাই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তুমি চাও আমি এখানে কিছু সময় কাটাই, তাহলে আমার জানা দরকার তুমি আমাকে খুঁজে বের করলে কীভাবে?'

'কাজিনের হেল্প নিয়েছি। ও ডাক্তার, এই শহরে অনেক বছর ধরে কাজ করে। বাকিটা জানি না কীভাবে খুঁজে বের করেছে। আমি শুধু ওকে আপনার নাম আর অন্যান্য কিছু তথ্য দিয়েছি।' সালার বলল।

'লাঞ্চ?' জালাল বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞেস করল। আসার সময় লাঞ্চ ট্রে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

'না, না, আমি খাব না।' সালার ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যাখান করে।

জালাল খেতে থাকে। 'কোন বিষয়ে কথা বলতে চাও?

'আমি আপনাকে কিছু সত্য বলতে চাই।'

জালাল ঞ্ তুলল। 'সত্য?'

'বলতে চাই আমি মিথ্যে বলেছিলাম। আমি ইমামার বন্ধু ছিলাম না, ও আমার বন্ধুর বোন। শুধু আমার next-door neighbour...'

জালাল খেতে থাকে।

'ওর সাথে আমার নৈমিত্তিক পরিচয় ছিল। না ইমামা আমাকে পছন্দ করত, না আমি ওকে পছন্দ করতাম। এজন্য আপনার

সামনে বলেছিলাম ও আমার খুব ভালো বন্ধু, যাতে
আপনাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়।

জালাল গম্ভীর হয়ে সালারের কথা শুনতে শুনতে খাবার
খাচ্ছিল।

'যখন ইমামা বাড়ি ছেড়ে আপনার কাছে যেতে চেয়েছিল,
আমি ওকে আপনার বিয়ে নিয়ে মিথ্যে বলেছি।'

এবার জালাল খাওয়া থামিয়ে দেয়।

'আমি ওকে বলেছিলাম আপনি বিয়ে করে ফেলেছেন। তাই
আপনার কাছে আর যায়নি ও। পরে বুঝতে পারি আমি ভীষণ
অন্যায় করে ফেলেছি। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল।
ইমামার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু এটা
কাকতালীয় যে, আপনার সাথে যোগাযোগ হয়ে গেছে। আমি
আপনার কাছে এক্সকিউজ করতে চাই।'

'আমি তোমার এক্সকিউজ গ্রহণ করছি। কিন্তু আমি মনে করি না তোমার কারণে আমার এবং ইমামার মাঝে কোনো ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। আমি আগেই ওকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম।' জালাল খুব স্পষ্ট গলায় বলল।

'ও আপনাকে ভালোবাসত।' সালার নিচু গলায় বলে।

'হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে শুধু ভালোবাসা দেখলে হয় না। আরও অনেক কিছু দেখতে হয়।' জালাল বাস্তবিক ভঙ্গিতে বলল।

'জালাল! ওকে বিয়ে করা কী আপনার পক্ষে সম্ভব না?'

'প্রথমত ওর সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, দ্বিতীয়ত থাকলেও আমি ওকে বিয়ে করতাম না।'

'আপনার সাহায্য দরকার ওর।' সালার বলে।

'আমার মনে হয় না আমার সাহায্য দরকার আছে এখনো। অনেক সময় কেটে গেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই কোনো সহযোগী খুঁজে নিয়েছে।' নিশ্চিত সুরে বলল জালাল।

'হতে পারে এমন করেনি, এখনো আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে।'

'আমি এ ধরনের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবায় অভ্যস্ত নই। ক্যারিয়ারের এই স্টেজে আমার পক্ষে বিয়ে সম্ভব না, তাও ওকে।'

'কেন?'

'কেন-এর উত্তর কী দিয়ে দেবো? এর সাথে তোমার সম্পর্ক নেই। কেন আমি বিয়ে করতে চাই না এটা তখনই ওকে বলে দিয়েছিলাম। এতদিন পর এসে তুমি আবার সেই প্যাভোরা বক্স খোলার চেষ্টা করছ।' জালাল খানিক বিরক্ত হয়ে বলল।

'আমি শুধু সেই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছি, যা আমার কারণে আপনাদের দু'জনার হয়েছে।' সালার নরম সুরে বলে।

'আমার কোনো ক্ষতি হয়নি, ইমামারও হওয়ার কথা না। তুমি বেশি ভাবছ।' কয়েক টুকরা সালাদ মুখে দিয়ে বলল জালাল।

সালার তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারছিল না নিজের কথা কীভাবে বোঝাবে। 'আমি ওকে খুঁজতে সাহায্য করতে পারি।' কিছুক্ষণ পর বলল।

'কিন্তু আমি খুঁজতেই চাই না। যেহেতু বিয়ে করব না, তাহলে ওকে খুঁজে লাভ কী আমার?'

সালার গভীর শ্বাস ফেলে। 'আপনি জানেন ইমামা কীসের জন্য বাড়ি ছেড়েছে?'

"আর যাইহোক, অন্তত আমার জন্য ছাড়েনি।" জালাল বাধা দিয়ে বলে।

'আপনার জন্য ছাড়েনি। কিন্তু যে কারণে ছেড়েছে, সেটা জানার পর একজন মুসলমান হিসেবে আপনার ওকে সাহায্য করা উচিত না? যখন আপনি এটাও জানেন যে, মেয়েটা আপনাকে ভালোবাসে। আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত।'

'আমি পৃথিবীর একমাত্র মুসলমান না। তাছাড়া আমার ওপরে তার সাহায্য করা ফরজ করা হয়নি। আমার একটাই জীবন, যা অন্য কারো জন্য নষ্ট করতে পারি না। তুমিও একজন মুসলমান, তুমি কেন বিয়ে করেনি ওকে? আমি তখনো বলেছিলাম বিয়ে করে নাও। এমনিতেও তোমার মাঝে ওর জন্য সফট কর্নার আছে।' জালাল কিছুটা তীক্ষ্ণতা নিয়ে বলল।

সালার আগের মতো নিঃশব্দে বসে থাকে। বলতে পারে না বিয়ে করেছিল। 'বিয়ে? আমাকে পছন্দ করে না ইমামা।'

'এ ব্যাপারে চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি। তুমি আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দাও, রাজি করিয়ে ফেলব আমি। তুমি

মানুষ ভালো, বংশ-পরিবারও ঠিকঠাক হওয়ার কথা। দেড় বছর আগেই চমৎকার গাড়ি দেখেছিলাম, এর মানে টাকা-পয়সাও ভালো আছে। যাইহোক, এখানে কী করছ?

'এমবিএ করছি।'

'তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই নেই। চাকরি পেয়ে যাবে, টাকা-পয়সা আগে থেকেই আছে। মেয়েদের আর কী দরকার? আর ইমামা এমনিতেও তোমাকে চেনে।' জালাল তুড়ি মেরে সমস্যার সমাধান বের করে ফেলল।

সব সমস্যা তো সেই চেনা নিয়েই, ইমামা আমাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চেনে। সালার মনে মনে ভাবে। 'ইমামা আপনাকে ভালোবাসে।'

'এখানে আমার দোষ নেই। মেয়েরা একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে এসব বিষয়ে।' জালাল বিরক্ত হয়ে বলল।

'এটা ওয়ানসাইড লাভ অ্যাফেয়ার তো না, আপনিও কিছুদূর পর্যন্ত ইনভলভড ছিলেন।' সালার গম্ভীর হয়ে বলে।

'হ্যাঁ, কিছুটা ইনভলভড ছিলাম। তবে সময় এবং পরিস্থিতির সাথে মানুষের পছন্দ পরিবর্তন হতে থাকে।'

'যদি সময় এবং পরিস্থিতির সাথে নিজের পছন্দ পরিবর্তন করার ছিল, তাহলে সেটা ইমামা ইনভলভ হতেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এতে অন্তত আপনার কাছে সাহায্যের আশা বা এতটা নির্ভরশীল হওয়ার ভুল করত না ও। আশা করি বলবেন না যে, আপনি বিয়ে নিয়ে ওকে কোনো কথা বা প্রতিশ্রুতি দেননি।'

জালাল রাগী চোখে তাকায়। 'তুমি আমাকে কী বলতে বা বোঝাতে চাইছ?' কিছুক্ষণ পর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

'ইমামা যখন আমার সাথে প্রথম যোগাযোগ করে, তখন আপনার ফোন নম্বর আর এড্রেস দিয়ে বলেছিল, আমি যেন

আপনাকে জিজ্ঞেস করি-আপনি আপনার বাবা-মায়ের সাথে বিয়ের বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিনা। আমি ওকে নিজের ফোন দেই, যাতে এই কথা ও নিজেই আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারে। নিশ্চয়ই ইসলামাবাদ আসার আগে আপনি ওকে বলেছিলেন, বিয়ে নিয়ে আপনি আপনার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলবেন। অবশ্যই প্রেম-ভালোবাসার পর ওকে প্রপোজ করেছিলেন।"

জালাল শক্তভাবে সালারকে থামায়। 'আমি ওকে প্রপোজ করিনি, ও আমাকে করেছিল।'

'মেনে নিচ্ছি ও করেছিল। আপনি কি করেছিলেন? না বলে দিয়েছিলেন?' সালার চ্যালেঞ্জ করার স্টাইলে জিজ্ঞেস করল। 'নিশ্চয়ই না।' অদ্ভুতভাবে হাসে। 'ইমামা আমাকে বলেছিল আপনি খুব ভালো নাত আবৃত্তি করেন এবং নবী সা.-কে অনেক ভালোবাসেন। আপনাকেও নিশ্চয়ই বলেছে, ও আপনাকে কেন ভালোবাসে। কিন্তু আপনার সাথে দেখা করে এবং আপনাকে জানার পরে আমি বেশ হতাশ! আপনি নাত

খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারেন। কিন্তু যতদূর হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে ভালোবাসার সম্পর্ক, তাতে আমার মনে হয় না আপনার মাঝে তা আছে। আমি নিজেও খুব ভালো মানুষ না। ভালোবাসা নিয়ে তেমন কিছু বলতে পারি না। বিশেষ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসার ব্যাপারে। তবে এটুকু জানি, যে মানুষ আল্লাহ বা তাঁর রসুল সা.-কে ভালোবাসার দাবি করে বা অন্যদের এমন ইম্প্রেশন দেয়, সে সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হাত ফিরিয়ে দিতে পারে না। কাউকে ধোঁকা দেওয়া অথবা কারো সাথে প্রতারণা করতে পারে না।" সালার উঠে দাঁড়ায়। "আমি রিকোয়েস্ট করতে এসেছিলাম আপনার কাছে ওর সাহায্যের জন্য। যদিও দেড় বছর আগেও আপনি না বলেছিলেন। আজও না-র ওপর অটল থাকলে আমি বা অন্য কেউ আপনাকে বাধ্য করতে পারবে না। কিন্তু আপনার সাথে দেখা করে এবং কথা বলে আমি হতাশ।" বিদায় জানাতে হাত এগিয়ে দেয় ও। জালাল হাত বাড়ায় না। কপাল কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'আল্লাহ হাফেজ।' সালার হাত সরিয়ে নিয়ে বলে।

জালাল বসে বসে ওর চলে যাওয়া দেখল। এরপর মনেমনে বিড়বিড়িয়ে, 'It's really an idiot's world out there.' বলে লাঞ্চ ট্রের দিকে মনোযোগ দেয়। তার মেজাজ খুব খারাপ হচ্ছে।

জালাল আনসারের সঙ্গে দেখা করার পর নিজের অনুভূতিকে কোনো নাম দিতে ব্যর্থ সালার। ওর কি নিজের অনুশোচনা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত? কারণ জালাল বলেছে ও মাঝে না এলেও সে ইমামাকে বিয়ে করত না। তাছাড়া কথা বলার পর বুঝতে পেরেছে, তার মধ্যে ইমামার জন্য কোনো গভীর অনুভূতি নেই। তবে এটা ওর জন্য আরও অনেক নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। জালালের সাথে আজ দেখা করেছে। কিন্তু দেড় বছর আগে হয়তো এভাবে কথাবার্তা বললে তার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হতো। তখন ইমামার জন্য তার অনুভূতির মাত্রা হয়তো ভিন্ন ছিল। হয়তো আজকের এই উদাসীনতা দেড় বছর আগে ছিল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজের কাঁধ বোঝামুক্ত অনুভব করে আবার পরের মুহূর্তেই দ্বিধার শিকার হয় ও।

এমবিএর দ্বিতীয় বছর খুব শান্তিতে কাটায় সালার। লেখাপড়ার বাইরে ওর জীবনে অন্য কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ডিসকাশনের সময়ই শুধু ক্লাসফেলোদের সাথে কথাবার্তা বলত বা গ্রুপ প্রজেক্টের প্রয়োজনে একসঙ্গে সময় কাটাত। বাকি সময়টা লাইব্রেরিতেই কাটে ওর। উইকেন্ডে একক মাথাব্যথা ছিল ইসলামিক সেন্টারে যাওয়া। ওখানে এক আরবের কাছ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শিখছিল এবং তার কাছে সবক দিত। সেই আরবের কাছ থেকে আরবি ভাষাও শিখতে শুরু করে। খালিদ আবদুর রহমান নামের সেই আরব একজন মেডিকেল টেকনিশিয়ান। যিনি একটি হসপিটালের সাথে সংযুক্ত। উইকেন্ডে তার কাছে এসে আরবি ভাষা এবং কুরআন ক্লাস করে ও। এ কাজের জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। বরং ইসলামিক সেন্টারে থাকা লাইব্রেরির বইয়ের একটা বড় অংশ তার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের দেওয়া। একদিন কুরআনের ক্লাস চলাকালীন তিনি ওকে বললেন।

'তুমি কুরআন হেফজ করছ না কেন?'

সালার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে থমকে যায়। 'আমি... আমি কীভাবে করব?'

'কেন? তুমি কেন পারবে না?' খালিদ জবাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা খুব কঠিন, তাও আমার মতো মানুষ? না, না। আমি পারব না।' সালার বলল।

‘তোমার মেধা খুব ভালো। বরং বলতে পারি আজ পর্যন্ত আমি তোমার মতো মেধাবী কাউকে দেখিনি। এত কম সময়ে যে গতিতে তুমি এত দ্রুততার সাথে আরবি শিখছ, আমি তাতেও অবাক। মস্তিষ্ক এত উর্বর তোমার। যখন বড় সুরা মুখস্থ করছ, অন্য কাউকে তা করতে দেখিনি। এমনকি যেই দ্রুততার এবং অনেককিছু শেখার এবং ধরে রাখার

আকাজ্জকা আছে, তবে কুরআন কেন না? তোমার মেধার ওপর আল্লাহ তায়ালারও হক আছে।" খালিদ বললেন।

‘আপনি আমাকে বোঝেননি। আমার শিখতে আপত্তি নেই। কিন্তু এটা খুব কঠিন। এই বয়সে এসে আমি তা শিখতে পারব না।’ সালার কারণ দেখায়।

‘আমার মনে হয় না কুরআন হেফজ করা তোমার জন্য কঠিন হবে। একবার শুরু করে দেখো। আমি অন্য কাউকে নিয়ে তো এমন দাবি করছি না। কিন্তু তোমার ব্যাপারে দাবি করে বলতে পারি, খুব সহজেই না বরং খুব কম সময়ে পারবো।’

সেদিন এই বিষয়ে কিছু বলেনি সালার। কিন্তু রাতে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে খালিদ আবদুর রহমানের কথাই ভাবতে থাকে। মনে করেছিল দ্বিতীয়বার আর এ বিষয় নিয়ে কথা হবে না। কিন্তু পরের সপ্তাহে তিনি আবারও একই প্রশ্ন করেন।

সালার অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকে দেখতে থাকে। তারপর মৃদু আওয়াজে বলে। 'আমি ভয় পাই।'

'কী? কুরআন হেফজ করাকে?' খালিদ আবদুর রহমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সালার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

‘কিন্তু কেন?’

চুপ রইল ও। একপর্যায়ে কার্পেটের উপর আঙুল দিয়ে রেখা টানতে টানতে বলল। 'আমি অনেক গুনাহ করেছি। এত গুনাহ যে, সেগুলো গুনতে গেলেও কঠিন হয়ে যাবে। কবিরাস-সগিরাস সব গুনাহ, যা একজন মানুষ ভাবতে পারে বা করতে পারে। আমি এই কিতাব নিজের মস্তিষ্কে বা মনে সংরক্ষণ করার কথা ভাবতেও পারি না। আমার মস্তিষ্ক-মন পাক না। আমার মতো মানুষ কুরান হেফজ করার যোগ্য না।'

আমি ভাবতেও পারি না তা করার।' ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।

খালিদ আবদুর রহমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন। 'এখনো গুনাহ কর?'

সালার না-বোধক মাথা নাড়ে।

'তাহলে কীসের ভয়? নিজের সব পাপ সত্ত্বেও যদি তুমি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারো, তাহলে হেফজও করতে পারবে। গুনাহ করেছিলে, এখন করো না, এটাই যথেষ্ট। যদি আল্লাহ তায়ালা না চান তুমি তাহলে সহস্রবার চেষ্টার পরও তা পারবে না। আর যদি সৌভাগ্যবান হও, তাহলে করে ফেলবে।' খালিদ মিনিটেই সমস্যার সমাধান বের করে ফেললেন।

সালার সারা রাত জেগে থাকে। মধ্যরাতের পর প্রথম পাঁচ খুলে কাঁপতে থাকা হাত ও জিহবা নিয়ে হেফজ করতে শুরু

করে। হেফজ করার সময় ওর মনে হলো খালিদ ঠিক বলেছেন। কুরআনের অনেক অংশ আগে থেকেই ওর মুখস্থ। ভয়ের সেই অনুভূতি, যা কুরআন হেফজ করার শুরুতে অনুভব করেছিল তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ওর হৃদয় কোথাও থেকে শক্তি খুঁজে পাচ্ছিল। 'কোথা থেকে?' কেউ ওর জিহবার জড়তা দূর করছিল। 'কে?' কেউ ওর হাতের কাঁপুনি থামিয়ে দিচ্ছিল। 'কিন্তু কেন?'

ফজরের নামাজের কিছুক্ষণ আগে কান্নায় ভেঙে পড়ল ও। যখন গত পাঁচ ঘন্টা ধরে মুখস্থ করা সবক প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করে, কোথাও না আটকে। কোনো আয়াত ভুলে না গিয়ে, কোনো যবর-যেরে ভুল না করে। শেষ কয়েক আয়াতে কণ্ঠ কেঁপে ওঠে। শেষ আয়াতগুলো সম্পূর্ণ করতে একটু কষ্ট হয়, কারণ চোখ দিয়ে তখন অবিরত পানি পড়ছিল। 'যদি আল্লাহ চান এবং তুমি সৌভাগ্যবান হও, তাহলেই কুরআন হেফজ করতে পারবে। নাহলে সহস্রবার চেষ্টা করলেও পারবে না।' খালিদ আবদুর রহমানের বলা কথা বারবার মনে পড়ছিল।

ফজরের নামাজ শেষ করে জীবনের প্রথম সবক রেকর্ড করে রাখে। এবারও কোনো অসুবিধা হয়নি; বরং কঠ আরও সাবলীল এবং সুর আগের চেয়ে বেশি উচ্চকিত ছিল। ওর জীবনে একটা নতুন বিষয় যোগ হয়। আরও একটা অনুগ্রহ ওর ওপর করা হয়। কিন্তু ওর ডিপ্রেসন শেষ হয় না তাতে। রাতের বেলা স্লিপিং পিল ছাড়া ঘুমানোর কথা এখনো কল্পনা করতে পারে না। স্লিপিং পিল নিয়েও রুমের লাইট অফ করতে পারে না। অন্ধকারকে ভয় লাগে।

তারপর একদিন খালিদ আবদুর রহমানই ওকে বললেন। তাকে কুরআনের সবক মুখস্থ শোনাচ্ছিল তখন। টের পায় তিনি স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যখন সবক শেষ করে পানির গ্লাস তুলে ঠোঁটে রাখল তখন বলতে শোনে।

‘আমি কাল রাতে তোমাকে স্বপ্নে হজ করতে দেখেছি।’

সালার মুখে নেওয়া পানি গিলতে পারল না। গ্লাস নিচে রেখে তার দিকে তাকায়।

‘এ বছর তোমার এমবিএ শেষ হয়ে যাবে। পরের বছর হজ করে নাও।’ তার সুর নরম ছিল।

মুখের পানি কোনোরকম গিলল ও। কিছুই বলতে পারল না। কারণ বলার মতো কিছু যে নেই।

এমবিএর ফাইনাল সেমিস্টারের দুই সপ্তাহ আগে কুরআন হেফজ করা শেষ হয় ওর। সেমিষ্টারের চার সপ্তাহ পর সাড়ে তেইশ বছর বয়সে সালার সিকান্দার জীবনের প্রথম হজ করতে যায়। সেখানে যাওয়া থেকে আসা পর্যন্ত ওর মন-মস্তিষ্কে কিছুই ছিল না। না কোনো অহংকার, কোনো হিংসা, কোনো কিছুই না। পাকিস্তানি ক্যাম্পে ওর সঙ্গে আসা সবাই হয়তো ভাগ্যবান, যাদের নেকির বিনিময়ে তাদের এখানে ডাকা হয়েছে। কিন্তু ও তো নিজের আমল জানে, ওকে হয়তো এখানে নিজের কৃতকর্মের ব্যাখ্যা দিতে ডাকা

হয়েছে। কুরআন হেফজ করতে না পারলে কখনো হজের কথা ভাবতেও পারত না। যে মানুষটার মাঝে হেরেম শরিফ থেকে দূরে আল্লাহর মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই, তার কাছে এই আশা করা যায় না, সে কাবার সামনে এসে আল্লাহর মুখোমুখি হবে। সব জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলেও কাবায় আসার সাহস ছিল না ওর।

কিন্তু খালিদ আবদুর রহমানের কথায় পরাস্ত সৈনিকের মতো হজে যাওয়ার জন্য পেপার'স জমা দিয়ে আসে। মানুষ হজে যাওয়ার সুযোগ তখন পায়, যখন তাদের ঝুলিতে পাপ থাকে না, থাকে শুধু নেকির পাহাড়। সালার সিকান্দার এই সুযোগ তখন পেয়েছিল, যখন তার কাছে গুনাহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 'ঠিক আছে, যদি আমি গুনাহ করতে ভয় না পেয়ে থাকি, তাহলে আল্লাহর সামনে গিয়ে মাফ চাইতেও আমার ভয় পাওয়া উচিত না। ঠিক আছে আমি ওখানে মাথা তুলতে পারব না, চোখ তুলতে পারব না, মুখ নিয়ে মাফ চাওয়ার বাইরে আর কিছু বলতে পারব না, তাও চলবে। এই শান্তি পাওয়াও উচিত। আমি তো এরচেয়ে বেশি লজ্জা ও

অপমানের যোগ্য। প্রতিবার হজে এমন কোনো না-কোনো বাকি নিশ্চয়ই আসে, যার কাছে গুনাহ ছাড়া কিছু থাকে না। এবার সেই মানুষটা নাহয় আমি হলাম, সালার সিকান্দারই হলো।" আসার আগে মনে মনে ভেবেছিল।

গুনাহের বোঝা কী এবং মানুষ কীভাবে সেই বোঝা হাশরের দিন নিজের পিঠ থেকে ফেলে দিতে চাইবে, কীভাবে তা থেকে দূরে সরতে চাইবে, তা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইবে; এটা হেরেম শরিফে পৌঁছানোর পর বুঝে আসে ওর। এখানে দাঁড়িয়ে নিজের কাছে থাকা এবং আগামীতে আসা সারা জীবনের সব সম্পদের বিনিময়েও যদি কারো কাছে নিজের গুনাহ বিক্রি করতে চায়, তবুও কেউ এই লেনাদেনায় রাজি হবে না। হায়! মানুষ যদি কোনো সম্পদের বিনিময়ে নিজের গুনাহদের বিক্রি করতে পারত... কোনো অধিকারের জোরে অন্যের কাছ থেকে তার নেকি চাইতে পারত...!

লাখো মানুষের এই ভিড়ে দুটো সাদা চাদর জড়িয়ে রাখা
সালারকে কে চেনে? ওর আইকিউ লেভেল কত তাতে কার
কী আসে-যায়? ওর কাছে কোন কোন এবং কোথাকার ডিগ্রি
আছে কার জানা? জীবনের মাঠে কত একাডেমিক রেকর্ড
ভেঙেছে, নতুন করে গড়েছে; কার কাছে এর খবর আছে?
নিজের মেধা দিয়ে কত কী জয় করেছে, তা নিয়ে হিংসা
করার জন্য কে বসে আছে এখানে? এই ভিড়ের মাঝে
একবার হোঁচট খেয়ে পড়লে সবার পায়ের নিচে পিষে যাবে।
ওকে মাড়িয়ে যাওয়া কারো কাছে এটা ভাবারও সময়
থাকবে না তারা কোন মেধাবীকে হারাচ্ছে। কোন আইকিউ
লেভেলের বিরল মানুষকে এভাবে শেষ করে দিচ্ছে।
পৃথিবীতে নিজের অবস্থান ও গুরুত্ব জানা হয়ে যায়। অবশিষ্ট
ভ্রান্তিটুকুও এখানে এসে শেষ হয় ওর। এতদিনে কোনো
সন্দেহ বাকি থেকে থাকলেও তা দূর হয়ে যায়। আভিজাত্য,
অহংকার, আত্মপ্রত্যয়, স্বার্থপরতা, ঈর্ষার প্রতিটি ফোঁটা
নিংড়ে ওর ভেতর থেকে বের করা হয়। এসব থেকে মুক্তি
পেতেই এখানে এসেছিল ও।

এমবিএতে সালারের উজ্জ্বল সাফল্য কারো জন্য আশ্চর্য বা অবাক হওয়ার বিষয় ছিল না। ডিপার্টমেন্টের সবাই আগেই জানত। সালার আর ওর ক্লাসফেলোদের প্রজেক্ট, অ্যাসাইনমেন্টে এত ব্যবধান থাকত যে, প্রফেসরদের এটা মেনে নিতে কোনো দ্বিধা ছিল না ও প্রতিযোগিতার এই দৌড়ে দশ গজ এগিয়ে দৌড়াচ্ছিল। এমবিএর দ্বিতীয় বর্ষে এই দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয় ও। জাতিসংঘের একটি এজেন্সিতে ইন্টার্নশিপ করে। ওর এমবিএ শেষ হওয়ার আগেই সেই এজেন্সি ছাড়া আরও সাতটি ভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে চাকরির অফার আসে।

‘এখন তুমি কী করতে চাও?’ রেজাল্ট জানার পর সিকান্দার উসমান সালারকে নিজের কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আমেরিকা ফিরে যাব, ইউনাইটেড নেশনের সাথেই কাজ করতে চাই।’

‘কিন্তু আমি চাই তুমি নিজস্ব বিজনেস শুরু করো, নাহলে আমার সঙ্গে যোগ দাও।’ সিকান্দার উসমান ওকে বললেন।

‘পাপা! আমি বিজনেস করতে পারব না। বিজনেসওয়ালা টেম্পারমেন্ট এই আমার? জব করতে চাই। তাছাড়া পাকিস্তান থাকতে চাই না।’

সিকান্দার উসমান অবাক হলেন। ‘আগে তো কখনো বলোনি পাকিস্তান থাকতে চাও না। স্থায়ীভাবে আমেরিকায় সেটেল্ড হতে চাইছ?’

‘আগে কখনো আমেরিকায় সেটেল্ড হওয়ার কথা ভাবিনি। কিন্তু এখন এখানেই থাকতে চাই।’

‘কেন?’

সালার তাকে বলতে পারল না যে, পাকিস্তান থাকলে ওর ডিপ্রেসন বেড়ে যায়। ক্রমাগত ইমামাকে নিয়ে ভাবে।

এখানের সবকিছু ওকে ইমামার কথা মনে করিয়ে দেয়। ওর অনুশোচনা, অপরাধবোধ বাড়তে থাকে। 'আমি এডজাস্ট করতে পারব না।'

সিকান্দার উসমান কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'যদিও আমি মনে করি তুমি চাইলে ভালোই এডজাস্ট হতে পারবে।'

সালার জানে তার ইশারা কোনদিকে। কিন্তু চুপ রইল।

'জব করতে চাও, ঠিক আছে কয়েক বছর করো। কিন্তু এরপর এসে আমার বিজনেস দেখতে হবে। এই সবকিছু আমি তোমাদের জন্য ষ্টাবলিশড কাছি, অন্য কারো জন্য না।' তিনি কিছুক্ষণ ছেলেকে বোঝালেন। সালার চুপ করে তার কথা শুনল।

এরই এক সপ্তাহ পর আমেরিকা ফিরে আসে সালার। কয়েক সপ্তাহ পর ইউনিসেফে জব শুরু করে। হ্যাভেন থেকে নিউইয়র্কে চলে আসতে হয়। একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা। কিন্তু আসার কয়েক সপ্তাহ পর বুঝে যায় কোথাও গিয়েই পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। ইমামাকে আগের মতোই মনে পড়ে। অপরাধবোধ এখানেও পিছু ছাড়ে না ওর।

রোজ ষোলো থেকে আঠারো ঘন্টা কাজ করা শুরু করে। তিন-চার ঘন্টার বেশি ঘুমায় না। রাত-দিনের এই ব্যস্ততা অনেকাংশে স্বাভাবিক করে তোলে ওকে। একদিকে এই ব্যস্ততা ওর ডিপ্রেশনকে কমাতে সাহায্য করছিল, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ওয়ার্কারদের মধ্যে বিবেচিত হতে শুরু করে। ইউনিসেফের বিভিন্ন প্রজেক্টে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশে যেতে হয় ওকে। দারিদ্র্য আর রোগ-ব্যাধিকে প্রথমবার নিজের চোখে এত কাছ থেকে দেখছিল। রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে ছাপানো কলাম এবং সেই সত্যকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার মাঝে ভীষণ পার্থক্য। এই পার্থক্য চাকরির মাধ্যমে বুঝতে শেখে। প্রতিদিন

খালি পেটে ঘুমানো মানুষের সংখ্যা লাখ লাখ। প্রতিরাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাওয়া মানুষের সংখ্যাও কোটিতে। মাত্র তিনবেলার খাবার, মাথার উপর ছাদ এবং গায়ের জামাকাপড়ও যে কত বড় নেয়ামত, তখন জানতে পারে।

ইউনিসেফ টিমের সাথে চার্টার্ড প্লেনে ভ্রমণের সময় নিজের জীবন নিয়ে ভাবত। ওর জীবনে কী এমন কাজ আছে, যার দরুন ওকে এই বিলাসবহুল জীবন দেওয়া হয়েছে? যা যাপন করছে ও। আর সেসব মানুষদের কী এমন পাপ রয়েছে, যার জন্য জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকেও বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকার জন্য শুধু এক প্যাকেট খাবারের পেছনে ছোট্ট তারা? সারা রাত জেগে জেগে প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্ভাব্য স্কিম ও প্ল্যান তৈরি করত। কোথায় খাবার কীভাবে বিতরণ হবে, কী কী উন্নতি করা যেতে পারে, কোথায় আরও সাহায্য প্রয়োজন, কোন এলাকায় কোন ধরনের প্রজেক্ট প্রয়োজন। মাঝেমধ্যে টানা আটচল্লিশ ঘন্টাও না ঘুমিয়ে কাজ করতে থাকত।

ওর তৈরি করা প্রপোজাল এবং রিপোর্ট টেকনিক্যালি এত পুঙ্খানুপুঙ্খ হতো যে, কারো জন্য সেটার মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বের করা অসম্ভব ছিল। এই গুণ ওর খ্যাতি এবং নামকে আরও মজবুত করে। যদি আল্লাহ আমাকে অন্যদের তুলনায় ভালো মেধা এবং সক্ষমতা দিয়ে থাকে, আমার উচিত অন্যদের জন্য তা ব্যবহার করা। যাতে অন্যদের জীবনে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারি, তাদের জীবনকে উন্নত করতে পারি। কাজ করার সময় আর কিছু ভাবত না ও। ইউনিসেফে কাজ করার সময়ই এমফিল করার কথা ভাবে এবং অ্যাডমিশন নেয়। ইভনিং ক্লাসে জয়েন করার সময় কোনো সন্দেহ ছিল না যে ওর, নিজেকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যস্ত করে নিচ্ছে। কিন্তু এর চেয়ে কোনো পথ খোলা ছিল না। কাজ ওর অবসেশন হয়ে উঠেছিল, অথবা এরচেয়ে দু-কদম এগিয়ে মিশন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ফুরকানের সঙ্গে সালারের প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমেরিকা থেকে পাকিস্তান আসার ফ্লাইটে। ফুরকান পাশের সিটের যাত্রী ছিল। আমেরিকা থেকে ডাক্তারদের কনফারেন্সে

যোগদান শেষে দেশে ফিরছিল। অন্যদিকে সালার বোন আনিতার বিয়ের জন্য পাকিস্তান আসছিল। এই দীর্ঘ ফ্লাইটে তাদের প্রাথমিক পরিচয়ের পর কথাবার্তার ধারাবাহিকতা আর থামেনি। ফুরকান বয়সে সালারের চেয়ে অনেক বড়। তার বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়। লন্ডন থেকে স্পেশালাইজেশন করে পাকিস্তান ফিরে এসেছে। এখন গরিস্তানের এক হসপিটালে কাজ করে। বিবাহিত এবং দুটো বাচ্চা আছে। কয়েক ঘন্টা একে-অন্যের সঙ্গে কথা বলার পর ফুরকান আর ও ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়। সালার যথারীতি ব্রিফকেস থেকে স্লিপিং পিল বের করে পানির সাথে গিলে ফেলল। ফুরকান চুপচাপ ওর কাজ দেখতে থাকে। যখন ব্রিফকেস বন্ধ করে রেখে দেয়, তখন বলে উঠল।

'অধিকাংশ মানুষই ফ্লাইটে স্লিপিং পিল ছাড়া ঘুমাতে পারে না।'

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে বলল। 'আমি স্লিপিং পিল ছাড়া ঘুমাতে পারি না, ফ্লাইটে থাকি বা না থাকি।'

‘ঘুমতে অসুবিধা হয়?’ ফুরকান কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘অসুবিধা?’ সালার হেসে বলল। ‘আমি ঘুমাতেই পারি না। স্লিপিং পিল নিয়েও বহু চেষ্টায় তিন-চার ঘন্টা ঘুমাই।’

‘ইনসোমনিয়া হয়েছে?’ ফুরকান জিজ্ঞেস করল।

‘চেক-আপ করানো হয়নি, কিন্তু হতে পারে।’ সালার উদাসীন ভঙ্গিতে বলল।

‘না। আমার মনে হয় তুমি কাজের পেছনে পাগল হয়ে গেছ, এই কারণে তোমার চেক-আপ করানো উচিত। এই বয়সে ইনসোমনিয়া ভালো স্বাভাবিক ঘুমের রুটিন নষ্ট হয়ে গেছে।’

ফুরকান এখন ডাক্তারদের মতো বলছিল। সালার হাসিমুখে শুনতে থাকে। ফুরকানকে বলতে পারে না, এভাবে দিন-রাত কাজ না করলে সে অপরাধবোধ নিয়ে বাঁচতে পারবে না, যা

প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায় ওকে। এটাও না যে, স্লিপিং
পিল ছাড়া ঘুমানোর চেষ্টা করলে ইমামার কথা মনে পড়ে
যায় ওর। সেইসাথে এত পরিমাণ মাথাব্যথা যে, মাথা ফেটে
যাওয়ার উপক্রম হয়।

'দিনে কয় ঘন্টা কাজ করো?' ফুরকান খোঁজ নিচ্ছিল।

'আঠারো ঘন্টা, কখনো বিশ।'

'মাই গুডনেস! কবে থেকে?'

'দুই-তিন বছর থেকে।'

'তখন থেকেই ঘুমে সমস্যা, তাই না? আমার আন্দাজ ঠিক
ছিল। তুমি রুটিন নষ্ট করে ফেলেছ।' ফুরকান বলছিল।
'নাহলে এত ঘন্টা কাজ করা মানুষকে তো মানসিক ক্লান্তিই
একটা দীর্ঘ আর শান্তির ঘুম এনে দেওয়ার কথা।'

'আমার সাথে হয় না এমনটা।' সালার নিস্তেজ সুরে বলল।

'জানার চেষ্টা করো তোমার সাথে কেন হয় না।'

সালার বলতে পারল না যে, ও কারণ জানে।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর ফুরকান বলল। 'আমি যদি কিছু আয়াত বলে দেই ঘুমের আগে পড়ার জন্য, তুমি পড়বে?'

'কেন পড়ব না?'' সালার ঘাড় ঘুরিয়ে বলল।

'না, ব্যাপারটা এমন যে, তোমার-আমার মতো মানুষ; যারা অনেক পড়াশোনা করে। বিশেষ করে যারা পশ্চিমা শিক্ষা নেয়, তারা এসব বিষয় বিশ্বাস করে না অথবা এগুলোকে প্র্যাকটিক্যাল মনে করে না।' ফুরকান কারণ দেখায়।

'ফুরকান! আমি হাফেজে কুরআন।' সালার হেলান দেওয়া অবস্থায় শান্ত গলায় বলল।

ফুরকানের যেন কারেন্ট লাগল।

'প্রতিরাতে ঘুমানোর আগে এক পাঁরা পড়ে ঘুমাই। আমার সাথে বিশ্বাস বা আছার কোনো সমস্যা নেই।' সালার বলতে থাকে।

‘আমিও একজন কুরআনের হাফেজ।’ ফুরকান বলল।

সালার হাসে। এটা সত্যিই আনন্দদায়ক কাকতালীয় বিষয় ছিল। ফুরকানের দাড়ি থাকলেও সালার অনুমান করতে পারেনি সে হাফেজ হতে পারে।

‘তাহলে তো এ ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা না তোমার। কুরআন তিলাওয়াত করে শোয়া মানুষের ঘুম আসে না, এটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।’

ফুরকানকে বিড়বিড় করতে শোনে সালারা। ওর ইন্দ্রিয় ঝিমিয়ে আসছে, ঘুম গ্রাস করে নিচ্ছে। ও চোখ বন্ধ করে নেয়।

‘তোমার কোনো দুশ্চিন্তা আছে?’ ফুরকান জিজ্ঞেস করল।

ঘুমের ওষুধের প্রভাবে না থাকলে হেসে এড়িয়ে যেত। কিন্তু যে অবস্থায় ছিল, তাতে অস্বীকার করতে পারেনি। ‘হ্যাঁ, আমার অনেক দুশ্চিন্তা। আমার স্বস্তি নেই। মনে হয় ক্রমাগত মরুভূমিতে হাঁটছি। আমার অনুশোচনা, অপরাধবোধ আমাকে ছাড়ে না। আমি একজন পীর-এ-কামিলকে খুঁজছি। যে আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবে, যে আমাকে আমার জীবনের পথ দেখাবে।’

ফুরকান স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। সালারের চোখ বন্ধ, কিন্তু চোখের আর্দ্রতা দেখা যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর ল্লান, থমথমে। স্লিপিং পিলের প্রভাবে অচেতন অবস্থায় বলে চুপ হয়ে যায়। ফুরকান

নীরবে শুনল। খুব মসৃণভাবে দোল করা ওর শ্বাস-প্রশ্বাস ইঙ্গিত দিচ্ছিল ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম থেকে ওঠার পরও দুজন একে-অন্যের সাথে আবার কথা বলে। ফ্লাইটের সেই বৈঠক শেষ হয়নি। ফুরকান সালারকে সেসব কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি, যা ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করেছিল। সালারও জানে না ঘুমের মধ্যে কিছু বলেছিল কিনা বা বললেও কী ছিল। যাত্রা শেষ হওয়ার আগে নাম্বার এবং এড্রেস বিনিময় হয়। সালার আনিতার বিয়েতে ইনভাইট করে। ফুরকান আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও সালার বিশ্বাস করেনি। দু'জনের সাক্ষাৎ করাটি পর্যন্ত। এরপর সালার ইসলামাবাদের ফ্লাইট নেবে আর ফুরকান লাহোরের। এয়ারপোর্টে ফুরকান ওর সাথে খুব উষ্ণ আলবিদায়ি মুসাফা করে।

আনিতার বিয়ে তিনদিন পর। সালারের কাছে এই তিনদিনের জন্য অনেক কাজ। কিছু বিয়ের ব্যস্ততা আর কিছু নিজস্ব। পরদিন সন্ধ্যায় ফুরকানের কল পেয়ে চমকায়। দশ-পনেরো

মিনিট কথা হলো। ফোন রেখে দেওয়ার আগে সালার আরেকবার ফুরকানকে আনিতার বিয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'তোমার মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই, আমার ভালোভাবে মনে আছে। তাছাড়া এই উইকেন্ডে আমি ইসলামাবাদেই থাকব।' ফুরকান জবাবে বলল। 'ওখানে গ্রামের স্কুল দেখতে যেতে হবে। বিন্ডিংয়ে কিছু সংযোগ কাজ চলছে, তাই। এবার ইসলামাবাদে আমার থাকাটা একটু লম্বাই হবে।'

সালার আগ্রহ নিয়ে ফুরকানের কথা শুনল। 'গ্রাম... স্কুল... মানে কী?'

'গ্রামে আমি একটা স্কুল চালাচ্ছি।' ফুরকান ইসলামাবাদের শহরতলির এক গ্রামের নাম বলে। 'কয়েক বছর ধরে।'

'কীসের জন্য?'

ফুরকানকে ওর প্রশ্ন বিস্মিত করে। 'মানুষের সাহায্যের জন্য, আর কীসের জন্য?'

'চারিটি ওয়ার্ক?'

'না, চারিটি ওয়ার্ক না। এটা আমার দায়িত্ব, কারো প্রতি অনুগ্রহ না।' ফুরকান কথা বলতে বলতে বিষয় পাল্টে ফেলে। স্কুলের ব্যাপারে আর কোনো কথা হলো না সেদিন। ফোন রেখে দেওয়া হয় দুইপাশ থেকেই।

ফুরকান সত্যিই আনিতার বিয়েতে আসে। বেশ অনেকক্ষণ থাকে। কিন্তু সালার টের পায় ফুরকান কিছুটা বিস্মিত।

'তোমার পরিবার বেশ পশ্চিমা।'

সালার মুহূর্তেই ফুরকানের বিভ্রান্তি ও বিস্ময়ের কারণ বুঝে যায়।

'আমার মনে হয়েছিল তোমার পরিবার কিছুটা কনজারভেটিভ হবে। কারণ বলেছিলে তুমি হাফেজে কুরআন। আর তোমার লাইফস্টাইলও আমার কাছে সাদাসিধা মনে হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে আমি অবাক। তুমি এবং তোমার পরিবারের মাঝে অনেক ব্যবধান। I think you're the odd one out,' ফুরকান নিজের শেষ বাক্যে নিজেই হাসল।

দু'জনই ফুরকানের গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে।

'আমি শুধু দুই বছর আগে কুরআন হেফজ করেছি। এই গত দুই-তিন বছরেই odd one out হয়েছি। এর আগে আমি আমার পরিবারের চেয়েও বেশি পশ্চিমা ছিলাম।' সালার বলল।

‘দুই বছর আগে কুরআন হেফজ করেছ... আমেরিকায় পড়াশোনার সময়? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' ফুরকান অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। কতটুকু সময় লেগেছে?'

'প্রায় আট মাসের মতো।'

ফুরকান কিছু না বলে শুধু সালারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। 'তোমার ওপর আল্লাহর বিশেষ রহমত আছে। নাহলে যা বলছ তা সহজ কাজ না। আমি ফ্লাইটেও তোমার আচরণে বেশ মুগ্ধ হয়েছি। কারণ এই বয়সে তুমি ইউনেস্কোর যে সিটে কাজ করছ, তা সবাই পারে না।' ফুরকান বেশ উষ্ণভাবে সালারের সাথে হাত মেলায়।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সালারের চেহারার রং বদলায়। 'আল্লাহর বিশেষ রহমত!' যদি বলে দেই আমি সারা জীবন কী করেছি, তাহলে সে...! হাত মেলানোর সময় ভাবে। 'তুমি পরশু কোনো স্কুলের কথা বলছিলে।' ইচ্ছে করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। 'তুমি ইসলামাবাদে থাকো না?'

'না, ওখানে আমার গ্রামের বাড়ি। পৈতৃক গ্রাম। কিছু জমি আর একটা বাড়ি আছে।' ফুরকান ওকে বিস্তারিত বলতে শুরু করে। 'অনেক বছর আগে আমার বাবা-মা ইসলামাবাদে

শিফট হয়ে যায়। বাবা ফেডারেল সার্ভিস থেকে অবসর নেওয়ার পর ওখানের জমিতে একটা স্কুল নির্মাণ করেন। গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না তখন। বাবা প্রাইমারি স্কুল শুরু করে। এখন সাত-আট বছর ধরে আমি ওটা দেখছি। স্কুল সেকেন্ডারি হয়েছে। চার বছর আগে ওখানে একটা ডিসপেনসারি বানিয়েছি। তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। সর্বাধুনিক সব যন্ত্রপাতি আছে। আমার এক বন্ধু একটা অ্যান্ডুলেন্সও গিফট করেছে। এখন শুধু আমার গ্রাম না বরং আশপাশের গ্রামের মানুষও সেই স্কুল এবং ডিসপেনসারি থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে।

ফুরকানের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে সালার। 'কিন্তু তুমি এসব কেন করছ? তুমি একজন সার্জন। এত সব কীভাবে করো? এর জন্য তো অনেক টাকাও প্রয়োজন হয়।'

'কেন করছি এই প্রশ্ন কখনো নিজেকেও জিজ্ঞেস করিনি। গ্রামে এত দারিদ্রতা ছিল যে, এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন তৈরি হয়নি। ছোটবেলায় মাঝেমধ্যে গ্রামে যেতাম ছুটি কাটানোর

জন্য। আমাদের হাভেলি ছাড়া গ্রামের কোনো ঘর পাকা ছিল না এবং রাস্তার তো প্রশ্নই ওঠে না। মনে হতো আমরা জঙ্গলে এসে পড়েছি। যদি পশু হতাম তাহলে অসুবিধা হতো না। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। এটা ভেবে খুশি হতাম যে, অন্যরা আমাদের চেয়ে নীচু পর্যায়ের জীবনযাপন করছে। তারা আমাদের মতো খেতে, থাকতে বা পরতে পারে না। কিন্তু মানুষ হয়ে এসব সহ্য করা কঠিন যে, আমাদের আশপাশের মানুষ পশুর মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। হতে পারে কিছু মানুষ এতে খুশি হয় তারা সব নেয়ামত পেয়েছে এবং অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আমরা সেসব মানুষদের মধ্যে পড়ি না। এখন প্রশ্ন ছিল কী করা যায়? আমার কাছে কোনো জাদুর কাঠি ছিল না, যেটা নেড়ে সব বদলে ফেলব, না ছিল অগণিত সম্পদ। বললাম না আমার বাবা সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন, একজন সৎ অফিসার। আমি আর আমার ভাই শুরু থেকেই স্কলারশিপে লেখাপড়া করেছি। বাবা-মায়ের আমাদের পেছনে এজন্য বেশি খরচ করতে হয়নি। তারাও অহেতুক খরচ করতেন না। তাই কিছু জমতে থাকে। অবসরের পর আমার বাবা ভাবলেন লাহোরে বা

ইসলামাবাদের কোনো বাড়িতে বসে খবরের কাগজ পড়ে, হাঁটাচলা করে বা টিভি দেখে জীবন কাটানোর পরিবর্তে নিজের গ্রামে যাওয়া উচিত এবং সেখানের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা উচিত।’

দু'জন গাড়ির ভেতরে বসে ছিল।

‘অসুবিধার পরিমাণ কল্পনাও করতে পারবে না তুমি। গ্রামে বিদ্যুৎ, পরিষ্কার পানি কিছু ছিল না। বাবা দৌড়াদৌড়ি করে এসবের অনুমোদন আনেন। যখন সেখানে প্রাইমারি স্কুল নির্মাণ করা হয়, একটা রাস্তাও হয়ে যায়। বিদ্যুৎ, পানির সুবিধাও আসে। তখন হঠাৎ করে সরকার ওখানে একটা স্কুল নির্মাণের কথা ভাবে। আমার বাবা-মা খুশি ছিলেন সরকার তাদের স্কুল নজরদারিতে রাখবে। সেখানে সরকারি শিক্ষক পাঠাবে এবং স্কুল আপগ্রেড হবে। কিন্তু শিক্ষা-অধিদপ্তরের সাথে কয়েক বৈঠকের পর বাবা বুঝলেন, সরকারের হাতে স্কুল গেলে সমস্ত পরিশ্রম বিফলে যাবে। বাবা স্কুলের বাচ্চাদের সবকিছু দেন। বই, কপি, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এসব ব্যয়ের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আন্দাজ করতে পারবে না যে স্কুল সরকারের কাছে চলে যাওয়ার পর সেটার অবস্থা কী হতো। শিক্ষা-অধিদপ্তর তবুও সেখানে স্কুল খুলেছিল। কিন্তু সেই স্কুলে একটা বাচ্চাও যায়নি। শেষ পর্যন্ত হার মেনে তারা স্কুল বন্ধ করে করেছেন। এভাবে উন্নতির অগ্রগতি হতে থাকে। তখন আমি লন্ডনে পড়তাম এবং টাকা জমিয়ে পাঠাতাম। আমাদের স্কুল আপগ্রেড করে। বাবার কিছু বন্ধু এই বিষয়ে সাহায্য করেছেন। এখনো আমরা অগ্রগতি করছি। আশপাশের গ্রামের মানুষজনও তাদের বাচ্চাদের আমাদের কাছে পাঠায়। পাকিস্তান ফিরে সেখানে একটা ডিসপেনসারি তৈরি করি আমি। গ্রামের জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু দারিদ্র্য এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। তবে লেখাপড়ার সুবাদে গ্রামের কিছু বাচ্চা এখন উচ্চশিক্ষার জন্য শহরের বাইরে যেতে পারছে, কিছু হতে শিখছে। দারিদ্র্যের চক্র কমছে। ওদের এই প্রজন্ম না হলেও আগামী প্রজন্ম হয়তো তোমার-আমার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে বের হবে, কে বলতে পারে।' ফুরকান মুচকি হেসে

বলল। 'আমি প্রতিমাসে এক উইকেন্ড গ্রামে যাই। ওখানে দু'জন কম্পাউন্ডার আছে, কিন্তু ডাক্তার নেই। এক উইকেন্ডে আমি যাই, বাকি তিন উইকেন্ডে অন্য কাউকে পাঠাই এবং প্রতি তিন মাস পরপর মেডিকেল ক্যাম্প করি।'

'আর এসবের জন্য টাকা কোথেকে আসে?'

'শুরুতে বাবার টাকা ছিল। তার জমিতে স্কুল তৈরি হয়েছে, তার নজরদারিতে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মায়ের কাছে থাকা টাকা দিয়ে বাবাকে সহায়্য করেন। তারপর বাবার কিছু বন্ধু আর্থিক সাহায্য করতে শুরু করলেন। এরপর আমি ও মেহরান তাতে যোগ দেই এবং আমার কিছু বন্ধু। প্রতিমাসে আমার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ গ্রামে পাঠিয়ে দেই। তা দিয়ে ডিসপেনসারি ভালোভাবে চলে যায়। মাসের তিন উইকেন্ডে যে ডাক্তাররা সেখানে যায়, তারা কোনো চার্জ নেয় না। তাদের জন্য এটা সোশ্যাল ওয়ার্ক। মেডিকেল ক্যাম্পও এভাবেই চলে। স্কুলের কাছেও এই পরিমাণ ফিক্সড ডিপোজিট আছে, যা থেকে আসা অর্থ শিক্ষকদের বেতন

এবং অন্যান্য খরচের জন্য যথেষ্ট। কয়েক বছরের মধ্যে আমরা ওখানে টেকনিক্যাল এডুকেশন নিয়েও কাজ করতে চাচ্ছি।’

‘কবে যাচ্ছ ওখানে?’

‘সকালে যাচ্ছি।’

‘আমি যদি তোমার সাথে যেতে চাই?’

‘মোস্ট ওয়েলকাম। কিন্তু কাল ওয়ালিমা, তুমি ব্যস্ত থাকবে।’
ফুরকান ওকে মনে করায়।

‘ওয়ালিমা রাতে হবে, সারা দিন ফ্রি থাকবে। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসা কি কঠিন?’ সালার জিজ্ঞেস করে।

‘না, একদমই না। তুমি খুব সহজে ফিরতে পারবে। তবে ভোরে তাড়াতাড়ি রওনা দিতে হবে। যদি তুমি সত্যিই

সেখানে কয়েক ঘন্টা কাটাতে চাও। অন্যথায় দিন শেষে ফিরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

'আমি ক্লান্ত হব না। ইউনিসেফ টিমের সাথে আমি কোন কোন এলাকায় ঘুরেছি, তোমার আন্দাজ নেই। ফজরের পর তৈরি থাকব, তুমি আমাকে টাইম বলো।'

'সাড়ে পাঁচটা।'

'ওকে। বাসা থেকে বেরিয়ে আমাকে একটা কল দিও। এখানে এসে কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে। আমি বেরিয়ে আসব।' সালার ফুরকানকে বলে। এরপর আল্লাহ হাফেজ বলে ভেতরে চলে যায়।

পরদিন সকাল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ফুরকান ওদের গেটের সামনে এসে হর্ন বাজায়। সালার প্রথম হর্নেই বেরিয়ে আসে।

'পাকিস্তান কেন ফিরে এলে? ইংল্যান্ডে অনেকদূর যেতে পারতে।' ফুরকানকে জিজ্ঞেস করে সালার।

গাড়ি শহরের বাইরের রাস্তায় দৌড়াচ্ছে। ওদের যাত্রার আধঘন্টা কেটে গেছে।

'ইংল্যান্ডের আমাকে প্রয়োজন নেই কিন্তু পাকিস্তানের আছে, তাই ফিরেছি।' ফুরকান সাবলীল ভঙ্গিতে বলল।
'ওখানে একজন ডা. ফুরকান না থাকলে কিছু হবে না। কিন্তু এখানে একজন ডা. ফুরকান না থাকলে অনেক কিছু হবে। এখানে আমার সেবা প্রয়োজন।' শেষ বাক্যে জোর দেয়।

'কিন্তু ওখানে এত বছরে তুমি অনেক এগিয়ে যেতে পারতে। প্রফেশনালভাবেও অনেক কিছু শিখতে। ফিন্যান্সিয়ালভাবেও এই প্রজেক্টের জন্য আরও টাকা জোগাড় করতে পারতে, যা শুরু করেছ। আফটার অল পাকিস্তানে তুমি এত সফল হতে পারবে না।' সালার বলল।

‘সফলতা বলতে তোমার ইঙ্গিত যদি পাউন্ড আর সুযোগ-সুবিধা হয় তাহলে হ্যাঁ, দুই জায়গার কোনো তুলনা চলে না। কিন্তু তোমার ইঙ্গিত যদি চিকিৎসার দিকে হয়, তবে এখানে আমি বেশি মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছি। একজন ডাক্তার রোগীর সুস্থতা দেখে যে তৃপ্তি পায়, তুমি তা আন্দাজ করতে পারবে না। ইংল্যান্ডে প্রচুর অনকোলজিস্ট আছে। কিন্তু পাকিস্তানে এই সংখ্যা হাতে গোনার মতো। আমি ওখান থেকে এক গাদা টাকা এখানে পাঠালেও তেমন কোনো উপকার হতো না। যেখানে একজন মানুষের অভাব, সেখানে সেই মানুষটা দিয়েই শূন্যতা পূরণ করতে হয়। টাকা বা অন্যকিছু তার জায়গা নিতে পারে না। আমি খুব তৃপ্ত সালার! আমার পরিবারও খুব তৃপ্ত। যদি আমি কিছু শিখি, তা সবার আগে নিজের লোকদের কাজে লাগানো উচিত। আমি নিজের লোকদের মরতে রেখে অন্যদের জীবন বাঁচাতে যেতে পারি না। পাকিস্তানে কিছু ঠিক নেই। সব খারাপ, কিছু ঠিক না। সুবিধাবঞ্চিত হসপিটাল, দুর্নীতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা। যেকোনো কমতি বা খারাপ দিক খুঁজতে গেলে এখানে পাবো। তারপরও আমি এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না। যদি আমার হাতে

নিরাময় থাকে, তাহলে সবার আগে এই নিরাময় আমার নিজের লোকদের কাজে আসা উচিত।"

সালার অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। গাড়িতে নীরবতা নেমে আসে।

'তুমি আমাকে তো এটা জিজ্ঞেস করে ফেললে, আমি পাকিস্তান কেন ফিরে এসেছি। এখন আমি কি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, তুমি কেন পাকিস্তান ফিরছ না?' ফুরকান হেসে নীরবতা ভেঙে বলল।

'আমি এখানে থাকতে পারব না।' সালার অসহায়ভাবে বলে।

'তুমি কি এটা অর্থ আর সুযোগ-সুবিধার কারণে বলছ?'

'না, টাকা বা সুযোগ-সুবিধা আমার সমস্যা না। কখনো ছিলও না। তুমি আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড জেনেছ।'

'তাহলে?'

'তাহলে... কিছুই না। ব্যস, আমি এখানে আসতে পারব না।'
সালার চূড়ান্ত সুরে বলে।

'তোমাকে এখানে প্রয়োজন।'

'কার?'

'এই দেশের।'

সালার হেসে ওঠে। 'আমি তোমার মতো দেশপ্রেমিক নই।
আমাকে ছাড়াও এখানে সব ঠিকঠাক চলছে। একজন
ডাক্তার হওয়া অন্য কথা, কিন্তু একজন ইকোনমিষ্ট কাউকে
জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে না।'

'তুমি যে সার্ভিস ওখানে দিচ্ছ, সেগুলো এখানের প্রতিষ্ঠানে দিতে পারো। যা নিজের লেকচারে ওখানের ইউনিভার্সিটিতে শেখাও, এখানের ইউনিভার্সিটিতে তা শেখাতে পারো।'

সালারের মন চাইছিল ফুরকানকে বলতে, এখানে এসে কিছু শেখানোর মতো অবস্থায় থাকে না ও। কিন্তু চুপ করে ফুরকানের কথা শুনতে থাকে।

'তুমি আফ্রিকার দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ দেখেছ। কিন্তু নিজের দেশের দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ দেখলে হতবাক হয়ে যাবে।'

'এখানকার অবস্থা সেইসব দেশের মতোও খারাপ না ফুরকান। এই জায়গা এত পিছিয়ে নেই।'

'ইসলামাবাদের যেই সেক্টরে তুমি বড় হয়েছ, সেখানে বসবাস করে আশেপাশের জীবন সম্পর্কে অনুমান করা বেশ কঠিন। কাছাকাছি কোনো গ্রামে গেলে বুঝতে পারতে দেশ কতখানি এগিয়েছে।'

'ফুরকান! তোমার প্রজেক্টে আমি কিছু কন্ট্রিবিউশন করতে চাই।' সালার প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল।

'সালার! আমার প্রজেক্টে আপাতত কোনো সাহায্য দরকার নেই। যদি কিছু করতে চাও, তাহলে নিজে কোনো গ্রামে এ ধরনের কাজ শুরু করো। তোমার কাছে ফান্ডের কমতি হবে না।'

'আমার কাছে সময় নেই। আমেরিকায় বসে আমি এসব চালাতে পারব না। তুমি যদি চাও অন্য কোনো গ্রামে স্কুল তৈরি করতে, আমি সাপোর্ট করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সময় দেওয়া কঠিন।'

ফুরকান চুপ হয়ে যায়। সম্ভবত বোঝে সালার তার পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হচ্ছে। আলোচনার প্রসঙ্গ আবার ফুরকানের গ্রামের দিকে মোড় নেয়।

দিনটা সালারের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিনের একটা ছিল। স্কুল দেখে সত্যিই অনেক মুগ্ধ হয় ও। বেশি হয় ডিসপেনসারি দেখে। যেটা দেখাতে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়। ওটাকে একটা ছোটখাটো হসপিটাল বললে বেশি ভালো হতো। সার্বক্ষণিক ডাক্তার না থাকা সত্ত্বেও খুব সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। সেদিন ফুরকানের আগমন জানা কথা, তাই রোগীদের একটি বিশাল ভিড় অপেক্ষায় ছিল। ফুরকান এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হসপিটালের চারপাশ রোগীতে পূর্ণ। সেখানে সব বয়সী, সব ধরনের রোগী ছিল। নবজাতক শিশু, মহিলা, বয়স্ক, তরুণ।

সালার চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। উপস্থিত কয়েকজন ওকেও ডাক্তার মনে করে কাছে চলে আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলে ও। এই প্রথমবার আন্সারের স্পেশালিস্টকে একজন ফিজিশিয়ানের মতো চেক-আপ করতে ও প্রেসক্রিপশন লিখতে দেখছে। ওকে স্বীকার করতে হয়, ফুরকানের মতো ভালো ডাক্তার খুব কমই দেখেছে। সে খুব প্রফেশনাল এবং নরম মেজাজের ছিল।

পুরো কাজের মাঝে এক মুহূর্তের জন্যও মুখ থেকে হাসি সরেনি। ওর মনে হলো ফুরকান হয়তো ঠোঁটের সাথে হাসিটাকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পর ফুরকান একজন লোক দিয়ে ওকে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে ফুরকানের বাবা-মায়ের সাথে দেখা হয়। তারা ওর আসার কথা জানতেন। ফুরকান হয়তো তাদেরকে ফোন করে বলে রেখেছিল। তাদের সঙ্গে স্কুল ঘুরে দেখতে থাকে। স্কুলের বিন্ডিং ওর প্রত্যাশার চেয়ে বড় এবং মজবুতভাবে নির্মাণ করা। ওখানে থাকা বাচ্চাদের সংখ্যাও অবাক করে ওকে। কয়েক ঘন্টা স্কুলে কাটিয়ে ফুরকানের বাবা-মায়ের সাথে তাদের বাড়িতে চলে যাসে। হাভেলির সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই মন আরও ভালো হয়ে যায়। গ্রামের বাড়িতে এত সুন্দর লন দেখতে পাবে, কল্পনায়ও ছিল না ওর। ওখানে প্রচুর গাছপালা, কিন্তু একটাও এলোমেলো না।

‘দুর্দান্ত লন, খুব আর্টিস্টিক!’ সালার প্রশংসা না করে থাকতে পারেনি।

‘এটা শাকিল সাহেবের শখ।’ ফুরকানের মা বললেন।

‘আমার আর নওশিনের।’ ফরকানের বাবা যোগ করলেন।

‘নওশিন?’ সালার প্রশ্নের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে।

‘ফুরকানের স্ত্রী। এই আর্টিস্টিক টাচ ওরই।’ তিনি হেসে বলেন।

‘ফুরকান বলেছিল ওর ফ্যামিলি লাহোর থাকে।’ সালারের মনে আছে।

‘হ্যাঁ, ওরা লাহোরই থাকে। কিন্তু ফুরকান এক উইকেন্ড এখানে কাটায়, সাথে পরিবারও আসে। এই স্লাইড ওর বাচ্চাদের জন্য লাগানো। নওশিনও ডাক্তার। বাচ্চা ছোট, তাই প্র্যাকটিস করতে পারছে না। কিন্তু এখানে এলে

ফুরকানের সঙ্গে ডিসপেনসারিতে যায়। এবার ভাইয়ের বিয়েতে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেনি।

সালার চারপাশ দেখছিল, তার কথা শুনছিল। তাদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে ডাইনিং টেবিলে আসে। ভেবেছিল কিছুক্ষণে ফুরকানও এসে পড়বে। কিন্তু খাবার সার্ভ হয়ে যাওয়ার পরও ফুরকানের আসার কোনো চিহ্ন না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে।

‘ফুরকান দুপুরের খাবার এখানে খায় না। শুধু একটা স্যান্ডউইচ আর চা হলেই হয়ে যায়। তাতেও পাঁচ মিনিটের চেয়ে বেশি সময় নেয় না। রোগী এত হয় যে, সন্ধ্যার আগে কোনো অবসর নেই। খাবার-দাবার একদম ভুলে যায়।’ ফুরকানের মা সালারকে বললেন।

তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাচ্ছিল ও। ফুরকানের বাবা ফাইন্যান্স ডিভিশনে চাকরি করতেন। ২০তম গ্রেডে এসে অবসর নেন। সালারের সম্পর্কও ফাইন্যান্সের সঙ্গে জানার

পর তার জোশ বেড়ে যায়। তার সাথে কথা বলতে গিয়ে সময়ের হিসেব থাকে না ওর। স্কুলের ব্যাপারেও কথা হয়।

'এই মুহূর্তে স্কুলের জন্য আমাদের কিছু লাগবে না, যথেষ্ট ফান্ড আছে। ফুরকানের এক বন্ধু নতুন একটা ব্লক তৈরি করছে, বলা যায় হয়ে গেছে। তোমার চোখে পড়ার কথা। কিছু করতে চাইলে ডিসপেনসারির জন্য করতে পারো। আমাদের একজন স্থায়ী ডাক্তার প্রয়োজন। এর জন্য বহুবার স্বাস্থ্য-মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছি। ফুরকান নিজের সংযোগ ব্যবহার করেছে। তবুও কোনো ডাক্তার এখানে স্থায়ীভাবে আসতে রাজি না, কিন্তু একজন ডাক্তার খুব প্রয়োজন। রোগীর সংখ্যা দেখেছ তো। কাছের এক গ্রামে একটি ডিসপেনসারি আর একজন ডাক্তার আছে। কিন্তু সে স্থায়ী ছুটিতে। পরবর্তী ডাক্তারও আসার আগেই ছুটিতে চলে যায়।'

'আমি এ বিষয়ে যতটুকু পারি করব। কিন্তু স্কুলের জন্যও কিছু করতে চাই। ফিরে যাওয়ার পর চেষ্টা করব এনজিওর মাধ্যমে

ইউনেস্কো থেকে যাতে আপনাদের কাছে কিছু বার্ষিক অনুদান আসে।"

'কিন্তু আমাদের এর দরকার নেই। তুমি যা দেখছ সব আমরা নিজেরা করেছি। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক বন্ধু, পরিচিত এবং সন্তানদের বন্ধুরা মিলে। আমাদের কখনো কোনো সরকারি বা আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান প্রয়োজন হয়নি। কতদিন ইউনেস্কো এসে আমাদের জনগণের ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও রোগের অবসান ঘটাবে? যে কাজ আমরা নিজেদের উদ্যোগে করতে পারি, সেটা নিজেদের উদ্যোগেই করা উচিত।'

'আমি শুধু চেয়েছিলাম এই প্রজেক্ট আরও প্রসারিত হোক।' সালার কিছুটা নড়েচড়ে বলে।

'এটা অনেক বেড়ে যাবে। বিশ বছর পর এখানে এসে এই গ্রামকে অন্য ভাবে পাবে। যেই দারিদ্র্য আজকে দেখছ, তখন তা থাকবে না। এদের ভবিষ্যৎ বিমানের চেয়ে ভিন্ন

হবে।" ফুরকানের বাবা খুব শান্ত সুরে বললেন। সালার চুপচাপ তাকে দেখতে থাকে।

বিকেলের দিকে ফুরকান ওকে ডিসপেনসারি থেকে ফোন করে। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বলে। 'এখন তোমার ইসলামাবাদের জন্য বের হওয়া উচিত। ভেবেছিলাম নিজেই দিয়ে আসব। কিন্তু এখনো অনেক ভিড়। যারা অন্য গ্রাম থেকে এসেছে তাদেরকে আজ না দেখলে, তাদের জন্য ঝামেলা হয়ে যাবে। এজন্য আমি ডিসপেনসারকে পাঠাচ্ছি। সে তোমাকে ইসলামাবাদ দিয়ে আসবে।'

'ওকে।' সালার বলে।

'যাওয়ার আগে ডিসপেনসারিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।' ফুরকান ফোন রাখার সময় বলল।

সালার আরেকবার ফুরকানের বাবা-মায়ের সাথে চা খায়। গাড়ি ততক্ষণে এসে পড়েছে। ওখান থেকে গাড়িতে

ফুরকানের কাছে আসে। সকালের ভিড় এখন কমে গেছে। পাঁচিশ-তিরিশ জনের মতো মানুষ আছে। ফুরকান একজন লোকের চেক-আপ করছিল। সালারকে দেখে হাসে। 'আমি দুই মিনিটে বিদয় দিয়ে আসছি।' রোগীকে বলে উঠে দাঁড়ায়। সালারে সাথে হাঁটতে হাঁটতে গাড়ি পর্যন্ত আসে। 'পাকিস্তান ক'দিন আছো?' জিজ্ঞেস করে।

'দেড় সপ্তাহ।'

'তাহলে আর দেখা হচ্ছে না তোমার সাথে। কারণ আগামী মাস ছাড়া ইসলামাবাদ বা এখানে আসা হবে না আমার। কিন্তু আমি ফোন করব। তোমার ফ্লাইট কবে?'

সালার ফুরকানের প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। 'দেখা কেন হবে না? আমি লাহোর যেতে পারি যদি তুমি ইনভাইট করো।'

ফুরকান খানিকটা অবাক হয়ে হাসল। সালার হাত মিলিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। জানে না কী হুট করে ওকে ফুরকানের

এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এটাও অজানা ফুরকানকে কেন এত ভালো লাগছে। এর পেছনের কারণ জানতে ব্যর্থ।

ফুরকানের সাথে গ্রাম দেখার চারদিন পর লাহোর আসে সালার। একদিনের জন্য। ফুরকানকে ফোনে জানিয়ে রাখে। ফুরকান ওকে এয়ারপোর্ট থেকে পিক করা এবং বাসায় ওঠার কথা বললে না করে দেয়। পরিকল্পনামাফিক চারটার কাছাকাছি ফুরকানের বাসায় পৌঁছায়। ভালো এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফুরকানের ফ্ল্যাট। কলিংবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করে ও। ভেতর থেকে বাচ্চা ছুটে আসার শব্দ আসে। একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্চা দরজা খুলে ডোর চেইনের ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকায়।

'আপনি কার সাথে দেখা করতে চান?'

সালার বাচ্চাটাকে দেখে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসে। কিন্তু বাচ্চাটার মুখে হাসি এলো না। বরং খুব গম্ভীরভাবে ওকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমার বাবার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

বাচ্চা আর ফুরকানের চেহারা এত মিল যে, ওর জন্য অনুমান করা কঠিন ছিল না এটা ফুরকানের মেয়ে।

'বাবা এই সময় কারো সাথে দেখা করে না।' খুব শক্তভাবে জানানো হয়। 'আমার সাথে দেখা করবে।' সালারও কিছুটা দৃঢ় গলায় বলে।

'আপনার সাথে কেন দেখা করবেন?' দ্রুত প্রশ্ন এল।

'কারণ আমি তার বন্ধু। গিয়ে বলো সালার আফ্কেল এসেছে।' নরমভাবে বলে ও।

মেয়েটা ওর হাসিতে প্রভাবিত হয় না। 'কিন্তু আপনি তো আমার আফ্কেল নন।'

সালার এবার হাসি সামলে রাখতে পারল না।

‘হাসবেন না।’ বাচ্চাটা মুখ ভার করে।

সালার হাঁটুতে ভর করে ওর সামনে বসে। ‘আচ্ছা, হাসব না।’ হাসি ঢুকিয়ে নেয়। ‘তোমাকে এই ফ্রকে অনেক সুন্দর লাগছে।’

ওর প্রশংসাতেও দরজার ফাঁকে উঁকি দেওয়া মূর্তিমান অভিব্যক্তি আর বদল এলো না। ‘কিন্তু আমার আপনাকে ভালো লাগেনি।’

বাচ্চাটার কথার চেয়ে বলার অঙ্গভঙ্গি সালার বেশি উপভোগ করছিল। ভেতর থেকে কারো পায়ের শব্দ আসছে। কেউ দরজার দিকে আসছে।

‘কেন? আমাকে কেন ভালো লাগেনি?’ সালার জিজ্ঞেস করে।

‘ব্যস, ভালো লাগেনি।’ মাথা নেড়ে বলল বাচ্চাটা।



‘নাম কী তোমার?’

বাচ্চাটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল। ‘ইমামা।’

সালারের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজার ফাঁকে ইমামার পেছনে ফুরকান এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েকে কোলে তুলে দরজা খুলে দেয়। সালার উঠে দাঁড়াল। ফুরকান সবেমাত্র গোসল করে বেরিয়েছে হয়তো, চুল ভেজা আর এলোমেলো। সালার হাসতে চেষ্ঠা করলেও তাৎক্ষণিকভাবে ব্যর্থ হয়। ফুরকান ওর সাথে হাত মেলায়।

‘আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।’ ভেতরে ঢোকান সময় ফুরকান বলল।

ওরা ড্রয়িংরুমে আসে। ইমামা বাবার কোলে বসে ক্রমাগত কানে কিছু একটা ফিসফিস করে বলার চেষ্ঠা করছিল, যা বারবার ফুরকান উপেক্ষা করছে।

'সালার আঙ্কেলের সাথে পরিচয় হয়েছে তোমার?' ফুরকান সালারকে বসতে ইশারা করে মেয়েকে বলল। নিজেও সোফায় বসল।

'ওনাকে আমার ভালো লাগেনি।' ইমামা বাবার কাছে নিজের অপছন্দের কথা জানিয়ে দেয়।

'খুব পচা কথা এটা ইমামা! এভাবে বলে না।' ফুরকান শাসনের ভঙ্গিতে বলল। 'আঙ্কেলের কাছে গিয়ে হাত মেলাও।' ইমামাকে কোল থেকে নামিয়ে সালারের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে ইমামা দৌড়ে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে যায়।

'আশ্চর্যের কথা ওর তোমাকে ভালো লাগেনি। আমার সব বন্ধুদের ওর ভালো লাগে। আজ মুডও কিছুটা অফ এরা।' ফুরকান হেসে বুঝিয়ে বলল।

এটা নামের প্রভাব। আমি আশ্চর্য হতাম যদি ওর আমাকে ভালো লাগত সালার মনে মনে ভাবে। চা খাওয়ার সময় কথা বলছিল ওরা। কথার ফাকে ফুরকানকে বলল সালার।

'এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের ডিসপেনসারিতে ডাক্তার এসে পড়বে।'

'এটা তো খুব ভালো খবর!' ফুরকান খুশি হয়।

'এবার ডাক্তার ওখানেই থাকবে। না থাকতে চাইলে আমাকে জানাবে।'

'বুঝতে পারছি না কীভাবে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব। ডিসপেনসারিতে একজন ডাক্তারের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিয়ে সবচেয়ে বড় ঝামেলায় ছিলাম।'

'এর কোনো প্রয়োজন নেই।' সালার একটু থেমে বলে।
'ওখানে যাওয়ার আগে আমার ধারণা ছিল না, তুমি এবং

তোমার ফ্যামিলি কাজটা এই ভাবে, এত অর্গানাইজভাবে করছ। তোমাদের কাজ দেখে সত্যিই খুব মুগ্ধ হয়েছি। আমার অফার এখনো সেটাই, এই প্রজেক্টে তোমাদের সাহায্য করতে চাই।"

'সালার! আগেও বলেছি, আমি চাই তুমি এমন কোনো প্রজেক্ট অন্য কোনো গ্রামে শুরু করো। তোমার কাছে আমার চেয়ে বেশি সুযোগ আছে এবং তুমি আমার চেয়ে বেশি ভালোভাবে এ ধরনের প্রজেক্ট চালাতে পারবে।'

'তোমাকেও আমি বলেছিলাম আমার ঝামেলা । তোমার মতো এত সময় দিতে পারব না। তাছাড়া পাকিস্তানেও থাকি না। তোমার মতো আমার ফ্যামিলি মেম্বার'স এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।' সালার নিজের সমস্যার কথা বলে।

'যাইহোক, এ ব্যাপারে পরে কথা বলি। আপাতত তুমি চা শেষ করো। তোমাকে কোথাও নিয়ে যাব।' ফুরকান প্রসঙ্গ বদলে বলল।

'কোথায়?'

'এটা রাস্তায় বলব।' গোপন হাসি দিয়ে উত্তর দেয় ফুরকান।

'আমি ওখানে গিয়ে কী করব?' গাড়িতে বসে ফুরকানকে জিজ্ঞেস করে।

'আমি যা করি।' সিগন্যালে গাড়ি থামিয়ে বলল ফুরকান।

'আর তুমি ওখানে কী করো?'

'ওখানে গিয়েই দেখো।'

ফুরকান ওকে ড. সিবতে আলির কাছে নিয়ে যাচ্ছে। যার কাছে নিজেও যায়। তিনি একজন মাজহাবি আলেম। কিন্তু সালারের মাজহাবি ওলামাদের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। গত কয়েক বছরে এত মাজহাবি ওলামার আসল চেহারা দেখেছে যে, এখন আর সেসব জায়গায় সময় নষ্ট করতে চায় না।

'ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং ফুরকান! আমি সেই টাইপের না, যেই টাইপ তুমি আমাকে ভাবছ।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল সালার।

'কোন টাইপ?' ফুরকান ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকায়।

'এই যে পীর-মুরিদি বা বাইআত নেওয়া, তুমি বুঝে নাও।' সালার স্পষ্ট সুরে বলে।

'এজন্যই আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার সাহায্যের দরকার।'

সালার হতভম্ব হয়ে ফুরকানের দিকে তাকায়। যে রাত্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

'কেমন সাহায্য?'

'যদি একজন হাফেজ প্রতিরাতে এক পারা কুরআন পড়ার পরও ঘুমানোর জন্য তার ওষুধ দরকার হয়, তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও ভুল কিছু আছে। কয়েক বছর আগে আমিও ভীষণ ডিপ্রেশনে ছিলাম। আমার মনও অশান্ত থাকত। তখন একজন আমাকে ডক্টর সাহেবের কাছে নিয়ে আসে। এখন তো আট-দশ বছর হয়ে যাচ্ছে তার কাছে যাওয়া-আসার। আমাদের দেখা হওয়ার পর মনে হলো আমার মতো তোমারও কারো সাহায্য দরকার, গাইডেন্স দরকার।' ফুরকান নরম গলায় বলল।

'তুমি আমাকে কেন সাহায্য করতে চাইছ?'

'কারণ দ্বীন বলে তুমি আমার ভাই।' ফুরকান রাস্তার মোড় ঘুরে বলল।

সালার ঘাড় সোজা করে বসে। ফুরকানকে আর কী বলা যায়। মাজহাবি ওলামাদের ব্যাপারে আগ্রহ নেই ওর। সব আলেম নিজের পন্থার প্রশংসায় আকাশ-পাতাল এক করে ফেলায় পারদর্শী। প্রত্যেকে নিজস্ব জ্ঞান নিয়ে গর্ব করতে থাকে। সবার মুখে একই কথা, আমি ভালো বাকি সকলে খারাপ। আমি সর্বজ্ঞ, অন্য সবাই অজ্ঞ। প্রত্যেক আলেমকে দেখলে মনে হয়, তারা এলেম বই থেকে নয় সরাসরি ওহির মাধ্যমে অর্জন করেছে: যেখানে ভুলের কোনে সম্ভাবনা নেই। আজ পর্যন্ত এমন কোনো আলেম খুঁজে পায়নি, যে নিজের সমালোচনা শুনতে পারে এবং তা সহ্য করে। ও নিজে তাহলে সূন্যত সম্প্রদায়ের। কারো সাথে নিজের চিন্তাধারা ও সম্প্রদায় আলোচনা করতে চাইত। মাজহাবি ওলামাদের কাছেও আলোচনার প্রথম বিষয়, চিন্তাধারা ও সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু ওলামাদের সাথে দেখা করতে গিয়ে ধীরে ধীরে ওর মন উঠে যায়। তাদের পুঁটলিতে শুধু এলেম ভরা, আমল না। 'গিবত

করা গুনায় তারা এ বিষয়ে লম্বা-চওড়া লেকচার দেয়, কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি টানে আর পরের শ্বাসেই সমপর্যায়ের কোনো আলেমের নাম নিয়ে ঠাট্টা করে, তার জ্ঞানের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লাগে। তারা তাদের কাছে আসা প্রত্যেকের সম্পূর্ণ বায়োডাটা জানবে, এরপর সেই বায়োডাটা তাদের কাজের হলে দাবি আর অনুরোধের একটা লম্বা ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। এবং তা দিয়ে অন্যদেরকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা চলে। তাদের কাছে কোন সময় কে এসেছে, কীভাবে কে তার জ্ঞানে ধন্য হয়েছে, কোন উঁচু মানুষ সবসময় তার জুতা ঠিক করার জন্য তৈরি থাকে, তাকে কে বাড়িতে ডেকেছে এবং কীভাবে তার খেদমত করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই একবার গিয়ে দ্বিতীয়বার আর সেসব আলেমের কাছে যায়নি ও। এখন ফুরকান ওকে আবার এক আলেমের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল।

ওরা শহরের একটি সুন্দর এলাকায় এসে পৌঁছায়। এলাকাটি চমৎকার, কিন্তু খুব পশ না। রাস্তায় আগে থেকেই অনেক গাড়ি পার্কিং করা। ফুরকানও রাস্তার পাশে উপযুক্ত জায়গা

খুঁজে গাড়ি পার্ক করে বের হয়। সালারও তাকে অনুসরণ করে। তিন-চার মিনিট হাঁটার পর সারি হয়ে দাঁড়ানো বাংলোগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট তবে সম্ভ্রমশালী একটি বাংলোর সামনে পৌঁছায়। নেমপ্লেটে ড. সৈয়দ সিবতে আলি নাম লেখা। ফুরকান নিঃসংকোচে ভেতরে ঢুকে গেল, সালারও একই কাজ করে।

বাড়ির ভেতরের ছোট লনে একজন মালি তার কাজে ব্যস্ত। ফুরকান পোর্টে এক কাজের লোকের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে একটু এগিয়ে একটা দরজার সামনে গিয়ে জুতা খোলে। ওখানে ইতিমধ্যে অনেক জুতা পড়ে আছে। ভেতর থেকে কথার আওয়াজ আসছিল। সালারও দেখাদেখি জুতা খোলে। এক পা ভেতরে দিয়ে একনজরে পুরো রুম দেখে নেয়। প্রশস্ত একটা রুম। মেঝেতে কার্পেট, উপরে অনেকগুলো কুশনও পড়ে আছে। ফার্নিচারের নামে শুধু অল্প কিছু জিনিসপত্র। দেয়ালে কুরআনের কিছু আয়াত ক্যালিগ্রাফি করা। ওখানে প্রায় বিশ-পঁচিশ জনের মতো পুরুষ, যারা নিজেদের মাঝে কথা বলছে। ফুরকান ভেতরে ঢুকে উচু

আওয়াজে সালাম দেয় এবং কিছু মানুষের সাথে কুশল
বিনিময় করে। এরপর খালি কোণা বেছে সেখানে বসে পড়ে।
'ড. সৈয়দ সিবতে আলি কোথায়?' ফুরকানের পাশে বসে
সালার নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে।

‘আটটা বাজলে তিনি ভেতরে আসবেন, এখন তো শুধু
সাতটা পঁচিশ বাজে।’ ফুরকান ওকে বলল।

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে রুমে বসে থাকা মানুষজনকে পর্যবেক্ষণ
করে। সেখানে সব বয়সের মানুষ ছিল। কিছু টিনএজার, কিছু
ওর বয়সী, ফুরকানের বয়সী কিছু, কয়েকজন মধ্যবয়সী এবং
কিছু বয়স্কও। ফুরকান তার ডান দিকে থাকা একজন লোকের
সঙ্গে কথায় ব্যস্ত।

ঠিক আটটা বাজে সালার একজন ষাট-পয়ষটি বছর বয়সী
লোককে অভ্যন্তরীণ দরজা খুলে রুমে প্রবেশ করতে দেখে।
ওর প্রত্যাশার বিপরীতে সেখানকার কেউ তাকে স্বাগত
জানাতে দাঁড়ায়নি। প্রবেশকারী সালামের সূচনা করে, যার

জবাব সেখানে উপস্থিত মানুষগুলো দেয়। প্রবেশকারীর শ্রদ্ধায় না দাড়াতেও এখন বসে থাকা লোকজনের বসার ভঙ্গিতে তার জন্য সম্মান দেখতে পায়। তাদের সবাইকে এখন সজাগ ও সতর্ক মনে হচ্ছে।

প্রবেশকারী নিশ্চয়ই তবে ড. সিবতে আলি। দেয়ালের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসলেন তিনি, যা হয়তো তার জন্যই খালি রাখা ছিল। তার পরনে সাদা জুব্বা। গায়ের রং লাল ও সাদার মিশেল। সন্দেহ নেই যৌবনে তিনি একজন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তার চেহারার দাড়ি খুব লম্বা না, তবে খুব ঘন এবং সুন্দরভাবে ছাঁটা। দাড়ি এখনো সম্পূর্ণ সাদা হয়নি, মাথার চুলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সাদা-কালোর এই সংমিশ্রণ তাকে একটি পরিপক্ব ও শ্রদ্ধেয় চেহারা দিয়েছে। তার ডানদিকে থাকা একজনের অবস্থা জিজ্ঞেস করছিলেন। হয়তো লোকটা কোনো অসুস্থতা থেকে উঠেছে। সালার কয়েক মুহূর্তে তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়। ও আর ফুরকান অন্য সবার সঙ্গে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল।

ড. সিবতে আলি লেকচার শুরু করেন। তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু এবং বলার ধরন ধীর। রুমজুড়ে পিনপতন নীরবতা। ওখানে বসে থাকা মানুষ নড়চড়াও করছিল না যেন। তার প্রথম কয়েক বাক্যেই সালার বুঝে যায় একজন অসাধারণ আলেমের সামনে বসে আছে। তিনি শুকরিয়ার ব্যাপারে কথা বলছেন। 'মানুষকে তার জীবনে অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কখনো তারা পূর্ণতার উচ্চতায় পৌঁছায়, কখনো আবার শূন্যতায় খসে তলিয়ে যায়। সারা জীবন মানুষকে এই দুই পথের মাঝামাঝি ভ্রমণ করতে হয়। তবে যে পথেই ভ্রমণ করুক, সে কৃতজ্ঞ হবে নাকি অকৃতজ্ঞ, সেটা নির্ভর করছে তার ওপরে। কিছু মানুষ ভাগ্যবান হয়, যারা পূর্ণতার দিকে যায় বা শূন্যতার দিকে সবসময় কৃতজ্ঞতা আদায় করে। কিছু মানুষ আবার এমন হয়, যারা শুধু অকৃতজ্ঞই থেকে যায়। তাতে পূর্ণতা হাসিল হোক বা শূন্যতায় গিয়ে পৌঁছাক। আবার এমন কিছু মানুষ থাকে, যাদের অবস্থান মাঝামাঝি পর্যায়ে। পূর্ণতার পথে থাকলে কৃতজ্ঞ আর শূন্যতার পথে গেলে অকৃতজ্ঞ। মানুষ আল্লাহর অগণিত সৃষ্টির একটি, আশরাফুল মাখলুকাত। তবু অন্যসব

সৃষ্টির মতোই একটি সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার ওপর তার কোনো অধিকার নেই, আছে শুধু দায়িত্ববোধ। মানুষ এমন কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি যে, সে আল্লাহর কাছে কিছুকে তার অধিকার ভেবে দাবি করতে পারে। তবু মানুষের ওপর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের সূচনা জান্নাতের মাধ্যমে শুরু করে একের পর এক নেয়ামতের বর্ষণ করছেন। আর এই সবকিছুর বিনিময়ে একটা বিষয়ই মানুষের কাছে চাওয়া হয়েছে, আর তা হলো শুকরিয়া আদায় করা।

'আপনার কেমন লাগবে যখন আপনি কারোর উপকার করলেন, কিন্তু সেই মানুষটা তা ভুলে গিয়ে বা কৃতজ্ঞ না হয়ে, আপনাকে সেই সময়ের কথা মনে করায়, যখন আপনি তার উপকার করেননি বা এটা বোঝায় যে, আপনার উপকার তার জন্য যথেষ্ট ছিল না। আপনি যদি তার জন্য এটা করে দিতেন, সেটা করে দিতেন, তাহলে বেশি ভালো হতো। এমন মানুষের সঙ্গে আপনি কী করতেন বা করবেন? দ্বিতীয়বার উপকার করা তো দূরের কথা, আপনি হয়তো তার সাথে সম্পর্ক রাখাও পছন্দ করবেন না। আমরা আল্লাহর সঙ্গে

প্রতিনিয়ত এটাই করি। তাঁর নেয়ামত-রহমতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে, সেইসব নিয়ে অভিযোগ শুরু করে দেই যা হাসিল করতে চাই। আল্লাহ তবু রহিম, তিনি আমাদের ওপর তাঁর রহমত নাজিল করে যান। আমাদের আমল অনুযায়ী তা বাড়ে-কমে। কিন্তু এর ধারাবাহিকতা কখনো চিরদিনের জন্য ভঙ্গ হয় না।"

সালার পলক না ফেলে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"শুকরিয়া আদায় না করাও একধরনের রোগ। এমন রোগ, যা আমাদের হৃদয়কে প্রতিনিয়ত বিশালতা থেকে দিনে দিনে সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। আমাদের জিহ্বায় অভিযোগ ছাড়া কিছু আসতে দেয় না। যদি আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে অভ্যস্ত না হই, তাহলে মানুষের শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাসও আমাদের হবে না। যদি স্রষ্টার অনুগ্রহের কথা মনে রাখার অভ্যাস আমাদের না থাকে, তবে আমরা কোনো সৃষ্টির অনুগ্রহ স্মরণ করার অভ্যাসও করতে শিখব না।"

সালার চোখ বন্ধ করে নেয়। অকৃতজ্ঞ কাকে বলে ওর চেয়ে ভালো কেউ জানে না। আবার চোখ খুলে ড. সৈয়দ সিবতে আলির দিকে তাকায়। পুরো এক ঘন্টা পর তিনি লেকচার শেষ করেন। কিছু লোক তার কাছে আরও প্রশ্ন করে। কেউ কেউ উঠছে। বাইরে এসে সবাই যে যার গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ওরাও নিজেদের গাড়িতে এসে বসে। রাত গভীর হয়ে আসছে। সালারের কানে তখনো ড. সিবতে আলির কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ফুরকান গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ফেরার পথ ধরেছে। সাত দিন আগেও ফুরকান নামক কারো সাথে পরিচয় ছিল না ওর। কিন্তু মাত্র সাত দিনে এই মানুষটার সাথে সম্পর্কের বহু ধাপ অতিক্রম করে ফেলেছে। নিজের কাছেই অবাক লাগছে। মানুষের সাথে মেশায় অভ্যস্ত না ও।

'কিছু সম্পর্ক আর পরিচয় উপর থেকে নির্ধারিত হয়ে আসে-কে, কোন সময়, কোথায়, কীভাবে, কার সাথে মিলে যাবে এবং কার জীবনে কী পরিবর্তন নিয়ে আসবে সবকিছুই লেখা।'

সালার শুধু একদিনের জন্য লাহোর এসেছিল সেদিন। কিন্তু এরপর পাকিস্তানে থাকা বাকি সময়টাও ইসলামাবাদের পরিবর্তে লাহোরেই কাটিয়ে দেয়। বাকি দিনগুলোও নিয়ম করে ফুরকানের সাথে ড. সৈয়দ সিবতে আলির কাছে যেতে থাকে। তবে কখনো তার সাথে সরাসরি দেখা করেনি। শুধু তার লেকচার শোনে এবং উঠে এসে পড়ে। ড. সিবতে আলির জীবনের একটি বড় অংশ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক স্টাডিজ এবং ইসলামিক হিস্ট্রি পড়ানোয় কেটেছে। গত দশ-বারো বছর ধরে পাকিস্তানের একটি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত এবং ফুরকান তাকে প্রায় এতবছর ধরেই চেনে।

যেদিন ওর লাহোর থেকে ইসলামাবাদ আর ওখান থেকে ওয়াশিংটন যাওয়ার কথা, সেই রাতে প্রথমবার লেকচার শেষ হওয়ার পর ও ফুরকানের সাথে রয়ে যায় সেখানে। একজন একজন করে সবাই রুম থেকে বের হচ্ছিল। ড. সিবতে আলি দাঁড়িয়ে কিছু মানুষের সঙ্গে বিদায়ি মুসাফাহ করছেন। ফুরকান ওকে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়।

ফুরকানকে দেখে হাসি ফোটে তার মুখে। তিনি রুমে উপস্থিত শেষ মানুষটাকে বিদায় জানাচ্ছিলেন।

‘কেমন আছেন ফুরকান সাহেব? অনেকদিন পর রয়ে গেলেন।’ ফুরকানকে বললেন।

ফুরকান কিছু কারণ দেখায়, এরপর সালারের সঙ্গে পরিচয় করায়। ‘ও সালার সিকান্দার, আমার বন্ধু।’

সালার নিজের নাম শুনে তাকে চমকে যেতে দেখে কিছুটা অবাক হয়। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই তার মুখে আবার সেই হাসি ফিরে আসে। ফুরকান এখন ওর ব্যাপারে বিস্তারিত বলছিল।

‘এসে বসো।’ ড. সিবতে আলি ফ্লোরের গদির দিকে ইশারা দিয়ে বললেন।

ওরা তার থেকে একটু দূরে বসল। ফুরকানের সাথে প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলছিল তিনি। সালার নীরবে সেসব শোনে। কথোপকথনের মাঝে একজন কাজের লোক ভেতরে আসে। ডক্টর সাহেব খাবার আনতে বলে। কাচের লোক রুমে দস্তুরখান বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করতে থাকে। ফুরকান নিশ্চয়ই এর আগেও এখানে খাবার খেয়েছে। সালার হাত ধুয়ে যখন দস্তুরখানে এসে বসল, তখন ড. সিবতে আলি আমচকা ওকে সম্বোধন করে বললেন।

'আপনি হাসেন না সালার?'

তার প্রশ্নের চেয়ে প্রশ্নের ধরনে নড়েচড়ে উঠল ও। কোনোরকম তাকায়।

'এই বয়সে এত গান্ধীর্ষ কিন্তু ভালো কথা না।'

সালার খানিকটা অবাক হয়ে হাসল। পনেরো-বিশ মিনিটের এই সাক্ষাতে তিনি কী করে জানলেন ও হাসতে অভ্যস্ত না।

ফুরকানের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকায়। খোলামেলাভাবে হাসতে চেষ্টা করলেও তা সহজ হলো না।

আমার চেহারা কি আমার সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ করে দিচ্ছে? প্রথমে ফুরকান, এখন ড. সিবতে আলি আমার কাছে আমার গান্ধীর কারণ জানতে চাইছেন। ও ভাবল। 'এমন কিছু না, আমি তেমন গান্ধীর নই।' ড. সিবতে আলির চেয়ে বেশি যেন নিজেকে আশ্বস্ত করল।

'আশা করি এমনটাই হোক।' ড. সাহেব হেসে বলেন।

খাবার শেষে দু'জনকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি ভেতরে গেলেন। ফিরলেন একটা বই নিয়ে। বইটা সালারের দিকে এগিয়ে দেন। আপনার সম্পর্ক অর্থনীতির সাথে। কিছু সময় আগে ইসলামি অর্থনীতির ওপরে আমি এই বইটা লিখেছিলাম। আমি খুশি হব যদি আপনি পড়েন। যাতে আপনার ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছু জানার সুযোগ হয়।

সালার তার হাত থেকে বই নেয়। বইয়ের দিকে তাকিয়ে মধ্যম আওয়াজে বলে। 'আমি চলে যাওয়ার পরও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই। শুধু অর্থনীতি সম্পর্কে না, আরও অনেক কিছু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে।'

ড. সিবতে আলি আলতো করে ওর কাঁধে হাত রাখলেন।

ড. সিবতে আলির কাছে আসা সকলেই কোনো না-কোনো সামাজিক কাজের সাথে জড়িত। কেউ আগে থেকে এই কাজের সাথে সংযুক্ত, কেউ-বা তার কাছে আসার পর থেকে শুরু করেছে এমন। তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর ফুরকান এ বিষয়টি খোলাসা করে সালারের কাছে।

'তার কাছে আসা বেশিরভাগ মানুষই কোয়ালিফাইড। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। আমিও কাকতালীয়ভাবে তার কাছে আসা শুরু করি। লন্ডনে একবার তার লেকচার শোনার সুযোগ হয়েছিল। পাকিস্তান আসার পর এক বন্ধুর মাধ্যমে দেখা করার সুযোগ পাই। তখন থেকে তার কাছে আসা-

যাওয়া এবং আমি অনুভব করি জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি স্পষ্ট ও স্থির। মানসিকভাবেও আগের তুলনায় শক্ত হয়ে উঠেছি। তুমি প্রজেক্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলে। এই প্রজেক্টে ড. সিবতে আলির কাছে আসা এসব মানুষজন আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। অনেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ ধরনের প্রজেক্টে কাজ করা মানুষ আমি একা নই, এখানের সবাই। এসব কাজে আমরা একে অন্যের সাহায্য করি। সাহায্যের ধরন ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য একটাই; আমরা দেশকে বদলাতে চাই।"

ফুরকানের শেষ বাক্যে সালার তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল। 'এটা অত সহজ না।'

'আমরা জানি এটা সহজ না। এটাও জানি এসবের বাস্তব প্রতিফলন আমাদের জীবদ্দশায় ঘটবে না। কিন্তু আমরা এমন একটা ভিত্তি স্থাপন করে রেখে যেতে চাই, যার ওপর আমাদের সন্তান এবং পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে উঠবে। যাতে

ওদের অন্ধকারে প্রতিনিয়ত ধাক্কা খেতে না হয়। এতে অন্তত মৃত্যুর সময় মনে হবে না, আমরা শুধু দর্শকের মতো জীবন কাটিয়েছি। অন্য মানুষের মতো আমরাও কেবল সমালোচনা করে গেছি, খারাপের দিকে আঙুল তুলেছি, ইসলামকে শুধু মসজিদের গাঙিতে সীমাবদ্ধ করে রেখে এসেছিলাম নিজেদের এবং অন্যদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনার চেষ্টা করিনি।"

সালার অবাক হয়ে ফুরকানের কথা শোনে। ইমামা হাশিম, জালাল আনসার ও সাদের পর আরেকজন মুসলমানকে দেখছে। একজন প্র্যাকটিক্যাল মুসলমান। আরেক ধরনের মুসলমানের সাথে পরিচিত হচ্ছে। এমন মুসলমান, যে দ্বীন-দুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়। যে এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ চেনে এবং তার ওপর চলতে জানে। ভীষণ মুগ্ধ হয় ও।

‘তুমি আমার শেষ অফারের ব্যাপারে কী ভাবলে?’

‘আমি বলেছি তোমার কাছে কী চাই। এই দেশের তোমাকে প্রয়োজন এখানের মানুষের, এখানের প্রতিষ্ঠানের। তোমার এখানে এসে কাজ করা দরকার।’

ফুরকানের কথায় সালার হালকা হেসে বলল। ‘তুমি কখনো এই টপিক ছাড়বে না? আচ্ছা, এ ব্যাপারে ভেবে দেখব। এরপর তুমি আমার অফারের উত্তরে কী বলবে?’

‘আমার গ্রামের পাশে আরেকটা গ্রাম আছে। সেই অবস্থায় যে অবস্থা দশ-পনেরো বছর আগে আমার গ্রামের ছিল। আমি ইদানীং চেষ্টায় আছি কেউ ওখানে স্কুল তৈরি করুক। সরকারি প্রাইমারি স্কুল আছে একটা, তবে নামেমাত্র। তুমি ওখানে স্কুল শুরু করলে ভালো হতো। আমি এবং আমার ফ্যামিলি তুমি না থাকলেও দেখাশোনা করতে পারব। আমরা এটা তৈরিতেও তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু চালাতে তোমাকেই হবে, শুধু টাকা পাঠানো যথেষ্ট হবে না।’ ফুরকান বলল।

'কাল আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে? সালার কিছুটা ভেবে বলে।

'কিন্তু কালকে সকালে তো তোমার ফ্লাইট আছে!'

'দুদিন পর যাব। একবার গেলে, তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব না। তাই যাওয়ার আগে কাজ শুরু করে রেখে যেতে চাই।' বলে ও।

ফুরকান সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

রাতের ফ্লাইটে ওরা ইসলামাবাদ এসে ফুরকানের গ্রামে চলে যায়। রাত এখানে কাটিয়ে ভোরবেলায় পাশের গ্রামে গেল। দুপুর বারোটা পর্যন্ত এখানকার মানুষের সাথে কথা বলে এবং এদিক-সেদিক ঘুরে দেখে। ওখানের প্রাইমারি স্কুলের অবস্থা দেখে সালারের বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওটার অবস্থা দেখে যাইহোক স্কুল মনে হয় না। এখানের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার আগে থেকেই ভালোভাবে জানা। ফুরকান ওর মতো অবাক

হয়নি। কারণ বছরে ও চারবার বিভিন্ন গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে। তাই গ্রামের জীবন ও অবস্থার সাথে সালারের চেয়ে বেশি পরিচিত। ফুরকান সন্ধ্যার ফ্লাইটে লাহোরে ফিরবে। তাই ওরা দুপুর দুইটার দিকে সেখান থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

স্কুলের প্রজেক্ট শুরু করার আগে সিকান্দার উসমানের সাথে কথা বলে সালার। সংক্ষিপ্ত আকারে তাকে এ ব্যাপারে জানায়। তিনি কোনো বাধা না দিয়ে ছেলের কথা শোনেন। এরপর খুব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

'এসব কেন করছ তুমি?'

'পাপা! আমি এ কাজের প্রয়োজন অনুভব করছি, কারণ মানুষ...' তিনি ছেলের কথায় বাধা দেন। 'আমি স্কুলের কথা বলছি না।'

'তাহলে আপনি কীসের কথা বলছেন?' ও অবাক হয়।

'আমি তোমার লাইফস্টাইলের কথা বলছি।'

'আমার লাইফস্টাইলের কী হয়েছে?'

সিকান্দার উসমান ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'কুরআন হেফজ করার বিষয়ে তখন বললে, যখন তোমার হেফজ করা শেষ। ওকে ফাইন, আমি কিছু বলিনি। হজ করতে যেতে চেয়েছ, এই বিষয়ে আমি চিন্তিত থাকলেও তোমাকে বাধা দেইনি। সব ধরনের সোশ্যাল লাইফ থেকে দূরে সরেছ, আমি আপত্তি করিনি। ধর্মে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছ, নামাজ শুরু করেছ তা-ও মসজিদে: এরপরও আমি কিছু বলিনি। বিজনেস করার পরিবর্তে জব করতে চেয়েছ, তা-ও এখানে না আমেরিকায়। করতে দিয়েছি। এখন তুমি একটা স্কুল খুলতে চাও। তাই এখন জরুরি হয়ে পড়েছে পুরো বিষয়টা নিয়ে আমাদের সিরিয়াস হয়ে কথা বলা।' তিনি খুব গম্ভীর ছিলেন।

'তোমার কোনো আন্দাজ আছে, এই লাইফস্টাইল তোমাকে আমাদের সোশ্যাল সার্ক্লে অগ্রহণযোগ্য করে তুলছে? আগে এক পাগলামির চরমে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছ, এখন আরেক পাগলামির। তোমার নিজের ক্যারিয়ারে মনোযোগ দেওয়া উচিত, নিজের লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনা দরকার। আমরা যে ক্লাসে চলাফেরা করি সেখানে ধর্মের প্রতি এ ধরনের সম্পৃক্ততা অনেক সমস্যার তৈরি করে।'

সালার মাথা নিচু করে তার কথা শুনছিল।

‘শুধু তোমার জন্য না, আমাদের জন্যও অনেক সমস্যা তৈরি হবে। চিন্তা করে দেখো, তুমি মানুষকে কী ইম্প্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করছ? কাল যখন আমরা বা তুমি নিজের ক্লাসের ভালো ফ্যামিলির একটা মেয়েকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবে, তখন এই ধর্মীয় অনুষঙ্গ তোমার জন্য কত বড় ঝামেলা তৈরি করবে আন্দাজ করো। কোনো ফ্যামিলি শুধু সিকান্দার উসমানের নাম শুনে-জেনে বা তোমার কোয়ালিফিকেশন

দেখেই নিজেদের মেয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে না। তার ওপর এই বয়সে সামাজিক কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, যেখানে তোমার বয়সীরা নিজেদের ক্যারিয়ারের পেছনে দৌড়ায়। ইউনসেফের মাধ্যমে তুমি অনেক সামাজিক কাজ করো, এটাই যথেষ্ট। পার্সোনাল লাইফেও এসব শুরু করা জরুরি না। যে টাকা তুমি ওই স্কুল তৈরি এবং মানুষের জীবন উন্নত করায় খরচ করবে, সেগুলো নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পুঁজি করো। ওদের বিলাসিতা দেওয়ার জন্য, একটা আরামদায়ক লাইফস্টাইল দেওয়ার জন্য; নাহলে নিজের ওপর খরচ করো। তিনশো বছরের জীবন নিয়ে আসোনি তুমি। এত অল্প বয়সে কেন বার্ধক্যের ভার নিতে চাইছ নিজের ওপর? একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, খারাপ হয়েছে। তুমি শিক্ষা নিয়েছ, অনেক ভালো করেছ, তাতেই চলবে। এর মানে এই না যে, এই বয়সে তসবিহ ধরে বসে থাকবো। তিনি থামেন। 'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করলেন।

'পাপা! আমি তসবিহ ধরে বসে নেই।' সালার তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজের কথা বলে। 'আপনি জীবনে ভারসাম্য রাখার কথা বলছেন, আমি সেই ভারসাম্য ধরে রাখার চেষ্টা করছি। আমি নিজের ক্যারিয়ারে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আপনি ভালো করে জানেন, আমার পারফরম্যান্স সম্পর্কে আপনার অজানা নেই কিছু।'

'আমি জানি। এজন্যই বলছি যদি এসব বিষয়ে মাথা না খাটাও, তাহলে আরও এগিয়ে যাবো।' সিকান্দার উসমান বললেন।

'এসব করলে কেন তা পারব না? আপনার যদি মনে হয় সবকিছু ছেড়ে দিলে আমি ক্যারিয়ারের মাউন্ট এভারেস্ট পৌঁছে যাব, তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন।' ও শান্ত গলায় বলল।

'ভবিষ্যৎ নিয়েই নাহয় ভাবো, বিয়ে নিয়ে। এমন এপ্রোচ রাখার পর তোমাকে কে গ্রহণ করবে?'

‘ভেবেছি পাপা! আমি কখনো বিয়ে করব না।’

সিকান্দার হাসেন। ‘ছেলেমানুষি ভাবনা। সবাই এমন বলে। নিজের অ্যাডভেঞ্চার মনে থাকার কথা তোমার।’

সালার জানে তার ইশারা কোনদিকে। তাই অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। এটাও না যে, সেই অ্যাডভেঞ্চারের কারণেই বিয়ে করতে চায় না। ‘মনে আছে।’ অনেকক্ষণ পর নিচু আওয়াজে বলে। ‘আমি আপনার সোশ্যাল সার্কলের মাঝে অনেক আগেই মিসফিট হয়ে গেছি, সেখানে জায়গা তৈরির চেষ্টাও করব না। এই সোশ্যাল সার্কলে কোনো নতুন পরিচয় বা সম্পর্ক তৈরির ইচ্ছে নেই আমার। আমি পরোয়া করি না মানুষজন, আমার ভাইবোন আমাকে নিয়ে মজা করবে না হাসবে। মানসিকভাবে এসবের জন্য প্রস্তুত আমি। যতদূর কথা রইল প্রজেক্টের, তাহলে বলব, পাপা! আমাকে এটা শুরু করতে দিন। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে, এই প্রজেক্ট শুরু করলেই আমাকে ফুটপাতে এসে দাঁড়াতে হবে না। কারো শারীরিক অসুস্থতা থাকে, কারো

আত্মার। শরীরের অসুস্থতার জন্য মানুষ ডাক্তারের কাছে যায়।
আত্মার অসুস্থতার জন্য মানুষ তা করে, যা আমি করতে
চাইছি। এই টাকা দিয়ে অনেক কিছু কেনা যাবে কিন্তু শান্তি
না। জীবনে প্রথমবার শান্তি খুঁজে পাওয়ার আশায় আমি এই
টাকা ইনভেস্ট করছি। হতে পারে আমি তার সম্মান পেয়ে
যাব।"

সিকান্দার উসমানের কাছে এখন আর বলার মতো কিছু ছিল
না।

ওয়াশিংটনে ফিরে আগের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে সালার।
কিন্তু এবার পাকিস্তানে ফুরকান আর ড. সিবতে আলির সাথে
নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। ফুরকান ওকে স্কুলের যাবতীয়
খবর জানায়। ইউনিসেফে এ ধরনের কাজ ওর চাকরির
অংশই ছিল। এমন কাজে অনেক ভালো সুযোগ-সুবিধা
পাওয়া যায়। কিন্তু পাকিস্তানে এমন কাজের সূচনা, তাও

নিজের সম্পদে? কয়েক বছর আগের সালার সিকান্দারকে যারা চেনে, তারা কখনো এটা বিশ্বাস করবে না। নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না কখনো এ ধরনের কাজের কথা ভাবতে পারে। তবে প্রজেক্টের জন্য অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বের করার সময় এটুকু বুঝতে পারে, আর্থিকভাবে অন্তত এই কাজ সামাল দেওয়া ওর জন্য কঠিন না। গত তিন বছরে ওর খরচ অনেকটা কমে এসেছে। এমন সব বিষয় জীবন থেকে বেরিয়ে গেছে, যার ওপর একসময় চোখ বন্ধ করে টাকা ঢালত। নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অঙ্ক গুনে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। ও এমন মানুষ ছিল না, যার কাছে টাকা জমানো আশা করা যায়। এমফিলের জন্য স্কলারশিপ ছিল। এই ক্ষেত্রেও নিজের কিছু খরচ করতে হচ্ছিল না।

সেদিন অ্যাপার্টমেন্টে পায়চারি করার সময় সবকিছু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। কোথাও দামি কিছু নেই। আসবাবপত্র খুব সীমিত। কিচেনেও খাবারদাবারের জিনিস থাকে খালি। কফি, চা-পাতা, দুধ এই জাতীয় কিছু আছে শুধু। অ্যাপার্টমেন্টে ওর সময় খুব কম কাটে। যতটুকু কাটে তা-ও

ঘুমিয়ে। কাজে যাওয়ার জন্য আগে থেকেই যে পরিমাণ কাপড় আর অন্যান্য ব্যবহারিক জিনিসপত্র ছিল, তাতে এই ব্যাপারেও উদাসীন হয়ে পড়ে। ওর স্পষ্ট মনে আছে, শেষবার কবে নিজের জন্য কিছু কিনেছে। কলিগ ও ইউনিভার্সিটির ক্লাসফেলো ছাড়া নিউইয়র্কের কাউকে চিনত না বা ইচ্ছে করেই নিজেকে একটা সার্কলে সীমাবদ্ধ করে রাখত। মানুষের সাথে ওর পরিচয় কেবল ফরমাল ছিল। একমাত্র যেখানে ও খরচ করত, তা বইয়ের পেছনে। এই লাইফস্টাইলের সাথে ওর অ্যাকাউন্টে যদি এই পরিমাণ টাকা জমা হয়, তাহলে সেটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। অফিস, ইউনিভার্সিটি, অ্যাপার্টমেন্ট, ওর জীবনের রুটিনে চতুর্থ কোনো বিষয় ছিল না।

এমফিল চলাকালীন ইউনিসেফ ছেড়ে ইউনেস্কোতে জয়েন করে সাধারণ। এমফিলের পর প্যারিসে ওর পোস্টিং হয়। এর আগে ফিল্ড অফিসে কাজ করত। কিন্তু এরপর থেকে ইউনেস্কোর হেড কোয়ার্টারে কাজ করার সুযোগ হয়। গত পাঁচ বছর সময়ে-অসময়ে ছোটখাটো প্রজেক্টের জন্য ও

প্যারিস আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু এবার লম্বা সময়ের জন্য এখানে আসা। পরিচিত এক জগৎ ছেড়ে অপরিচিত এক জগতে। সেই জগৎ, যেখানের ভাষার সাথেও পরিচিত ছিল না। নিউইয়র্কে ওর অনেক বন্ধু ছিল। এখানে তেমন কেউ ছিল না, যাকে চেনে-জানে।

ইউনিসেফের মতো ইউনেস্কোতে এসেও বিরামহীনভাবে কাজ করতে থাকে সালার। তবে ইসলামাবাদের শহরতলিতে শুরু করা স্কুল ওর মস্তিষ্ক থেকে মোছেনি। মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে ভাবত, ওর চাকরির সাথে পড়াশোনার এত গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ফুরকানের মতো ওর মাথায় কেন কখনো স্কুল খেলার কথা আসেনি। যদি এই স্কুলের চিন্তা কয়েক বছর আগে করত, তাহলে এতদিনে তা স্থিতিশীল এক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যেত।

‘পাকিস্তানের প্রতি আমার খুব একটা ভালোবাসা নেই, তেমন টান কাজ করে না।’ প্রথমদিকের সাক্ষাতে একবার ফুরকানকে বলেছিল ও।

'কেন?' ফুরকান জিজ্ঞেস করেছিল।

'কেন-এর উত্তর আমার কাছে নেই। ব্যস, পাকিস্তানের জন্য বিশেষ কোনো অনুভূতি নেই আমার।' ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল।

'এটা জানার পরও যে, এটা তোমার দেশ?'

'হ্যাঁ, এটা জানার পরও।'

'আমেরিকার জন্য বিশেষ কোনো টান আছে, ভালোবাসা কাজ করে?' ফুরকান প্রশ্ন করেছিল।

'না, সেই দেশের জন্যও আমার মনে কিছু নেই।' ও শান্তস্বরে বলেছিল।

ফুরকান তখন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'আসলে আমি দেশপ্রেমে বিশ্বাস করি না।' ফুরকানকে অবাক হতে দেখে বাখ্যা করেছিল। 'অথবা বলা যায়, যেখানে আমি থাকি সেই জায়গাগুলোর প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলা আমার জন্য কঠিন। কাল তৃতীয় কোনো দেশে চলে গেলে আমেরিকাকেও মনে রাখব না।'

"তুমি বড় আজব মানুষ সালার!" ফুরকান হুট করে বলেছিল। 'এটা আদতে সম্ভব একটা মানুষ তার দেশ বা সেই জায়গার প্রতি কোনো টান অনুভব করে না, যেখানে সে বসবাস করে?' ওর কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কিন্তু ভুল বলেছিল না ও। প্যারিস আসার পর নিউইয়র্কের কিছু মনে থাকেনি। এমনকি নিউ হ্যাভেন থেকে নিউইয়র্ক আসার সময়ও এটাচমেন্টের কোনো ঝামেলা হয়নি। সব পানির মাছ যাকে বলে।

ইউনাইটেড নেশনের আঞ্চলিক কনফারেন্সের জন্য পাকিস্তান এসেছে অনরিটিউটে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের কিছু লেকচার দেওয়ার কথা। ফুরকানের সাথেও স্কুল নিয়ে প্ল্যান সালারের। পার্ল-কন্টিনেন্টালে থাকছে। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার কিছুটা খেয়ে জরুরি কাজে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজছিল। লাহোরে আজ তৃতীয় দিন ওর। মল রোড দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে যায়। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে টায়ার চেক করে। কয়েক মিনিট পর জানালার কাছে এসে বলে। 'স্যার! গাড়িতে অতিরিক্ত টায়ার নেই। আপনার জন্য ট্যাক্সি নিয়ে আসছি, ট্যাক্সিতে চলে যান।'

সালার হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে থামায়। 'থাক, আমি নিয়ে নিচ্ছি।' বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে যায়।

দূরের পার্কিংয়ে কিছু ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। সালার সেদিকে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে ওর সামনে ব্রেক লাগায়। গাড়ি সামনে থেকে এসেছে। ভেতরে থাকা

মানুষটাকে একনজর দেখে চিনে ফেলে। ওটা আকিফ। যে এখন ড্রাইভিং সিট থেকে বাইরে নামছিল। ওর কয়েক বছর আগের জীবনের অন্যতম প্রধান চরিত্র। আকিফ ও আকমল, এই দুজনের সঙ্গেই তখন বেশিরভাগ সময় কাটাত। এবারের সাক্ষাৎ অনেক বছর পর হচ্ছে, সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার পরে এই প্রথম। পাকিস্তান বা লাহোর এসেও কখনো ওদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি। ওরা যদিও অনেকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। তবে ওদের কাছে আসার চেষ্টা ব্যর্থ করে ওদেরকে এড়িয়ে চলায় সফল ছিল সালার। কিন্তু এত বছর পর হুট করে আকিফ ওর সামনে হাজির। স্নায়ু সংকীর্ণ হয়ে আসে। আকিফ খুব জোশ আর উষ্ণতা নিয়ে সামনে আগায়।

'সালার! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এটা তুমি। এত বছর কোথায় নিখোঁজ ছিলে? তুমি তো গাধার শিংয়ের মতো নাই হয়ে গেলে। কোথায় ছিলে ইয়ার? এখানে কী করছ? বেশভূষাই পাল্টে ফেলেছ। কোথায় গেল সেই চুল! লাহোর কবে এলে? আসার খবর কেন দাওনি?' আকিফ একের পর

এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে। বন্ধুর ভঙ্গিতে থাকা শীতলতা খেয়াল না করে আকিফ আবার জিজ্ঞেস করল। 'এখানে মল রোডে কী করছ?'

'গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, ট্যাক্সি খুঁজছি।' সালার বলল।

'কোথায় যাবে? আমি ড্রপ করে দেই।'

'না, আমি চলে যাচ্ছি। ট্যাক্সি কাছেই।'

আকিফ কোনো কথা কানে নেয় না। 'ভেতরে বসো।' হাত ধরে ওকে টেনে বলল।

সালার ছটফট করে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ওর মুড খারাপ হচ্ছে।

‘তুমি তো স্টেটসে পড়তে গিয়েছিলে, পরে খবর পেলাম ওখানেই জব করছ। তাহলে হঠাৎ পাকিস্তান?’ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল। ‘ছুটি কাটাতে এসেছ?’

‘হ্যাঁ।’ সালার সংক্ষেপে বলে। এভাবে হয়তো কিছুটা বেঁচে যাবে।

‘কী করছ আজকাল?’

‘ইউনাইটেড নেশনের এজেন্সিতে কাজ করছি।’

‘লাহোরে কোথায় থাকছ?’

‘পিসিতে।’

‘পিসিতে কেন? আমার কাছে আসতে, নাহলে আমাকে ফোন করতে। কবে এসেছ?’

'কাল।'

'তাহলে এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে, আমার বাসায় থাকবে। হোটেলে থাকার প্রয়োজন নেই।'

'না, কাল সকালে ইসলামাবাদ চলে যাব।' দ্রুত মিথ্যে বলে সালার। যেকোনো মূল্যে মুক্তি চায়। আকিফের সাথে ওর অস্বস্তি লাগছে। এর কারণ হয়তো সেই অতীত, যা কাটিয়ে এসেছিল।

'যদি কাল ইসলামাবাদ চলে যাও, তাহলে আজ আমার সাথে কাটাও। একসাথে ডিনার করব।' আকিফ অফার করে।

'আমি দশ মিনিট আগে খেয়ে বের হয়েছি।'

'তবুও চলো, আমার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করাব।'

'তুমি বিয়ে করে ফেলেছ?'

‘হ্যাঁ, তিন বছর। আর তুমি?’

‘না।’

‘কেন?’

‘কাজের ব্যস্ততায়।’

‘গুড। এখনো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছ।’ আকিফ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ‘ভাগ্য তোমারই।’

সালার কিছু বলে না। আকিফ কথা বলতে বলতে গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে ভেতর থেকে ক্যাসেট বের করতে চাইল। মনোযোগ কিছুটা এদিক-সেদিক হওয়ায় ভেতরে থাকা অনেককিছু গড়িয়ে সালারের কোল আর পায়ের কাছে পড়ে। ‘টু ব্যাড।’ বিরক্তি নিয়ে বলল।

সালার নিচু হয়ে জিনিসপত্র তুলতে থাকে। আকিফ গাড়ির ভেতরের লাইট অন করল। সবকিছু উঠিয়ে আগের জায়গায় রাখতে গিয়ে সালার হঠাৎ থেমে যায়। যেন কেউ ওর শরীরে কারেন্ট ছেড়ে দিয়েছে। গ্রোভ কম্পার্টমেন্টের কোণায় একজোড়া কানের দুলা। ওর হাত কাঁপছে। বাম হাত বাড়িয়ে কানের দুলাগুলো বের করে। গাড়ির আলোয় হাতের তালুতে তা ঝলমল করছে। অবিশ্বাস্য চোখে এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। বহু বছর আগে এই কানের দুলাগুলো কারো কানে দেখেছিল। একবার... দুইবার.... তিনবার... চতুর্থবার, বারবার দেখল। ওর কোনো সন্দেহ নেই, এগুলো ইমামা হাশিমের কানের দুলা। চোখ বন্ধ করে এগুলোর ডিজাইন কাগজে আঁকতে পারবে ও- প্রতিটি নকশা, প্রতিটি বাঁকসহ।

আকিফ ওর হাত থেকে কানের দুলাগুলো নিলে ধ্যান ভাঙে। কানের দুলাগুলো রেখে দেয়।

'এই কানের দুলা...!' সালার আটকে আটকে বলল। 'এগুলো তোমার স্ত্রীর?'

'স্ট্রীর... কাম অন ইয়ার! আকিফ হাসে। 'স্ট্রীর হলে আমি এখানে রাখতাম?'

সালার পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকে। 'তাহলে?'
ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল।

'গার্লফ্রেন্ডের। গতকাল রাতে আমার সঙ্গে ছিল। দুলগুলো বেডরুমে ফেলে গেছে। কিছুটা তাড়াহুড়োয় যেতে হয়েছিল ওকে। কারণ রোহা ফিরে এসেছিল। আমি এনে গাড়িতে রেখে দিয়েছি। কারণ আজ ওইদিকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।' আকিফ খুব সহজ ভঙ্গিতে বলছিল।

'গার্লফ্রেন্ড...?' সালারের গলায় যেন ফাঁস লাগে।

'হ্যাঁ, গার্লফ্রেন্ড। রেড লাইট এরিয়ার মেয়ে। এখন ডিফেন্সে শিফট হয়ে গেছে।'

'কী... নাম কী?' ইমামা রেড লাইট এরিয়ার মেয়ে কখনো হতে পারে না। নিশ্চয়ই আমার ভুল হচ্ছে। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ভাবে সালার।

‘সুনোবর।’ আকিফ মেয়েটার নাম বলল।

সালার হাতে থাকা জিনিসপত্রগুলো গ্রোভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দেয়। ওর আসলেই ভুল হচ্ছিল।

আকিফ গাড়ির লাইট অফ করে দেয়। সিটের সাথে হেলান দিয়ে সালার লম্বা শ্বাস ফেলো।

‘কিন্তু এটা ওর আসল নাম না।’ আকিফ বলতে রইল। ‘ওর আসল নাম ইমামা।’

সালারের কানে বিস্ফোরণ ঘটে। যেন কেউ কানে গলিত সিসা ঢেলে দিয়েছে।

আকিফ সিটারিং হুইলে ঝুঁকে দুই ঠোঁটে রাখা সিগারেট
জ্বালাচ্ছিল।

‘তুমি... কী বললে?’ সালারের গলা কাঁপছিল।

আকিফ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তাকায়।

‘নাম বলছিলে তুমি, কী নাম?’

‘হ্যাঁ, ইমামা। চেনো নাকি?’ আকিফ বাঁকা হেসে জিজ্ঞেস
করে। জানালার কাঁচ খোলা।

সালার এমনভাবে বন্ধুর দিকে তাকায় যেন প্রথমবার দেখছে।

কানের দুলগুলো আকিফের হাতের মুঠোয়। ‘আমি কী
জিজ্ঞেস করছি ইয়ার! তুমি চেনো ওকে?’

'আমি... আমি...' সালার কিছু বলার চেষ্টা করে। ওর আওয়াজ কোনো মুনীর খাদ থেকে আসছিল। রেড লাইট এরিয়া...নিজের কল্পনার শেষ সীমানায়ও ইমামা সেখানে থাকতে পারে ভাবেনি।

গাড়ির ভেতরে আসা রোড লাইটের আলোতে আকিফ ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। ওর বিবর্ণ হয়ে আসা চেহারা, বন্ধ হাতের মুঠ, কাঁপতে থাকা চোঁট, অর্থহীন-অসংলগ্ন কথাবার্তা। হেসে কাঁধে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হাত রেখে বদল। 'ডোন্ট ওয়ারি ইয়ার! ঘাবড়াচ্ছ কেন? শুধু গার্লফ্রেন্ড আমার। তোমাদের মাঝে কিছু থাকলে ব্যাপার না। আমরা আগেও কত কী শেয়ার করেছি, মনে আছে তোমার?' হাসতে হাসতে বারুদে ম্যাচের কাঠি ছোঁয়ায়। 'আর এটা তো একটা মেয়ে!'

মল রোডে কী পরিমাণ ভিড়, আকিফ কোন গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে এসব ছাড়াও সালার ভাবতে সময় নষ্ট করেনি, স্টিয়ারিং হুইলে থাকা মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ওর

নিজের সাথে কী হতে পারে। পলক ফেলার আগেই আকিফের কলার চেপে ধরল। আকিফের পা ব্রেকে গিয়ে লাগে, গাড়ি এক ঝটকায় থামে। দু'জন ড্যাশবোর্ডের সাথে জোরে ধাক্কা খায়। সালার আকিফের কলার ছাড়েনি। আকিফ বিহ্বল অবস্থায় চিৎকার করে।

'কী করছ তুমি?' সালারের হাত থেকে কলার ছাড়িয়ে দূরে ঠেলার চেষ্টা করে। 'পাগল হয়ে গেছ?'

'How dare you talk like that?' সালার হিংস্র চোখে তাকায়। হাত এবার আকিফের ঘাড়ে চলে যায়।

আকিফের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। রাগ এবং কিছু করার মতো না পেয়ে সালারের মুখে ঘুষি মারল। সালার ঝটকা খেয়ে পেছনে সরে। দুই হাত এখন নিজের মুখে। পেছনে থাকা গাড়িগুলো একে একে হর্ন দিচ্ছে। ওরা রাস্তার মাঝখানে। এটা দু'জনের সৌভাগ্য যে, এভাবে হুট করে গাড়ি থামার পরও পেছন থেকে কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা দেয়নি।

সালার দুই হাতে চোয়াল চেপে ব্যথায় সিটে হেলান দিয়ে বসে রইল। আকিফ নিজেকে ধাতস্থ করে গাড়ি একটু সামনে নিয়ে সুনসান রাস্তার পাশে থামায়। সালার ততক্ষণে সোজা হয়ে গেছে। হাত দিয়ে ঠোঁট, চোয়াল চাপতে চাপতে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। কয়েক মিনিট আগের উত্তেজনা এখন কেটে গেছে। আকিফ গাড়ি থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল।

'কী সমস্যা তোমার? আমার গলার সাথে কেন ঝুলে পড়লে? আমি কী করেছি?' ড্যাশবোর্ড থেকে টিস্যুবক্স বের করে বন্ধুর দিকে এগিয়ে দেয়। সালারের শাটে পড়া কয়েক ফোঁটা রক্ত নজর এড়ায়নি ওর।

সালার দুইটা টিস্যু বের করে নেয়। ঠোঁটের কোণা পরিষ্কার করে, যেখান থেকে রক্ত ঝরছিল।

'এক্সিডেন্ট হয়ে যেত এতক্ষণে।' আকিফ বলল।

হাত মুছতে মুছতে সালারের আবার কানের দুলের কথা মনে পড়ে। নিচে ঝুঁকে পায়ের কাছে ওগুলো খুঁজতে লাগল।

‘গাড়ি ফুটপাতে উঠে যেত নাহলে...’ আকিফ কথা মাঝে থামিয়ে দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ‘কী খুঁজছ?’

‘এই কানের দুলগুলো।’ সালার সংক্ষেপে বলল।

আকিফ খেপে ওঠে। ‘কী সমস্যা? আমার গার্লফ্রেন্ডের কানের দুল। সমস্যা হলে আমার বা ওর হবে, তোমার না।’

সালার থেমে যায়। নিজের অযৌক্তিক আচরণ বোঝে। উঠে সোজা হয়ে গেল। বাইরে টিস্যু ফেলার সময় ওর দম আটকে আসে।

আরিফ ভ্রু ঝুঁচকে তাকায়। ‘তোমার আর সুনোবরের কিছু...?’ বলতে গিয়ে সাবধান হয়। আন্দাজ করার চেষ্টা করে শেষবার

ওর বাক্যে এমন কী ছিল, যা সালারকে উত্তেজিত করেছে।
সেই ভুল দ্বিতীয়বার করতে চায় না।

'I'm sorry!' আকিফের থেমে যাওয়ায় সালার বলে।

'ওকে ফাইন।' আকিফ কিছুটা স্বস্তি পায়। 'তুমি আর
সুনোবর...' আবার বলে।

'তুমি বলেছিলে ওর নাম ইমামা।' সালার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

ওর চোখ দেখে আকিফের আতঙ্ক লাগে। এগুলো কোনো
স্বাভাবিক মানুষের চোখ ছিল না। বিভীষিকা, রাগ, ভয়
সবরকম অভিব্যক্তি তার মাঝে।

‘হ্যাঁ। একবার আমাকে বলেছিল, শুরুর দিকে। নিজের
ব্যাপারে বলার সময়।’

'ওর বর্ণনা দিতে পারবে?' সালার ক্ষীণ আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, কেন না। অনেক সুন্দর, ফর্সা-লম্বা।' আকিফ থেমে থেমে বলল। 'কালো চোখ, চুলও আগে কালো ছিল; এখন ডাই করিয়েছে। আর কী বলবা'

সলার ঘায়েল হয়। চোখ বন্ধ করে উইন্ডস্ক্রিনে মুখ ঘুরিয়ে ফেলো। দমবন্ধ বেড়ে গেছে। 'ওর নাম কি ইমামা হাশিম?' বিড়বিড় করে।

'জানি না, বাবার নাম তো বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি।'

'ইমামা হাশিমই ওটা।' সালার বিড়বিড় করে। মুখ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। 'এসব আমার জন্য হয়েছে, সব...। আমি সবকিছুর জন্য দায়ী।'

‘কীসের জন্য দায়ী তুমি?’ আকিফ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

সালার উত্তর দেয় না। আকিফ উত্তরের অপেক্ষা করে। কয়েক মিনিটের নীরবতার পর সালার ঘাড় ঘুরিয়ে বলল।

‘আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই। এখন, এই মুহূর্তে।’

আকিফ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ড্যাশবোর্ড থেকে মোবাইল তুলে নাম্বার ডায়াল করে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর বলল। ‘ওর মোবাইল অফ। বাসায় পাওয়া যাবে কিনা জানি না, রাত হয়ে গেছে। আর রাতে ও।’ চুপ করে গাড়ি স্টার্ট দেয়। ‘কিন্তু ওর বাসায় নিয়ে যাচ্ছি।’

আধঘন্টা পর গাড়ি ডিফেন্সের এক বাংলোর সামনে থামে। সেখানে পৌঁছানো পর্যন্ত দু’জনের মাঝে কোনো কথা হলো না। আকিফ এখন সে সময়কে গালি দিতে থাকে মনে মনে, যখন সালারকে লিফট দিতে চেয়েছিল। কয়েকবার হর্ন দিলে

একটা লোক ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। উনি দারোয়ান হয়তো।

'সুনোবর বাড়িতে আছে?' আকিফ তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল।

'না, বিবি সাহেবা তো নেই।'

'কোথায় গেছে তাহলে?'

'আমি জানি না।'

আকিফ গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে সালারকে বলল। 'বসো, আমি আসছি।' আকিফ লোকটার সাথে ভেতরে চলে যায়। ফেরে দশ মিনিট পর।

'তুমি ওর সাথে কথা বলবে?' ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল আকিফ।

'আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই।'

আকিফ গাড়ি স্টার্ট করে। যাত্রা আবারও নীরবতায় কাটে। তখন নয়টা বাজছে, যখন ওরা রেড লাইট এরিয়ায় পৌঁছায়। সালারের জন্য জায়গাটা নতুন ছিল না। শুধু সেই যন্ত্রণার অনুভূতি নতুন ছিল, যা এবার অনুভব করছিল।

'আজ এখানে ও। এক লোক এখানের কিছু মেয়েকে বুক করেছে ফাংশনের জন্য। সুনোবরও যাচ্ছে।' আকিফ গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল। 'তুমিও বের হও, অনেক ভেতরে যেতে হবে। এখন সুনোবরকে তো তোমার সাথে দেখা করার জন্য এখানে ডেকে আনতে পারব না।'

সালার গাড়ি থেকে বের হয়। আকিফের সঙ্গে আবারও পাড়ি দিতে থাকে সেই গলি। শেষবার কবে এই জায়গায় এসেছিল খুব ভালো করে মনে আছে ওর। কিছু বদলায়নি। মানুষের মাংসের ব্যবসা এখনো এখানে খুব প্রচ্ছন্নতার পথে চলে। ওর পরিষ্কার মনে আছে প্রথমবার আঠারো বছর বয়সে এখানে

এসেছিল। তারপর বহুবার এখানে আসা-যাওয়া... বহুবার।
কখনো নাচ দেখতে, কখনো বিখ্যাত কোনো অ্যাঙ্ক্বেসের
নাজমা দেখতে। কখনো আবার এসব গলির দরজা, জানালা
বা বারান্দা দিয়ে অর্ধনগ্ন নারীদের দেখতে। এসব গলি দিয়ে
হাঁটার সময় অদ্ভুত আনন্দ কাজ করত ওর মাঝে। এখানে
যেকোনো বয়সের, যেকোনো চেহারার মেয়েকে কয়েক
ঘন্টার জন্য কিনে ফেলা যায়। ওয়ালেট থেকে বের হওয়া
মাত্র কিছু নোট এখানে থাকা যেকোনো মেয়ের মাথা থেকে
পা পর্যন্ত ওর করে দিত। পায়ের নিচে পৃথিবী ও জগৎ হাতের
মুঠোয় হওয়া আর কাকে বলে? এতে পৈশাচিক আনন্দ ছিল।
মাঝেমাঝে রাত কাটানোর জন্য এসব মেয়েদের কাছে
আসত, যাদের প্রতি ঘৃণা ছিল। যারা কয়েকটা নোটের
বিনিময়ে শরীর বিক্রি করে তাদের জন্য এরচেয়ে বেশি কী
অনুভূতি রাখা যায়? ঘৃণা সত্ত্বেও এইসব মেয়েদেরকে কিনত
ও, কারণ ওর কেনার ক্ষমতা ছিল।

আঠারো-উনিশ বছর বয়সে ও নিশ্চিত ছিল, এসব মেয়েদের
মধ্যে এমন কোনো মেয়ে থাকতে পারে না, যার সাথে ওর

সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। যোগাযোগ, রক্তের সম্পর্ক বা ভালোবাসা হতে পারে। ওর মা-বোন এলিট নারী ছিল। ওর স্ত্রীও একই ক্লাসের কোনো ফ্যামিলি থেকে আসবে। ওর মেয়েও এই ক্লাসে বড় হবে। রেড লাইট এরিয়ার মেয়েগুলো শরীর বিক্রির জন্যই জন্ম নেয়। ওর বিশ্বাস ছিল সোজা ঘাড়, উঁচু চিবুক এবং উখিত ভ্রুর এই প্রাণীগুলোকে যতটা ঘৃণা করা হোক, তা কম হয়ে যায়। যত অপমান করা হোক, তা যথেষ্ট নয়। 'কিন্তু আজ... ভাগ্য কী করল?'

সাত পর্দায় থাকা সেই মেয়ে, যার শরীরে কারো আঙুলের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে না ও, তাকে এই বাজারে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে? ওর কয়েক পা আগে সেই মানুষটা হাঁটছে, যে মেয়েটার একজন খরিদার। সালার সিকান্দার কিছু বলার মতো অবস্থায় ছিল না। কোনো আওয়াজ তুলতে পারেনি, কোনো অভিযোগ করতে পারেনি। কাউকে কী বলবে? আল্লাহকে কীভাবে জিজ্ঞেস করবে, কেন এমন হলো? ওর ভুল কী ছিল? ঠোঁট কামড়ে ধরে। কীভাবে এই কাঁপুনি থামবে? এই গলিতে আসা কোনো মানুষ কি

নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবে- তার ঘরের, নিজের পরিবারের কোনো মেয়ে কখনো এই বাজারে আসবে না? অন্য পুরুষের পকেটে থাকা নোটের সামনে বিক্রি হয়ে যাবে না? মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে, নাতনি বা আগামী প্রজন্মেরও কেউ।

সালার সিকান্দারের গলা থেকে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ইমামা হাশিম তার স্ত্রী, তার অর্ধাঙ্গিনী। এলিট ক্লাসের সেই মেয়ে, যার এই বাজারের সাথে কখনো কোনো সম্পর্ক হওয়ার কথা না। নিজেকে আরও একবার মার্গাল্লার পাহাড়ে, সেই রাতের মতো অন্ধকারে গাছের সাথে বাঁধা অবস্থায় অনুভব করে। অসহায়ত্বের শেষ সীমায় খুঁজে পায় নিজেকে।

'সাহেব! আমার সাথে চলুন। সব বয়সের মেয়ে। এই এলাকার সবচেয়ে ভালো মেয়ে। দামও বেশি না।' ওর পাশে একজন লোক হাঁটতে হাঁটতে বলল। 'আমি এর জন্য আসিনি।' সালার নিচু গলায় লোকটার দিকে না তাকিয়ে বলল।

'কোনো ড্রিংক'স? কোনো ড্রাগস? আমি সবকিছু সাপ্লাই দেই।'

আকিফ একটু ধমক দিয়ে লোকটাকে বলল। 'তোমাকে একবার বলল না দরকার নেই, তাহলে পেছনে কেন পড়েছ?'

লোকটার পা থেমে যায়। সালার নীরবে হাঁটতে থাকে। মস্তিষ্কে ঝড় চলছিল। ইমামা হাশিম! এখানে, কখন, কেন, কীভাবে এলো? অতীত একটা চলচ্চিত্রের মতো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'প্লিজ! তুমি একবার, শুধু একবার তার কাছে গিয়ে আমার ব্যাপারে সব বলো। তাকে বলো আমাকে বিয়ে করে নিতে। তাকে বলবে আমার কিছু দরকার নেই, শুধু একটা নাম। তাকে হজরত মুহাম্মাদ সা.-র দোহাই দিলে না বলতে পারবে না। জালাল এত ভালোবাসে নবী সা.-কে।' কয়েক বছর আগে ঘুম-ঘুম চোখে বিছানায় চিপস খেতে খেতে মোবাইলের এপাশ থেকে ইমামার অনুনয় শুনছিল ও।

'বাই দ্য ওয়ে, তুমি ইমামার কী হও?' 'আমি...! আমি আর ইমামা খুব ঘনিষ্ঠ আর পুরনো বন্ধু।' জালাল আনসারের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। সালার তখন অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল। জালাল তখন ইমামা আর ওকে নিয়ে কী ভাবছিল ভালো করে আন্দাজ করতে পারছিল। 'ইমামাকে গিয়ে পরিকার বলে দাও আমি ওকে বিয়ে করব না।' জালাল আনসারের এই খবরে ইমামার চেহারা দেখতে চেয়েছিল ও। চুইংগামের বাবল বানাতে বানাতে ইমামাকে ফোনে এই খবর দিয়েছিল।

"তুমি আমার এত উপকার করেছ, ব্যস আরেকটা উপকার করো; আমায় তালাক দিয়ে দাও।" ইমামা ফোনে অনুরোধ করেছিল। 'আর না, তোমার উপকার করতে করতে ক্লান্ত আমি। তাই এখন আর কোনো উপকার করতে পারব না। আর এই উপকার...এটা তো অসম্ভব!' ও উত্তরে বলেছিল। 'তুমি তালাক চাইলে কোটে গিয়ে নাও। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি না।' সালারের গলায় ফাঁস পড়তে থাকে। 'হ্যাঁ, আমি এসব করেছি। কিন্তু আমি তো জালালের ভুল বোঝাবুঝি

দূর করে দিয়েছি। সব বলেছি, কিছু গোপন রাখিনি। আমি শুধু একটা মজা করেছিলাম। একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক্স! এটা চাইনি ইমামার সাথে এমন কিছু হোক।" যেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। 'ঠিক আছে আমি অন্যায় করেছি তালাক না দিয়ে। কিন্তু এমন কিছু তো চাইনি যে এখানে আটকে পড়ুক। আমি ওকে বাড়ি ছাড়তে নিষেধ করেছি। মজা করেই হোক সাহায্যের অফার করেছি। আমি তো ওকে এখানে নিয়ে আসিনি। কেউ আমাকে দায়ী করতে পারবে না এসবের জন্য।' অসংলগ্ন বাক্যে অজুহাত দিচ্ছিল নিজেকে।

মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। মাথাব্যথার এক ভয়ানক পরিচিত নাম হচ্ছে মাইগ্রেন, মাথার একপাশের ব্যথা। মাইগ্রেন, মাইগ্রেনের আরেকটা অ্যাটাক। হাঁটা বন্ধ করে থেমে যায় ও। ঠোঁট কামড়ে অসহায়ভাবে কপাল চেপে ধরল। ব্যথার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে গলির মোড় দেখে। এটা অন্ধ গলি, অন্তত ওর আর ইমামার জন্য। পা আগে বাড়ায়। আকিফ একটা চৌকো আকৃতির বাড়ির সামনে থামে। ঘুরে সালারের দিকে তাকিয়ে বলল। 'এটাই বাড়ি।'

সালারের চেহারা আরও বিবর্ণ হয়। 'কেয়ামত আর কতখানি দূরে রয়েছে...?'

'উপরে যেতে হবে, সুনোবর ওখানো।' আকিফ সরু ও অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে।

সালার প্রথম সিঁড়িতেই হোঁচট খায়। আকিফ ওর দিকে তাকিয়ে থেমে যায়।

'সাবধানে! সিঁড়ির অবস্থা খুব একটা ভালো না। তার ওপর এরা বাঁধ লাগাতেও অভ্যস্ত না।'

সালার সোজা হয়ে আকিফের সাহায্য নিয়ে সামনের সিঁড়িতে পা রাখে। সিঁড়িগুলো গোলাকার হয়ে উপরে গেছে। আর তা এত সরু যে, একসময় মাত্র একজন মানুষই উঠতে পারবে। নিচের সিমেন্ট এবড়ো-খেবড়ো। বুট পায়ে থাকলেও ওখানকার জরাজীর্ণ অবস্থা টের পাওয়া যাচ্ছে। যেই দেয়াল ধরে উঠছিল, সেখানের সিমেন্টও খসে খসে পড়ছে। সালার

অন্ধ মানুষের মতো দেয়াল ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। দোতলার খোলা দরজা থেকে আসা আলো ওকে দেখতে সাহায্য করে। আকিফ আশেপাশে নেই। নিশ্চয়ই দরজা পার করে ভেতরে ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ দেমে দরজার ভেতরে পা রাখে ও। এটা একটা বারান্দা। একপাশে অনেকগুলো রুমের দরজা, অন্যপাশে কিছু নেই: নিচের গলি দেখা যায়। লম্বা বারান্দাটা একবারে ফাঁকা। ওখানে দাঁড়িয়ে সব দরজাই বন্ধ মনে হয় ওর। আকিফ কোনদিকে গেছে বুঝল না। খুব সাবধানে পা বাড়ায়, যেন কোনো ভূতের বাংলোতে ঢুকে পড়েছে।

'এখন যদি কোনো দরজা খুলে ইমামা হাশিম সামনে এসে দাঁড়ায়? আমার আল্লাহ! আমি আমি এখানে কীভাবে ওর মুখোমুখি হব?' হৃদয় ডুবতে থাকে। বন্ধ দরজাগুলোর দিকে তাকিয়ে সামনে হাঁটতে থাকে কেবল। বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা দরজা থেকে আকিফ উঁকি দিয়ে জোরে জোরে বলে। 'এখনো ওখানে? এদিকে আসো।' পায়ের গতি দ্রুত হয়ে যায় ওর। তবে দরজায় পৌঁছানোর আগে কিছুক্ষণ থামে। নিজের

হৃৎস্পন্দনের শব্দ বাইরে থেকে শুনছিল। চোখ বন্ধ করে, ঠান্ডা হাত দুটো মুঠ করে নিয়ে রুমের ভেতরে ঢুকল। আকিফ একটা চেয়ারে বসে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আকিফের সঙ্গে কথা বলছে।

'এটা ইমামা না।' সালারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

'হ্যাঁ, এটা ইমামা না। ও ভেতরে, চলো।' আকিফ উঠে আরেকটা রুমের দরজা খোলে।

সালার ভারী পায়ে বন্ধুকে অনুসরণ করে। আকিফ এই রুম পার করে আরেকটা দরজা খুলে অন্য এক রুমে ঢুকল। 'হ্যালো সুনোবর!' দূর থেকে আকিফকে বলতে শোনে। ওর হৃদয় লাফিয়ে গলায় এসে পড়ে। মন বলছিল সেখান থেকে পালিয়ে যেতে- এখন, এই মুহূর্তে, খুব দ্রুত কোনো দিকে না তাকিয়ে। এই রুম থেকে, এই এলাকা থেকে, এই শহর

থেকে, এই দেশ থেকে। একবারও পেছনে না ফিরে। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের দরজাটা দেখল।

'এসো সালার!' আকিফ ওকে ডাক দিয়ে ভেতরে থাকা মেয়েটার সাথে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সালার খুতু ফেলল। ওর গলা কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। সামনে আগায়। আকিফ পেছনে ওর পায়ের আওয়াজ শুনে দরজা থেকে সরে যায়। সালার দরজায় দাঁড়ানো। আকিফ রুমের মাঝখানে।

'এই হচ্ছে সুনোবর।' আকিফ পরিচয় করিয়ে দেয়।

সালার চোখ সরাতে পারে না। মেয়েটাও স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। 'ইমামা...?' বিড়বিড়িয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, ইমামা।' আকিফ নিশ্চিত করে ওকে।

সালার হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ে।

আকিফ ভয় পেয়ে যায়। 'কী হয়েছে?'

দুই হাত বিছিয়ে সেজদায় চলে যায়। পতিতগৃহে সেজদা করা প্রথম লোক ছিল ও। আকিফ নিচে বসে কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে। সালার সেজদায় বাচ্চাদের মতো কাঁদছিল। 'পানি... পানি আনো।' আকিফ বলে।

সুনোবর ঘাবড়ে গিয়ে বিছানার পাশ থেকে জগ-গ্লাস নিয়ে আসে। গ্লাসে পানি ঢেলে সালারের পাশে এসে দাঁড়ায়। 'সালার সাহেব! আপনি পানি নিন।'

সালার এক ঝটকায় উঠে বসে। যেন শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেছে। মুখ কান্নায় ভেজা। কিছু না বলে জিপ্সের পকেট থেকে নিজের ওয়ালেট বের করে পাগলের মতো একের পর এক কারেন্সি নোট বের করে সুনোবরের সামনে রাখছিল। কয়েক সেকেন্ডে পুরো ওয়ালেট খালি করে ফেলে। ক্রেডিট কার্ড ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। এরপর উঠে দাঁড়ায়।

উল্টো পায়ে দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে রুমের বাইরে আসে। আকিফ হতভম্ব হয়ে ওর পিছু নেয়।

'সালার! সালার! কী হয়েছে, কোথায় যাচ্ছ?' কাঁধ ধরে থামানোর চেষ্টা করে।

সালার পাগলের মতো নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। 'ছাড়ো আমাকে। হাত লাগাবে না। আমাকে যেতে দাও।' জোরে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করছিল।

'ইমামার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে তুমি।' আকিফ ওকে মনে করায়।

'এটা ইমামা না, ও ইমামা হাশিম না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমার সাথে যাবে তুমি।'

'আমি যেতে পারব। তোমাকে দরকার নেই আমার।' পিছপা হয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায় ও। আকিফ বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে। মুড অফ হয়ে গেছে। ঘুরে সুনোবরের রুমে ঢোকে। সুনোবর এখনো বিস্ময় নিয়ে নোটের ভূপের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সিড়িগুলো এখনো আগের মতোই অন্ধকার। কিন্তু এবার সালার যে মানসিক অবস্থার মধ্যে ছিল, তাতে ওর কোনো দেয়াল-সাহায্য বা আলোর প্রয়োজন ছিল না। ও সিড়ি দিয়ে অন্ধের মতো নিচের দিকে দ্রুত নামতে শুরু করে, ফলস্বরূপ বাজেভাবে পড়ে যায়। সিড়ি সোজা হলে একবারে নিচে পড়ত। কিন্তু সিড়ির ধরন গোলাকার হওয়ায় বেঁচে গেছে। অন্ধকারে আবার উঠে দাঁড়ায় ও। হাঁটু আর গোড়ালির যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আগের গতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা করে। কয়েক সিঁড়ি পার হওয়ার পর দেওয়া লাফ ওকে নিচে ফেলে দেয়। এবার মাথা গিয়ে দেয়ালের সাথে বাড়ি লাগে। কিন্তু ভাগ্য ভালো ওর হাড় ভাঙেনি। হয়তো উপরের সিঁড়ি থেকে পড়ে শেষ সিঁড়িতে পড়েছে। কারণ সামনে গলির আলো

দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি থেকে নেমে এলেও সামনে যেতে পারল না। কয়েক কদম এগিয়ে বাড়ির বাইরে রাখা চৌকির উপর বসে পড়ল। বমি আসছে। মাথা চেপে নিচু হয়ে ওয়াক ওয়াক করে। চোখের পানি তখনো থামেনি।

গলি দিয়ে যাতায়াত করা মানুষের জন্য এই দৃশ্য নতুন না। এখানে অনেক মদ্যপ, মাদকাসক্তরা অতিরিক্ত নেশা করে ফেলার পর এমনই করে। শুধু ওর বেশভূষা, চেহারা কিছুটা বেমানান। ওর কান্না আর উন্মাদনা কোনো পতিতার অবিশ্বাসের পরিণাম হিসেবে ধরা হচ্ছিল। পতিতাদের আস্তানা সবার হজমের বিষয় না। পথচারীরা যেতে যেতে তাকিয়ে হাসছিল। কেউ ওর কাছে আসেনি। এই বাজারে অন্যের খোঁজখবর নেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই।

আকিফ নিচে আসেনি। এলে হয়তো ওর পাশে থাকত। ইমামা হাশিম ওখানে ছিল না। সুনোবর ইমামা হাশিম না। কত বড় বোঝা ওর কাঁধ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কী ভীষণ যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, আঘাত দেওয়া হয়েছে;

কিন্তু তা বাড়ানো হয়নি। শুধু আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করিয়ে ওকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। ইমামাকে এখানে না পেয়ে ওর এই অবস্থা, যদি পেয়ে যেত তবে কী হতো? আল্লাহকে ভয় পাচ্ছিল, সীমাহীন ভয়। তিনি কী পরিমাণ ক্ষমতাবান। কী আছে যা করতে পারেন না। তিনি কী পরিমাণ দয়ালু! কত কী করেন না। মানুষকে কীভাবে মানুষ রাখতে হয়, তিনি জানেন। কখনো কঠোর হয়ে কখনো সদয় হয়ে: মানুষকে বৃত্তের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখেন।

নিজের জীবনের সেই কালো অধ্যায়ের প্রতি কখনো এত ঘৃণা, এত অনুশোচনা অনুভব করেনি, যতটা এই মুহূর্তে করছিল। 'কেন, কেন...? আমি কেন এখানে আসতাম? কেন কিনতাম আমি মেয়েদেরকে? কেন গুনাহের উপলব্ধি আমার মাঝে জাগত না?' রাস্তার পাশে বসে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে আত্ননাদ করে ও। 'আর যখন আমি সব ছেড়ে দিয়েছি, তাহলে... তাহলে কেন এখন...? এই ব্যথা, এই যন্ত্রণা কেন অনুভব করছি? আমি জানি, জানি নিজের সব আমলের জবাব দিতে হবে। কিন্তু সেই হিসাব এখানে,

এমনভাবে নিও না আল্লাহ! যেই মেয়েটাকে আমি ভালোবাসি, তাকে বাজারে এনে দাঁড় করিয়ে না। কাঁদতে কাঁদতে থেমে যায়।

'কোথায় হওয়া স্বীকারোক্তি কোথায় হচ্ছে? ভালোবাসা?' গলি দিয়ে যাতায়াত করা মানুষজনের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে। 'আমি কি... আমি ওকে ভালোবাসি...?' অজানা এক তরঙ্গ মাথা থেকে পা পর্যন্ত বয়ে যায়। 'এই যন্ত্রণা কি শুধু এ কারণে হচ্ছিল যে, আমি ইমামাকে.... উপর দিয়ে ছায়া ভেসে গেল। 'তাহলে এটা আমার অনুশোচনা না, অন্যকিছু?' এর মনে হলো এখান থেকে আর কখনো উঠতে পারবে না।

তার মানে এটা অনুশোচনা না, ভালোবাসা; যার পেছনে আমি ছুটছি?' ওর কাছে নিজের শরীর বালির তৈরি মনে হলো। 'ইমামা ফাঁসির দড়ি না, মনের অসুখ।' তখনো ওর গাল গড়িয়ে চোখের পানি ঝরছে। 'মেয়েটাকে এই বাজারে খুঁজতে গিয়ে আমার পা এজন্য কাঁপছিল যে, আমি ওকে

নিজের হৃদয়ের মাঝে খুব উঁচু জায়গাতে রেখেছি। এমন জায়গায়, যেখানে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিলাম না।
Check mate!

১৫০+ আইকিউ লেভেলের সেই পুরুষ মুখ খুবড়ে পড়েছে।
আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ও। 'কোন ক্ষত নতুন করে ব্যথা দিচ্ছে? এই যন্ত্রণার কী নাম, যা শ্বাস নিতে দিচ্ছে না? আয়না ওকে কোথায় কী দেখাচ্ছে, বিবেক ওকে কী মনে করিয়ে দিচ্ছে, কী কেড়ে নিতে চায়?' সেখান থেকে উঠে হাঁটা শুরু করে, কাঁদতে কাঁদতে। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে।
আশেপাশের তাকিয়ে থাকা মানুষের চাহনি পরোয়া না করে। নিজের সত্তার ওপর এত ঘৃণা এর আগে কখনো অনুভব করেনি, যতটা এখন করছিল। রেড লাইট এরিয়া ওর জীবনের সবচেয়ে কালো অধ্যায়। এমন কালো অধ্যায়, যা ও খুবলে নিজের জীবন থেকে উপড়ে ফেলতে পারছে না। আবারও তা ওর জীবনে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক বছর আগে এখানে কাটানো রাতগুলো অশুভ ছায়ার মতো তাড়া করছে, যা থেকে পালাতে পারছে না। আর এখন যে ভয় এর মাঝে বাসা

বেঁধেছিল, সেটা যদি হতো... 'যদি ইমামা সত্যিই এই বাজারে থাকত...? সুনোবর ইমামা হাশিম না, কিন্তু অন্য কেউ...?' ওর মাথাব্যথা বেড়ে যায়। মাইগ্রেন খারাপের দিকে যাচ্ছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে আসে। গাড়ির হর্ন, রোড লাইটের আলো ওর ব্যথা বাড়িয়ে তুলছিল। মস্তিষ্ক অন্ধকারে ডুবতে শুরু করে।

বিড়বিড় করে কিছু বলল। অপর এক কণ্ঠ উত্তরে কিছু বলল। সালারের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে কাজ করতে শুরু করে, বহুকালের ক্লান্তি কাটিয়ে। মস্তিষ্ক কণ্ঠগুলো চেনার চেষ্টা করছে। খুব ধীরে ধীরে চোখ মেলল। অবাক হয়নি এখানেই থাকার কথা। ও হসপিটাল বা ক্লিনিকের কেবিনের বিছানা। একটু দূরে থাকা ফুরকান অন্য একজন ডাক্তারের সঙ্গে মৃদু আওয়াজে কথা বলছিল। সালার একটা লম্বা শ্বাস নেয়। ফুরকান আর অন্য ডাক্তার কথার ফাঁকে মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখে কাছে আসে। ও আবার চোখ বন্ধ করে নেয়। চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। ফুরকান কাছে এসে আলতো করে ওর বুকে হাত রাখে।

'এখন কেমন লাগছে সালার?'

সালার চোখ মেলে। হাসতে চেষ্টা করেনি। কয়েক মুহূর্ত শূন্য মস্তিষ্ক নিয়ে ফুরকানের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'ফাইন' তারপর বলে।

অন্য ডাক্তার ওর পালস চেক করে। সালার আবার চোখ বন্ধ করে নেয়। ফুরকান আর অন্য ডাক্তার আবার কথা বলছিল। তাদের কথোপকথনে মোটেও আগ্রহ নেই ওর। সেই মুহূর্তে আদতে কোনো কিছুতে আগ্রহ অনুভব করছিল না। বাকি সব আগের মতোই ছিল অপরাধবোধ, অনুশোচনা, আকিফ, সুনোবর... ইমামা... রেড লাইট এরিয়া। সবকিছুই। ওর মন বলছিল এখনই যদি জ্ঞান না ফিরত।

'তো সালার সাহেব! এখন বিস্তারিত কথা বলা যাক আপনার সাথে।' ফুরকানের গলা শুনে ও চোখ মেলে। ফুরকান বিছানার কাছে থাকা একটা টুলের উপর বসছে। অন্য ডাক্তার রুমে থেকে বেরিয়ে গেছে। সালার পা ভাঁজ করার চেষ্টা

করল। মুখ থেকে অস্ফুট গোঙানি বের হয়। হাঁটু আর গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা লাগে। পায়ের উপর কম্বল দেওয়া, তাই অবস্থা দেখতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে পারে হাঁটু, গোড়ালি ব্যান্ডেজ করা। পরনে নিজের পোশাকও নেই, হসপিটালের রোগীদের পোশাক।

'কী হয়েছে?' সালার ব্যথায় ককিয়ে পা সোজা করে বলল।

'Sprained ankle-তোমার গোড়ালি মচকে গেছে। দুই হাঁটু আর উরুতে স্ক্র্যাচ লেগে ফুলে উঠেছে। তবে ভাগ্যক্রমে ফ্র্যাকচার হয়নি। বাহু আর কনুইতে কিছু ব্রুজ, সৌভাগ্যক্রমে আবারও কোনো ফ্র্যাকচার নেই। মাথার বাঁ-দিকে ছোট একটা কাট, সামান্য তবে সিটি স্ক্যান অনুযায়ী সিরিয়াস কোনো ইনজুরি নেই। বুকে ঘর্ষণজনিত কারণে অল্প কিছু আচড় লেগেছে। যতদূর প্রশ্ন রইল কী হয়েছে, সেটা তুমি বলবে, কী হয়েছে?'

ফুরকান একজন পেশাদার ডাক্তারের মতো বলল। সালার চুপচাপ তাকিয়ে আছে।

'প্রাথমিক ধারণা ছিল মাইগ্রেনের মারাত্মক অ্যাটাকের কারণে তুমি বেহুশ হয়ে গেছ। কিন্তু পরে চেক-আপ করে বুঝলাম এমন না। কেউ তোমার ওপর হামলা করেছিল?' ফুরকান গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করছে।

সালার একটা লম্বা শ্বাস টেনে মাথা নিচু করে নেয়। 'তুমি আমার কাছে কীভাবে পৌঁছালে? মানে আমি এখানে কীভাবে এলাম?'

'আমি তোমার মোবাইলে কল করেছিলাম। তোমার বদলে অন্য এক লোক কল রিসিভ করে। সে তখন ফুটপাথে তোমার পাশে ছিল। তোমার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টায়। সে আমাকে তোমার অবস্থার কথা জানায়। লোকটা ভালো মানুষ। আমি তাকে পরামর্শ দেই ট্যাক্সি দিয়ে তোমাকে

আশপাশের কোনো হসপিটালে নিয়ে যেতে। সে নিয়ে যায়,
আমি ওখানে পৌঁছাই। এরপর এখানে নিয়ে আসি।

'এখন কয়টা বাজে?'

'সকাল ছয়টা। সামির তোমাকে রাতে পেইন কিলার দিয়েছে
তাই এই পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলো।' বলতে বলতে ফুরকান টের
পায় সালার শুনতে ইচ্ছুক না। ওর চোখজুড়ে এক অদ্ভুত
শীতলতা। এমন কিছু, যেন ফুরকান কোনো তৃতীয় ব্যক্তির
অবস্থা সম্পর্কে ওকে বলছে।

'তুমি আমাকে... আবারও...' ফুরকানকে চুপ করে থাকতে
দেখে সালার বলে। চোখ বন্ধ করে গুছিয়ে নেয় কী বলতে
চায়, মস্তিষ্কের ওপর জোর দেয়। 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে কোনো
ট্রানকুইলাইজার দাও। আমি অনেকক্ষণ ঘুমাতে চাই।'

'অবশ্যই ঘুমাবে, কিন্তু বলবে তো কী হয়েছিল?'

'কিছু না।' সালার নিষ্প্রভ হয়ে বলে। 'মাইগ্রেন, এরপর ফুটপাথে পড়ে যাই, যার কারণে আঘাত লেগেছে।'

ফুরকান মনোযোগ দিয়ে ওর দিকে তাকায়। 'কিছু খেয়ে নাও।'

'না, ক্ষুধা নেই। তুমি শুধু কোনো ট্যাবলেট, ইনজেকশন যাইহোক দাও... আমি খুব ক্লান্ত।'

'ইসলামাবাদে তোমার পরিবারের কাছে...'

সালার কথা শেষ করতে দিলো না। 'তাদেরকে খবর দিও না। ঘুম থেকে উঠে আমি ইসলামাবাদ যাব।'

'এই অবস্থায়?'

'তুমি বলেছ আমি ঠিক আছি।'

'ঠিক আছো, কিন্তু এত না। দু'চারদিন বিশ্রাম করো লাহোরে।
তারপর যেও।'

'ঠিক আছে, তবে পাপা আর মাম্মিকে খবর দিও না।'

ফুরকান অবোধ্য ভঙ্গিতে তাকায়। কপালে ভাঁজ পড়ে।
'আচ্ছা, আর কিছু?'

'ট্রানকুইলাইজার।'

ভাবতে ভাবতে ফুরকান ওকে দেখতে থাকে। 'আমি কি
তোমার সাথে থাকব?'

'ফায়দা? আমি এখনই ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি যাও, উঠে কল
করব।' সালার হাত দিয়ে চোখ ঢেকে নেয়।

এই রুঢ়তা আর শীতলতা ফুরকানকে কিঞ্চিৎ চিন্তায় ফেলে।
ওর আচরণ বেশ অস্বাভাবিক। 'সামিরের সাথে কথা বলছি।

কিন্তু ট্রানকুইলাইজার চাইলে, আগে কিছু খেতে হবে।
ফুরকান ওঠার সময় সোজাসাপ্টা বলল।

সালার চোখে থেকে হাত সরায়নি। পরেরবার যখন ওর চোখ
খোলে, তখন প্রায় সন্ধ্যা। রুম খালি, কেউ নেই।
শারীরিকভাবে সকালের চেয়ে বেশি ক্লান্তবোধ করছে।
পায়ের উপর থেকে কম্বল ফেলে বাম গোড়ালি আর হাঁটুর
তীব্র ব্যথা উপেক্ষা করে পা ভাঁজ করল। নিজের ভেতর
অদ্ভুত দমবন্ধ অনুভূতি টের পায়। এমন দমবন্ধ, যেন কেউ
বুক চেপে ধরে রেখেছে। শুয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে
রইল। এরপর হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় উঠে যায়।

সালার হোটেলে ফিরে নিজের জিনিসপত্র প্যাকিং করছিল,
এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। দরজা খুলে ফুরকানকে
দেখে অবাক হয়। আশা করেনি এত দ্রুত ওর নাগাল পেয়ে
যাবো।

‘আজব মানুষ সালার তুমি।’ ফুরকান ওকে দেখামাত্র রাগ নিয়ে বলল। ‘এভাবে কাউকে না বলে সামিরের ক্লিনিক থেকে এসে আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছ। তার ওপর ফোন অফ করে রাখা।’

সালার কিছু বলল না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ব্যাগের কাছে এসে জিনিসপত্র প্যাক করতে থাকে।

‘তুমি চলে যাচ্ছ?’ ফুরকান ব্যাগ দেখে চমকায়।

‘হ্যাঁ।’ সালার এক শব্দে উত্তর দেয়।

‘কোথায় যাবে, ইসলামাবাদ?’

সালার ব্যাগের জিপ বন্ধ করে বিছানায় বসে। ‘না।’

ফুরকান ওর সামনের সোফায় বসে। ‘তাহলে?’

'করাচি যাচ্ছি।'

'কেন?'

'ফ্লাইট আমার।'

'প্যারিসের?'

'হ্যাঁ।'

'চারদিন পর তোমার ফ্লাইট, এখন গিয়ে কী করবে? তাহলে সামিরের অনুমান ঠিক।'

ওর চেহারার অভিব্যক্তি ভীষণ অচেনা লাগছে। 'কাজ আছে আমার ওখানে।'

'কী কাজ আছে?'

উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে চুপ করে থাকে ও। ফুরকান সাইকোলজিষ্ট না, তবুও বিপরীত সেই মানুষটার চোখ পড়তে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। ওর চোখে কিছু নেই, শীতলতা ছাড়া। যেন কাউকে চেনে না ও, নিজেকেও না... অন্য কাউকেও না। ও যে ডিপ্রেসড, ফুরকানের তাতে সন্দেহ রইল না। কিন্তু এই ডিপ্রেসন ফুরকানের তা অজানা।

'তোমার আসলে সমস্যা কী সালার?' প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না।

সালার থমকে ছিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'কোনো সমস্যা নেই।'

‘তাহলে, এইসব...?’

'তুমি জানো আমার মাইগ্রেন আছে। মাঝেমধ্যে এমন হয়ে যায় আমার সঙ্গে।'

'আমি একজন ডাক্তার সালার!' ফুরকান গম্ভীর হয়ে বলল।
'মাইগ্রেন সম্পর্কে আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। এসব
মাইগ্রেনের জন্য হয়নি।'

'তাহলে তুমি বলো আর কী কারণ হতে পারে?' সালার পাল্টা
প্রশ্ন করে।

'কোনো মেয়ে নিয়ে সমস্যা?'

সালার চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়। ফুরকান কোথায়
গিয়ে পৌঁছেছে। 'হ্যাঁ।' ওর জানা নেই 'না' কেন বলেনি।

'কারো সাথে ইনভলভ তুমি?' নিজের আন্দাজ সত্য হওয়ায়
ফুরকানের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

"হ্যাঁ।"

ফুরকান অনেকক্ষণ চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। যেন নিজের অবিশ্বাসের ওপর কাবু পাওয়ার চেষ্টা করছে। 'কার সাথে ইনভলভ তুমি?'

'তুমি ওকে চিনবে না।'

'বিয়ে করতে পারোনি ওকে?'

সালার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে। 'করে ফেলেছিলাম।' ওর কণ্ঠে কিছু ছিল।

'বিয়ে হয়ে গিয়েছিল?' ফুরকান আবারও বিশ্বাস করতে পারল না।

‘হ্যাঁ।’

'তাহলে... তালাক হয়ে গেছে?'

'না।'

'তো?'

সালারের কাছে সামনে বলার মতো কিছু ছিল না। 'তো ব্যস।'

'তো ব্যস কী?'

সালার মাথা নিচু করে ডান হাতের হৃদয়-রেখার উপর বাঁ-
হাতের আঙুল নাড়াতে থাকে।

'নাম কী ওর?' ফুরকান ওকে জিজ্ঞেস করল।

সালার রেখার উপর আঙুল বোলাতে বোলাতে চুপ থাকে।
অনেকক্ষণ...

এরপর বলে। 'ইমামা হাশিম।'

ফুরকানের শ্বাস বহাল হয়। এখন বুঝতে পারে তার ছোট মেয়েকে সালার কেন গাদা গাদা উপহার দেয়। গত কয়েক বছর ধরে যখন থেকে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকে সালার আর ইমামার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পাকিস্তান থেকে চলে গেলেও ইমামার জন্য কিছু না-কিছু পাঠাতে থাকত। কিন্তু ফুরকান প্রায়ই একটা বিষয়ে অবাক হতো, সালার কখনো ইমামার নাম ব্যবহার করত না। নিজে থেকে কথা বললেও নাম ছাড়া সম্বোধন করত। ফুরকান কয়েকবার বিষয়টা টের পেলেও অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু ইমামা হাশিমের নাম শুনে বুঝল, কেন তার মেয়ের নাম ধরে ডাকত না সালার।

সালার থেমে থেমে অসংলগ্ন বাক্যে ম্লান কণ্ঠে নিজের আর ইমামার ব্যাপারে বলছিল। ফুরকান শুদ্ধ হয়ে তা শুনতে থাকে। সব খুলে বলে যখন চুপ হয় ও, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুরকানও কিছু বলতে পারে না। বুঝতে পারছিল না কী বলবে, সান্ত্বনা দেবে নাকি অন্যকিছু... কোনো পরামর্শ?

'ওকে ভুলে যাও।' অবশেষে বলেই ফেলল। 'নিজেকে বলো ও যেখানেই থাকুক ভালো আছে, নিরাপদে আছে। এমন ভাবা জরুরি না যে, ওর সাথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। হতে পারে ও সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছে।' ফুরকান বলতে থাকে। 'তুমি ওকে সাহায্য করেছ যতটা তোমাকে দিয়ে হয়েছে। অনুশোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত করো। আল্লাহ মানুষের সাহায্যের জন্য আছেন। তোমার পরে হয়তো ও আরও ভালো কাউকে খুঁজে পেয়েছে। তুমি কেন এসব ভুল আন্দাজ করে বসে আছো? আমার মনে হয় না জালালের সাথে বিয়ে না হওয়ার কারণ তুমি ছিলে। যতটুকু জালালের ব্যাপারে বললে তাতে আমার অনুমান ছেলেটা কোনো অবস্থাতেই ইমামাকে বিয়ে করত না, হয়তো তুমি মাঝখানে না এলেও, চেষ্টা করলেও। যতদূর ইমামাকে তালাক না দেওয়ার বিষয় রইল, তবে ওর উচিত ছিল তোমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা। করলে তুমি অবশ্যই তালাক দিয়ে দিতে। এ ব্যাপারে তোমাকে দিয়ে ভুল হয়েছে, তবে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবেন। কারণ তুমি অনুতপ্ত, আল্লাহর কাছে মাফ চাইছ। এটাই যথেষ্ট। কিন্তু এভাবে ডিপ্রেশনে

ভুগে কী হবে?' ওর নীরবতা দেখে ফুরকানের মাঝে আশা জাগে হয়তো চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে। কিন্তু লম্বা পরামর্শের পর যখন চুপ হয়, সালার উঠে নিজের ব্রিফকেস খুলতে থাকে। 'কী করছ?' ফুরকান জিজ্ঞেস করল।

‘আমার ফ্লাইটের টাইম হচ্ছে।’

ও ব্রিফকেস থেকে কাগজপত্র বের করছিল। ওকে আর কী বলা যায় ফুরকানের মাথায় আসে না।

গত কয়েক বছরে সালার বহুবার পাকিস্তানে যাওয়া-আসা করেছে। কিন্তু কখনো ফেরার পথে এ ধরনের অনুভূতির মুখোমুখি হয়নি, যা এবার হচ্ছে। প্লেন টেকঅফ করার সময় এক অদ্ভুত শূন্যতা নিজের মাঝে অনুভব করে। প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দেয়। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তের কোথাও না-কোথাও ইমামা হাশিম নামের মেয়েটা আছে। এখানে থাকলে কখনো, কোথাও, কোনোভাবে হয়তো দেখা হয়ে যেত ওদের। ইমামাকে পাওয়া যেত, অথবা এমন কাউকে

খুঁজে পাওয়া যেত যে, ইমামাকে চেনে। কিন্তু এখন ও যেখানে যাচ্ছে, সেখানের কোথাও ইমামা হাশিম নেই। কোনো কাকতালীয় ঘটনাও ওদেরকে মুখোমুখি করতে পারবে না। আবারও সব ইচ্ছেকে পেছনে ফেলে দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে যাচ্ছিল ও। জীবনে কতবার এভাবে ইচ্ছেদের মাটিচাপা দিয়ে চলে যেতে হবে?

দশ মিনিট পর পানির সাথে ট্রানকুইলাইজার গেলার সময় অনুভব করে, জীবনের কোথাও দাঁড়িয়ে নেই ও। কখনো দাঁড়াতেও পারবে না কোথাও। কখনো পায়ের নিচে মাটি অনুভব করবে না। সাত তলার উপরে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলার সময় ভেতর থেকে কেউ বলে ওঠে এখানে আসতে চায়নি ও, অন্য কোথাও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু কোথায়...? অ্যাপার্টমেন্টের দরজা লক করে লাউঞ্জের টিভি অন করে। সিএনএনে নিউজ বুলিটিন সম্প্রচার হচ্ছে। জুতা আর জ্যাকেট খুলে একপাশে ফেলে রিমোট নিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ে। শূন্য মস্তিষ্কে চ্যানেল বদলাতে গিয়ে এক চ্যানেল

থেকে ভেসে আসা আওয়াজ ওকে থামায়। একজন বিখ্যাত
শিল্পী গজল গাইছেন-

'মেরি জিন্দেগি তো ফিরাক হ্যায়, ওহ আজাল ছে দিল ম্যা
মাকি ছাহি।

ওহ নিগাহ-এ-শৌক ছে দূর হ্যায়, রাগ-এ-জান ছে লাখ
কারি ভারি।"

(আমার জীবন বিচ্ছেদে ভরপুর, সে চিরকাল আমার
হৃদয়েই থাকুক।

সে তৃষণার্ত চোখ থেকে দূরে থেকেও রয়েছে প্রতিটি
হৃৎস্পন্দন জুড়ে।)

রিমোট বুকের উপর রেখে দেয়। শিল্পীর কণ্ঠ খুব সুন্দর অথবা
হয়তো সে এর অনুভূতিকে বাক্যে রূপ দিচ্ছিল।

'হামে জান দেনি হ্যায় একদিন, ওহ কিছি তারাহ, ওহ কাহি
ছাহি।

হামে আপ খেঞ্চিয়ে দারপার, যো নেহি কোয়ি তো হামহি
ছাহি।"

(প্রাণ দিতে হবে একদিন আমাকে, তা যেখানে হোক, যে
করেই হোক।

আমাকে টানুন আপনার দরবারে, কেউ না থাকলেও
আমাকে রাখুন।)

শায়েরি, ক্লাসিক্যাল মিউজিক, পুরনো ফিল্ম আর
ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিকের মূল্য বিগত কয়েক বছর থেকে
উপলব্ধি করছিল। পেছনের সুরগুলো ওর সংগীত পছন্দকে
অনেক উপরে তুলেছে। নাহলে ও শুনবে উর্দু গজল, স্বপ্নেও
ভাবেনি।

'সার-এ-তুর হো, সার-এ-হাশার হো, হামে ইত্তেজার কাবুল
হ্যায়।

ওহ কাভি মিলে, ওহ কাহি মিলে, ওহ কাভি ছাহি, ওহ
কাহি ছাহি।"

(সিনাইয়ের চূড়া হোক বা হাশরের ময়দান, আমার পক্ষ
থেকে অপেক্ষা করুন।

সে কখনো মিলুক, কোথাও মিলুক, তা যেখানে হোক বা
যেভাবে হোক।)

আবার ইমামার কথা মনে পড়ে যায়। এটা সবসময় হয়।
প্রথমে শুধু একাকিত্বে মনে পড়ত, তারপর ভিড়ের মাঝে।
সালার ভালোবাসাকে এতদিন অনুশোচনা ভেবেছিল।

'নাহো উন পে যো মেরা বাছ নেহি, কে ইয়ে আশিকি হ্যা
হাভাস নেহি।

ম্যায় উনকি থাহ, ম্যায় উনকি হু. ওহ মেরে নেহি তো
নেহি ভালি।"

(তার ওপর আমার অধিকার নেই, এটাকে ভালোবাসা বলে:

লালসা নয়।

আমি তারই ছিলাম, আমি তারই আছি: সে আমার নাহলে,
না হোক।)

হঠাৎ সোফা থেকে উঠে জানালার কাছে যায় ও। সাত তলার
উপর দাঁড়িয়ে আলোর মাঝেও অন্ধকার অনুভব করতে
পারছিল। অদ্ভুত বিভীষিকা, যা বাইরে চলছে। অদ্ভুত
দোটানা, যা ভেতরে বইছে।

'যো হো ফেয়সলা ওহ সুনাইয়ে, উইসে হাশার পার না
উঠাইয়ে।

যো কারেসে আপ সিতাম ওয়াহা, ওহ আভি ছাহি, ওহ
ইয়াহি ছাহি।"

(সিদ্ধান্ত যাইহোক তা ঘোষণা করুন, সেসব হাশরে না

তুলুন।

যে আঘাত তখন করবেন, তা এখন করুন; এখানেই

করুন।)

ওখানে দাঁড়িয়ে জানালার কাঁচ দিয়ে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা আলোর দিকে তাকিয়ে নিজের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে ও। 'আমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসব? প্রশ্নই ওঠে না।' কিছু বছর আগে প্রায়ই বলা এই বাক্য মনে পড়ে যায়। বাইরের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছে, ভেতরে যন্ত্রণাও বেড়ে যাচ্ছে। পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা নিচু করে নিলো। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে আবার জানালার বাইরে তাকায়। মানুষের কর্তৃত্ব কোথায় শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়? ডিপ্রেশনের আরেকটা ঢেউ। বাইরের মিটমিট করে জ্বলতে থাকা আলো নিভে যাচ্ছে।

‘উছহে দেখনে কি যো লোভ লাগি, তো নাসির দেখহি
লেঙ্গৈ হাম।

ওহ হাজার আঁখি ছে দূর হো, ওহ হাজার পারদা-নাশিন
ছাহি।”

(তাকে দেখার যে বাসনা জেগেছে, আমি নাসির দেখেই
ছাড়ব।

সে হাজার চোখ থেকে দূরে, হাজার পর্দায় ঢেকে রাখুক
নিজেকে।)

সালার ঘুরে ফ্রিনের দিকে তাকায়। শিল্পী থেমে থেমে বারবার
শেষ শ্লোকটা গাইছেন। যন্ত্রের মতো এসে সোফায় বসে ও।
সেন্ট্রাল টেবিলে রাখা ব্রিফকেস খুলে ভেতর থেকে ল্যাপটপ
বের করে।

'তাকে দেখার যে বাসনা জেগেছে, আমি নাসির দেখেই
ছাড়াব।

সে হাজার চোখ থেকে দূরে, হাজার পর্দায় ঢেকে রাখুক
নিজেকে।'

শিল্পী গাইছে। ওর আঙুল ল্যাপটপের উপর বিদ্যুৎ গতিতে
পদত্যাগপত্র লেখায় ব্যস্ত। রুমে গজলের আওয়াজ ম্লান হয়ে
আসছে। পদত্যাগপত্রের ঘোর থেকে মুক্ত হচ্ছে, যেন
কোনো তাকবির চলছে।

বাকি লাইন ওর সত্তার নিশ্চলতার ছায়া দূর করে দিচ্ছিল।

‘ক্যারিয়ারের এই স্টেজে দাঁড়িয়ে এমন আহাম্মকের মতো সিদ্ধান্ত শুধু তুমিই নিতে পারো।’

সালার চুপ করে ফোনে বাবা সিকান্দার উসমানের কথা শুনছিল।

‘এত ভালো পোস্ট কেন ছাড়ছ, তাও হুট করে? আর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে এসে নিজের বিজনেস করো। ব্যাংকে গিয়ে লাভ কী?’ সিকান্দার উসমান ছেলের সিদ্ধান্তে রেগে ছিলেন।

‘আমি পাকিস্তানে কাজ করতে চাই, তাই জব ছেড়ে দিয়েছি। বিজনেস করতে পারব না। ব্যাংকের অফার অনেকদিন থেকেই পড়ে আছে। তারা আমাকে পাকিস্তান পোস্ট করতে রাজি, তাই আমিও রাজি হয়ে গেছি।’ সব প্রশ্নের উত্তর এককথায় দিয়ে দেয় ও।

'ব্যাংকে জয়েন করার দরকার নেই, এসে আমার সাথে কাজ করো।'

'না পাপা, আমাকে জোর করবেন না প্লিজ!'

'তাহলে ওখানেই থাকো। পাকিস্তান আসার কী মানে?'

'আমি এখানে থাকতে পারছি না।'

'দেশপ্রেমের অসুখ ধরা পড়েছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে...?'

'আপনাদের কাছে থাকতে চাই আমি।' প্রসঙ্গই বদলে ফেলল ও।

উসমানের সুর নরম হয়। 'যাইহোক, এই সিদ্ধান্ত যদিও আমাদের জন্য নেওনি।' সিকান্দার উসমান বললেন।

সালার চুপ করে রইল। সিকান্দার উসমানও কিছুক্ষণ চুপ রইলেন।

‘সিদ্ধান্ত যখন নিয়ে ফেলেছ, আমি এখন বললেও লাভ হবে না। ঠিক আছে আসতে চাইছ, আসো। কয়েক বছর ব্যাংকে কাজ করেও দেখো। কিন্তু আমার ইচ্ছে আমার সাথে বিজনেস দেখবো।’ সিকান্দার উসমান আত্মসমর্পণ করে বললেন। 'তোমার তো পিএইচডি করার ইচ্ছে ছিল, তার কী হলো?'

'এখন স্টাডি কন্টিনিউ করতে চাইছি না। হয়তো কয়েক বছর পর পিএইচডির জন্য আসব, হতে পারে করবই না।' মধ্যম আওয়াজে বলল ও।

'তুমি সেই স্কুলের জন্য আসছ?' সিকান্দার উসমান হুট করে বললেন।

'হয়তো...' তার ভাবনায় বাধা দেয় না ও। তিনি স্কুলকে ওর ফিরে আসার কারণ ভেবে নিলেও অসুবিধা নেই।

'আরেকবার ভেবে দেখো সালার!' সিকান্দার উসমান না বলে থাকতে পারলেন না। 'অনেক কম মানুষ তোমার মতো ক্যারিয়ার শুরু করতে পারে। তুমি কি শুনছ?'

'জি।' শুধু একটা শব্দ বলল ও।

'বাকিটা তুমি ম্যাচিউর, নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারো।' শেষ কথা বলে ফোন রেখে দেন তিনি।

সালার ফোন রেখে অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে চোখ বোলায়। আঠারো দিন পর ওকে এই অ্যাপার্টমেন্ট চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

সাত

প্যারিস থেকে ফিরে সালারের জীবনে এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। শুরুর দিকে ফরেন ব্যাংকের ইসলামাবাদের শাখায় কাজ করলেও কিছুদিন পর ব্যাংকের নতুন শাখায় লাহোর চলে আসে। ওর কাছে করাচি যাওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু লাহোর বেছে নেয়। এখানে ড. সিবতে আলির সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবে বলে।

পাকিস্তানে ব্যস্ততার ধরন পরিবর্তন হলেও, ব্যস্ততা কমে নি ওর।

এখানেও দিন-রাত কাজ করত। একজন এক্সসেপশনাল ইকোনমিক এক্সপার্ট হিসেবে ওর খ্যাতি ওর সাথে ভ্রমণ করতে থাকে। সরকারি মহলে ওর নাম নতুন ছিল না। পাকিস্তান আসার পর অর্থ-মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তাদের মাঝে লেকচার দেওয়ার

জন্য ওকে ডাকা হতো। লেকচারের ধারাবাহিকতা ওর জন্য নতুন না। ইয়েলে পড়াকালীন সেখানে বিভিন্ন ক্লাসেও লেকচার দেওয়ার অভ্যাস ওর আছে। এই ধারাবাহিকতা নিউইয়র্ক যাওয়ার পরও অব্যাহত ছিল। ওখানে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের ওপর হওয়া সেমিনারে অংশ নিত। সবশেষে ওর মনোযোগ ইকোনমিক্সের দিকে স্থির হয়। পাকিস্তানেও দ্রুত সেইসব সেমিনারের সাথে ইনভলভ হয়ে পড়ে, যা আইভিএ, লামস, ফাষ্ট (IBA, LUMS এবং FAST) এর মতো প্রতিষ্ঠান আয়োজন করত। ইকোনমিক্স ও হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এমন দুই বিষয় ছিল, যে ক্ষেত্রে চুপ থাকতে পারত না। এগুলো ওর কথোপকথনের প্রিয় বিষয় ছিল। সেমিনারে ওর লেকচারের ফিডব্যাক সবসময় চমৎকার আসত।

মাসের এক উইকেন্ড গ্রামের স্কুলে কাটাত। সেখানে থাকার সুবাদে জীবনের এক নতুন দিকের সাথে পরিচিত হয় ও। 'আমরা আমাদের দারিদ্র্যতা আমাদের গ্রামে লুকিয়ে রাখি। ঠিক তেমন, যেমন মানুষ ঘরের মেঝে কাপেট দিয়ে ঢেকে

রাখো।' স্কুলের নির্মাণকাজ চলাকালীন ফুরকান ওকে একবার বলেছিল। গ্রামে কাটানো দিনগুলো সেই বাক্যের সত্যতা ওকে উপলব্ধি করায়। এমন না ও পাকিস্তানে দারিদ্র্যের উপস্থিতির সঙ্গে অপরিচিত ছিল। ইউনেস্কো এবং ইউনিসেফে কাজ করার সময় এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো পাকিস্তান সম্পর্কিত অনেক রিপোর্ট দেখেছে। কিন্তু এই প্রথম এসব মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে দেখছিল।

'পাকিস্তানের দশ-পনেরোটি বড় শহর থেকে বের হলে বুঝে আসে ছোট ছোট শহরে বসবাস করা মানুষ তৃতীয় জগতে না; বরং দশম বা দ্বাদশ জগতে বসবাস করছে। যেখানে না আছে তাদের জন্য কর্মসংস্থান, না কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা। এরা অর্ধেক জীবন কাটায় আশায়, বাকি অর্ধেক হতাশায়। কী নৈতিকতা শিক্ষা দেবে তুমি সেই মানুষকে, যার দিন শুরু হয় বাসি রুটিতে এবং রাত কাটে অনাহারে? অথচ আমরা মানুষের ক্ষুধা মেটানোর বদলে মসজিদের পর মসজিদ নির্মাণ করতে থাকি। আলিশান মসজিদ, ব্যয়বহুল মসজিদ, মার্বেল দিয়ে সাজানো মসজিদ। মাঝেমধ্যে তো

একেক রাস্তায় দশটা করে মসজিদ দাঁড়িয়ে থাকে। মুসল্লিশূন্য মসজিদ।" ফুরকান তিক্তভাবে বলত।

'দেশে এত মসজিদ তৈরি হয়েছে যে, পুরো পাকিস্তানের মানুষও যদি এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য জড়ো হয় তবু বহু মসজিদ খালি পড়ে থাকবে। আমি মসজিদ নির্মাণে বিশ্বাস করি না। যেখানের মানুষেরা ক্ষুধার কারণে আত্মহত্যা করে, সামাজিক স্তরের কিছু প্রজন্ম অজ্ঞতার অন্ধকারে বিচরণ করে, সেখানে মসজিদের জায়গায় মাদরাসা প্রয়োজন। স্কুল প্রয়োজন। শিক্ষাসচেতনতা এবং কর্মসংস্থান থাকলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আসবে মানুষের; নাহলে কেবল অভিযোগই থাকবে।' চুপচাপ ফুরকানের কথা শুনেছিল।

নিয়মিত গ্রামে যাওয়া শুরু করার পর বুঝতে পারে ফুরকান ঠিক বলত। দারিদ্র্য মানুষকে কুফুরি পর্যন্ত নিয়ে যায়। ছোট ছোট প্রয়োজন তাদের জন্য ভারী ছিল। আর যে তাদের এই সাধারণ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিত, তারা সেই মানুষটার গোলামি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। যে উইকেন্ডে ওর

গ্রামে আসার কথা থাকত, স্কুলে মানুষ নিজেদের ছোট ছোট কাজের জন্য জড়ো হতো। মাঝেমধ্যে মানুষের সারি লেগে যেত। 'ছেলেকে শহরের কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগিয়ে দিন, বেতন হাজার টাকাই হোক; কিছু টাকা তো আসুক।' 'দুই হাজার টাকা হলে মেয়েটা বিয়ে দিতে পারতাম।' 'বৃষ্টি সব ফলন নষ্ট করে দিয়ে গেছে। নতুন করে বীজ কিনব টাকা নেই। আপনি কিছু টাকা ধার মনে করে দেন, ফসল তোলার পর শোধ করে দেবো।' 'ছেলেটা পুলিশের কাছে জেলে, কী দোষ করেছে সেটাও বলে না। ইচ্ছেমতো আটকে রেখেছে, আইজির কাছে যেতে বলে।' 'পাটোয়ারী আমার জমিনে কবজা করে অন্য কাউকে দিতে চায়, বলছে আমার কাগজপত্র নাকি ভুল।' 'ছেলেটা কাজের জন্য পাশের গ্রামে যায়, রোজ আট মাইল পথ হাঁটতে হয়। একটা সাইকেল জোগাড় করে দিলে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকতাম।' 'বাড়িতে টিউবওয়েল লাগাতে হবে, আপনার সাহায্য লাগবে।' অবাক হয়ে এসব অনুরোধ শুনত। এমন ছোটখাটো কাজও তাদের জন্য পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে? এমন পাহাড়, যা পার করতে

গিয়ে তারা জীবনের অগণিত সময় নষ্ট করে দিচ্ছে। ভাবত ও।

প্রতি মাসের এক উইকেন্ডে যখন গ্রামে আসত, তখন নিজের সঙ্গে অতিরিক্ত দশ-পনেরো হাজার টাকা নিয়ে আসত ও। টাকাগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়ে গ্রামের মানুষের চোখে বড় কিন্তু বাস্তবে অনেক ছোটখাটো চাহিদা পূরণ করত। তাদের জীবনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনত। ওর লেখা কিছু সুপারিশপত্র আর ফোনকল সেই মানুষগুলোর কাঁধের বোঝা এবং পায়ের অদৃশ্য শিকল থেকে কীভাবে মুক্তি দিত, তার সঠিক উপলব্ধি হয়তো ওর নিজেরও ছিল না।

লাহোর থাকাকালীন সালার নিয়মিত ড. সিবতে আলির কাছে যাওয়া-আসা শুরু করে। তার কাছে প্রতিরাতে এশার নামাজের পর মানুষ জড়ো হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন। কখনো বিষয় নিজে বেছে নিতেন, কখনো-বা উপস্থিত কেউ তার কাছে কোনো প্রশ্ন করলে প্রশ্নটি সেই

রাতের বিষয় হয়ে উঠত। বেশিরভাগ বক্তাদের মতো তিনি শুধু নিজে বলতেন না বা তারটা শুনতে বাধ্য করতেন না। বরং কথার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট প্রশ্ন করতেন। যার মাধ্যমে মানুষের সাহস বাড়াতেন এবং তারা কিছু বললে তাদের মতামতের গুরুত্ব দিতেন। তাদের আপত্তি বেশ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে শুনতেন। সবার মধ্যে শুধু সালার সিকান্দার ছিল, যে কখনো কোনো প্রশ্ন করত না বা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত না। না কখনো আপত্তিকারীদের মধ্যে शामिल হতো, না কোনো মতামতকারীদের কাতারে পড়ত। ও ফুরকানের সঙ্গে আসত। ফুরকান না এলে একা চলে আসত। রুমের শেষ কোণায় গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বসত। নীরবে মনোযোগ দিয়ে ড. সাহেব এবং সেখানে উপস্থিত সবার কথা শুনত। মাঝেমধ্যে ডান-বামে এসে বসা মানুষের জিজ্ঞাসায় এক বাক্যের উত্তর পেশ করত। 'আমি সালার সিকান্দার, ব্যাংকে চাকরি করি।'

যতদিন আমেরিকায় ছিল, প্রতি সপ্তাহে একবার সেখান থেকে ড. সিবতে আলিকে ফোন করত। ফোনে কথাবার্তা

খুব সংক্ষিপ্ত এবং একই রকম হতো। ও কল করত, সিবতে আলি রিসিভ করতেন এবং একটাই প্রশ্ন করতেন। সেই প্রশ্নে ও প্রথমবার তখন আশ্চর্য হয়েছিল, যখন পাকিস্তান থেকে কিছুদিন আগেই আমেরিকায় গিয়েছিল। ড. সাহেব ওর ফিরে আসার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। ও অবাক হয়েছিল।

'শীঘ্রই না...' ও অবোধ্য ভঙ্গিতে বলেছিল। পরে প্রশ্নটি তাকে অবার করত না। কারণ অজ্ঞাতভাবে ও জেনে গিয়েছিল তিনি কী জিজ্ঞেস করছেন। শেষবার এই প্রশ্নটি তিনি ওকে তখন করেছিলেন, যখন ইমামার খোঁজে রেড লাইট এরিয়ায় গিয়েছিল ও। প্যারিস ফেরার এক সপ্তাহ পর যথারীতি আগে কল করেছিল। স্বাভাবিক আলাপচারিতার পর আবার সেই প্রশ্নে থেমেছিলেন। 'পাকিস্তান কবে ফিরছেন?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সালারের মন ভরে উঠল। নিজেকে কম্পোজ করতে কিছুটা সময় লাগে। 'আগামী মাসে এসে পড়ব। রিজাইন করছি। ফিরে এসে পাকিস্তানে কাজ করব।'

'ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে আগামী মাসে দেখা হচ্ছে।'

'দোয়া করবেন।' সালার সবশেষে বলত।

'করব, আর কিছু?'

'আর কিছু না। আল্লাহ হাফেজ...।' ও বলেছিল।

'আল্লাহ হাফেজ।' তিনিও জবাবে বলেছিলেন।

কথোপকথনের এই ধারাবাহিকতা পাকিস্তান আসা অন্দি ছিল। যখন নিয়মিত কাছে আসা শুরু করল, তখন থেকে এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায়।

লাহোর আসার পর থেকে সালার নিয়মিত ড. সিবতে আলির কাছে যাওয়া শুরু করে। তার কাছে এলে শান্তি খুঁজে পায় ও। শুধু তার আশেপাশে কাটানো মুহূর্তগুলো এমন হতো, যখন ডিপ্রেসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকত। মাঝেমাঝে

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে ওর ইচ্ছে করত, তাকে সব বলে দিতে- যা এত বছর ধরে বিষের মতো নিজের মাঝে বয়ে বেড়াচ্ছে। অনুশোচনা, অপরাধবোধ, অস্থিরতা, অসহায়ত্ব, দুশ্চিন্তা, লজ্জা সবকিছু। কিন্তু ভয় পেত এরপর তিনি ওকে কোন নজরে দেখবেন, সাহস মরে যেত।

ড. সিবতে আলি ভ্রম দূর করায় পারদর্শী ছিলেন। ও তার কাছে এসে চুপ করে বসে থাকত। শুধু শুনত। শুধু বুঝত। সিদ্ধান্ত খুঁজত। কোনো আবছায়া ছিল, যা সরে যেতে থাকে। এমন অনেককিছু ছিল, যা দেখতে শুরু করে। যে প্রশ্নগুলো বহু বছর ধরে মাথায় বোঝার মতো নিয়ে ঘুরেছিল, তার কাছে সেসবের উত্তর পায়।

'ইসলাম বুঝতে শিখলে আপনি জানতে পারবেন এর পরিধি কত বিশাল। এটা সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ হৃদয়ের ধর্ম না। এই দুই বিষয়ের কোনো অবকাশ নেই ইসলামে। এটা আমি থেকে শুরু করে আমরা হয়, ব্যক্তি থেকে সম্প্রদায় পর্যন্ত পৌঁছায়। ইসলাম আপনাকে বলে না যে চব্বিশ ঘন্টা মাথায়

টুপি, হাতে তসবিহ, সবখানে জায়নামাজ বিছিয়ে রাখুন বা সব কথায় প্রমাণ টানুন। ইসলাম আপনার কাছে কাগজ-কলমে প্রমাণ চায় না, আপনার জীবন থেকে প্রমাণ চায়। আপনার কাছে ন্যায়পরায়ণতা ও তাকওয়া দাবি করে। সততা ও নিষ্ঠা চায়। আন্তরিকতা ও অধ্যবসায় চায়। একজন ভালো মুসলমান হওয়ার প্রত্যাশা রাখে। একজন ভালো মুসলমান তার কথা দিয়ে নয়, নিজের চরিত্র দিয়ে অন্যদেরকে প্রভাবিত করে।"

তার কথাগুলো ছোট একটা রেকর্ডারে রেকর্ড করে এনে বাসায় ফিরেও শুনত। একজন পরামর্শদাতা খুঁজছিল এতদিন ও। ড. সিবতে আলির রূপে নিজের সেই পরামর্শদাতা খুঁজে পেয়েছে।

'সালার আসো, এখন তো আসতে পারো...আর কত অনুরোধ করাবে?' অনিতা রাগ দেখিয়ে সালারের হাত ধরে টেনে বলল।

আম্মারের বিয়েতে অংশ নিতে সালার ইসলামাবাদ এসেছে, তিন দিনের ছুটিতে। যদিও পরিবারের জোর ছিল এক সপ্তাহের। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এসব অনুষ্ঠানের ধরন আর আয়োজন ওর পরিচিত। তাই সবার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিন দিনের বেশি ছুটি নেয়নি। এখন আম্মারের মেহেন্দি ফাংশন চলছে। যেখানে ওদের বাড়ি ও আম্মারের শ্বশুরবাড়ির পরিবার উপস্থিত ছিল। আম্মার আর আসরা দুই পক্ষের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব বিভিন্ন ফিল্মি ও পপ গানে ডান্স করছে। একপাশে এ ধরনের অভদ্রতা। অন্যদিকে স্লিভলেস শার্টস, খোলা গলা, শরীরের সাথে লেপ্টে থাকা পোশাক, নেটের ব্লাউজের সঙ্গে সিল্ক ও শিফনের শাড়ির ছড়াছড়ি। ওর পরিবারের মহিলারাও অন্যসব মহিলাদের মতো এ ধরনের পোশাকে ছিল।

মিক্স গ্যাডারিং চলছে। তাই অনুষ্ঠান শুরু হতেই সালার হট্টগোল থেকে দূরে এমন মানুষদের সঙ্গে গিয়ে বসে, যারা কর্পোরেট বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত এবং বাবা-

ভাইয়ের পরিচিত। কিন্তু মেহেদির আয়োজন শুরু হলে আনিতা ওকে টেনে স্টেজে নিয়ে আসে। আসরা ও আম্মার দূড়ে বসে কথা বলছে। এই প্রথম আসরার সঙ্গে সালারের দেখা। আম্মার ওকে আসরার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। নিজের পাঠ চুকিয়ে ওখান থেকে সরে আসার চেষ্টা করলে বড় ভাই কামরান আর মা তায়িবা ওকে জোর করে সেখানে আটকায়।

'তোমার ভাইয়ের মেহেদি চলছে আর তুমি কোণায় গিয়ে বসে আছো?' তায়িবা ধমক দিলেন। 'তোমার এখানে থাকা দরকার।'

মায়ের কথায় কামরান আর তার স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ও। একজন কাজিন ওর গলায় দোপাট্টা প্যাঁচানোর চেষ্টা করে, যা অন্য সবাই গলায় পেঁচিয়ে রেখেছিল। কাজিনের হাত সরিয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়ে সতর্ক করল ও। পরের কয়েক মিনিটে সেখানে নাচ শুরু হয়ে যায়। আম্মারসহ সব ভাইবোন, কাজিনরা মিলে নাচছিল। আনিতা

ওকে টানতে শুরু করে। 'না আনিতা, পারব না। আমি পারি না।' হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে মাফ চাইল।

কিন্তু ওর মাফ কবুল করার পরিবর্তে আনিতা আর আন্নার ওকে টেনে যারা নাচছিল তাদের মাঝে নিয়ে আসে। কামরান আর মুয়িজের বিয়েতে সবার মতো ও নিজেও নেচেছিল। কিন্তু আন্নারের মেহেদির আগে গত সাত বছরে ও এত লম্বা মানসিক সফর অতিক্রম করে এসেছে যে, সেই ভিড়ের মাঝে শুধু দাঁড়িয়ে থাকাও দুষ্কর ছিল ওর জন্য। মেকি হাসি নিয়ে কিছুক্ষণ সেই ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে আনিতার কানে কানে গিয়ে বলল।

'আনিতা! আমি ডান্স ভুলে গেছি। অনেক বড় উপকার হবে যদি আমাকে যেতে দাও।'

'তুমি শুরু করো, মনে পড়ে যাবো।' আনিতা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল।

এখন আসরাও সেই ভিড়ে যোগ দিয়েছে।

'আমি পারব না, তোমরা করো। আমি ইনজয় করেছি, এখন যাই।' হাসিমুখে সরার চেষ্টা করে। আসরার আগমন ওর চেষ্টা সফল হতে দিয়েছিল।

'উত্থান প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বপ্ন। যেই জাতির ওপর ইসলামি কিতাব নাজিল হয়েছে, তারা তো উত্থানকে নিজেদের অধিকার বলে মনে করে। কিন্তু কখনো কোনো জাতির উত্থান শুধু এজন্য হয়নি যে, তাদের কাছে কিতাব এবং নবী এসেছিল। যতক্ষণ না সেই জাতি আমল ও আখলাক দিয়ে উত্থানের জন্য নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে পেরেছে, ততক্ষণ অবধি তারা কোনো অবস্থান, সম্মান, ফজিলতের অধিকারী হয়নি। মুসলমান জাতি এবং উম্মতের সাথেও এমনটা ঘটেছিল এবং ঘটছে। এদের সমস্যা হলো তাদের ক্রিবিত্তরা বিলাসিতা ও স্বার্থপরতায় মত্ত। এ দুটো বিষয় মহামারির মতো। একটা থেকে আরেকটা, আরেকটা থেকে আরেকটা, এভাবে ধারাবাহিকতা চলতেই

থাকে।" সেখানে নাচতে থাকা নারী-পুরুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে এর ড. সিবতে আলির বলা কথা মনে পড়ল।

মুমিন নিজেকে কখনো প্রশ্ন দেয় না। যখন সে প্রজা থাকে তখনো না, যখন সে রাজা হয় তখনো না। তাদের জীবন পশুদের জীবনের মতো না। খাওয়া-দাওয়া, নিজের বংশ এগিয়ে নেওয়া এবং শেষ হয়ে যাওয়া। এটা পশুর জীবন ধারণের উপায় হতে পারে, তবে কোনো মুসলমানের না। সালারের ঠোঁটের কোণে হাসি। এখানে আজ একদল প্রাণী এবং পৃথিবীর পোকামাকড়ের ভিড় দেখাচ্ছে। স্বস্তি পাচ্ছে এই ভেবে যে, ও অনেক আগেই এসব থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবাইকে খুশি আর তৃপ্ত দেখাচ্ছে। অট্টহাসি, চমকানো চোখ-মুখ। ওর সামনে তায়িবা আন্নারের শ্বশুরের সঙ্গে নাচছে। অনিতা বড় ভাই কামরানের সঙ্গে।

সালার আঙুল দিয়ে কপালের ডানপাশের অংশ ঘষে। হয়তো লাউড মিউজিক অথবা মানসিক অবস্থার কারণে ব্যথার সামান্য ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে মাথায়। চশমা খুলে বাঁ-হাত দিয়ে

দুই চোখ ডলল। আবার চশমা চোখে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে থাকে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

'কোথায় যাচ্ছ?' যাওয়ার আগে লাউড মিউজিকের মাঝে তায়িবা ওর হাত ধরে জিঞ্জেস করলেন। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার শ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছে।

'মান্নি! আমি এখনই আসছি নামাজ পড়ো।'

'আজ থাকুক...'

সালার মুচকি হেসে না-বোধক মাথা নাড়িয়ে আলতো করে বাহু থেকে মায়ের হাত সরায়। বাইরে বের হতে হিমশিম খেতে হয়।

সালার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে খানিক আফসোস নিয়ে ভাবলেন। 'এই ছেলে কখনো নরমাল হবে না। জীবনে উপভোগ করাও একটা আর্ট। এই আর্ট এই আহান্মকের মাথায় কখনো ঢুকবে না।'

সালার ভিড় থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যখন নামাজের জন্য বাড়ির গেট দিয়ে বের হচ্ছিল, গায়ক তখন ফুল ফর্মে গাইছে। মসজিদের দিকে যাওয়া মানুষ ও একা। গাড়ির লম্বা সারি পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ক্রমাগত ড. সিবতে আলির কথা ভাবছিল। সেই শতাধিক মানুষের কথাও ভাবে, যারা ওর বাড়িতে নাচে-গানে ব্যস্ত। মসজিদের জামাতে শুধু চৌদ্দজন মানুষ উপস্থিত হয়।

পাকিস্তানে আসার পর ইসলামাবাদে পোস্টিং চলাকালীন সালার নিজেদের বাড়িতেই থাকত। লাহোর আসার পর পশ এলাকায় বড় কোনো বাড়ি কেনার পরিবর্তে ফুরকানের বিন্ডিংয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়াকে বেশি ভালো মনে করে। ফুরকানের পাশে ফ্ল্যাট নেওয়ার প্রথম কারণ ছিল নিজের

অনুপস্থিতিতে যেন বাসা নিয়ে ওর চিন্তা করতে না হয়। আর দ্বিতীয় কারণ ফ্ল্যাটের পরিবর্তে বাড়ি কিনলে দু'চারজন কাজের লোক সবসময়ের জন্য রাখতে হবে। কিন্তু বাসায় কাটানোর মতো সময় ওর কাছে খুব কম থাকে। ফুরকানের সাথে চলাফেরার কারণে ধীরে ধীরে লাহোরে ওর সোশ্যাল সার্কেল বিস্তৃত হয়। ফুরকান বেশ সোশ্যাল মানুষ, পরিচয়ের পরিধিও তাই অনেক লম্বা-চওড়া। সালারের মুড আর টেম্পারমেন্ট সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সময়ে-অসময়ে নিজের সঙ্গে ওকে বিভিন্ন জায়গায় টেনে নিয়ে যেত।

সেদিন রাতে ফুরকানের সঙ্গে তার এক ডাক্তার বন্ধুর পাটি ও গজলের মাহফিলে যোগ দেয় ও। ফার্ম হাউজে ছিল এই পাটি। ফুরকান ওকে মানিয়ে নেয়। গজলের মাহফিল শুনে না করতে পারেনি। ওখানে শহরের এলিট ক্লাসের ভিড় জমেছিল। তাদের অধিকাংশই ওর পরিচিত। নিজের পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। ডিনার চলছে। কথাবার্তার ফাঁকে ফুরকানের খোঁজে চোখ এদিক-ওদিক করল ও। কিন্তু দেখতে তাকে না পেয়ে খাওয়ায় মনোযোগ

দেয়। খাওয়া শেষে কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড়ানো ফুরকানকে দেখে সেদিকে এগিয়ে যায়।

'আসো সালার! তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেই।' ফুরকান ওকে কাছে আসতে দেখে বলল। 'ইনি ডা. রেজা। গঙ্গা রাম হসপিটালে কাজ করেন। একজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট।'

সালার তার সঙ্গে হাত মেলায়।

'আর ইনি ডা. জালাল আনসার।'

ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না। ফুরকান এরপর কী বলছে কানে যাচ্ছিল না ওর। জালাল আনসারের দিকে হাত বাড়ায়। দু'জনের মাঝে ফরমাল হ্যান্ডশ্যাক হয়। জালালও নিশ্চয়ই ওকে চিনতে পেরেছে। সেখানে একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটানোর জন্য এসেছিল ও। কিন্তু সেই মুহূর্তে টের পায় এটা একটা ভয়ংকর রাত হতে চলেছে। স্মৃতির এক তুমুল বন্যা, যা এবার সমস্ত বাঁধ ভেঙে ওর দিকে ধেয়ে

আসছে। উপস্থিত সবাই সেদিকে যাচ্ছে, যেখানে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফুরকান ওর পাশাপাশি হাঁটছে। জালাল অন্য সব ডাক্তারের সঙ্গে কিছুটা সামনে। পাংশুটে মুখ নিয়ে জালালকে পেছন থেকে দেখছিল ও।

'দাশত-এ তানহায়ি মেঁ
আয়ে জান-এ-জাহা লারজ হ্যায়
তেরে আওয়াজ কে সায়ে
তেরে হোটো কে সারাব'

(আমার নির্জনতার প্রান্তরে
প্রিয় ভালোবাসা, কম্পন
তোমার কণ্ঠের ছায়ার
তোমার ঠোঁটের মরীচিকা...)

ইকবাল বানু গাওয়া শুরু করেছেন-

'দাশত-এ তানহায়ি মেঁ
দূরি কী খাছ-ও-খাক তালে
গিল রাহি হ্যায় তেরে পেহলু কী সামান
জল গুলাব...'

(আমার নির্জনতার প্রান্তরে
দূরত্বের ধবংসভূপের নিচে
তোমার সান্নিধ্যে ফোটে
জুঁই আর গোলাপ।)

আশেপাশের মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে মাথা দোলাচ্ছে। সালার কয়েক টেবিল দূরে বসে সেই লোকটাকে দেখছিল, যে তার আশেপাশের মানুষের সঙ্গে আড্ডায় ব্যস্ত। জীবনে কাউকে দেখে কখনো ওর মাঝে হিংসা কাজ করেনি, কিন্তু সেদিন প্রথমবার করছিল। আধঘন্টা হওয়ার পর ফুরকানকে বলল।
'চলো।'

ফুরকান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। 'কোথায়?'

'বাসায়।'

'প্রোগ্রাম শুরু হলো মাত্র। তোমাকে বলেছিলাম আয়োজন গভীর রাত পর্যন্ত চলবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি যেতে চাই। কারো সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দাও আমাকে। তুমি পরে এসো।'

ফুরকান ওর চেহারা মনযোগ দিয়ে দেখল। 'চলে যেতে কেন চাইছ?'

'একটা জরুরি কাজ মনে পড়েছে।' ও হাসতে চেষ্টা করল।

'ইকবাল বানুকে শোনার সময় অন্য কাজের কথা মনে পড়ে?' ফুরকান কিছুটা অভিযোগের সুরে বলল।

'তুমি থাকো, আমি চলে যাচ্ছি।' সালার কিছু বলার পরিবর্তে উঠে দাঁড়ায়।

'অদ্ভুত কথাবার্তা বলো। এখান থেকে কীভাবে যাবে? ফার্ম
হাউজ কত ভেতরো। আচ্ছা, এত জরুরি হলে চলো।'
ফুরকানও উঠে দাঁড়ায়।

মেজবানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওরা ফুরকানের
গাড়িতে এসে বসল।

'এখন বলো, হঠাৎ কী হলো?' গাড়ি বের করতে করতে
জিজ্ঞেস করে ফুরকান।

'আমার ওখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না।'

'কেন?'

সালার উত্তর দেয় না। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ওখান থেকে চলে আসার কারণ জালাল?'

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে ফুরকানকে দেখে।

ফুরকান দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'তার মানে আমার অনুমান ঠিক।
তুমি জালাল আনসারের কারণে ফাংশন ছেড়ে পালিয়েছ।'

‘তুমি কীভাবে বুঝলে?’ সালার পরাজয় স্বীকার করে বলল।

'তোমরা দু'জন খুব অদ্ভুতভাবে পরিচিত হচ্ছিলে। জালাল নিজের স্বভাবের বিপরীতে গেল, তোমার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেখাল না। যেখানে তোমার মতো নামকরা ব্যাংকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ওর। জালাল উপরের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করে না। তাছাড়া তুমিও ক্রমাগত ওকে দেখাচ্ছিলে।' ফুরকান সহজ গলায় বলে। 'তুমি জালালকে চেনো?'

সালার ঘাড় সোজা করে আবার বাইরে তাকায়। 'ইমামা একেই বিয়ে করতে চেয়েছিল।' অনেকক্ষণ পর মধ্যম আওয়াজে বলে।

ফুরকান কিছু বলে না। ভাবতে পারেনি জালাল আর সালারের পরিচয় এমন কিছু হতে পারে। তাহলে হয়তো এমন প্রশ্ন করত না। গাড়িতে অনেকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে। এরপর ফুরকান সেই নীরবতা ভাঙল।

'ইমামা জালালের মতো মানুষকে বিয়ে করতে চেয়েছিল জেনে হতাশ হলাম। এ তো ভীষণ সুযোগবাদী লোক। আমরা কসাই বলি। এর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হলো টাকা। রোগী কীভাবে এনে দেবে, কোথা থেকে আনবে; সেদিকে তাকানোর সময় নেই। আগামী আট বছরে এই গতিতে টাকা কামিয়ে লাহোরের সবচেয়ে ধনী ডাক্তার হয়ে যাবে, দেখো তুমি।' ফুরকান জালালের নথিপত্র বলছিল।

সালার চুপ করে শোনে। যখন কথা শেষ হয় তখন বলল।
'এটাকে ভাগ্য বলে।'

'তোমার হিংসা হচ্ছে ওর প্রতি?' ফুরকান কিছুটা আশ্চর্য
হয়ে বলল।

'না, হিংসা করা আমার কাজ না।' সালার অদ্ভুত ভঙ্গিতে
হাসে। 'এসব যা তুমি আমাকে বলছ, এগুলো আমি অনেক
বছর আগে থেকেই জানি। যখন ইমামার ব্যাপারে তার সঙ্গে
দেখা করতে এসেছিলাম। এ কেমন ডাক্তার হবে আমার
আন্দাজ ছিল। কিন্তু আজ ফাংশনে একে দেখে আমার মাঝে
হিংসা জাগে। কিছু নেই এর মাঝে। সাধারণ চেহারা, বংশও
নামকরা না। এর মতো হাজার হাজার ডাক্তার আছে, লোভী
আর সুবিধাবাদী। কিন্তু ভাগ্য দেখো, ইমামা হাশিমের মতো
মেয়ে এর প্রেমে পড়েছিল। পেছনে ছুটেছিল। তুমি-আমি
একে কসাই বলি বা আরো কিছু বলতে পারি, কিন্তু আমাদের
কথায় এর ভাগ্য বদলাবে না। না এর, না আমার...' কথা
অসমাপ্ত রেখে দেয়।

ফুরকান ওর চেহারা মলিন হয়ে যেতে দেখে।

'কোনো না-কোনো গুণ নিশ্চয়ই আছে, নাহলে ইমামা হাশিম শুধু ওর প্রেমেই পড়ল; অন্য কারো না, শুধু ওর...?'
ও নিজের চোখ ঘষে।

'যদি জানতাম এখানে জালালের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবে, তাহলে নিয়ে আসতাম না।' ফুরকান গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে বলল।

আমি নিজেও যদি জানতাম এখানে আমাকে এর মুখোমুখি হতে হবে, কোনো মূল্যেই আসতাম না। সালার উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে রাস্তার দিতে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে। আরও কিছুটা যাত্রা নীরবতায় কাটে।

তারপর আবার ফুরকান বলল। 'তুমি কখনো ওকে খোঁজার চেষ্টা করোনি?'

'ইমামাকে...? এটা সম্ভব না।'

'কেন?'

'কীভাবে খুঁজব? কয়েক বছর আগে একবার চেষ্টা করেছি, লাভ হয়নি। আর এখন তো...এখন আরও কঠিন।'

'তুমি নিউজ পেপারের সাহায্য নিতে পারো।'

'নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া?' সালার কিছুটা আফসোসের সুরে বলল। 'ওকে পাবো কিনা তা জানি না, কিন্তু ওর পরিবার নিশ্চিত আমার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সন্দেহ তাদের আমার ওপর আগে থেকেই। আর ধরো আমি এমনটা করলাম, কিন্তু নিউজ পেপারে কী ছাপাব? কী লেখাব?'

'তাহলে ওকে ভুলে যাও?' ফুরকান শান্তস্বরে বলল।

'কেউ শ্বাস নেওয়া ভুলতে পারে?' সালার সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'সালার এখন অনেক বছর হয়ে গেছে। তুমি আর কত বছর এভাবে লা-হাসিল ভালোবাসার পেছনে ছুটবে? জীবন আবার গোছানো উচিত তোমার। নিজের সারা জীবন তুমি এভাবে ইমামা হাশিমের জন্য নষ্ট করে ফেলতে পারে না।'

‘কিছু নষ্ট করছি না আমি- না জীবন, না সময়, না নিজেকে। ইমামা হাশিমকে মনে রাখার কারণ হচ্ছে, আমি ওকে ভুলতে পারি না। ওকে নিয়ে ভাবলে আমার অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু আমি এই কষ্টে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ও আমার পুরো জীবনের ওপর রাজত্ব করে। ও আমার জীবনে না এলে আজ আমি তোমার সঙ্গে এখন পাকিস্তান বসে থাকতাম না। সালার সিকান্দার অন্য কোথাও থাকত, হয়তো থাকতই না। আমার ওপর ওর অনেক ঋণ। আর যে মানুষের কাছে আমরা ঋণী থাকি, তাকে তুলে জীবন থেকে ফেলে দেওয়া যায় না। আমিও পারি না।' সালার নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল।

'ধরো, কখনো যদি না পাও?' ফুরকান ওর কথার ওপরে বলল।

মুহূর্তেই গাড়িতে নীরবতা নেমে আসে।

অনেকক্ষণ পর সালার বলল। 'আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর নেই। অন্য কথা বলা যাক।' খুব সহজে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল।

কয়েক বছরের মধ্যে ফুরকানের মতো সালারও গ্রামের জন্য অনেক কাজ করে। তুলনামূলক আরও দ্রুত। কারণ ফুরকানের চেয়ে ওর পরিচিতি আর পরিধি বড় ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামের চেহারা বদলে যায়। বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ, মেইন রোডের দিকে যাওয়া রাস্তা পাকা করা প্রথম দুই বছরের পরিশ্রম। তৃতীয় বছরে পোষ্ট অফিস, কৃষি-মন্ত্রণালয় অফিস এবং টেলিফোন সংযোগের সুবিধা আসে। চতুর্থ বছর হাইস্কুলে বিকেলের ক্লাসে এক এনজিওর সাহায্যে মেয়েদেরকে হস্তশিল্প শেখানো শুরু হয়। গ্রামের ডিসপেনসারিতে অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে। সেখানে আরও কিছু যন্ত্রপাতি বসানো হয়। ফুরকানের মতো স্কুলের পাশাপাশি এই ডিসপেনসারি নিজের টাকায় শুরু করেছিল ও। তার উন্নতিতে ফুরকান সাহায্য করেছে।

ওর ডিসপেনসারিতে ফুরকানের মতো ডাক্তার না থাকার সমস্যা ছিল না। ডিসপেনসারি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই একজন স্থায়ী ডাক্তারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। স্কুলের পেছনের যাবতীয় খরচ ওর নিজের ছিল। কিন্তু ডিসপেনসারি নির্মাণ আর পরিচালনার খরচ ওর কিছু বন্ধু বহন করে। ইউনিসেফে কাজ করার সময় তৈরি কন্টাক্ট আর বন্ধুত্ব এখন কাজে লাগে: যা ব্যবহার করছিল ও। ইউনিসেফ আর ইউনেস্কোর বন্ধুরা পাকিস্তান এলে তাদেরকে গ্রামে নিয়ে আসত। এখন ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার তৈরির পরিকল্পনায় ছিল। চতুর্থ বছর শুধু এইসব না, অন্য কিছুও হয়েছিল।

ওইদিন দুপুরে ইসলামাবাদে আসার সময় টায়ার পাংচার হওয়ায় রাস্তায় থেমে ছিলেন সিকান্দার উসমান। ড্রাইভার টায়ার বদলাতে শুরু করে। তিনি রাস্তার আশপাশ দেখছেন। তখন একটা সাইনবোর্ডে চোখ পড়ে। সেখানে লেখা গ্রামের নাম তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সালার সিকান্দারের বদৌলতে এই নাম তার জন্য অপরিচিত ছিল না। ড্রাইভার টায়ার বদলে

ড্রাইভিং সিটে এসে বসলে তিনি ইশারা করে বললেন। 'এই গ্রামে চলো।' কৌতূহলী হয়ে উঠলেন সেই স্কুলের ব্যাপারে, যা সালার সিকান্দার গত কয়েক বছর ধরে চালাচ্ছিল।

পাকা রাস্তায় ফুল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের মাথায় তারা গ্রামের ভেতরে পৌঁছে যায়। আবাদি জমি চোখে পড়ছে, কিছু কাঁচা-পাকা দোকান দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত এটা গ্রামের বাণিজ্যিক এলাকা। 'বের হয়ে জিজ্ঞেস করো এখানে সালার সিকান্দারের স্কুল কোথায়?' সিকান্দার উসমান ড্রাইভারকে বললেন। তখন মনে পড়ে সালার কখনো তার সামনে স্কুলের নাম বলেনি। যেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানকার আশেপাশে কোনো স্কুলের চিহ্নও চোখে পড়ছে না। কয়েক বছর আগে হলে সিকান্দার উসমানের গাড়ি গ্রামের মানুষের জন্য কৌতূহলের কারণ হতো। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে সালার আর ফুরকানের কারণে এখানে সময়ে-অসময়ে এমন গাড়ি আসা-যাওয়া করে। তাই এটা আগের মতো তাদের জন্য অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু

গাড়ি যখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরিবর্তে অনেকক্ষণ থেমে রয়, তখন মানুষের মাঝে আগ্রহ তৈরি হয়।

সিকান্দার উসমানের কথামতো ড্রাইভার বেরিয়ে পাশের এক দোকানে গিয়ে কিছু লোকের কাছে স্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। 'এখানে সালার সিকান্দার সাহেবের কোনো স্কুল আছে?' প্রাথমিক কথা সেরে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আছে। এই রাস্তা দিয়ে ডানে মোড় নিলেই বড় একটা বিল্ডিং।' একজন বলল। 'আপনি তার কোনো বন্ধু?' লোকটা জিজ্ঞেস করে।

'না, আমি তার বাবার সাথে এসেছি।'

'তার বাবা!' লোকটার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো। সেখানে বসা অন্যরা সিকান্দার উসমানের গাড়ির দিকে তাকায়। লোকটা উঠে ড্রাইভারের সঙ্গে হাত মেলায়। 'সালার সাহেবের বাবা এসেছে এটা আমাদের সৌভাগ্য।' সে

ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। সেখানে বসে থাকা বাকি সবাইও তার পিছু নেয়।

সিকান্দার উসমান দূর থেকে তাদেরকে দল বেঁধে আসতে দেখে কিছুটা বিব্রত হন। ড্রাইভারের সঙ্গে আসা লোকটা খুব শ্রদ্ধার সাথে জানালা দিয়ে হাত বাড়ায়। সিকান্দার খানিক সংকোচ নিয়ে হাত এগিয়ে দিলে লোকটা বেশ জোশ নিয়ে হাত মেলায়। তার সঙ্গে আসা অন্য লোকগুলোও একই কাজ করে। সিকান্দার উসমান অবাক হয়ে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে থাকেন।

‘আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে অনেক ভালো লাগল সাহেব।’ মাঝবয়সী লোকটা শ্রদ্ধাভরে বলে। ‘আপনার জন্য চা আনব নাকি ঠান্ডা?’

ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছে।

‘না, কিছু দরকার নেই। শুধু রাস্তা জিজ্ঞেস করার ছিল।’
তাড়াহুড়ো করে বললেন তিনি।

ড্রাইভার গাড়ি সামনে বাড়ায়। লোকগুলো পেছনে থেকে
তাকিয়ে থাকে। লোকটা হতাশ হয়ে মাথা নাড়ে। ‘হাহ্!
সালার সাহেবের কথা আলাদা। সে কি এভাবে কিছু না খেয়ে
এখান থেকে যেত?’ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে তারা যে
যার পথে পা বাড়ায়।

সালার মূলত এই দোকানগুলোর সামনে গাড়ি থামায়।
সেখানে থাকা লোকজনের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের
দেওয়া ছোটখাটো জিনিস খায়। এরপর ওখান থেকে পায়ে
হেঁটে দশ মিনিটে স্কুল দেখতে যায়। তাই এরা হতাশ
হয়েছে। সিকান্দার উসমান গাড়ি থেকেই নামেননি, তাদের
কিছু খাওয়া-পান তো দূরের কথা।

গাড়ি মোড় ঘোরে। ড্রাইভারের সঙ্গে কিছু বলতে বলতে
সিকান্দার উসমান থেমে যান। পেছনের সিটের উইন্ডস্ক্রিন

জুড়ে বিস্তৃত বিল্ডিংটা ছোট ছোট কাঁচা-পাকা বাড়ি-ঘর এবং ফসলের খোলা মাঠের মাঝে দূর থেকেও অবাক করে দিতে যথেষ্ট। সিকান্দার উসমানের অনুমান ছিল না তার ছেলে এখানে এত বড় স্কুল চালাচ্ছে। কিন্তু তাকে অবাক সেই বিশাল-বিস্তৃত বিল্ডিং করেনি। বরং স্কুলের দিকে যাওয়া রাস্তার সেই সাইনবোর্ডে করেছে। যেখানে হিরের একটা সংকেতের সঙ্গে মোটা অক্ষরে উদুতে লেখা ছিল, 'সিকান্দার উসমান হাইস্কুল।'

ড্রাইভার স্কুলের সামনে গাড়ি থামায়। সিকান্দার গাড়ি থেকে নেমে বিল্ডিংয়ের উপরে জ্বলজ্বল করা নিজের নাম দেখেন। তার চোখ কিছুটা ভিজে ওঠে। সালার সিকান্দার আবারও তাকে কিছু বলার মতো অবস্থায় রাখেনি। গেট বন্ধ, কিন্তু ওপাশে দারোয়ান ছিল। যে গাড়ি ওখানে থামতে দেখে সেটা খুলতে আসে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে বের হয়, দারোয়ানও সামনে এসে পড়ে।

'সাহেব শহর থেকে এসেছে, একটু স্কুল দেখতে চান।'
ড্রাইভার দারোয়ানকে বলল।

সিকান্দার উসমান তখনো স্থির চোখে স্কুলের উপরে থাকা
নিজের নামের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'সালার সাহেবকে জানিয়ে এসেছেন?' দারোয়ান জিজ্ঞেস
করল।

'না, এমনিতে এসেছি।' ড্রাইভার না থেমে বলল।

সিকান্দার উসমান এই প্রথম চোখ সরিয়ে ড্রাইভার আর
দারোয়ানের দিকে তাকায়। 'আমি সালার সিকান্দারের বাবা।'
ভরাট গলায় বললেন।

ড্রাইভার অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে। দারোয়ানও
হতভম্ব। 'আপনি... আপনি সিকান্দার উসমান সাহেব?'

সিকান্দার উসমান কিছু বলার পরিবর্তে যান্ত্রিকভাবে গেটের ভেতরে এগিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যায় তখন জগিং ট্রাকে ছিল সালার, যখন সিকান্দার উসমানের কল আসে। দ্রুত ওঠানামা শ্বাস কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে জগিং ট্রাকের পাশে একটা বেঞ্চে বসল।

'হ্যালো পাপা! আসসালামু আলাইকুম।'

'ট্রাকে?' ওর ভারী শ্বাসের শব্দে তিনি আন্দাজ করলেন।

'জি। কেমন আছেন আপনি?'

'আমি ভালো আছি।'

'মাম্মি কেমন আছেন?'

'সে-ও ঠিক আছে।'

সালার তার পক্ষ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করার বা বলার
অপেক্ষায় রইল। অপরপাশ নীরব।

কিছুক্ষণ পর বললেন। 'আজকে তোমার স্কুল দেখে এসেছি
আমি।'

'Really? কেমন লেগেছে আপনার?'

‘তুমি এসব কীভাবে করলে সালার? ওইসব, যা ওখানে
হচ্ছে।’

'জানি না, শুধু হয়ে গেছে... আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে
যেতাম। কোনো সমস্যা হয়নি তো?' সালারের চিন্তা হলো।

'সালার সিকান্দারের বাবার ওখানে কোনো সমস্যা হতে
পারে?' তিনি উত্তরে বললেন।

সালার জানে এটা প্রশ্ন না।



'তুমি কেমন মানুষ সালার?'

'জানি না। আপনার জানা উচিত, আপনার ছেলে।'

'না... আমি কখনোই জানতে পারিনি।' তার সুর অদ্ভুত ছিল।

সালার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'আমিও জানতে পারিনি। এখনো নিজেকে জানার চেষ্টাই করছি।'

'তুমি... তুমি... সালার তুমি একটা আহাম্মক, ইতর আর খবিশ মানুষ!'

সালার হাসে। 'আপনি ঠিক বলেন পাপা! আমি সত্যিই এগুলো। আর কিছু?'

'আর...এটা যে, আমি খুব ভাগ্যবান তুমি আমার সন্তান।' সিকান্দার উসমানের কণ্ঠ কাঁপছে।

এইবার চুপ থাকার পালা সালারের।

'আমাকে স্কুলের প্রতি মাসের খরচের হিসাব জানাবে, আমার ফার্ম প্রতিমাসে সেই অঙ্কের চেক পাঠিয়ে দেবো।'

এর কিছু বলার আগে অপর পাশ থেকে ফোন কেটে দেওয়া হয়। পার্কের কিছুক্ষণ বসে ট্র্যাকে দৌড়ানো মানুষগুলোকে ফাঁকা মস্তিষ্ক নিয়ে দেখল। এরপর সালার নিজেও লম্বা লম্বা পা ফেলে ট্র্যাকে ফিরে যায়।

রিমশার সঙ্গে সালারের প্রথম সাক্ষাৎ লাহোর আসার এক বছর পর হয়েছিল। রিমশা লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে স্নাতক করেছে এবং সালারের ব্যাংকে পোস্টিং হয়েছে। রিমশার বাবা ব্যাংকের একজন দীর্ঘদিনের কাষ্টমার ছিল এবং সালার তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনত।

রিমশা খুব সুন্দরী, বুদ্ধিমতী আর হাসিখুশি একটা মেয়ে। সেখানে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যাংকের সবার সঙ্গে

ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। একজন কলিগ হিসেবে সালারের সঙ্গেও বেশ ভালো পরিচয় ছিল এবং রিমশার বাবার কারণে মেয়েটাকে আলাদা শ্রদ্ধার চোখে দেখত ও। ব্যাংকে কাজ করা অন্যসব মেয়ের তুলনায় রিমশার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা হতো। কিন্তু সালারের কোনো আন্দাজ ছিল না রিমশা কখন থেকে ওকে সিরিয়াসলি নেওয়া শুরু করেছে। একটা সময় টের পায় প্রয়োজনের বেশি খেয়াল রাখে ওর। অফিসে ঘনঘন চলে আসে। অফিসের বাইরেও প্রায়ই ফোন করতে থাকে। এসব আচরণ কয়েকবার অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল যদিও। কিন্তু মনে ঊঁকি দেওয়া সন্দেহগুলি ঝেড়ে ফেলে। তবে ওর এই নিশ্চিত্তভাব পুরো এক বছর পর ঘটা এক ঘটনার সাথে একেবারে বিদায় নেয়।

সকালে অফিসে ঢুকতেই সালার চমকে উঠল। টেবিলের উপর বিশাল বড় আর খুব সুন্দর একটা বুকোট পড়ে আছে। ব্রিফকেস টেবিলে রেখে বুকোটের উপরে থাকা কার্ডটা তুলে হাতে নেয়। 'Happy birthday to Salar Sikander.'- রিমশা হামদানি।

একটা লম্বা শ্বাস ফেলল। এতে সংশয় নেই যে, আজ ওর জন্মদিন। কিন্তু রিমশা কীভাবে জানল? বিচক্ষণ ভাবনায় মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকোটটা একপাশে সরিয়ে রেখে কোট খুলে রিভলভিং চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে চেয়ারে বসল। বুকোটের নিচে টেবিলের উপর আরেকটা কার্ড। সেটাও খোলো। কয়েকবার তাতে লেখা লাইনগুলো পড়ে। এরপর কার্ড বন্ধ করে ড্রয়ারে রেখে উচিত। কিছুক্ষণ ভেবে মাথা থেকে সব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় কাঁধ ঝাঁকায়। ও জানে না এই বুকোট আর কার্ডের প্রতি কেমন প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। ল্যাপটপ বের করে ব্রিফকেসটা নিচে টেবিলের পাশে রাখছিল, তখন রিমশা ভেতরে আসে।

'Happy birthday Salar!' ভেতরে ঢুকেই বলল।

সালার হাসল। 'Thanks!'

রিমশা চেয়ার টেনে বসে। সালার ল্যাপটপ অন করছিল।

'বুকেট আর কার্ডের জন্য ধন্যবাদ। সুন্দর সারপ্রাইজ ছিল!'
সালার কথা বলতে বলতে ল্যাপটপের সঙ্গে ফোন অ্যাটাচ
করছে। 'কিন্তু তুমি আমার বার্থডে'র ব্যাপারে কীভাবে
জানলে?' জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না।

'জনাব! এটা তো আমি বলছি না আপনাকে। শুধু জানার,
জেনে নিয়েছি।' রিমশা রহস্যময়ী হেসে বলল। 'তাছাড়া বন্ধুরা
একে-অপরের কাছে এমন প্রশ্ন করে না। এসব বিষয় না
জানলে বন্ধু হওয়া যায় না।'

সালার ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রেখে রিমশার কথা শুনে
হাসে।

'এখন আমি সকল স্টাফের হয়ে পাটির ডিমাল্ড নিয়ে এসেছি।
আজকের দিনার তোমার তরফ থেকে।'

সালার ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে রিমশার দিকে তাকায়।
'রিমশা! আমি জন্মদিন পালন করি না।'

'কেন?'

'এমনিতেই।'

'কোনো কারণ তো থাকবে?'

'বিশেষ কোনো কারণ নেই। এমনিতেই করি না।'

'আগে করোনি হয়তো, কিন্তু এবার করতে হবে। সব ষ্টাফের ডিম্যান্ড।'

রিমশা সোজাসাপটা বলল।

'অন্য কোনোদিন খাওয়াতে পারি। বাড়িতে, হোটেলে বা যেখানে সবাই চাইবে। কিন্তু বার্থডে'র জের ধরে না।' সালারও স্পষ্ট বলে।

‘অর্থাৎ, তুমি চাইছ অন্য কেউ তোমার হয়ে পাটির ব্যবস্থা করুক?’

‘আমি এমনটা তো বলিনি।’ সালার হতভম্ব হয়ে বলল।

‘আচ্ছা, সবাইকে না হলেও আমাকে তো ডিনারে নিয়ে যেতে পারো.’

‘রিমশা! আজ রাতে কিছু বন্ধুর সঙ্গে ব্যস্ত থাকব আমি।’

‘কোনো ব্যাপার না, আমিও যোগ দেবো।’

‘না, এটা ঠিক হবে না।’

‘কেন...?’

‘সবাই পুরুষ, তাদেরকে তুমি চেনোও না।’

'আমি বুঝেছি। তাহলে কালকে যাই?'

'কাল না, অন্যদিন। আমি বলব।'

রিমশার মনখারাপ হয়। বোঝে সালার নিয়ে যেতে চাইছে না।
'ওকে।' উঠতে উঠতে বলল।

'আমি আশা করব তুমি মাইন্ড করোনি।' রিমশাকে উঠতে
দেখে সালার বলল।

'না, মোটেও না। ইট'স অলরাইট।' রিমশা হাসিমুখে ওর রুম
থেকে বেরিয়ে যায়।

সালার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভেবেছিল জন্মদিনের ঝামেলা
এখানেই শেষ। কিন্তু এটা ওর ভুল। লাঞ্চ আওয়ারে একটা
সারপ্রাইজ পার্টির ব্যবস্থা করা হয়। বস মিষ্টার পল মিলার খুব
উষ্ণভাবে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায় ওকে। পার্টি রিমশা
অ্যারেঞ্জ করেছে। কেক আর অন্যান্য সব খুঁটিনাটি দেখে

সত্যিই অস্থির হয়ে উঠল ও। আগে রিমশা আড়ালে-
আবডালে পছন্দের কথা বোঝাতে চাইলেও, আজ তা
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। লাঞ্চ আওয়ারের পর প্রায়
আধঘন্টা রিমশাকে নিয়ে ভাবে। বোঝার চেষ্টা করে কী এমন
ভুল হয়েছে, যা রিমশাকে ওর প্রতি আগ্রহী করে তুলল।

রিমশা খুব সুন্দরী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পেছনের
সময়গুলোতে দেখা হওয়া মেয়েদের মধ্যে সেরা একজন।
কিন্তু এটা কখনো চায়নি যে, ওর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠুক।
বেশ কিছুদিন ধরে রিমশার এই ভিন্ন ধরনের আচরণকে
আন্তরিকতা ভেবে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু সেদিন অফিস থেকে
বাড়ি ফিরে উপহারের প্যাকেট খোলার পর চোখ ছানাবড়া
হয়ে যায়। উপহারগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর যখন বিহ্বল
অবস্থা, ফুরকান তখন ভেতরে ঢোকে। ড্রয়িংরুমে পড়ে
থাকা প্যাকেট ফুরকানেরও নজর কাড়ে।

'ওয়াও! আজকে তো বিশেষ সব উপহার একসঙ্গে এসে
পড়েছে। আমিও দেখি?' ফুরকান সোফায় বসে বলল।

সালার শুধু মাথা নাড়ল। ঘড়ি, পারফিউম, টাই, শার্ট-ফুরকান
এক এক করে সব বের করে দেখতে থাকে।

'তোমার বিয়ের মার্কেট হয়ে গেল না?' ফুরকান ঠাট্টাচ্ছিলে
বলল। 'কলিগরা মনখুলে উপহার দিয়েছে।'

'শুধু একজন কলিগ।' সালার কথার মাঝে বলল।

'এতকিছু একজন দিয়েছে।' ফুরকান অবাক হয়।

'হ্যাঁ।'

'কে সে?'

'রিমশা।'

ফুরকান ঠোঁট চেপে ধরল। 'এগুলো এক-দেড় লাখের মতো
হবে।' আবার জিনিসগুলোর ওপর চোখ বোলায়। 'শুধু একটা

ঘড়িই পঞ্চাশ হাজারের। কেউ শুধু একজন কলিগ ভেবে এত দামি জিনিসপত্র দেওয়ার কথা না। তোমাদের মাঝে কিছু...?' বলতে বলতে থেমে যায়।

'আমাদের দু'জনের মাঝে কিছু নেই, অন্তত আমার তরফ থেকে। কিন্তু আজ আমিও চিন্তায় পড়ে গেছি। মনে হচ্ছে রিমশা আমার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ নিচ্ছে।' সালার জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল।

'দারুণ! যাক অবশেষে তোমার প্রতি কোনো মেয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে।' ফুরকান প্যাকেটগুলো সেন্টার টেবিলের উপরে রেখে বলল। 'এমনিতেও তুমি যথেষ্ট ব্যাচেলর থেকেছ, পারলে এই বছর খুশির কাজটা সেরে ফেলো।'

'যেহেতু আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, তাই এই বিষয়টা এগিয়ে নেওয়ার মানে নেই।'

'সালার! দিনে দিনে তুমি এত ইল্যাকট্রিক্যাল হয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার এখন সেটেল্ড হওয়ার ব্যাপারে ভাবা উচিত। কতদিন এভাবে মেয়েদের কাছ থেকে পালাবে? নিজের ফ্যামিলি শুরু করো। রিমশা ভালো মেয়ে। আমি ওর পরিবারকে চিনি। কিছুটা মডার্ন কিন্তু ভালো মেয়ে। রিমশা না হোক, অন্য কাউকে অন্তত বিয়ে করে নাও। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। নিজের বাবা-মায়ের সাহায্য নিতে পারো। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার এখন সিরিয়াস হয়ে ভাবতে হবে। এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কমপক্ষে অন্য কারো কথায় তাকে কিছু জানিয়ে দেওয়া উচিত।' ফুরকান শেষ বাক্যে জোরে দেয়। ইশারা সালারের নীরবতার দিকে। 'তাতে অন্তত অপর মানুষটা বুঝে যাবে ভিডের মাঝে এমন কিছু করতে নেই। তুমি কখনো নিজের বিয়ে নিয়ে ভাবো না?'

'নিজের বিয়ে নিয়ে কে ভাবে না? আমিও ভাবি। কিন্তু আমি সেভাবে ভাবি না, যেভাবে তুমি ভাবছ।' সালার মধ্যম আওয়াজে বলল। 'চা চলবে?'

'শেষ বাক্যের পরিবর্তে সোজা বলো, বাজে প্যাঁচাল বন্ধ করো।' ফুরকান রাগ করে বলল।

সালার হেসে কাঁধ ঝাঁকায়। এরপর জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখে।

রিমশা অবাক হয়ে সামনে রাখা প্যাকেটগুলোর দিকে তাকায়। 'কিন্তু সালার! এগুলো তোমার বার্থডে গিফট।'

সালার পরদিন সকালে একটা টাই রেখে বাকি সব তুলে রিমশার অফিসে নিয়ে আসে। 'আমি কারো কাছ থেকে এত দামি উপহার নেই না। একটা টাই যথেষ্ট।'

'সালার! আমি আমার বন্ধুদেরকেও এমন দামি উপহার দেই।' রিমশা বোঝানোর চেষ্টা করে।

'তুমি দিয়ে থাকবে, কিন্তু আমি নেই না। বেশি জোর করলে রেখে দেওয়া টাইও ফেরত দেবো।' কথা শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে যায় সালার।

রিমশা রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখল।

সেদিনও যথারীতি ড. সিবতে আলির কাছে এসেছিল সালার। ড. সাহেব এখনো লেকচার শুরু করেনি। এমন সময় তার পাশে বসা এক মধ্যবয়সী লোক তাকে বলে উঠল।

“পীর সাহেব। মানুষ পীর-এ-কামিল পেয়ে গেলে তার তকদির বদলে...”

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। গত কয়েকদিন ধরে এখানে আসছে সেই লোকটা।

‘যখন থেকে আপনার কাছে আসছি মনে হচ্ছে আমি হেদায়ত পেয়ে গেছি। আমার ভুলগুলো শুধরে যাচ্ছে।

আমার হৃদয় বলছে, আমি পীর-এ-কামিল পেয়ে গেছি। আমি আপনার হাতে বাইআত নিতে চাই।" লোকটা পরম ভক্তিভরে ড. সাহেবের হাত ধরে বলল।

রুমজুড়ে পিনপতন নীরবতা। ড. সাহেব আলতো করে লোকটার হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নেন। 'তকি সাহেব! আমি আজ পর্যন্ত কারো কাছ থেকে বাইআত নেইনি। আপনার মুখ থেকে পীর-এ-কামিলের উল্লেখ শুনছি। পীর-এ-কামিল কে? কাকে বলে? তিনি কী করেন? তাকে মানুষের প্রয়োজন কেন?' খুব গভীর কণ্ঠে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি পীর-এ-কামিল।' লোকটা বলল।

'না, আমি পীর-এ-কামিল নই।'

'আপনার কাছ থেকে আমি নির্দেশনা পাই।' লোকটা জোর দেয়।

'নির্দেশনা তো শিক্ষক, অভিভাবক, নেতা, বন্ধু এবং
আশেপাশের মানুষরাও দেয়। তারা কি পীর-এ-কামিল?'

'আপনি... আপনি গুনাহ করেন না।' লোকটা খতমত খেয়ে
বলল।

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করে করি না। কারণ গুনাহকে ভয় পাই আমি।
এখানে বসে যারা অনেক মানুষই ইচ্ছে করে গুনাহ করে না,
কারণ তারাও হয়তো আমার মতো গুনাহকে ভয় পায়। কিন্তু
অনিচ্ছায় আমাকে দিয়ে কত কী হয়ে যায়, আমিও জানি না।
হতে পারে অনিচ্ছায় আমাকে দিয়েও গুনাহ হয়ে যায়।' তিনি
হেসে বললেন।

'আপনার দোয়া কবুল হয়ে যায়।' লোকটা নিজের বিশ্বাস
থেকে নড়তে প্রস্তুত না।

‘বাবা-মায়ের দোয়া কবুল হয়। নির্যাতিত-নিপীড়িতদের মতো
আরও অনেকের দোয়াও তো কবুল হয়।’

'কিন্তু আপনার সব দোয়া কবুল হয়।' লোকটা জোর দিয়ে বলে।

ড. সিবতে আলি না-বোধক মাথা নাড়লেন। 'না, আমার সব দোয়া কবুল হয় না। বছ বছর ধরে আমি প্রতিদিন মুসলমানদের পূর্নজাগরণের দোয়া করছি, কিন্তু এখনো তা কবুল হয়নি। এমন অনেক বিষয় আছে, যে ব্যাপারে আমি রোজ দোয়া করি, কিন্তু তা কবুল হচ্ছে না।'

'কিন্তু আপনার কাছে যারা দোয়ার জন্য আসে, তাদের জন্য করা আপনার দোয়া কবুল হয়ে যায়'

ডক্টর সাহেবের হাসি আরও গভীর হয়। 'আপনার জন্য করা দোয়া হয়তো কবুল হয়ে গেছে। তবে এখানে অনেকেই আছে, যাদের জন্য আমার করা দোয়া কবুল হয়নি বা হবেও না।'

লোকটা আর কিছু বলতে পারল না।

'আপনাদের মধ্যে কেউ বলতে পারবেন পীর-এ-কামিল কে?'

ওখানে উপস্থিত সবাই এক-অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

'পীর-এ-কামিল নেককার, পরহেজগার ও পবিত্র মানুষ।'

ড. সিবতে আলি মাথা নাড়লেন। 'অনেক মানুষ নেক হয়, পরহেজগার ও পবিত্র হয়। আপনার আশেপাশে এমন অনেক মানুষ রয়েছে। তাহলে কি তারা সবাই পীর-এ-কামিল?'

'না। পীর-এ-কামিল এমন একজন, যে দেখানোর জন্য ইবাদত করে না। মন থেকে ইবাদত করে শুধু আল্লাহর জন্য। যার ধার্মিকতা ও তাকওয়ার মাঝে লৌকিকতা থাকে না। আরেকজন তার মতামত দেয়।

'আপনাদের পরিচিতদের মধ্যে প্রত্যেকেই এমন কাউকে নিশ্চয়ই চেনে যার ইবাদতের ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস তার

এসব লৌকিকতা না। তার ধার্মিকতা ও তাকওয়ার ওপর আপনার ভরসা রয়েছে। তাহলে কি সেই মানুষটা পীর-এ-কামিল?’

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আরেকজন বলল। ‘পীর-এ-কামিল এমন একজন, যার কথায় তাসির থাকে, মানুষের মন পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকে।’

‘এমন তাসির অনেক মানুষের কথায় থাকে। কারো মুখ থেকে বের হওয়া কথায়, কারো কলম দিয়ে বের হওয়া লেখায়। তাসির তো স্টেজে দাঁড়ানো একজন বক্তা এবং খবরের কলাম লেখা একজন সাংবাদিকের কথায়ও থাকে। তবে কি তারা পীর-এ-কামিল?’

আরেকজন বলে উঠল। ‘পীর-এ-কামিল এমন একজন, যার মাঝে অনুপ্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। যিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন।’

‘আমাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা স্বপ্ন দেখে। এমন স্বপ্ন, যেখানে আগামীতে আসা বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়। কিছু মানুষ ইন্টিখারাও করে এবং কিছু বিষয় বুঝে ফেলে। কিছু মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ হয়। তারা বিপদ টের পেয়ে যায়। তাহলে বলুন পীর-এ-কামিল আসলে কে?’ তিনি আবার প্রশ্ন করলেন। ‘পীর-এ-কামিল মূলত কে হতে পারে?’

সালার অবোধ্য চেহারা নিয়ে ড. সিবতে আলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ড. সিবতে আলি ছাড়া অন্য কেউ কি পীর-এ-কামিল হতে পারে? যদি তিনি পীর-এ-কামিল না হয়ে থাকেন তাহলে কে সেই পীর-এ-কামিল? আর কে হতে পারে? সেখানে উপস্থিত মানুষের মন আর মস্তিষ্কেও একই প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ড. সিবতে আলি একে একে সবার চেহারা দেখলেন। তার মুখের হাসি আন্তে আন্তে মৃদু হয়ে আসে।

'পীর-এ-কামিলের মাঝে পরিপূর্ণতা থাকে। পরিপূর্ণতা হচ্ছে সেই সবকিছুর যোগফল, যা আপনারা বলছিলেন। পীর-এ-কামিল এমন একজন, যিনি হৃদয় থেকে আল্লাহর ইবাদত করেন। পরহেজগার ও তাকওয়াশীল। যার প্রতিটি দোয়া কবুল হয়, যতটুকু আল্লাহ চান। তার কথায় তাসির থাকে। তিনি মানুষকে হেদায়তের পথ দেখান। কিন্তু তার মাঝে ইলহাম থাকে না, বিজদান থাকে। ওহি নাজিল হয় তার ওপর এবং ওহি কোনো সাধারণ মানুষের ওপর নাজিল হয় না। কেবল নবীদের ওপর নাজিল হয়। এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীর সকলেই কামিল ছিলেন। তবে পীর-এ-কামিল হচ্ছে কেবলই তিনি, যার মাধ্যমে এই নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে।'

'প্রতিটি মানুষের জীবনে একটা সময় পীর-এ-কামিলের প্রয়োজন দেখা দেয়। কখনো কখনো জীবন মানুষকে এমন পর্যায়ে এনে দাঁড় করায়, যখন মনে হয় আমাদের মুখ ও মন থেকে বের হওয়া দোয়া অকার্যকর হয়ে পড়েছে। আমাদের সেজদা, উপরে তোলা হাত রহমত ও নেয়ামতকে

নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারছে না। এমন মনে হয়, যে সম্পর্ক ছিল তা এখন ভেঙে গেছে। তখন মানুষের ইচ্ছে করে, তার জন্য যেন অন্য কেউ হাত তোলে। অন্য কারো জিভ তার দোয়া যেন আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়। অন্য কেউ তার হয়ে যেন আল্লাহর কাছে অনুন্নয় করে। এমন একজন, যার দোয়া কবুল হয়। পীর-এ-কামিলের সন্ধান শুরু করে। চারপাশে দৌড়ায়। এমন কারো খোঁজে, যার ঠোঁটের আবেদন তার দোয়ার মতো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। মানব-বিবর্তনের শুরু থেকে এখনো অবধি অব্যাহত। এটা যে পরিপূর্ণতার যেকোনো পর্যায়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। তখন মানুষ অনুসন্ধান করে। পীর-এ-কামিলের অনুসন্ধান সেই আকাজক্ষা, যা আল্লাহ নিজে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেছে। এই আকাজক্ষা, এই অনুসন্ধান যদি মানুষের অন্তরে না তৈরি করা হতো, তবে মানুষ নবীদের প্রতি বিশ্বাস আনত না। কখনো তাঁদের অনুসরণ ও আনুগত্যের চেষ্টা করত না। পীর-এ-কামিলের এই অনুসন্ধানই মানুষকে প্রতিটি যুগে নাজিল হওয়া নবীদের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর নবীদের আগমনের এই ধারাবাহিকতাকে হজরত মুহাম্মাদ

সা.-র মাধ্যমে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। নবী সা.-র উন্মত্তের জন্য তাঁর পরে কোনো পীর-এ-কামিলের অবকাশ রাখা হয়নি।

'আজ বা আগামীতে এমন কে আছে বা আসতে পারে, যাকে হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সা.-র চেয়ে উঁচু স্থান দেওয়া যাবে? এমন কেউ কি আছে বা আসবে, যাকে হজরত মুহাম্মাদ সা.-র চেয়ে নিখুঁত বানানো হয়েছে বা হবে। এমন কেউ কি আছে, যে হজরত মুহাম্মাদ সা.-র চেয়ে বেশি শাফায়াতের দাবি করতে পারবে? স্থির ও স্থায়ী নীরবতায় আসা না-বাচক এই উত্তর আমাদের কাছে শুধু একটা প্রশ্ন করে, পীর-এ-কামিল সা.-কে ছেড়ে আমরা পৃথিবীতে অন্য কাকে খুঁজছি? নবী সা.-র বাইআত পাওয়ার পরও আমাদের জন্য অন্য কার বাইআতের প্রয়োজন রয়ে গেছে? রসূল সা.-র রাস্তায় চলার পরিবর্তে অন্য কোন রাস্তা আমাদের টানছে? মুসলমানদের জন্য একজন আল্লাহ, এক কুরআন ও একজন রসূল সা. এবং তাঁর সুন্নত কি যথেষ্ট নয়? আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. এবং তাঁর কিতাব ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি বা বাণী আছে, যা

আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে? কে আছে, যে আমাদের দোয়া কবুল করাবে, আমাদের ওপর নেয়ামত এবং রহমত নাজিল করাবে? কেউ কি পীর-এ-কামিলের পন্থা বলতে পারবে? কেউ বলতে পারবে না।" ড. সিবতে আলি বলছিলেন।

'তিনি একমাত্র মুসলমান ছিলেন, যিনি বিশ্বাস করতেন যে সিরাজে মুস্তাকিমের ওপর চললে জান্নাত এবং সেই রাস্তা থেকে সরে গেলে আল্লাহর আজাবের নিশানা হতে হবে এবং সেই মোতাবেকই চলতেন। সিরাতে মুস্তাকিম সেই পথ, যা আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে কুরআনে বর্ণনা করেছেন। স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সেই কাজ করুন, যা আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে আদেশ করেছেন এবং যা নিষেধ করা হয়েছে, সেই কাজ থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ রসুল সা. এবং কুরআন কোনো বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা রাখেনি। কুরআন খুলুন যদি কোথাও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বাক্যে কোনো দ্বিতীয় নবী বা পীর-এ-কামিলের উল্লেখ পান, তবে তাকে খুঁজতে পারেন। আর যদি তেমন কিছু খুঁজে না পান, তাহলে শুধু ভয় পাওয়া শুরু

করুন যে নিজেকে কোন চোরাবালিতে নিয়ে যাচ্ছেন?
পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবন ব্যবহার করে কীভাবে
অনন্তকালের জীবন ধ্বংস করছেন? কত বড় লোকসানের
ব্যবসা করছেন?'

'হেদায়তের খোঁজ চাইলে কুরআন খুলুন। এমন কী আছে,
যা আপনার জন্য সেখানে বলে দেওয়া হয়নি? কুরআন
আপনাকে মূর্খ, অজ্ঞ এবং অজানায় রাখবে না। সত্য আপনার
মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে। আল্লাহ কি মানুষকে চেনেন না?
সেই প্রাণীকে, যে তাঁর কোটি কোটি সৃষ্টির একটি। দোয়া
কবুল না হলে সঙ্গ বা মাধ্যম খোঁজার পরিবর্তে শুধু উপরে
হাত তুলুন, আল্লাহর কাছে নিজে চান। দিয়ে দিলে শুকরিয়া
আদায় করুন, না দিলে সবর করুন। কিন্তু হাত নিজেই তুলুন।
জীবনযাপনের শৃঙ্খলা-নির্দেশনা না খুঁজে পেলে রসূল সা.-
কে অনুসরণ করুন। সবকিছু পেয়ে যাবেন। সম্মান সবার
করুন। প্রত্যেক ওলি, মুমিন, দরবেশ, শহিদ, ধার্মিক ব্যক্তি,
পবিত্র মানুষের। কিন্তু জীবনের পথপ্রদর্শন ও নির্দেশনা কেবল
হজরত মুহাম্মাদ সা.-র কাছ থেকে নিন। কারণ তিনি

আপনার-আমার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত আদেশ পৌঁছাননি, যা বলে গেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছিল।"

'ড. সিবতে আলি কে, কী, কয়জন চেনে? আপনি আর হয়তো কয়েকশো বা কয়েক হাজার মানুষ। কিন্তু আমি যে পীর-এ-কামিল সা.-র কথা বলছি, তাঁকে হাজার কোটির বেশি মানুষ নিজেদের আধ্যাত্মিক নেতা মানে। আমি তো সেইসব বলছি, পুনরাবৃত্তি করছি, যা চৌদ্দশো বছর আগে হজরত মুহাম্মাদ সা. বলে গেছেন। আমি নতুন কী বলেছি?' ড. সিবতে আলি নীরব হয়ে গেলেন।

রুমে উপস্থিত সবাই আগে থেকেই নীরব। তিনি যেন সেখানে বসা প্রত্যেকের সামনে আয়না ধরে ছিলেন। আয়নায় ভেসে ওঠা প্রতিবিন্দু কাউকে নাড়াচ্ছে, কাউকে কাঁপাচ্ছে। লেকচার শেষে বেরিয়ে সালার অনেকক্ষণ গাড়ির সিটে চুপচাপ বসে রইল। ওর চোখে বাঁধা শেষ পট্টাও আজ খুলে দেওয়া হয়েছে। কয়েক বছর আগে ইমামা হাশিম যখন পরিণতি বিবেচনা না করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ছিল, তখন

এই ভক্তি বুঝতে অক্ষম ছিল ও। বোকামি মনে ছিল। পরে মতামতে পরিবর্তন এনেছে। বিশ্বাস করেছে একজন মানুষ সত্যি হজরত মুহাম্মাদ সা.-র ভালোবাসায় সবই ছেড়ে দিতে পারে। ইসলাম সম্পর্কে জানতে শুরু করার পর জেনেছে সাহাবায়ে কেরামও এমন কুরবানি দিতেন। হজরত বিলাল রা. থেকে হজরত উয়াইস আল কারনি পর্যন্ত অগণিত মানুষ ছিল এবং সব যুগেই থাকবে।

সালার সিকান্দার স্বীকার করে নেয় রসুল সা.-কে ভালোবাসার শক্তি এত প্রবল যে, মানুষ যেকোনো কিছু ছাড়তেও দ্বিধা করবে না। কখনো এই ভালোবাসার বিশ্লেষণের চেষ্টা করেনি ও। কিন্তু আজ প্রথম সেই কাজ করছিল। শুধু নবী সা.-র ভালোবাসাই না; বরং ইমামা হাশিম বাড়ি থেকে বের হয়েছিল সিরাতে মুস্তাকিম পেয়ে। সেই সিরাতে মুস্তাকিম, যা একসময় অন্ধের মতো খুঁজেছে ও। সাহাবায়ে কেরাম রা. যেই পথ ধরে হেঁটেছেন। ইমামা হাশিম বহু বছর আগেই পীর-এ-কামিল সা.-কে পেয়ে গিয়েছিল। সেই নির্ভিকতা, এই হেদায়তের শক্তি ছিল; যা রসুল সা.-

কে ভালোবাসার কারণে এসেছিল। কিন্তু ও... আজ অবধি একা পীর-এ-কামিলকে খুঁজে বের করতে পারেনি। অথচ ইমামা নিজে সব করেছিল, খোঁজ থেকে আনুগত্য পর্যন্ত। সালার সিকান্দারের মতো ইমামা হাশিমের অন্য কারো কাঁধ প্রয়োজন হয়নি।

সালার সিকান্দার গত আট বছরে ইমামা হাশিমের জন্য সব ধরনের অনুভূতি অনুভব করেছে। অবজ্ঞা, উপহাস, অনুশোচনা, ঘৃণা, ভালোবাসা সবকিছু। কিন্তু আজ সেখানে বসে প্রথমবার ইমামার প্রতি হিংসা কাজ করে। 'কী ছিল ও? একটা মেয়ে... খুব সাধারণ... আকাশের হরও না। সালার সিকান্দারের মতো পুরুষের সামনে ওর কী মূল্য? আমার মতো আইকিউ ছিল ওর? আমার মতো সফলতা ছিল ওর কাছে? আমার মতো কাজ করতে পারবে ও? আমার মতো নাম অর্জন করতে পারবে ও? কিছুই ছিল না। তবু ওর সামনে সবকিছু প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আমি... যার আইকিউ লেভেল ১৫০+! তাকে চোখের সামনে থাকা জিনিস দেখতেও অক্ষম রাখা হয়।' আর্দ্র চোখে অন্ধকারে

উইন্ডফ্রিন দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিড়বিড় করে। 'আমাকে শুধু যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে বাইরে বেরিয়ে পৃথিবী জয় করার। সেই পৃথিবী, যার কোনো মূল্য নেই। আর ও...ও...?'

সালার খেমে যায়। ইমামার ওপর ওর রাগ উঠছিল। আট বছর আগের সময় থাকলে এখন ইমামাকে 'Bitch' বলত ও। তখন ইমামার ওপর রাগ উঠলে এটাই বলত। কিন্তু আট বছর পর আজ ইমামার জন্য কোনো গালি জবানে আনতে পারেনি। ইমামা হাশিমের জন্য কোনো বাজে ভাষা ব্যবহারের সাহস করতে পারেনি। সিরাতে মুস্তাকিমে নিজের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা সেই মেয়ের জন্য কে মুখ দিয়ে বাজে কথা আনতে পারে? চশমা খুলে চোখ মোছে। ওর ভঙ্গিতে পরাজয় ছিল। পীর-এ-কামিল... সিরাতে হয়েছে। উত্তর পেয়ে গেছে ও।

ওরা দু'জন একটা রেস্টুরেন্টে ছিল। রিমশা আজকে আলাদাভাবে সেজেছে। ও যে খুশি, তা যে-কেউ চেহারা দেখে বলে দিতে পারবে। সালারও তা জানে। ওয়েটারের কাছ থেকে মেন্যু কার্ড নিলেও বন্ধ করে রেখে দেয় সালার। রিমশা অবাক হয়, ও নিজের কার্ড খুলে দেখছিল।

'লাঞ্চ আমার তরফ থেকে হলেও মেন্যু তোমার পছন্দের হবে।' সালার মুচকি হেসে বলে।

'ওকে।' রিমশা মনখুলে হাসে। ওয়েটারকে খাবার নোট করায়। ওয়েটার চলে যাওয়া পর বলল। 'তোমার তরফ থেকে লাঞ্চ। এই দাওয়াত আমার জন্য বেশ সুন্দর সারপ্রাইজ। আগে তো কখনো এভাবে দাওয়াত দাওনি বরং আমি দিলেও ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমাদের কিছু কথা বলা জরুরি হয়ে গেছে। এজন্য ডাকতে হলো।' সালার বলল।

রিমশা গভীর চোখে তাকায়। 'কিছু কথা? কোন বিষয়ে?'

'আগে লাঞ্চ করি, তারপর বলব।' সালার এড়িয়ে যায়।

'কিন্তু লাঞ্চ আসতে এবং খেতে অনেক সময় লাগবে। ভালো হয় যদি আমরা এখনই বলে ফেলি।' রিমশা অধৈর্য হয়ে বলল।

'না, এটা ভালো হবে না। লাঞ্চের পরই কথা হোক।' সালার হাসে, কিন্তু নির্দেশের সুরে বলে।

রিমশা আর জোর দেয়নি। ওরা হালকা আলাপ করতে থাকে। লাঞ্চ চলে আসে। দু'জন খাওয়ায় ব্যস্ত হয়। লাঞ্চ শেষ হতে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা লাগে। সালার ওয়েটারকে কফি আনতে বলে।

'আমার মনে হয় এখন কথা শুরু করা উচিত।' রিমশা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল।

সালারকে এখন খুব গম্ভীর লাগছে। মাথা নিচু করে কফিতে চামচ নাড়ছিল ও। রিমশার আওয়াজে মাথা তোলে। 'আমি সেই কার্ডের ব্যাপারে কথা বলতে চাই, যা দুদিন আগে তুমি পাঠিয়েছ।'

রিমশার মুখ কিছুটা লাল হয়ে ওঠে।

দুদিন আগে...? দুদিন আগে যখন সালার ফ্ল্যাটে ফেরে, তখন একটা কার্ড আর বুকেট অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। এক সপ্তাহ ব্যাংকের কাজে হংকং-এ কাটিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় ফিরেছিল। কার্ড রিমশার পাঠানো। 'তোমাকে আবার দেখতে পাওয়ার খুশি আমার জন্য কত বড়, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।' কার্ডের উপরের লেখা লাইন পড়ে থা মেরে বসে থাকে। ওর সবচেয়ে খারাপ ভয় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রিমশা নিজের অনুভূতির জানান দিচ্ছিল। পরের দুইদিন এই কার্ডের ব্যাপারে কিছু বলেনি। কিন্তু উইকেন্ডে লাঞ্চার জন্য ডাকে। রিমশার সঙ্গে এখন সব কথা পরিষ্কার করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

'কার্ড তোমাকে বিরক্ত করেছে?' রিমশা জিজ্ঞেস করল।

'না, লাইন।'

রিমশা খানিক ব্রিডত হয়। 'আ'ম সরি! কিন্তু সালার... আমি শুধু বলতে চেয়েছি তোমাকে কতটা মিস করেছি।'

সালার কফিতে চুমুক দেয়।

'আমি তোমাকে পছন্দ করি, বিয়ে করতে চাই।' রিমশা কিছুক্ষণ বিরতির পর বলল। 'হয়তো এই প্রপোজাল তোমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে আমি এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। ফ্লাট না, কার্ডে যা লিখেছি, সত্যি আমি তোমার জন্য তা অনুভব করি।'

সালার ওকে কথা শেষ করতে দেয়। এরপর কফির কাপ নামিয়ে রেখে বলল। 'কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাই না।'

'কেন?'

'এই প্রশ্নের উত্তর কি জরুরি?'

'না, জরুরি না। তবে বলতে ক্ষতি কী?'

'তুমি আমাকে কেন বিয়ে করতে চাও?'

'কারণ তুমি আলাদা।'

সালার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলো।

‘সাধারণ পুরুষদের মতো নও, সততা আছে তোমার মাঝে।
কালচারড, প্রমড।’

'আমি এমন নই।'

'প্রমাণ করো।' রিমশা চ্যালেঞ্জ করে।

‘করতে পারি কিন্তু করব না।’ কফির কাপ আবার তুলে নেয়।
‘সব পুরুষ সালার সিকান্দারের চেয়ে অন্তত ভালো।’

‘না।’

‘কোন দিক দিয়ে?’

‘সবদিক দিয়ে।’

‘আমি বিশ্বাস করি না।’

‘তোমার অবিশ্বাসে সত্য বদলে যাবে না।’

‘আমি তোমাকে চিনি, দেড় বছর ধরে তোমার সঙ্গে কাজ
করছি।’

‘পুরুষদের ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি কোনো সিদ্ধান্তে আসা
ঠিক না।’

'তোমার কোনো কথাই তোমার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত
বদলাতে পারবে না।'

'তুমি যে ফ্যামিলির, যে সোসাইটির; সেখানে আমার চেয়ে
ভালো কাউকে পেয়ে যাবো।'

'আমার সাথে তুমি শুধু নিজের তরফের কথা বলো।'

'রিমশা... আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি।' অবশেষে বলে।

এতক্ষণের কথাবার্তায় এই প্রথম রিমশার মুখ কালো হয়ে
যায়। "তুমি... তুমি কখনো... কখনো বলোনি।"

সালার মৃদু হাসল। 'আমাদের মধ্যে এমন খোলামেলা সম্পর্ক
কখনো ছিল না।'

'তুমি ওকে বিয়ে করবে?'

দু'জনের মাঝে দীর্ঘ নীরবতা নেমে আসে।

'হতে পারে কিছু অসুবিধার কারণে বিয়ে করতে পারব না।'
সালার বলল।

'বুঝলাম না। কাকে ভালোবাসো এটা জেনেও যে, তোমাদের
বিয়ে না-ও হতে পারে?'

'হ্যাঁ, এমন কিছুই।'

'এত আবেগি তো তুমি নও সালার! একজন সম্পূর্ণ
প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। আর একজন প্র্যাকটিক্যাল মানুষ হয়ে
এসব অদ্ভুত কথা বলছ?' রিমশা ঠাটাচ্ছলে বলল। 'ধরো
ওখানে যদি তোমার বিয়ে না হয়, তাহলে বিয়ে করবে না?'

'না।'

রিমশা ডানে-বামে মাথা নেড়ে বলল। 'আই কান্ট বিলিভ ইট!'

'কিন্তু ব্যাপারটা এমনই। বিয়ের কথা ভাবলেও দশ-পনেরো বছর পর। আর দশ-পনেরো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকব কিনা এর নিশ্চয়তা কী।' খুব শুকনো সুরে বলে হাতের ইশারায় ওয়েটারকে ডাকল ও। 'আমি চাই রিমশা আজকের কথাবার্তার পর আমাদের মধ্যে আর কোনো সমস্যা তৈরি হবে না। আমরা ভালো কলিগ। সম্পর্কটা এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকুক। আমার জন্য নিজের সময় নষ্ট করো না। আমি তা নই, যা তুমি ভাবছ।'

ওয়েটার এসে পড়ে। সালার বিল দেয়। রিমশা একদৃষ্টে সালারের দিকে তাকিয়ে রইল, গভীর ভাবনায় ডুবে।

সেদিন এক কাজে সালার লাঞ্চ ব্রেকে অফিস থেকে বেরিয়ে ছিল। রেলক্রসিংয়ে যানজটের ভিড় দেখে দূরে থেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়। এই মুহূর্তে কোনো ট্রাফিক-জ্যামে ফেঁসে সময় নষ্ট করতে চায় না। গাড়ি পেছনে এনে অন্য রাস্তায় ইউটার্ন নিলো। রাস্তায় একটু এগিয়ে যেতেই একজন বয়স্ক মহিলা ফুটপাথে বসা দেখতে পায়। এটা একটা হাই রোড, প্রায় নির্জন। মহিলার পোশাক ও চেহারা মনে হচ্ছে ভালো পরিবারের। হাতের স্বর্ণের চুড়িগুলোও দেখা যাচ্ছিল। ওর ভয় হয় বয়স্ক মহিলা নির্জন রাস্তায় কোনো বিপদের মুখে না পড়ে যায়। গাড়ি তার কাছে এনে থামাল। মহিলার ফর্সা রং লাল হয়ে উঠেছে, শ্বাস দ্রুত ওঠা-নামা করছে। হয়তো শ্বাস ঠিক করার জন্যই রাস্তার পাশে বসেছিল।

'আসসালামু আলাইকুম আম্মাজি। কী সমস্যা, এখানে কেন বসে আছেন?' সানগ্লাস খুলে জানালা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করে ও।

'বাবা! আমি রিকশা পাচ্ছি না।'

সালার তার কথা শুনে অবাক হয়। এটা মেইন রোড না, আবাসিক এলাকার হাই রোড। এখানে রিকশা পাওয়ার কোনো চান্স নেই। 'আম্মাজি, এখান থেকে আপনি রিকশা পাবেন না। কোথায় যাবেন?'

ভদ্রমহিলা শহরের ভেতরের এক এলাকার নাম বলে। সালারের পক্ষে তাকে সেখানে রেখে আসা সম্ভব না। 'আমার সাথে চলুন, মেইন রোডে দিয়ে আসছি। সেখান থেকে রিকশা পেয়ে যাবেন।' পেছনের দরজার লক খুলে বাইরে বের হয়। কিন্তু মহিলাকে উদ্বিগ্ন মনে হলো। তার ভয়ের কারণ বোঝে সে। 'আম্মাজি! ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি ভালো মানুষ, আপনার ক্ষতি করব না। শুধু সাহায্য করতে চাই। কারণ এখান থেকে রিকশা পাওয়া যাবে না। তাছাড়া রাস্তা নির্জন। গয়না পরে আছেন, যে-কেউ ক্ষতি করতে পারে।' নরমভাবে তার ভয় দূর করার চেষ্টা করল।

মহিলা চোখের চশমা ঠিক করে চুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। 'এগুলো... এগুলো তো সব নকল গয়না।'

'এটা তো ভালো কথা, কিন্তু যে-কেউ ভুল বুঝতে পারে।
কেউ তো এসে জিজ্ঞেস করবে না এগুলো আসল না নকল'
সালার তার মিথ্যের মান রেখে বলল।

মহিলা চিন্তায় পড়ে যায়। সালারের দেরি হচ্ছে। 'আচ্ছা
আম্মাজি! আপনি ঠিক মনে না করলে থাক।' গাড়ির দিকে পা
বাড়ায়।

মহিলা পেছনে থেকে বলে ওঠে। 'না, না আমি যাব তোমার
সাথে। এমনিতেই পায়ের দম শেষ হাঁটতে হাঁটতে।' পায়ের
উপর জোর দিয়ে তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। সালার তার
হাত ধরে সাহায্য করে। এরপর পেছনের সিটের দরজা খুলে
ভেতরে বসিয়ে দেয়। হাই রোড ক্রস করে মেইন রোডে
এসে খালি রিকশা খোঁজে। কিন্তু আশেপাশে কোনো রিকশা
চোখে পড়ছিল না। তাই আন্তে আন্তে গাড়ি চালিয়ে ভিড়ের
মাঝে খালি রিকশার খুঁজতে থাকে।

'তোমার নাম কী বাবা?'

'সালার।'

'স্লার?' তিনি নিশ্চিত হতে চাইলেন।

ও হেসে ফেলল। জীবনে এই প্রথম কারো মুখে নিজের নাম বিগড়ানো শুনছে। তাকে নিশ্চিত করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ তিনি পাঞ্জাবি মহিলা। ওর সঙ্গে টেনেটুনে উর্দুতে কথা বলছে। 'জি।' সালার তাকে নিশ্চিত করল।

‘এটা কেমন নাম, অর্থ কী এর?’ মহিলা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সালার নিজের নামের অর্থ তাকে পাঞ্জাবি ভাষায় বোঝায়। আম্মাজি ওর মুখে পাঞ্জাবি শুনে খুশি হয়। এরপর পাঞ্জাবিতে কথা বলতে থাকেন। ওর নামের অর্থ জানার পর বললেন। 'আমার বড় বউয়ের ছেলে হয়েছে।'

ও হতভম্ব। নামের অর্থের সাথে এই বাক্যের কী সম্পর্ক?
'জি, মোবারক হোক।' এর বাইরে বলার মতো কিছু পায় না।

'খায়ের মোবারক।' মহিলা বেশ সানন্দে ওর শুভেচ্ছা গ্রহণ
করলেন। 'আমার ছেলের বউয়ের ফোন এসেছিল, বলল মা!
আপনি কোনো নাম রাখেন। তোমার নাম বলে দেই?'

সালার ব্যাক ভিউ মিরর দিয়ে অবাক হয়ে মহিলার দিকে
তাকায়। 'দিয়ে দেন।'

'যাক, এটার একটা সমাধান হলো।'

আম্মাজি এখন নিশ্চিন্তে চশমা খুলে তার লম্বা চাদরের আঁচল
দিয়ে কাঁচ পরীক্ষার করছেন। সালার এখনো কোনো রিকশার
দেখা পায়নি।

'বয়স কত তোমার?' মহিলা কথা সেখান থেকে শুরু
করলেন, যেখানে থেমে ছিলেন।

'তিরিশ বছর।'

'বিয়ে হয়ে গেছে?'

সালার হ্যাঁ বলতে চেয়েছিল, কিন্তু চিন্তা করে হ্যাঁ-য়ের পর প্রশ্নের ধারাবাহিকতা বেড়ে যাবে। তাই ভালো হবে যদি না বলে দেয়। কিন্তু এই আন্দাজ সেদিনের সবচেয়ে বড় ভুলে পরিণত হয়েছিল ওর। 'না।'

'বিয়ে করোনি কেন?'

'ব্যস এমনিতেই।'

"আচ্ছা।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সালার মনে মনে দোয়া করে তাড়াতাড়ি যেন রিকশা পেয়ে যায়। ওর দেরি হচ্ছিল।

'কী করো তুমি?'

'ব্যাংকে চাকরি করি।'

'কী ধরনের কাজ করো সেখানে?'

সালার নিজের চাকরির পদবি বলল। জানত আম্মাজির মাথার ওপর দিয়ে যাবে। কিন্তু তখন হতবাক হয়, যখন তিনি বেশ সহজ ভঙ্গিতে বললেন। 'এটাকে তো অফিসার বলে, তাই-না?'

সালার হাসে। ওর কাজকে এর চেয়ে ভালো নাম অন্য কেউ দিতে পারবে না। 'জি, আম্মাজি! অফিসার বলে।'

'কতখানি পড়াশোনা করেছ?'

'ষোলো গ্রেড পর্যন্ত।' এবার আম্মাজির ফরমুলা ব্যবহার করে উত্তর দেয়। কিন্তু তার পরবর্তী প্রশ্ন আরও অবাক করে ওকে।

'এটা কেমন ষোলো গ্রেড?' এমবিএ করছ নাকি এমএ ইকোনমিক্স?'

সালার পেছনে ঘুরে তাকায়। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। 'আম্মাজি! আপনি জানেন এমবিএ বা এমএ ইকোনমিক্স কী?' সত্যিই বিস্মিত ও।

'দেখো, আমি নাকি জানব না। আমার বড় ছেলে প্রথমে পাকিস্তান থেকে এমএ ইকোনমিক্স করেছে, এরপর ইংল্যান্ড গিয়ে এমবিএ করেছে। আমার ছেলেও ব্যাংকে চাকরি করে, তবে ইংল্যান্ডে। ওরই তো ছেলে হয়েছে।'

সালার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ঘাড় সামনে ফেরায়।

'তাহলে, তুমি এখনো আমাকে বলোনি তো...'

'কী?' সালার ভুলে যায় কী জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'তোমার পড়াশোনার ব্যাপারে।'

'আমি এমবিএ করেছি।'

'কোথা থেকে?'

'আমেরিকা থেকে।'

'ভালো। বাবা-মা আছে?'

'জি।'

'কয় ভাইবোন?' প্রশ্নের ধারাবাহিকতা দীর্ঘ হতে থাকে।

'পাঁচ।' পালানোর কোনো পথ নেই ওর।

'কয় ভাই, কয় বোন?'

‘এক বোন আর চার ভাই।’

‘কয়জনের বিয়ে হয়েছে?’

‘আমি ছাড়া সবার।’

‘তুমি সবার ছোট?’

‘না, চার নাম্বার। ছোট এক ভাই আছে।’ নিজের মানবিক আচরণে আফসোস হচ্ছে ওর।

‘তোমার ছোট ভাইও বিয়ে করে ফেলেছে?’

‘জি।’

‘তাহলে তুমি বিয়ে করোনি কেন? প্রেমের কোন চক্রর তো নেই?’

এবার সত্য সত্য সালারের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়। তার মানসিক অবস্থা নিয়ে সন্দিহান হয়। 'আম্মাজি! রিকশা তো পাচ্ছি না। আপনি ঠিকানা বলুন আমি দিয়ে আসছি।' তার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়। দেরি ওর আগেই হয়ে গেছে। রিকশার কোনো নাম-নিশানা নেই। বয়স্ক মহিলাকে কোনো রাস্তায় একা রেখে যেতেও পারবে না। আম্মাজি ঠিকানা বলল। সালার বোঝে না। চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশ কনষ্টেবলের কাছে সাহায্য চায়। সে এলাকার রাস্তা বুঝিয়ে দেয়। আবার গাড়ি চলতে শুরু করে।

'তাহলে তুমি আমাকে বললে না প্রেমের কোনো চক্রর আছে কিনা?'

সালারের মনে চায় কোথাও ডুবে মরতে। মহিলা নিজের প্রশ্ন ভুলে যায়নি। অথচ এই প্রশ্নের উত্তর থেকে বাঁচার জন্যই তাকে বাড়ি ছেড়ে আসতে রাজি হয়েছে ও। 'না আম্মাজি! এমন কোনো ব্যাপার নেই।' গম্ভীর হয়ে বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ।'

আম্মাজির এই আলহামদুলিল্লাহর কারণ বুঝল না ও। চেষ্টাও করে না বোঝার। তিনি এখন খুঁটে খুঁটে ওর বাবা-মায়ের ব্যাপারে তথ্য জানার চেষ্টা করছেন। ও সত্যিই বিপদে পড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় গন্ডগোল তখন হয়, যখন আম্মাজির বলা এলাকায় পৌঁছায়। তাকে বাড়ির গলি দেখিয়ে দিতে বললে আম্মাজি চমৎকার নিশ্চিতভাবে বলল।

'আমি শুধু জানি এই এলাকায় বাড়ি, কিন্তু গলি আমি চিনি না।'

সালার আহাম্মক বনে যায়। 'আম্মাজি! তাহলে বাড়িতে কীভাবে পৌঁছাব? না চিনলে আপনাকে এই এলাকার কোথায় রেখে যাব?'

তিনি ওকে বাড়ির নাম্বার আর নাম বলতে লাগলেন।

‘না আন্মাজি! গলির নাম বলুন আমাকে।’

তিনি গলির নামের বদলে আলামত বলতে থাকেন। ‘মিষ্টির একটা দোকান আছে গলির কোণায়। খুব চওড়া রাস্তা। পারভেজ সাহেবের বাড়ি এখানে, যার ছেলে গত সপ্তাহে জার্মানিতে বিয়ে করেছে। ছেলের প্রথম বউ এখানেই আছে, আমাদের মহল্লায়। বিয়ের খবর শুনে বেচারি কান্নাকাটি করে মহল্লা মাথায় তুলে ফেলেছিল।’ আলামত বলতে গিয়ে অন্য কোথাও পৌঁছে গেছেন।

সালার রাস্তার পাশে গাড়ি থামায়। ‘আন্মাজি! আপনার স্বামীর নাম কী? বাড়ির ব্যাপারে, গলির ব্যাপারে খুলে বলুন। এভাবে বললে আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছাতে পারব না।’ ধৈর্য নিয়ে বলল।

‘আমাকে সাদ্দা আন্মা নামে চেনে সবাই। স্বামী বেচারা দশ বছর আগে মারা গেছেন। তাকে মানুষ কবেই ভুলে গেছে। আর গলির ব্যাপারে বলছি তো তোমাকে, অনেক বড় গলি।’

তিনদিন আগে দুইটা ড্রেনের ঢাকনা লাগানো হয়েছে,
একেবারে নতুন। সিমেন্ট দিয়ে লাগিয়েছে এবার। প্রতিমাসে
কেউ না-কেউ তুলে নিয়ে যায়। এবার নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সালার বিরক্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আম্মাজি! আমি কি
মানুষকে এটা বলে জিজ্ঞেস করব যে, কই নতুন ড্রেনের
ঢাকনার গলি? আপনি ওখানকার এমন কারো নাম বলুন,
যাকে সবাই চিনবে; পরিচিত মুখ।'

'তিনি হলেন মর্তুজা সাহেব। যার ছেলে মুজাফফারের কাল
পা ভেঙেছে।'

"আম্মাজি এটা কোনো পরিচয় হলো না।"

তিনি রাগ করলেন। 'সবার ঘরে কি একজন করে পা ভাঙা
মানুষ আছে নাকি?'

সালার চুপচাপ গাড়ি থেকে বের হয়। আশেপাশের দোকানে গিয়ে আন্নার বিবরণ অনুযায়ী গলি খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝে যায় তার বিবরণে মতো অন্তত বাড়ি খুঁজে পাবে না। হতাশ হয়ে ফিরে আসে। 'আন্মাজি। ফোন আছে আপনার বাড়িতে?' গাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আছে।'

সালার স্বস্তির শ্বাস নেয়। 'নাম্বার বলুন।' মোবাইল বের করে বলল।

'নাম্বার তো আমি জানি না।'

সালার পাথর হয়ে যায়। 'ফোন নাম্বারও জানেন না?' চরম ধাক্কা যেয়ে বলল।

'বাবা! আমি কই ফোন করব? ছেলেরা নিজেরা করে, আত্মীয়রা করে। প্রয়োজন হলে মেয়ে করে দেয়।'

'ওখানে মডেল টাউনে কার কাছে গেছেন?' সালারের হঠাৎ খেয়াল আসে।

'কিছু আত্মীয় আছে আমার। নাতির মিষ্টি দিতে গেছি।' গর্ব করে বললেন।

সালার তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেয়। 'আচ্ছা ওখানে যাই, ঠিকানা বলুন।'

'ওখানকার ঠিকানাও জানি না আমি।'

সালার এবার ধাক্কার চোটে কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে যায়। 'তাহলে কীভাবে গেলেন?'

'বাবা! আসলে যেখানে যাওয়ার প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েরা দিয়ে আসে। ওরা জানে ঠিকানা। গত দশ বছর ধরে ওরা আসা-নেওয়া করে আমাকে। ওরা দিয়ে আসে আর ওখান থেকে বিলাল বা অন্য কেউ নিয়ে আসে। আসলে বিলালরাও

আগে আমাদের মহল্লায় থাকত। দশ-বারো বছর আগে এদিকে চলে এসেছে। তাই আমার পুরো এলাকা ওদের ঠিকানা জানে।

সালার কিছু বলে না। ভাবে যেখান থেকে এনেছে, সেখানে গেলেই বিলালের বাড়ি পেয়ে যাবে। সাঈদা আম্মার কথা চলছে।

'আজকে বিলালদের বাড়িতে কেউ ছিল না, কাজের মেয়ে ছাড়া। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপরও যখন ওরা এলো না, তখন ভাবলাম নিজেই চলে যাই বাড়ি। তারপর মাশাল্লাহ তোমাকে খুঁজে পেলাম।'

'আম্মাজি! আপনি রিকশাওয়ালাকে কী বলতেন?'

'সেইসব, যা তোমাকে বলেছি।'

তার বুদ্ধিমত্তায় থ বনে যায় ও। 'এর আগে কখনো এভাবে ঠিকানা বলে বাড়ি পৌঁছেছেন?' খানিক আশ্চর্যের সুরে গাড়ি রিভার্স নিয়ে বলল সালার।

"না...কখনো না। দরকারই হয়নি।" সাঈদা আম্মার ভেতরের প্রশান্তিভাব লক্ষণীয়।

সালার আর কিছু না বলে গাড়ি রোডে নিয়ে আসে।

'এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সাঈদা আম্মা বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারলেন না।

'আপনাকে যেখান থেকে এনেছি, বাড়ি সেখানে কোথাও হবে। কোনো ইউটার্ন নেননি তো?' সালার ব্যাক ভিউ মিররে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না, আমি তা নেইনি।' সাঈদা আম্মা কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে বললেন।

সালার তার কথার ধরন খেয়াল করেনি। এটা ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এর মানে বাড়ি সেই রাস্তার কোথাও হবে। আর গলির চেয়ে কলোনিতে বাড়ি খোজা সহজ। সেটাও যদি আবার এক রাস্তায় হয়।

'তুমি সিগারেট খাও?' নীরবতা ভেঙে ফেললেন তিনি।

গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে থম মেরে যায়। 'আমি...?' ব্যাক ভিউ মিররে দেখে তিনি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'না' প্রশ্ন মাথায় ঢোকেনি।

'অন্য কোনো নেশা ইত্যাদি?'

এবার প্রশ্নের চেয়ে তার খোলামেলা ভাব বেশি অবাক করে ওকে। 'আপনি কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'ব্যস, এমনিতে। এত লম্বা রাস্তা আমি কীভাবে চুপ থাকব?'

তিনি নিজের সমস্যা বললেন।

'আপনার কি মনে হয় আমি কোনো নেশা করি?' সালার তাকে প্রশ্ন করল।

'না তো, এই জন্যই তো জিজ্ঞেস করেছি। তার মানে করো না, তাই-না?'

তার রক্ষণাত্মক স্টাইল সালারকে মুগ্ধ করে। 'না।' সংক্ষেপে বলে।

গাড়ি এখন সিগন্যালে থেমে আছে।

'কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে?'

সালারের মনে হলো ভুল শুনেছে। ঘুরে সাইদা আন্নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আপনি কী জিজ্ঞেস করলেন?'

'জিজ্ঞেস করেছি তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে?' সাইদা আন্না গার্লফ্রেন্ডের ওপর জোর দিয়ে বললেন।

সালার হো হো করে হেসে উঠল। 'তাহলে আপনি জানেন গার্লফ্রেন্ড কী?'

সান্দিদা আম্মা ওর প্রশ্নে কষ্ট পায়। 'কেন ভাই? দুই ছেলে আমার। আমি জানব না গার্লফ্রেন্ড কী? ওদেরকে পড়াশোনার জন্য বাহিরে পাঠানোর সময় আমার স্বামী বলে দিয়েছিল কোনো গার্লফ্রেন্ড যাতে না হয়। মাসে একবার ফোন আসত ওদের।'

সিগন্যাল সবুজ হয়ে গেছে। সালার হাসতে হাসতে সোজা হয়ে বসে এক্সিলারেটরের উপর পা রাখল।

সান্দিদা আম্মা বলছিল। 'আমি দু'জনকে বলতাম কসম খেয়ে বলতে, কোনো গার্লফ্রেন্ড তো বানায়নি। যতদিন বিয়ে হয়নি, ততদিন ওরা ফোন করে আগে কসম খেত, সালাম পরে দিত।' আম্মা গর্বের সুরে বললেন। 'খুব বাধ্য সন্তান আমার। দু'জনই গার্লফ্রেন্ড বানায়নি।'

'আপনারা নিজেদের পছন্দে দু'জনের বিয়ে দিয়েছেন?
সালার জিজ্ঞেস করল।

'না, ওরা ওখানে নিজেদের পছন্দে বিয়ে করেছে।' সরল
কণ্ঠে বললেন তিনি।

সালার এবার আর নিজের হাসি চেপে রাখতে পারল না
একদমই।

'কী হয়েছে?' সাঈদা আন্না গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

'কিছু না। আপনার ছেলে বউরা কি ইংরেজ?'

'না, পাকিস্তানি। কিন্তু ওখানেই থাকে। ছেলেদের সঙ্গে কাজ
করত। কিন্তু তুমি হাসলে কেন?'

'তেমন বিশেষ কোনো কারণে না।'

সান্দিদা আম্মা একটু চুপ থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন।
'তুমি তো বললে যে, গার্লফ্রেন্ড...?'

সালার কথা শেষ করতে দেয় না। 'না সান্দিদা আম্মা। কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই।'

'মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ!'

সালার এবারও তার মাশাল্লাহর পেছনের কারণ বুঝতে ব্যর্থ।

'নিজের বাড়ি আছে?'

'না, ভাড়া থাকি।'

'কাজের লোক আছে?'

'স্থায়ী নেই, ঝাড়ামোছার জন্য একজন আছে।'

‘আর এই গাড়ি নিশ্চয়ই তোমার?’

‘জি।’

‘বেতন কত?’

সালার আবার চমকায়। কথোপকথন কোন দিকে এগোচ্ছে, মাথায় কাজ করছে না। ‘সান্দীদা আন্মা! আপনি এখানে একা কেন থাকেন? ছেলেদের কাছে কেন চলে যান না?’ সালার প্রশঙ্গ বদলায়।

‘হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছে। আগে ইচ্ছে করত না। এখন ভাবছি মেয়ে বিয়ে দিয়ে চলে যাব। একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছি।’

সালার এখন সেই রাস্তায় গাড়ি নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে সান্দীদা আন্মাকে তুলেছিল। ‘আমি আপনাকে এখান থেকে

নিয়েছি। এখন বলুন এর মধ্যে কোন বাড়ি?' গাড়ির গতি কমিয়ে ডানদিকের বাড়িগুলোর দিকে ইশারা করে বলে।

'বাড়ির নাম্বার জানি না আমি।'

'দেখলে তো চিনবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা চিনবা।'

তিনি বিলালদের বাড়ির আলামতও এমনভাবে বলছিলেন, যেমন নিজের বাড়ির বেলায় করেছিলেন। রাস্তার শেষে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। আন্মা বাড়ি চিনতে পারেনি। বিলালের বাবার নাম জিজ্ঞেস করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এক এক করে দুই পাশের সব বাড়িতে তার কথা জিজ্ঞেস করে ও। আধঘন্টায় সেই রাস্তায় থাকা সব বাড়ির খোঁজ নেওয়া শেষ হয়ে যায়। কাজিফত নামের মনুষ্যটির বাড়ি এখানে নেই। 'নাম ঠিকমতো মনে আছে আপনার?' ক্লান্ত হয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, এটা কোন কথা... আমি এখন নামও ভুলে যাব।' সাঈদা আম্মা নারাজ হলেন।

'কিন্তু এই নামের কারো বাড়ি এখানে নেই। কেউ আপনাকে চেনে না এখানের।' সালার গাড়ির ভেতরে বসে বলল।

'হ্যাঁ, তাহলে এই পাশের রাস্তাটাও দেখো।' সাঈদা আম্মা একটু দূরে থাকা আরেকটা রাস্তার দিকে ইশারা করলেন।

'কিন্তু আম্মা! আপনি তো বললেন বাড়ি এই রাস্তায়।' সালার বলল।

'আমি কখন বললাম?' তিনি আপত্তি জানালেন।

'জিজ্ঞেস করেছিলাম ইউটার্ন নিয়েছেন কিনা, আপনি না বলেছিলেন।' সালার তাকে মনে করায়।

'হ্যাঁ, তা আমি বলেছি। কিন্তু এটা হয় কী?'

সালারের মাথা ঘুরতে থাকে।

'টার্ন?'

'হ্যাঁ'

'অন্য কোনো রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে এখানে তো আসেননি?'

'হ্যাঁ, এভাবে তো বলবো।' সাঈদা আম্মা স্বস্তি পেলেন। 'আমি এখানে কেন বসেছিলাম? হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়েছি বলে। এই রাস্তা তো ছোট, এখানে কয়েক পা হেঁটেই কি ক্লান্ত হওয়ার মানুষ আমি?'

সালার গাড়ি স্টার্ট দেয়। আজকের দিন খুব খারাপ ওর জন্য।
'কোন রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে এখানে এসেছিলেন আপনি?'

তিনি বললেন।

'আমার মনে হচ্ছে...' সাঈদা আম্মা রাস্তা দেখে বিভ্রান্ত হয়।
'হ্যাঁ, এটা থেকে।'

সালার নিশ্চিত রাস্তা এটাও না। তবু গাড়ি সেই রাস্তার দিকে নেয়। এটা তো দেখা হয়ে গেছে আজ ওর সারা দিন এভাবে নষ্ট হবে। পরবর্তী এক-দেড় ঘন্টা সাঈদা আম্মাকে নিয়ে আশেপাশের সব রাস্তায় ঘোরে। কিন্তু সাফল্যের দেখা মেলে না। সাঈদা আম্মার দূর থেকে বাড়ি পরিচিত মনে হয়, কিন্তু কাছে নিয়ে গেলে বলে ওঠেন। 'না...না...এটা তো না।'

অবশেষে কলোনিতে খোঁজাখুঁজি ছেড়ে তাকে আবার সেই মহল্লায় নিয়ে আসে, যেখানে শুরুতে তার বাড়ি খুঁজেছিল। সেখানে আরও এক ঘন্টা নষ্ট করে ক্লান্ত হয়ে যখন গাড়িতে ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওর অবস্থার বিপরীতে সাঈদা আম্মা খুব নিশ্চিত্তে গাড়িতে বসেছিল।

'পেয়েছ?' সালারকে ভেতরে বসতে দেখে আম্মা জিজ্ঞেস করলেন।

‘না। এখন রাত হয়ে গেছে, খোঁজা অর্থহীন। আমি থানায় রিপোর্ট করে রাখছি। আপনার মেয়ে বা প্রতিবেশীরা আপনাকে না পেয়ে নিশ্চয়ই পুলিশের সাথে যোগাযোগ করবে, তখন তারা এসে নিয়ে যাবো।’ গাড়ি স্টার্ট করত করতে

সাদ্দাদা আম্মা মেয়েকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। বলল, ‘বেচারি আমনা। চিন্তা করছে নিশ্চয়ই।’

সালারের বলতে ইচ্ছে করছিল তার মেয়ের চেয়ে এখন বেশি চিন্তায় আছে ও। কিন্তু নীরবে গাড়ি ড্রাইভ করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে তাকে। রিপোর্টে লেখানোর পর চলে আসার জন্য উঠল। সাদ্দাদা আম্মাও উঠে দাঁড়ায়।

‘আপনি বসুন, আপনি এখানেই থাকবেন।’ সালার তাকে বলল।

'না, না। আমরা তাকে এখানে রাখতে পারব না। আপনি সাথে নিয়ে যান। কেউ যোগাযোগ করলে আপনার ঠিকানা দিয়ে দেবো।' পুলিশ ইনসপেক্টর বলল।

'কিন্তু আমি তো ওনাকে আপনাদের দায়িত্বে রাখতে চাই।' সালার আপত্তি করে বলল।

'দেখুন, উনি বয়স্ক মানুষ। যদি কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে তাহলে রাতে কোথায় রাখব? যদি কিছুদিন লাগে তাহলে...?' পুলিশ ইনসপেক্টর বলতে থাকে।

সাঁঙ্গদা আম্মা পুলিশকে কথা শেষ করতে দিলেন না। 'আমি এখানে থাকব না বাবা! তোমার সঙ্গে যাব। এখানে এত পুরুষদের মাঝে কোথায় বসে থাকব?'

সালার তাকে এই প্রথম আতঙ্কিত হতে দেখে। 'কিন্তু আমি তো একা থাকি..?' বলতে বলতে থেমে যায়। ফুরকানের

বাসার কথা মনে পড়ে। 'আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গাড়িতে এসে ফুরকানকে কল দেয়। সাঈদা আম্মাকে ফুরকানের বাসায় রাখতে চায়। ফুরকান তখন হসপিটালে। ফোনে সালার পুরো পরিস্থিতি জানায়।

'নওশিন তো গ্রামে। কিন্তু ব্যাপার না, আমি কিছুক্ষণে আসছি। তাকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাব। তিনি যুবতি মেয়ে না যে, কোনো ঝামেলা হয়ে যাবে। তিনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সতর্ক।' ফুরকান বলল।

'না, আমি তার আরামের চিন্তা করে বলছি। অকোয়ার্ড যাতে না লাগে তার।' সালার বলে।

'লাগবে না ইয়ার। দরকার হলে জিজ্ঞেস করে দেখো। নাহলে পাশের ফ্ল্যাটের আলম সাহেবের পরিবারের সাথে রাখব।'

'যাইহোক, তুমি আসো, তারপর দেখব।' সালার মোবাইল রাখার সময় বলল।

'কোনো ব্যাপার না বাবা! আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারব। তুমি আমার ছেলের মতো, ভরসা আছে।' সাঈদা আন্মা নিশ্চিত ভঙ্গিতে বললেন।

জবাবে সালার শুধু হালকা হাসে।

রাস্তায় থেমে সালার একটা রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিলো। ক্ষুধায় ওর অবস্থা নাজেহাল। হঠাৎ ওকে অপরাধবোধ ঘিরে ধরে, সাঈদা আন্মাও দুপুর থেকে ওর সঙ্গে খাওয়াদাওয়া ছাড়া ঘুরছেন। নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে। ফেরার পথে এক জায়গায় থেমে আন্মার সঙ্গে তাজা আপেলের জুস খায়। জীবনে এই প্রথম কোনো বয়স্ক মানুষের সঙ্গে লম্বা সময় কাটিয়ে বুঝল এই কাজ সহজ না।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে যখন সাঈদা আম্মার সঙ্গে খাবার খাচ্ছিল, তখন ফুরকান আসে। তার সঙ্গে ফুরকানকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে খেতে থাকে ও। কিছুক্ষণের মধ্যে ফুরকান সাঈদা আম্মার সঙ্গে খোলামেলা যেভাবে পাঞ্জাবিতে কথা বলছিল, তা দেখে ওর হিংসা লাগে। ফুরকানের মতো মিশুক মানুষ খুব কম দেখেছে। ফুরকানের কথার মাঝে এমন কিছু থাকে, যা সামনের মানুষটাকে তার সঙ্গে মনখুলে কথা বলতে বাধ্য করে। এত বছরের বন্ধুত্বের পরেও এই গুণ ফুরকানের কাছ থেকে শিখতে পারেনি ও।

দশ মিনিট পর তাদের মাঝখানে সালারের অবস্থান ছিল নীরব দর্শকের মতো। ফুরকান ও সাঈদা আম্মা কথায় ব্যস্ত। ফুরকান ডাক্তার জানার পর সাঈদা আম্মা রোগের তালিকা নিয়ে বসেন। খাওয়া শেষ করে ফুরকানকে দিয়ে মেডিকেল বক্স আনিয়ে তার চেক-আপ করতেও বাধ্য করেন। ফুরকান আম্মাকে বলেনি সে অনকোলজিস্ট। নিজের ধৈর্যশীল স্বভাব মোতাবেক মেডিকেল বক্স এনে প্রথমে ব্লাডপ্রেসার চেক করে, এরপর স্টেথোস্কোপ দিয়ে হার্টবিট চেক করে।

সবশেষে পালস চেক করে আশ্বস্ত করে তিনি একদম সুস্থ-সবল। ব্লাডপ্রেসার বা হার্টের কোনো সমস্যা নেই। সাঈদা আম্মা হঠাৎ আরও চাঙা হয়ে ওঠে। সালার কিচেনে থালা-বাসান ধোয়ার ফাঁকে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। লাউঞ্জের সোফায় বসে ছিল তারা। ফোনের রিংটোন ভেসে আসে। ফুরকান ফোন তুলল। অপর পাশে ড. সিবতে আলি।

সালাম দেয়ার পর তিনি বললেন। 'সালার পুলিশ স্টেশনে সাঈদা নামে একজন মহিলার রিপোর্ট করিয়েছে।'

ফুরকান অবাক হয়। 'হ্যাঁ, তিনি এখানেই আছে, আমাদের সাথে।'

‘আল্লাহর শুকরিয়া।’ ড. সিবতে আলি বললেন। ‘সে আমার আত্মীয়। এক ঘন্টা ধরে তাকে খুঁজছি। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর তারা সালারের নাম আর নাম্বার দেয়।’

ফুরকান তাকে সাঈদা আম্মার ব্যাপারে বলল। এরপর ফোনে তার সঙ্গে কথা বলায়। সালার লাউঞ্জে চলে আসে। সাঈদা আম্মা ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

‘ড. সাহেবের আত্মীয় উনি।’ ফুরকান নিচু আওয়াজে বলল।

‘ড. সিবতে আলি সাহেবের?’ সালারও অবাক হয়।

‘হ্যাঁ, তারই।’

সালার অবশেষে স্বস্তির শ্বাস নেয়।

‘ভাইসাব বলছে তোমার সাথে কথা বলবো।’ সাঈদা আম্মা ফোন এগিয়ে দেয়।

ফুরকান দ্রুত তার হাত থেকে মোবাইল নিয়ে কাগজে কিছু লিখতে থাকে। সিবতে আলি ঠিকানা বলছিলেন। সাঈদা আম্মা একটু অবাক হয়ে লাউঞ্জের দরজায় দাঁড়ানো

সালারকে দেখলেন। 'তুমি কী করছ?' তার চোখ ওর এপ্রোনের উপর।

সালার একটু লজ্জা পায়। 'জি... আমি থালাবাসন ধুচ্ছিলাম।' কিচেনে ঢুকে এপ্রোন খুলে ফেলো। এমনিতেও থালাবাসন ধোয়া প্রায় শেষ।

'সালার! চলো তাকে দিয়ে আসি।' নিজের পেছনে ফুরকানের গলা শুনল।

'এগুলো পরে এসে করবো।'

'তুমি গাড়ির চাবি নাও, আমি হাত ধুয়ে আসছি।'

দশ মিনিটে সবাই সালারের গাড়িতে ছিল। ফুরকান সামনের সিটে বসলেও পেছনে থাকা সাঈদা আন্নার সঙ্গে যথারীতি কথায় ব্যস্ত। একই সঙ্গে সালারকে রাস্তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে বিশ মিনিটের মাথায় কাজিফত মহল্লার

গলিতে গিয়ে পৌঁছে যায়। গলির মাথায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওরা দুজন সাঈদা আম্মাকে ভেতরে তার বাড়িতে রেখে আসতে যায়। সাঈদা আম্মার এখন কোনো সাহায্যের দরকার ছিল না, গলি চেনা তার। গর্বভরে সালারকে দেখাতে দেখাতে হাঁটছিলেন। 'এই যে মিষ্টির দোকান... ড্রেনের সিমেন্ট দেওয়া নতুন ঢাকনা... ওই যে পারভেজ সাহেবের বাড়ি।'

'জি।' সালার মাথা নিচু করে হেসে সায় জানায়। বলতে পারে না তার বলা সব নির্দেশনা ঠিক ছিল, শুধু ভুল এলাকায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া।

'বেচারি আমনা! নিশ্চয়ই চিন্তায় শেষ।' লাল ইটের দোতলা এক বাড়ির সামনে থেমে বললেন তিনি।

বাড়ির নাম্বার ২৭৫। ফুরকান এগিয়ে বেল বাজায়। সালার বাড়িটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখল। বেশ পুরোনো ধাঁচের

একটা বাড়ি। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে গলির অন্য সব বাড়ির তুলনায় স্বতন্ত্র লাগছে।

'তোমাদেরকে আমি এখন চা না খেয়ে যেতে দেবো না' সাঈদা আম্মা বললেন। 'আমার জন্য তোমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। বিশেষ করে সালারের। বাচ্চটা আমাকে সারা দিন নিয়ে ঘুরেছে।' ওর কাঁধে হাত রাখেন আম্মা।

'কোনো ব্যাপার না আম্মা! চায়ের দাওয়াত অন্যদিন, আজ দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ সাঈদা আম্মা! চা না, একদিন আপনার সঙ্গে খাবার খাব।' ফুরকানও বলল।

'দেখো, আবার যেন এমন না হয় যে, তোমাদের মনেই রইল না।'

'আহ্, খাবারের কথা আমি কীভাবে ভুলব? আপনি যে পালংশাক দিয়ে মাংসের রেসিপি বলছিলেন, ওটা রান্না করে খাওয়াবেন।' ফুরকান বলল।

ভেতর থেকে পা ফেলার আওয়াজ আসে। সান্দীদা আম্মার মেয়ে দরজা খুলতে আসছিল হয়তো। দরজা খোলার আগেই আম্মা আর সাথে অন্য কারো কণ্ঠ পেয়ে কিছু না বলে দরজা একটুখানি ফাঁকা করে ভেতরে দাঁড়িয়ে রইল আম্মার মেয়ে।

"আচ্ছা সান্দীদা আম্মা! খোদা হাফেজ।" ফুরকান সান্দীদা আম্মাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখে বলে।

সালার আগেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

সালার গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে ফুরকানকে বলল। 'তোমার সবচেয়ে অপছন্দের খাবার পালংশাক দিয়ে মাংস। আর তুমি তাকে কী বলছিলে?' ফুরকান হো হো করে হেসে উঠল। 'বলতে দোষ কোথায়? এমনও হতে সত্যিই এত

ভালোভাবে তিনি রান্না করলেন যে, আমি খেতে বাধ্য হয়ে যাব।"

‘তুমি যাবে তার বাড়িতে?’ মেইন রোডের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সালার।

‘অবশ্যই যাব। কথা দিয়ে এসেছি, আমি আর তুমি।’

‘আমি যাচ্ছি না।’ সালার সোজা বলল। ‘জানাশোনা নেই, হাত-পা তুলে তার বাসায় খেতে যাওয়া।’

‘ড. সিবতে আলি সাহেবের ফাস্ট কাজিন। তাছাড়া আমার চেয়ে বেশি তোমার জানাশোনা হয়ে গেছে তার সাথে।’

‘সেটা আলাদা ব্যাপার। তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, করেছি। ব্যস! এটুকু যথেষ্ট। তার ছেলেরা থাকলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু এইরকম একা এক মহিলার বাড়িতে যাওয়া ঠিক না।’ সালার গম্ভীর।

'আমি-বা কোথায় একা যাচ্ছি ইয়ার? বউ-বাচ্চা নিয়ে যাব। জানি ওখানে একা যাওয়া ঠিক না। তাছাড়া নওশিনও তাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হবে।'

'হ্যাঁ, ভাবিকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সমস্যা থাকবে না।' সালার সন্তুষ্ট হয়।

'শুধু আমি যাব...? তোমারও যেতে হবে, দাওয়াত দিয়েছেন।'

'আমি পারব না, সময় নেই। তোমার যাওয়া যথেষ্ট।' সালার বলে।

'তুমি তার বিশেষ মেহমান। তোমার অনুপস্থিতিতে সব মাটি হয়ে যাবে।'

সালারের কাছে ফুরকানের কথার ধরন অদ্ভুত লাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে ফুরকানের দিকে তাকায়। ফুরকান হাসছে।

'মানে কী তোমার?'

'আমার মনে হয় তার কাছে তুমি মেয়ের জামাই হিসেবে
পছন্দ হয়েছ।'

'অহেতুক কথা কমিয়ে বলো।' সালার বিরক্তির চোখে
তাকায়।

'আচ্ছা মিলিয়ে নিও, প্রপোজাল আসবে ওই বাড়ি থেকে।
তোমাকে সবদিক থেকে পছন্দ হয়েছে সাঙ্গদা আম্মার।
সবকিছু জিজ্ঞেস করেছে আমার কাছে তোমায় নিয়ে।
এমনকি তোমার বিয়ের পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকলে
কবে? আমিও বলেছি ভালো প্রপোজাল পেলে করে
ফেলবো। এরপর তিনি তার মেয়ের ব্যাপারে বলতে শুরু
করেন। যে পরিমাণ প্রশংসা করেছে এই মাঝে আমরা পঞ্চাশ
শতাংশও যদি সত্য মনে করি, তাহলে মেয়েটা...কী যেন
নাম নিচ্ছিল? ওহ হ্যাঁ, আমনা... তোমার জন্য চমৎকার।'

'লজ্জা লাগা উচিত তোমার। ড. সিবতে আলির আত্মীয় তারা,
আর তুমি তাদের নিয়ে এসব বলছ।' সালার ধমক দেয়।

ফুরকান উদগ্রীব হয়ে উঠল। 'আমি খারাপ কিছু বলছি না।
এটা তো গর্বের হবে যে, তোমার বিয়ে ড. সিবতে আলি
সাহেবের পরিবারে...'

'Just shut up ফুরকান! এ বিষয় নিয়ে অনেক কথা হয়ে
গেছে, এখন থামো।' সালার কঠিনভাবে বলল।

'আচ্ছা ঠিক আছে শেষ করছি, অন্য কোনো সময় আবার
বলব।' ফুরকান শান্তস্বরে বলল।

সালার ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ফুরকানের দিকে তাকায়।

'ড্রাইভিং করছ, রাস্তায় চোখ রাখো।' ওর কাঁধ চাপড়ে বলল।

সালার কিছুটা রুষ্ট হয়ে রাস্তার দিকে মনোযোগ দেয়।

সান্দিদা আম্মার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ এই পর্যন্তই শেষ হয়নি। কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যার কথা। ওরা ড. সিবতে আলির কাছে এসেছিল। লেকচার শেষে তিনি থাকতে বলেন ওদের।

'সান্দিদা আপা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমাকে বলল আপনাদের নিয়ে যেতে। সন্ধ্যায় আপনারা আসবেন বলে আমি এখানে দেখা করতে বলেছি। আপনারা হয়তো কোনো কথা দিয়েছিলেন তার বাড়িতে যাওয়ার...কিন্তু যাননি।'

ফুরকান চোখ ঘুরিয়ে সালারের দিকে তাকায়। ও চোখ নামিয়ে ফেলে। 'হ্যাঁ, আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু ব্যস্ততায় তাই যেতে পারিনি।'

ওরা ড. সিবতে আলির সঙ্গে তার ড্রয়িংরুমে আসে। কিছুক্ষণ পর সান্দিদা আম্মা এলেন। আসতেই তার অভিমান আর অভিযোগের ঝুলি খুলে বসলেন।

ফুরকান তাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে, সালার চুপচাপ বসে থাকে। পরের উইকেন্ডে ফুরকান আর ওকে সাঈদা আম্মার বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু সালারকে ইসলামাবাদ এবং সেখান থেকে গ্রামে যেতে হবে। তাই ব্যস্ততার কথা জানিয়ে সাঈদা আম্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

উইকেন্ড কাটিয়ে লাহোর ফিরলে ফুরকান ওকে সাঈদা আম্মার বাড়িতে কাটানো সময়ের কথা বলতে থাকে। ফুরকান ফ্যামিলি নিয়ে গিয়েছিল। ‘সালার! সাঈদা আম্মার মেয়ের সাথে দেখা হয়েছে আমরা।’ কথার মাঝে হঠাৎ বলে উঠল। ‘খুব ভালো মেয়ে। সাঈদা আম্মার মতো না, চুপচাপ ধরনের। একদম তোমার মতো। তোমাদের দুজনকে ভালো মানাবে। নওশিনের খুব ভালো লেগেছে মেয়েটাকে।’

‘ফুরকান! কথা শুধু দাওয়াত পর্যন্ত রাখলে ভালো হয়।’ সালার বাধা দিয়ে বলল।

‘আমি খুব সিরিয়াস, সালার!’

'আমিও সিরিয়াস।' একই ভঙ্গিতে বলল ও। 'তুমি জানো ফুরকান, বিয়ে নিয়ে তুমি যতবেশি চাপ দাও, বিয়ের ওপর থেকে আমার ততবেশি মন উঠে যায়। কারণ তোমার এইসব কথাবার্তা।' সালার সোফায় হেলান দেয়।

'আমার কথার কারণে না। পরিকারভাবে বললেই পারো ইমামার কারণে বিয়ে করতে চাও না।' ফুরকান গম্ভীর হয়ে উঠল।

'ওকে... পরিকার বলছি, আমি ইমামার কারণে বিয়ে করতে চাই না। তারপর?' সালার শীতল গলায় বলল।

'এসব বাচ্চাদের মতো চিন্তা-ভাবনা।' ফুরকান ওর দিকে না তাকিয়েই বলল।

'ওকে ফাইন, বাচ্চাদের মতো চিন্তা-ভাবনা। তারপর?' সালার কাঁধ নাড়ে।

"Then you should get rid of it." ফুরকান আলতো সুরে বলল।

"I don't want to get rid of it, so?" সালার পাল্টা বলে।

ফুরকান কিছুক্ষণ বোবার মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমার সামনে তুমি আর কখনো সাদ্দা আম্মার মেয়ে নিয়ে কথা বলবে না। তিনিও যদি তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কিছু বলতে চায়, তাহলে স্পষ্ট বলে দেবে আমি বিয়ে করতে চাই না। অথবা আমি আগে থেকেই বিবাহিত।"

"ওকে, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আর কথা না। রাগ করার দরকার নেই।" ফুরকান দুই হাত তুলে মিটমাট করার ভঙ্গিতে বলল।

'তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে, তাই ডেকেছি'
সিকান্দার উসমান হাসিমুখে ছেলেকে বসতে ইশারা করেন।

স্ট্রী তায়্যিবার সঙ্গে তিনি লাউঞ্জে বসে ছিলেন। সালার তার ফোনকল পেয়ে এই উইকেন্ডে ইসলামাবাদ এসেছে। সিকান্দার উসমান আদরের চোখে তার তৃতীয় ছেলের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ আগে একসাথে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কাপড় বদলে এসেছে ও। পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পায়ে বাড়িতে পরা কালো জুতো। নিজের সাধারণ বেশভূষায়ও তাকিয়ে দেখার মতো। হয়তো এটা ওর চেহারার গাভীর্য বা তিনি আজ বহু বছর পর ছেলেকে এত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। স্বীকার করেন ছেলের ব্যক্তিত্বে অনেক স্থিরতা ও ভদ্রতা এসেছে।

কখনো ভাবেনি এই ছেলের জন্য সোশ্যাল সার্কেলে তিনি এত গুরুত্ব ও সম্মান পাবেন। অনেক জায়গায় তার পরিচয় এখন সালার সিকান্দারের বাবা হিসেবে হয়। এটা তার জন্য অবাক করা আনন্দের মতো। পুরো টিনএজে তাকে

বাজেভাবে বিব্রত আর বিরক্তি করেছিল ও। একটা সময় ছিল, যখন তার মনে হতো এই ছেলের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে অন্ধকার। সমস্ত অসাধারণ প্রতিভা, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু আজ তার অনুমান, আশঙ্কা সব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তায়িবা সিকান্দার শুকনো ফলের প্লেট ছেলের দিকে এগিয়ে দেন। সালার কয়েকটা কাজুবাদাম নেয়।

'আমি তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

কাজুবাদাম মুখে দিতে গিয়ে থেমে যায় সালার। মুখের হাসিও অদৃশ্য।

সিকান্দার উসমান আর তায়িবা বেশ খোশমেজাজে। 'এখন তোমার বিয়ে করে নেওয়া উচিত সালার।' সিকান্দার উসমান বললেন।

সালার তাদের অগোচরে হাতে থাকা কাজুবাদাম শুকনো ফলের প্লেটে রেখে দেয়।

‘আমি আর তায়িবা অবাক হচ্ছি, এত প্রস্তাব তোমার ভাইদের মধ্যে করো জন্য আসেনি, যতটা তোমার জন্য আসছে।’ সিকান্দার উসমান খুব আনন্দের সাথে বললেন।
‘ভাবলাম তোমার সঙ্গেও কথা বলে দেখি।’

ও চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘জাহিদ হামদানিকে চেনো?’ সিকান্দার উসমান একজন বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হেডের নাম বললেন।

‘হ্যাঁ... তার মেয়ে আমার কলিগ।’

‘রিমশা নাম হয়তো?’

‘জি।’

‘কী ধরনের মেয়ে?’

সালার তার মুখভঙ্গির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। তার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। 'ভালো।' কিছুক্ষণ পর বলে ও।

'তোমার পছন্দ?'

'কোন ক্ষেত্রে?'

‘রিমশার প্রপোজালের কথা বলছি।' সিকান্দার উসমান গম্ভীর হয়ে বললেন। 'জাহিদ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে বারবার কথা বলছে। তার স্ত্রীকে নিয়ে কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসে গেছে। আমরাও তাদের বাড়ি দেখে এসেছি। গত উইকেন্ডে রিমশার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। আমার আর তায়্যিবার খুব পছন্দ হয়েছে। ওয়েল বিহেভড মেয়ে। তোমার সঙ্গেও ভালো বন্ধুত্ব। তাদের ইচ্ছে তোমার মাধ্যমে দুই ফ্যামিলির মাঝে একটা সম্পর্ক তৈরি হোক।'

'পাপা! রিমশার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই।' সালার নিস্তেজ কণ্ঠে বলল। 'আমার কলিগ, জানাশোনা আছে। এর মাঝে

সন্দেহ নেই যে, খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না।

'তুমি অন্য কোথাও ইন্টারেস্টেড?' সিকান্দার উসমান জিজ্ঞেস করলেন।

ও চুপ ছিল। সিকান্দার আর তায়্যিবা দৃষ্টি আদানপ্রদান করেন। 'তোমার অন্য কোথাও আগ্রহ থাকলেও আমাদের অসুবিধা নেই: বরং আমরা আরও খুশি হয়ে সেখানে তোমার বিয়ের কথাবার্তা সামনে আগাব। নিশ্চিত থাকতে পারো এ ব্যাপার নিয়ে আমাদের কোনো জোর নেই তোমার ওপর।' সিকান্দরে উসমান নরমভাবে বললেন।

নিচু করে মৃদুস্বরে বলল সালার। 'আমি অনেক বছর আগেই বিয়ে করে ফেলেছি।' দীর্ঘ নীরবতার পর বলল।

সিকান্দার উসমানের কোনো অসুবিধা হলো না ছেলের ইশারা কোন দিকে তা বুঝতে। তার চেহারা গাঙ্গীর্ষ এসে পড়ে। 'ইমামার কথা বলছ?'

ও চুপ থাকে। সিকান্দার উসমান অনেকক্ষণ অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে রইলেন। 'এত বছর ধরে এজন্য বিয়ে করছ না?' তিনি হতভম্ব। তার ধারণা ছিল ইমামাকে ভুলে গেছে ও। সব মিলিয়ে আট বছর পুরনো কাহিনি। 'ইমামা এতদিনে বিয়ে করে নিয়েছে, জীবন আরামে কাটাচ্ছে। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে তো সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে।'

'না পাপা! ওর সঙ্গে আমার বিয়ে শেষ হয়নি।' সালার মাথা তোলে।

'নিকাহনামায় তুমি তালাকের হক দিয়েছিলে। আমার যতদূর মনে পড়ে তুমি ওকে খুঁজছিলে যাতে তালাক দিতে পারো।' সিকান্দার উসমান ছেলেকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। আর ইমামা জানে না যে, তালাকের হক ওর কাছে আছে। তাই যেখানেই থাকুক, এখনো আমার স্ত্রী হয়েই আছে।'

'সালার! আট বছর হয়ে গেছে। এটা এক-দুই বছরের ব্যাপার না। হতে পারে জেনে গেছে তালাকের হক ওর কাছে আছে। এটা সম্ভব না ও এখনো তোমার স্ত্রী হয়ে আছে।' সিকান্দার উসমান কিছুটা অস্থির হয়ে বলেন।

'আমি ছাড়া অন্য কেউ এ বিষয়ে বলতে পারার কথা না। আর আমি ওকে বলিনি। তাই যতদিন ও আমার বিয়ের অধিকারে থাকবে, অন্য কোথাও বিয়ে করব না।'

'তোমার কন্টাক্ট আছে ওর সাথে?'

'না।'

'আট বছর ধরে তোমার সঙ্গে ওর কোনো কন্টাক্ট নেই, সারা জীবন যদি এমন হয়, তাহলে কী করবে?'

চুপ থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর ওর কাছেও নেই। সিকান্দার উসমান কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করেন। 'আমাকে কখনো বলোনি মেয়েটার সাথে তুমি ইমোশনালি ইনভলভ। বলেছিলে সাময়িক সময়ের জন্য সাহায্য করেছ। মেয়েটা অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

সালার এবারও চুপ। সিকান্দার উসমান ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি তার এই তৃতীয় ছেলেকে কখনো চিনতে পারেননি। ওর মনে কী চলে সেই অর্দি কখনো পৌঁছাতে পারেনি। যে মেয়ের জন্য আট বছর নষ্ট করেছে, বাকি জীবন নষ্ট করতেও প্রস্তুত; সেই মেয়ের প্রতি ওর অনুভূতির গভীরতা কত তীব্র, তা এখন আর শব্দে প্রকাশের দরকার ছিল না।

রুমে নীরবতার একটা লম্বা সময় কাটে। সিকান্দার উসমান উঠে ড্রেসিংরুমে গেলেন। ফিরলেন কয়েক মিনিট পর। সোফায় বসে একটা খাম সালারের দিকে বাড়িয়ে দেন। সালার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে খাম হাতে নেয়। 'ইমামা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।'

ও শ্বাস নিতে পারল না।

'পাঁচ-ছয় বছর আগের কথা, তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল। নাসেরা ফোন তুলে ইমামার গলা চিনে ফেলো। তুমি তখন পাকিস্তানে। নাসেরা তোমার বদলে আমাকে ডাকে। ইমামা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি ওকে বলেছি তুমি মারা গেছ। আমি চাইনি ও তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করুক। যে বিপদ থেকে একবার পিছু ছাড়িয়েছি, তাতে গিয়ে আবার পড়ি। জানতাম ও আমার কথায় বিশ্বাস করবে। কারণ তুমি বহুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছ। ওয়াসিমের বোন, তাই এসব ওর জানার কথা। তাছাড়া এমন এক চেষ্টার সাক্ষী তো ও নিজেই। আমি ওকে নিকাহনামায়

থাকা তালাকের হকের কথা বলতে পারিনি। না সেই তালাকনামার কথা, যা তোমার হয়ে তৈরি করিয়ে রেখেছিলাম। যখন তোমাকে আমেরিকা পাঠাচ্ছিলাম তখন একটা সাদা কাগজে সাইন রাখি, যাতে প্রয়োজনে তালাকনামা তৈরি করাতে পারি। এটা বেআইনি বা নাজায়েজ, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না। তৈরি করিয়ে রাখি তা। ইমামাকে এ ব্যাপারে বলে পেপার পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফোন কেটে দেয় ও। নাম্বার ট্রেসড আউট করিয়ে জানি একটা পিসিওর। কিছুদিন পর পোস্টের মাধ্যমে বিশ হাজার টাকার ট্রাভেলার্স চেক আর একটা চিরকুট পাই। হয়তো তুমি ওকে কোনো টাকা দিয়েছিলে তা ফেরত পাঠিয়েছে। তোমাকে না বলার কারণ, আমি চাইনি তুমি আবার ঝামেলায় পড়ো। ইমামার ফ্যামিলিকে নিয়ে আমি ভয়ে ছিলাম। শঙ্কায় ছিলাম তারা তোমার ক্ষতি করতে পারে। অপরদিকে চেয়েছি তুমি ক্যারিয়ারে ফোকাস থাকো।’

খাম হাতে রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে তার কথা শুনছিল সালার। কেউ যেন খুব ধীরে ওর শরীর থেকে প্রাণ বের করে নিয়েছে।

খামটা টেবিলের উপর রাখল। চায়নি বাবা-মা ওর হাতের কাঁপুনি দেখে ফেলুক। কিন্তু তারা দেখে ফেলেছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর ইন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দেয়। মূর্তির মতো সামনের টেবিলে হাতের নিচে থাকা খামের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের উপর রেখেই ভেতরে থাকা কাগজ বের করে।

প্রিয় সিকান্দার আফ্কেল,

আপনার ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে আমি খুবই দুঃখিত। আমার জন্য আপনাদেরকে কয়েক বছর অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সালারের কিছু টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ছিল। এখন তা আমি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। খোদা হাফেজ।

ইমামা হাশিম।

সালারের মনে হয় ও সত্যিই মরে গেছে। ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে কাগজ খামে রেখে দেয়। কিছু না বলে খাম হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সিকান্দার আর তায়িবা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যখন বাবার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি উঠে দাঁড়ান। 'সালার!' ও খামে।

সিকান্দার উসমান ছেলের কাঁধে হাত রাখলেন। 'যা হয়েছে.... অনিচ্ছাকৃত। আমি জানতাম না তুমি। যদি কখনো ইমামার ব্যাপারে নিজের অনুভূতির কথা আমাকে বলতে, তাহলে কখনো এমন করতাম না। বিষয়টা অন্যভাবে হ্যান্ডেল করতাম বা তোমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ করিয়ে দিতাম। আমাকে নিয়ে কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ রেখো না মনে।'

সালার মাথা তুলল না। তার সাথে দৃষ্টি মেলায় না। সামান্য মাথা নাড়ে। তাকে নিয়ে ওর কোনো অভিযোগ নেই। সিকান্দার উসমান কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেন। ও দ্রুত রুম ছেড়ে চলে যায়। তিনিও চেয়েছেন ও যাতে সেখান থেকে

চলে যায়। ওর ঠোঁটগুলো বাচ্চাদের মতো কাঁপতে দেখেছেন। যা বারবার চেপে ধরে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল। আর কয়েক মিনিট এখানে থাকলে হয়তো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত। তিনি নিজের অনুশোচনা বাড়াতে চাননি। তায়িবা পুরো কথোপকথনে হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু সালার চলে যাওয়ার পর স্বামীকে হালকা করার চেষ্টা করেন। 'দুশ্চিন্তা করো না। তুমি যা করেছ ওর ভালোর জন্য করেছ। ও বুঝবে তা।' স্বামীর চেহারা দেখে মানসিক অবস্থা অনুমান করতে পারছিলেন।

সিকান্দার উসমান একটা সিগারেট জ্বালিয়ে রুমে পায়চারি করতে থাকে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। সালারকে জিজ্ঞেস না করে, না বলে এসব করা উচিত হয়নি। ইমামাকে এমন মিথ্যে বলা উচিত হয়নি। আমি...' কথা শেষ না করেই নিরুপায় ভঙ্গিতে এক হাত মুঠ করে জানালার কাছে গিয়ে দাড়িয়ে রইলেন।

গাড়ি খুব সাবধানে রাস্তা দিয়ে পিছলে যাচ্ছিল। বহু বছর পর রাতের এই প্রহরে এই রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে সালার। সেই রাতটা স্থিরচিত্রের মতো ওর চোখের সামনে ভাসছিল। মনে হয় মার্বের আট বছর উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সবকিছু এখানেই আছে, এখনো। কেউ নীরবে ওর পাশের সিটে বসল। নিজেকে কল্পনায় হারিয়ে যেতে দেয় ও। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের সিটের তাকায় না। কল্পনাকে বাস্তব হতে দিলো জেনেশুনে, খোলাচোখে। কেউ এখন হেঁচকি তুলে কাঁদছে পাশে।

প্রিয় সিকান্দার আফ্কেল,

আপনার ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে আমি খুবই দুঃখিত! আমার জন্য আপনাদেরকে কয়েক বছর অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, আমি এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সালারের কিছু টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ছিল। এখন তা আমি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। খোদা হাফেজ।

ইমামা হাশিম।

চিরকুটের বাক্যগুলো মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হয়। সিকান্দার উসমানের রুমে চেক দেয়নি ও। কিন্তু জানে ইমামা কোন ঋণ পরিশোধ করেছে। মোবাইলের দাম আর কলের বিল। শূন্য মস্তিষ্কে নিজের বিছানায় বসে মৃদু অন্তকারে রুমের জানালা দিয়ে ইমামাদের বাড়ির দিকে তাকায়। সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ করে ওর জন্য নশ্বর সবকিছু থেকে শূন্য হয়ে গেছে।

চিরকুটের উপরের তারিখ পড়ল। ইমামা বাড়ি ছাড়ার প্রায় আড়াই বছর পর পাঠানো এটা। আড়াই বছর পর ইমামা যদি বিশ হাজার টাকা পাঠাতে পারে, এর মানে যেখানে থাকুক ভালো আছে। অন্তত ইমামাকে নিয়ে ওর করা সবচেয়ে বাজে আশঙ্কা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। এজন্য খুশি ছিল ও। কিন্তু ইমামা যদি সত্যি বিশ্বাস করে সালার মরে গেছে, এর মানে ওর জীবন থেকেও বেরিয়ে গেছে। এর অর্থ কী দাঁড়ায় সালার তা জানে। কয়েক ঘন্টা ওভাবেই বসে ছিল। তারপর না-জানি কী মনে এলো, ব্যাগ প্যাক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। আর এখন সেই রাস্তায়।

একই কুয়াশা। একই আবহাওয়া। সবকিছু ধোঁয়া বা কুয়াশার মতো লাগছে। কয়েক ঘন্টা পর সেই হোটেলের মতো সার্ভিস ষ্টেশনে পৌঁছে গাড়ি থামায়। কুয়াশার চাদরে ঢাকা বিল্ডিংটা এখন পুরো বদলে গেছে। গাড়ি মোড় ঘুরিয়ে ভেতরে নিয়ে আসে। দরজা খুলে বাইরে বের হয়। আট বছর আগের মতো আজও সেখানে নীরবতার রাজত্ব। শুধু লাইটের সংখ্যা আগের চেয়ে বেশি এখন। হর্ন দেয়নি, তাই ভেতর থেকে কেউ বের হয়নি। বারান্দায় এখন আর সেই পানির ড্রাম নেই। বারান্দা দিয়ে ভেতরে ঢোকে ও। ভেতরে থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসে। লোকটা কিছু বলার আগে তাকে বলল। 'আমার এক কাপ চা লাগবে।'

লোকটা হাই তুলল। 'আসুন।'

সালার ভেতরে ঢোকে। এটা সেই রুম। কিন্তু ভেতর কিছুটা বদলে গেছে। আগের তুলনায় টেবিল-চেয়ারের সংখ্যা বেশি। রুমের অবস্থাও উন্নত হয়েছে।

'শুধু চা নাকি সাথে অন্যকিছুও?' লোকটা ঘুরে জিজ্ঞেস করল।

'শুধু চা।'

সালার একটা চেয়ার টেনে বসে।

লোকটা কাউন্টারের পেছনে গিয়ে সেটাভ জ্বালায়। 'কোথা থেকে এসেছেন?' চায়ের কেটলি চুলার উপর রেখে জিজ্ঞেস করল।

কোনো উত্তর আসে না। লোকটা মাথা ঘুরিয়ে তাকায়। দেখে চা খেতে আসা মানুষটা রুমের এক কোণার দিকে তাকিয়ে ছিল পাথরের মূর্তির মতো প্রাণহীন আর স্থির।

ও নামাজ শেষ করে সালারের বিপরীত চেয়ারে এসে বসে।

কিছু না বলে টেবিলে রাখা চায়ের কাপ তুলে তাতে চুমুক দেয়। হোটেলের ছেলেটা ততক্ষণে বার্গার নিয়ে এসে তা টেবিলের উপর রাখছে। সালার তীক্ষ্ণ মেখে বার্গারের প্লেটের দিকে তাকায়, যেটা ওর সামনে রাখা হচ্ছিল। ছেলেটার প্লেট রাখা হলে সালার চামচ দিয়ে বার্গারের উপরের অংশ তুলে সতর্ক চোখে ভেতরের ফিলিং চেক করে। ছবি তুলে ছেলেটাকে বলল, যে ইমামার সামনে বার্গারের প্লেট রাখছে।

'এটা শামি কাবাব' ফিলিংয়ের উপরের স্তর আলাদা করল ও। 'এটা ওমলেট' নিচে থাকা অমলেটটা ছুরি দিয়ে একটু উপরে তুলল। 'আর এটা কেচাপ, তাহলে চিকেন কোথায়? আমি তোমাকে চিকেন বার্গার আনতে বলেছিলাম না?'

ইমামা ততক্ষণে নীরবে বার্গার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

'এটাই চিকেন বার্গার।' ছেলেটা হড়বড়িয়ে বলে।

'কেমন চিকেন বার্গার? এর মধ্যে চিকেন নেই।'

'আমরা এটাকেই চিকেন বার্গার বলি।' ছেলেটা ঘাবড়ায়।

'আর এমনি বার্গারে মধ্যে কী দাও?'

'ওটার মধ্যে শুধু শামি কাবাব থাকে, ডিম থাকে না।'

'আর একটা ডিম দিলেই এমনি বার্গার চিকেন বার্গার হয়ে গেল? কারণ ডিম থেকে মুরগি বের হয় আর মুরগির মাংসকে চিকেন বলে তাই ডাইরেক্টলি না হলেও ইনডাইরেক্টলি এটা চিকেন বার্গার।' সালার ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল।

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে হাসে। ইমামা এদের কথাবার্তায় মনোযোগ না দিয়ে নিজের বার্গার খাচ্ছে।

'ঠিক আছে যাও।' সালার বলল।

ছেলেটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে সেখান থেকে কেটে পড়ে। ছুরি আর চামচ রেখে সালার বাঁ-হাতে বার্গার তুলে নেয়। ইমামা

খেতে খেতে ওর বাঁ-হাতে বার্গার খাওয়া দৃশ্য বিস্ময়ের চোখে দেখে। কিন্তু বিস্ময় মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়, আবার খেতে থাকে। সালার বার্গারে একটা কামড় দেয়, একটু চাবায় এরপর প্লেটের উপর উগড়ে ফেলে। 'বাজে বার্গার। তুমি কীভাবে খাচ্ছ?' কোনোরকম মুখে থাকা অংশ গিলে বলল।

'অতটাও খারাপ না যতটা তোমার কাছে লাগছে।' ইমামা ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে বলল।

'সবকিছুতে তোমার স্ট্যান্ডার্ড বড্ড লো, ইমামা! সেটা হোক বার্গার বা পছন্দ।'

ইমামার হাত থেমে যায়, ফর্সা গায়ের রং লাল হয়ে ওঠে। সালারের ঠোঁটে ক্রুর হাসি।

'আমি জালাল আনসারের কথা বলছি।' ইমামাকে মনে করিয়ে দেয়।

‘ঠিক বলছ, আমার স্ট্যান্ডার্ড আসলেই বড্ড লো।’ ইমামা ঠান্ডা গলায় বলে আবার খেতে থাকে।

‘আমি ভেবেছিলাম তুমি বার্গার আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে।’ সালার চাপা হাসি নিয়ে বলল।

‘রিজিকের মতো নেয়ামতকে আমি কেন নষ্ট করব?’

‘এত বাজে বার্গারও নেয়ামত?’ বিদ্রূপ করে বলল ও। ‘এই মুহূর্তে আর কী কী নেয়ামত আছে তোমার কাছে?’

‘মানুষ আদতে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেই পারে না। জিভের মাধ্যমে স্বাদ নিতে পারার শক্তিও যে কত বড় নেয়ামত! তারা বোঝে না। এই যে আমরা কিছু খাওয়ার পর স্বাদ অনুভব করতে পারছি। অনেক মানুষ এই নেয়ামত থেকেও বঞ্চিত।’

'সেইসব মানুষের মধ্যে সালার সিকান্দারের নাম টপ অফ দ্য লিষ্ট, তাই না?' ইমামাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল ও। 'সালার সিকান্দার অন্তত এই ধরনের খাবার খেয়ে ইনজয় করতে পারে না।'

লোকটা ওর সামনে এসে চায়ের কাপ রাখে। সালার চমকায়। সামনের চেয়ার খালি।

'সাথে আর কিছু লাগবে?' লোকটা দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল।

'না, শুধু চা যথেষ্ট।' সালার চায়ের কাপ নিজের দিকে টেনে বলে।

'আপনি ইসলামাবাদ থেকে এসেছেন?' লোকটা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ।'

'লাহোর যাচ্ছেন?' আরেকটা প্রশ্ন।

সালার মাথা নেড়ে উত্তর দিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। লোকটার মনে হলো সামনে বসে থাকা মানুষটার চোখে হালকা আর্দ্রতা দেখেছে।

‘আমি এখানে কিছুক্ষণ একা বসতে চাই।’ চায়ের কাপ টেবিলে রেখে মাথা না তুলেই লোকটাকে বলল ও।

লোকটা খতমত খেয়ে কিচেনে চলে আসে। নিজের কাজ করতে করতে ওর দিকে নজর রাখে। পুরো পনেরো মিনিট পর সালারকে উঠে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল সে। লোকটা তড়িঘড়ি করে কিচেন থেকে রুমে আসে। কিন্তু এর পেছনে যাওয়ার আগেই খালি কাপের নিচে থাকা নোট তাকে থামিয়ে দেয়। ঐ কুঁচকে নোটটার দিকে তাকায়। নোটটা হাতে নিয়ে দ্রুত রুম ছেড়ে বইরে বের হয়। সালারের গাড়ি রিভার্স হয়ে মেইন রোডের দিকে যাচ্ছে। লোকটা অবাক চোখে ওর দূরে চলে যাওয়া গাড়ি দেখে। এরপর

হাতে থাকা হাজার টাকার নোটটা বারান্দার টিউবলাইটের আলোয় ধরে। 'নোট আসল কিন্তু মানুষ বোকা।' টাকা পকেটে ঢুকিয়ে খুশিতে বিড়বিড় করে।

সকালে নাস্তার টেবিলে সবার আগে সালারের খেয়াল আসে সিকান্দার উসমানের মাথায়। 'সালার কোথায়? ওকে ডাকো।' কাজের লোককে বললেন।

'সালার সাহেব তো রাতেই চলে গেছে।'

সিকান্দার আর তায়িবা অসহায়ভাবে একে-অপরের মুখের দিকে তাকালেন। 'কোথায় গেছে? গ্রামে?'

'না, লাহোর ফিরে গেছে।'

সিকান্দার উসমান ছেলের নাম্বার ডায়াল করেন। মোবাইল অফ। ফ্ল্যাটের নম্বারে ডায়াল করলেন। ওখানে আনসার কল লাগানো। ফোন কেটে দিয়ে কিছুটা চিন্তিত হয়ে আবার নাম্বার টেবিলে এসে বসেন।

'ফোনে কন্টাক্ট হয়নি?' তায়িবা জিজ্ঞেস করলেন।

'না, মোবাইল অফ। ফ্ল্যাটে আনসার কল। কেন চলে গেল?'

'চিন্তা না করে নাম্বার করো।' তায়িবা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'তুমি করো। আমার মুড নেই।'

সিকান্দার উসমান উঠে চলে যায়। তায়িবা অসহায় নিশ্বাস ফেললেন।

সালার ফ্ল্যাটের দরজা খুলছিল। পাশে ফুরকান। 'তুমি কখন এলে?' ওর পেছন পেছন ঢুকতে ঢুকতে বলল।

'আজ সকালে।' সালার সোফার দিকে যেতে যেতে বলল।

'গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল না? পার্কিং লটে গাড়ি দেখলাম, মানুষ এলে একটু জানিয়ে আসে।'

সালার উত্তরে কিছু না বলে সোফায় গিয়ে বসে।

'কী হয়েছে?' ফুরকান ওর চেহারা দেখে চিন্তিত গলায় বলল।

'কী হবে?' সালার বলল।

'তোমাকে জিজ্ঞেস করছি কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'বাড়িতে সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি... তোমার কি মাথাব্যথা করছে? মাইগ্রেন?'

'না।' সালার হাসতে চেষ্টা করে না। এতে লাভ হতো না।

'তাহলে কী হয়েছে তোমার? চোখ লাল হয়ে আছে।'

'রাতে ঘুমাইনি, ড্রাইভ করেছি।' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল।

'তাহলে ফ্ল্যাটে এসে ঘুমাতে। সকাল থেকে কী করছ?'

'কিছুই করিনি।'

'ঘুমাওনি কেন?'

'ঘুম আসছে না।'

'তুমি তো স্লিপিং পিল নিয়ে ঘুমাও, তাহলে না ঘুমানোর মানে?'

'আজকে নিতে চাইনি অথবা ধরে নাও ঘুমাতে চাইনি।'

'কিছু খেয়েছিলে?'

'না, ক্ষুধা নেই।'

'দুইটা বাজছে। খাবার পাঠাচ্ছি খেয়ে নিও। একটু ঘুমিয়ে নাও, সন্ধ্যায় বের হব আউটিংয়ের জন্য।'

'না, খাবার পাঠানোর দরকার নেই। আমি এখন ঘুমাব। সন্ধ্যায় বাইরে দিয়ে খাব।' বলতে বলতে সোফায় শুয়ে চোখের উপর হাত রাখে সালার।

ফুরকান কিছুক্ষণ পর উঠে চলে যায়।

'তোমার শরীর ঠিক আছে?' সালারের কেবিনরুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করল রিমশা।

রিসেপশনে যাওয়ার পথে জানালা দিয়ে ওকে দেখে করিডোরে যাওয়ার পরিবর্তে রিমশা থেমে যায়। সালার কনুই টেবিলে রেখে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছে। রিমশা জানত মাঝেমধ্যে ওর মাইগ্রেনের ব্যথা ওঠে। রিসিপশনে যাওয়ার বদলে দরজা খুলে ওর কেবিনরুমে ঢুকল। ওকে দেখে সোজা হয়ে বসে সালার টেবিলের উপর রাখা একটা ফাইল নড়াচড়া করতে লাগল।

'তোমার শরীর ঠিক আছে?' রিমশা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, একদম ঠিক আছি।' রিমশার দিকে তাকায় না সালার।

রিমশা চলে যাওয়ার বদলে এগিয়ে আসে। 'না, তোমাকে দেখে ঠিক মনে হচ্ছে না।'

'তুমি প্লিজ এই ফাইলটা নিয়ে যাও। আমি দেখতে পারছি না।' ফাইল বন্ধ করে এগিয়ে দেয় সালার।

'হ্যাঁ, আমি দেখে রাখব। তোমার ভালো না লাগলে বাসায় চলে যাও।' রিমশা চিন্তিত হয়ে বলল।

'হ্যাঁ, আমার বাসায় চলে যাওয়াই ভালো মনে হচ্ছে।'

ব্রিফকেস খুলে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল সালার। রিমশা নীরবে তাকিয়ে থাকে।

এগারোটার দিকে সালার অফিস থেকে বাসায় ফিরে আসে। টানা চারদিন এমন অবস্থা ওর। হঠাৎ করে সবকিছু থেকে

আগ্রহ উঠে গেছে। ব্যাংকে নিজের চাকরি, লামস (Lums)-
এ লেকচার, ড. সিবতে আলির কাছে আসা-যাওয়া,
ফুরকানের সঙ্গে আড্ডা, গ্রামের স্কুল, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।
কিছুই ওকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারছিল না। যে
আশা নিয়ে কয়েক বছর আগে সবকিছু ছেড়ে পাকিস্তান
এসেছিল, তা এখন শেষ হয়ে গেছে। নিজেরও কখনো
আন্দাজ ছিল না এই আশা ভেঙে গেলে ওর জন্য সব শেষ
হয়ে যাবে। প্রতিনিয়ত নিজেকে সেই পরিস্থিতি থেকে বের
করার চেষ্টায় যুদ্ধ করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। ইমামা অন্য কারো স্ত্রী
হয়ে অন্য কারো বাড়িতে থাকছে। এটা সালার সিকান্দারের
জন্য ঠিক ততটাই প্রাণনাশক ছিল; যতটা অতীতের সেই
ভয় ইমামা কোনো ভুল হাতে পড়ে গেল না তো। এমন
মানসিক অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উমরায় যাওয়ার
সিদ্ধান্ত নেয়। সেটাই একমাত্র জায়গা, যা ওর জীবনে আসা
আকস্মিক এই যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারে।

আট

সালার ইহরাম বেঁধে খানায়ে কাবার প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো। খানায়ে কাবায় কেউ নেই। দরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো ছায়াও ছিল না। রাতের শেষ প্রহরে আকাশের চাঁদ আর তারার আলো প্রাঙ্গণের মাৰ্বেলে প্রতিফলিত হয়ে সেখানকার সবকিছুকে এক অদ্ভুত নুরানি আলোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চাঁদ আর তারা ছাড়া সেখানে আর কোনো আলো নেই। কাবার গিলাফে লেখা আয়াত কালো আবরণে অদ্ভুতভাবে জ্বলে ওঠে। সর্বত্র জুড়ে গভীর নীরবতা। সেই গভীর নীরবতাকে শুধু একটা কণ্ঠ ক্ষুণ্ণ করছে। যেটা ওর কণ্ঠ। মাকামে মূলতাজিমের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও। চোখ খানায়ে কাবার দিকে স্থির। মাথা তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল-

*'লাববাইক আল্লাহুমা লাববাইক লাববাইক লা শারিকা
লাকা লাববাইক ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা
ওয়ালমূলক লা শারি-কা লাকা।*

আমি হাজির হে আমার আল্লাহ! আমি হাজির। তোমার
ডাকে সাড়া দিতে হাজির আমি। তোমার কোনো
শরিক নেই। নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত
শুধুই তোমার। সমস্ত সাম্রাজ্য তোমার। তোমার কোনো
শরিক নেই।

পূর্ণ শক্তিতে অনুরিত ওর কণ্ঠ খানায়ে কাবার নীরবতাকে
ভাঙছে। সেই আওয়াজ মহাকাশে পৌঁছে যাওয়ার মতো।

'লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক'

খালি পায়ে, অর্ধেক পোশাকে ওখানে দাঁড়িয়ে নিজের কণ্ঠ
চেনার চেষ্টা করছে।

'লাববাইক লা শারিকা লাকা লাববাইক'

ওখানে শুধু ওর কণ্ঠ ছিল।

'ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক'

চোখের পানি চিবুক বেয়ে ওর পায়ের আঙুল পর্যন্ত গড়িয়ে
পড়ে।

'লা শারি-কা লাকা'

ওর হাত আকাশের দিকে তোলা।

'লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক'

কাবার গিলাফে লেখা আয়াতগুলো ছুঁতে করে খুব আলোকিত
হতে দেখে। এতটা আলোকিত যে, তা ঝলমল করতে শুরু
করে। আকাশে তারার আলোও হঠাৎ বেড়ে যায়।
আয়াতগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল বিস্মিত, বিমোহিত হয়ে,
জবানে একটা বাক্য নিয়ে। খানায়ে কাবার দরজা আন্তে
আন্তে খুলে যেতে দেখে এবার।

'লাববাইক আল্লাহুমা লাববাইক'

ওর কণ্ঠ আরও উঁচু হয়। একটা ব্যথা, একটা শ্বাস, একটা
শ্রোতের মতো।

'লাববাইক লা শারিকা লাকা লাববাইক'

সেই মুহূর্তে অনুভব করে, ওর কণ্ঠের সাথে আরেকটা কণ্ঠ
মিশে যাচ্ছে।

'ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা'

ওর কণ্ঠের মতো উঁচু না, ফিসফিস প্রতিধ্বনির মতো। বুঝতে
পারে এটা অন্য কারো কণ্ঠ।

'লাকা ওয়ালমুল'

এবার খানায়ে কাবায় নিজেকে ছাড়া অন্য কারো উপস্থিতি
অনুভব করে।

'লা শারিকা লাকা'

কাবার দরজা খুলে যাচ্ছে।

'লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক' এই মেয়েলি কণ্ঠস্বর ওর
চেনা। 'লাববাইক লা শারিকা লাকা লাববাইক' ওর সাথে একই
বাক্য পুনরাবৃত্তি করছে।

'ইন্নাল হামদা ওয়াননি 'মাতা'

কণ্ঠটা ডান না বাঁ-দিক থেকে আসছে। কিন্তু কোথায়... ওর
পেছনে, কয়েক পা দূরে।

'লাকা ওয়ালমুলক লা শারিকা লাকা'

নিচু হয়ে পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া চোখের পানির দিকে তাকায়, পা ভিজে গেছে। আবার মাথা তুলে একদৃষ্টে খানায়ে কাবার দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। দরজা খুলে গেছে। ভেতরে আলো ছিল, নুরানি আলো। নত থেকে মাথা তোলে ও। আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে। উঠে দাঁড়াল। খানায়ে কাবার আলো তে, ও হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে। সেজদায় চলে যায়। আলো কমছে। সেজদা দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে...আলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আবারও বাতাসে সেই মেয়েলি কণ্ঠের ফিসফিস শোনে। এইবার ঘুরে তাকায় ও।

সালারের চোখ খুলে গেল। হেরেম শরিফের বারান্দার থামে মাথা ঠেকিয়ে বসা ও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বসেছিল। কিন্তু ঘুম আচমকা ওকে কাবু করে নেয়। ওটা ইমামা ছিল, নিঃসন্দেহে ইমামা। সাদা ইহরামে ওর পেছনে। কেবল এক ঝলক দেখতে পেয়েছে। কিন্তু সেই এক ঝলকই এটা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল, ওটা ইমামা ছাড়া কেউ না। শূন্য মস্তিষ্কে নিশ্চল তাকিয়ে ওর মন ভরে উঠল।

আট বছরের বেশি হয়ে গেছে সেই মেয়েটাকে দেখার, যাকে আজ হেরেম শরিফে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে। ক্ষত আবার তাজা হয়ে ওঠে। চশমা খুলে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। চোখের উষ্ণ গরম পানি ঘষতে ঘষতে মনে পড়ল এটা হেরেম শরিফ। এখানে কারো কাছ থেকে চোখের পানি লুকানোর প্রয়োজন নেই। এখানে সবাই চোখের পানি ফেলতেই আসে। চেহারা থেকে হাত সরিয়ে নেয়। মাথা নিচু করে সেখানে বসে অনেকক্ষণ কাঁদতে থাকে। তখন মনে পড়ে, প্রতিবছর উমরাহ করতে এলে ইমামার হয়েও উমরাহ করে। ওর সুস্থতার, দীর্ঘায়ুর দোয়া করে। যেন সব বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে, সেই দোয়া করে। এত বছরে হেরেম শরিফে দাঁড়িয়ে নিজের আর ইমামার জন্য সব ধরনের দোয়া করেছে ও। পৃথিবীতে যত ধরনের দোয়া আছে। কিন্তু এখানে...হেরেম শরিফে দাঁড়িয়ে কখনো নিজের জন্য ইমামাকে চায়নি। অদ্ভুত ব্যাপার হলেও কখনো ইমামাকে পাওয়ার জন্য এখানে এসে দোয়া করেনি। চোখের পানি থেমে যায়। নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠে। অজু করে উমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধে নেয়। কাবা তাওয়াফ করতে

গিয়ে ঘটনাচক্রে মাকামে মূলতাজিমের কাছে সেই জায়গা পেয়ে যায়, স্বপ্নে নিজেকে সেখানে দাঁড়ানো দেখেছিল। হাত উপরে তুলে দোয়া করতে শুরু করে।

'এখানে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে আশ্বিয়াগণ দোয়া করতেন। তাঁদের দোয়া এবং আমার দোয়ায় অনেক অন্তরাল।' মিনতি করে ও। 'যদি আমি নবী হতাম, তবে নবীদের মতো দোয়া করতাম। কিন্তু আমি তো সাধারণ বান্দা... গুনাহগার বান্দা। আমার ইচ্ছে, আমার আর্জি সব সাধারণ। এখানে দাঁড়িয়ে কেউ কখনো হয়তো কোনো নারীর জন্য কাঁদেনি। আমার জন্য এরচেয়ে বেশি লজ্জা ও অনুশোচনার কী হতে পারে যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে, হেরেম পাকে দাঁড়িয়ে... একজন নারীর জন্য আর্তনাদ করছি। কিন্তু না হৃদয়ের ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ আছে, না চোখের পানির ওপর। এটা আমি না যে সেই নারীকে হৃদয়ে জায়গা দিয়েছি; এটা তুমি করেছ। কেন ওই নারীর জন্য এত ভালোবাসা ঢেলে দিলে যে, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে মনে করছি? কেন আমাকে এত অসহায় করে দিলে যে, নিজের অস্তিত্বের ওপর আমার

নিয়ন্ত্রণ চলে না? আমি সেই মানুষ, যাকে তুমি সমস্ত দুর্বলতা দিয়ে সৃষ্টি করেছ। আমি সেই মানুষটা, যাকে তোমার বাইরে পথ দেখানোর কেউ নেই। আর সেই নারী... সেই নারী আমার জীবনের প্রতিটি পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে কোথাও যেতে, কোথাও পৌঁছাতে দেয় না। হয়তো আমার হৃদয় থেকে ওর জন্য ভালোবাসা এমনভাবে মুছে দাও, যাতে কখনো ওর খেয়াল অন্দি না আসে, নাহলে ওকে আমার করে দাও। যদি ওকে না পাই, সারা জীবন ওর জন্য কাঁদব; কিন্তু পেয়ে গেলে তোমার বাইরে অন্য কারো জন্য কাঁদতে হবে না। আমার চোখের পানিকে খালিস হতে দাও ইয়া রব! আমি এখানে দাঁড়িয়ে পবিত্র নারীদের মধ্যে একজনকে চাইছি... আমি ইমামাকে হাশিমকে চাইছি।"

'আমি আমার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সেই নারীকে চাইছি, যে তোমার পয়গম্বর সা.-র ভালোবাসায় কাউকে শরিক করেনি। যে নিজের জীবনের সমস্ত আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছে। যদি আমি জীবনে কখনো কোনো নেকি করে থাকি, তাহলে আমাকে সেই বিনিময়ে ইমামা হাশিমকে দাও। তুমি চাইলে

এটা সম্ভব, এখনো সম্ভব। আমাকে এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে উদ্ধার করো। আমার জীবন সহজ করে দাও। আট বছর ধরে যে যন্ত্রণার মাঝে আছি, আমাকে তা থেকে রেহাই দাও। সালার সিকান্দারের ওপর আরেকবার রহম করো। সেটাই, যা তোমার গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" মাথা নিচু করে সেখানে অনুনয়ন করছিল ও, যেখানে নিজেকে স্বপ্নে দেখেছে। পার্থক্য শুধু, এখন ওর পেছনে ইমামা নেই।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদার পর সেখান থেকে সরে আসে। আকাশে তারার আলো ম্লান হয়ে আসছে। কিন্তু খানায়ে কাবা আলোয় তখনো আলোকিত। রাতের এই প্রহরেও মানুষ ভিড় ঠিক একইরকম। স্বপ্নের মতো খানায়ে কাবার দরজা খোলেনি। তা সত্ত্বেও সেখান থেকে সরে আসার সময় সালার নিজের মনের প্রশান্তি টের পায়। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, যার মাঝে গত এক মাস ধরে ভুগছিল। এক অদ্ভুত আশ্বাস পাচ্ছিল দোয়ার পর। সেই আশ্বাস আর স্বস্তি নিয়ে এক সপ্তাহ পর পাকিস্তান ফিরে আসে।

‘আগামী বছর পিএইচডির জন্য আমেরিকা যাচ্ছি।’

ফুরকান চমকে সালারের দিকে তাকায়। ‘মানে কী?’

সালার হাসে। ‘মানে কী এর মানে কী? পিএইচডি করব।’

‘এমন হঠাৎ করে?’

‘হঠাৎ না, পিএইচডির চিন্তা আগেরই। এখন করে ফেলা ভালো।’ সালার শান্ত ভঙ্গিতে বলল।

ওরা দুজন ফুরকানের গ্রাম থেকে ফিরছিল। ফুরকান ড্রাইভ করছে, যখন সালার হট করে পিএইচডির কথা জানায়।

‘ব্যাংকে জানিয়েছি। রিজাইন করব ভাবছিলাম। কিন্তু তারা ছুটি দিতে চাইছে। আমি এখনো ভাবিনি অফার অ্যাকসেপ্ট করব না রিজাইন করব।’

‘তুমি পুরো প্ল্যানিং করে বসে আছো?’

‘হ্যাঁ ইয়ার! মজা করছি না। আসলেই সামনের বছর পিএইচডির জন্য যাচ্ছি।’

‘কয়েক মাস আগ পর্যন্তও তোমার এমন কোনো ইচ্ছে ছিল না।’

‘ইচ্ছের কি আর ঠিক-ঠিকানা থাকে? একদিনেই তৈরি হয়ে যায়।’ সালার কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল। ‘আমি এমনিতেও ব্যাংকিং নিয়ে একটা বই লিখতে চাই। কিন্তু গত কয়েক বছর এত ব্যস্ততায় কাটিয়েছি যে, ওটা নিয়ে কাজ করতে পারিনি। চাইছি পিএইচডি চলাকালীন

বইটা লিখে প্রকাশ করিয়ে ফেলব। হাতে কিছুটা সময় থাকলে কাজটা সহজ হয়ে যাবে।"

ফুরকান কিছুক্ষণ নীরবে গাড়ি ড্রাইভ করে বলে উঠল। 'আর স্কুল? ওটার কী হবে?'"

'ওটার কিছুই হবে না, যেমন আছে তেমন চলবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরও গ্রোথ হবে। বোর্ড অফ গভর্নর আছে, তারা আসা-যাওয়া করবে। তুমি আছো। আমি পাপার সাথেও কথা বলেছি। তিনিও এখানে আসা-যাওয়া করবেন। আমার না থাকায় বিশেষ কোনো প্রভাব পড়বে না। এই স্কুল অনেক আগেই সালার সিকান্দারের লাঠি ছেড়ে দিয়েছে, আগামীতেও তা প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আমি পুরোপুরি এর থেকে সরে যাচ্ছি না। খেয়াল রাখব। সাহায্যের দরকার হলে এসে পড়ব। আগেও তো এমনটাই করতাম।' ফ্লাক্স থেকে চাকাপে ঢালছিল সালার।

'পিএইচডির পর কী করবে?' ফুরকান গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ফিরে আগের মতো এখানেই কাজ করব। একেবারে। আর যাচ্ছি না।'

হেসে ফুরকানের কাঁধে হাত রাখে ও।

'কয়েক বছর পর যেতে পারতে না?'

'না, যে কাজ আজ হওয়া উচিত সেটা আজই করা ভালো। আমার মুড আছে এখন পড়ার। হয়তো কয়েক বছর পর থাকবে না।' সালার চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল। বাঁহাতে রেডিয়ার টিউন বদলায়। 'রোটারি ক্লাব আগামী উইকেন্ডে একটা ফাংশন করছে। ইনভিটেশন এসেছে, যাবে?' জিজ্ঞেস করে সালার।

'কেন যাব না? তাদের প্রোগ্রাম চমৎকার হয়।' ফুরকান উত্তরে বলল।

কথোপকথনের প্রসঙ্গ বদলে গেছে।

সেদিন রবিবার ছিল। সালার দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। খবরের কাগজের শিরোনাম দেখতে দেখতে কিচেনে নাস্তা তৈরি করতে থাকে। শুধু হাত-মুখ ধুয়েছিল, শেভ করেনি। নাইট ড্রেসের উপর একটা টিলেঢালা সোয়াটার পরা। কেটলি চুলার উপর রাখার সময় ডোরবেল বেজে ওঠে। খবরের কাগজ হাতে কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে। দরজা খুলে মোটামুটি ভালো একটা ধাক্কা খায়, যখন দেখে সাঈদা আন্মা সামনে দাঁড়ানো। দরজা পুরো খুলে দেয়।

'আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি?'

‘আল্লাহর শুকরিয়া, একদম ঠিক। তুমি কেমন আছো?’ তিনি উষ্ণভাবে ওর মাথায় হাত বোলালেন।

‘আমিও ঠিক আছি। ভেতরে আসুন আপনি।’ ও হেসে বলল।

‘ঠিক তো মনে হচ্ছে না, দুর্বল দেখাচ্ছে। চেহারাও কালো হয়ে গেছে।’ চশমার ফাঁক দিয়ে ওর চেহারা পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি।

‘রং কালো হয়নি, শেভ করিনি।’ সালার কষ্ট করে নিজের হাসি চেপে বলল। তাকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে।

‘আচ্ছা, তাহলে শেভ করোনি কেন? ওহো দাড়ি রাখতে চাও? অনেক ভালো কথা। নেকির কাজ।’ সাঈদা আন্মা সোফায় বসলেন।

‘না আন্মা! দাড়ি রাখছি না। আজকে রবিবার দেরি করে উঠেছি, কিছুক্ষণ আগে। এজন্য শেভ করিনি।’

'দেরি করে কেন উঠেছ বাবা? দেরি করে উঠতে নেই।
ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়বে। চেহারা নুর আসবে।
এজন্যই তোমার চেহারা মলিন দেখাচ্ছে। মানুষের ভোরে
উঠে নামাজ পড়ে কুরআন তেলাওয়াত করে হাঁটতে বের
হওয়া উচিত। এতে শরীর ভালো থাকে, আল্লাহ পাকও খুশি
হন।'

সালার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমি নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছিলাম
আম্মা। শুধু রবিবার দেরিতে উঠি। নাহলে প্রতিদিন সকালে
সেসব করি, যা আপনি বলছেন।'

ওর ব্যাখ্যায় আম্মা বেশ সন্তুষ্ট হলেন। 'খুব ভালো! খুব
ভালো! এজন্যই তোমার চেহারা চমকাচ্ছে, ভালো
দেখাচ্ছে।' কথা বদলে গেল।

'আপনি কী খাবেন?' নিজের চেহারা নিয়ে আর কোনো
মন্তব্য শোনার ইচ্ছে ছিল না ওর। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।
'নাস্তা করবেন?'

'না, আমি নাস্তা করে এসেছি। সকাল ছয়টা-সাতটার দিকে নাস্তা করে ফেলি, সাড়ে এগারোটায় দুপুরের খাবার।' সাঈদা আম্মা নিজের রুটিন বলতে থাকলেন।

'তাহলে দুপুরের খাবার খান। সাড়ে দশটা তো বাজে।'

'না, এখন আমার খিদে নেই। তুমি আমার পাশে এসে বসো।'

'আমি একটু আসছি।' তার মানা করা সত্ত্বেও কিচেনে চলে আসে।

'পুরো ছয় মাস ধরে তোমার অপেক্ষা করছি। কিন্তু একবারও চেহারা দেখালে না, অথচ ওয়াদা করেছিলো।'

কিচেন থেকেই তার কথা শুনছিল ও। 'আমি অনেক ব্যস্ত ছিলাম আম্মাজি।' নিজের জন্য চা বানাতে বানাতে বলল।

'তোমার কীসের এত ব্যস্ততা? আরে বাচ্চা! ব্যস্ত তো তারা থাকে, যাদের বউ-বাচ্চা আছে। না তুমি নিজের ঘর বেঁধেছ, না নিজের পরিবারের সাথে থাকছ, তারপরও বলো ব্যস্ত ছিলাম?'

টোষ্টার থেকে স্লাইস বের করার সময় তার কথায় হাসে ও।

'এখন দেখো, এগুলো তোমার কাজ তো না।' ওকে চায়ের ট্রে আনতে দেখে নারাজ হয়ে বলেন।

কিছু না বলে হেসে টেবিলের উপর কাপ-পিরিচ রাখতে থাকে ও।

'বউ থাকলে এইসব কাজ বউ করত। এমন কাজ পুরুষের শোভা দেয় না।'

'ঠিক বলছেন আন্মাজি! কিন্তু বাধ্য, বউ নেই কী করার?' চায়ের কাপ তার দিকে বাড়িয়ে বলল।



ওর কথা শুনে সাঈদা আম্মা যেন লাফিয়ে উঠলেন। 'এটা কেমন কথা কী করার? আরে বাচ্চা! দুনিয়া মেয়ে দিয়ে ভরা। তোমার বাবা-মা আছে, তাদেরকে বলো তোমার জন্য সম্বন্ধ ঠিক করতে। নাহলে তুমি চাইলে আমি চেষ্টা করতে পারি।'

সালার টের পেল পরিস্থিতি নাজুক হচ্ছে। 'না, না আম্মাজি। আপনি চা নিন। আমি আমার জীবন নিয়ে বেশ সুখে আছি। আর যতদূর ঘরের টুকটাক কাজের বিষয়, সেটা তো আমাদের পয়গম্বর সা.-ও করতেন।'

'এখন তুমি কথা কোথায় নিয়ে গেলে? আমি তোমার জন্য বলছিলাম।' আম্মা কিছুটা খতমত খেয়ে বললেন।

'আপনি এই বিস্কুট নিন, সাথে কেকও।' সালার প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করে।

"আরে হাহ্, যে কাজের জন্য এসেছি সেটা ভুলেই গেছি।"
হাতের বড় ব্যাগটা খুলে তিনি কিছু খুঁজতে থাকেন। 'তোমার
বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে সালারের জিভে আঁচ লেগে যায়।
'আমার বোনের? আন্মাজি। আমার বোনের বিয়ে তো পাঁচ
বছর আগে হয়ে গেছে।' কিছুটা হতভম্ব হয়ে বলল।

সান্দিদা আন্মা ততক্ষণে ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে
ফেলেছেন। 'আরে, আমি আমার মেয়ের কথা বলছি। আমনা।
তোমার বোনের মতো, তাই না?' ওর কথায় খুব হতাশ হয়ে
তিনি কার্ড বাড়িয়ে দিলেন।

সালারের পেট ফেটে হাসি আসে। কাল পর্যন্ত উনি
মেয়েটাকে ওর বউ বানানোর চেষ্টায় ছিল আর আজকে
এসে বোন বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রচুর স্বস্তি অনুভব করে।
অন্তত এখন আর তাকে বা তার মেয়েকে নিয়ে ভয় নেই।

সানন্দে কার্ড নেয়। 'মোবারক হোক... কবে হচ্ছে বিয়ে?'
কার্ড খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল।

'পরের সপ্তাহে।'

'থাক আম্মাজি! আপনার দুশ্চিন্তা শেষ হলো।' সালার
'আমার' বদলে 'আপনার' শব্দটি ব্যবহার করে।

'হ্যাঁ, আল্লাহর শুকরিয়া। অনেক ভালো জায়গায় সম্বন্ধ
হয়েছে। আমার দায়িত্ব শেষ। ছেলেদের কাছে ইংল্যান্ড চলে
যাব।'

সালার কার্ডের উপর নজর বোলায়।

'তোমাকে এই কার্ড দিতে আলাদাভাবে এসেছি। এবার
কোনো বাহানা শুনব না। বিয়েতে আসতেই হবে। ভাইয়ের
মতো দায়িত্ব নিয়ে বোনকে বিদায় দেবো।'

সালার হাসি লুকানোর জন্য চায়ের কাপ ঠোঁটে ধরল। 'চিন্তা করবেন না, অবশ্যই আসব।' কাপ নিচে রেখে স্লাইসের উপর মাখন লাগায় ও।

'ফুরকানের কার্ডও নিয়ে এসেছি। ওকেও দিতে হবে।' ফুরকানের চিন্তা এখন সান্দিদা আম্মাকে জ্বালাচ্ছে।

'ফুরকানের আজ ভাবির সাথে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা। এতক্ষণে চলে গেছে হয়তো। আমার কাছে রেখে যান, আমি দিয়ে দেবো।'

'তুমি যদি ভুলে যাও, তাহলে?' সান্দিদা আম্মা নিশ্চিত হতে পারলেন না। 'আমি ভুলব না। আচ্ছা, ফোনে ফুরকানে সাথে কথা বলিয়ে দিচ্ছি।'

সান্দিদা আম্মা খুশি হন। 'হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। ফোনে কথা বলাও।'

নাস্তা খেতে থাকে। 'ফুরকান, সাঈদা আম্মা এসেছেন আমার কাছে।' ওপাশ সালার উঠে ফোন নিয়ে আসে। নাম্বার ডায়াল করে ফোন স্পিকারে রেখে তাকে ফোন রিসিভ হতেই বলল ও। 'তার সাথে কথা বলো।'

সালার চুপ হয়ে যায়। এখন ফুরকান আর সাঈদা আম্মার মাঝে কথা চলছে। দশ মিনিট পর যখন তাদের কথা শেষ হয়, ততক্ষণে ওর নাস্তা শেষ। কিচেনে কাপ-পিরিচ রাখতে রাখতে ওর খেয়াল আসে। 'এসেছেন কার সাথে আপনি?'

'আমার ছেলের সাথে।' সাঈদা আম্মা নিশ্চিত ভঙ্গিতে বললেন।

'আচ্ছা, আপনার ছেলেরাও এসে পড়েছে? ছোটজন নাকি বড়জন?'

'আমি পাশের বাসার রাশেদের কথা বলছি।' সাঈদা আম্মা নারাজ হলেন।

সালার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও ভুলে গেছে সাঈদা আম্মার জন্য প্রতিটা ছেলে তার ছেলে এবং প্রতিটা মেয়ে তার মেয়ে। তিনি আরামসে সম্পর্ক বানিয়ে ফেলেন। 'তাহলে ও কোথায়?' জিজ্ঞেস করল।

'চলে গেছে। মোটরসাইকেলে এসেছি ওর সাথে। ঝড়ের গতিতে চালায়। নয়টায় বসেছি পুরো সাড়ে দশটায় বাসার সামনে পৌঁছে দিয়েছে। আমার একটা কথাও শোনেনি সারা রাত্তায়। বারবার বলেছি আঙু চালাতে। এখানে নামিয়ে দেওয়ার সময় বলে গেছে, আপনার সাথে মোটরসাইকেলে এটা আমার শেষ সফর। আর কখনো কোথাও নিয়ে যেতে হলে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব।'

সালার বিনোদন পায়। আধঘন্টার রাত্তা দেড় ঘন্টা বসে পাড়ি দেওয়া মানুষটার বিরক্তি আন্দাজ করতে পারছিল। বয়স্কদের সঙ্গে সময় কাটানো খুব কঠিন। এটা সাঈদা আম্মার সঙ্গে হওয়া প্রথম সাক্ষাতেই বুঝে গেছে। 'তাহলে ফিরবেন কীভাবে? রাশেদ নিতে আসবে আপনাকে?'

'হ্যাঁ, বলেছিল তো ম্যাচ শেষ হওয়ার পর নিয়ে যাব। এখন দেখি কখন আসে।'

সান্দিদা আম্মা নতুন করে মেয়ে আর মেয়ের ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ির কথা বলতে থাকে। মুখে হাসি নিয়ে ধৈর্য ধরে শোনে সালার। এই ধরনের কথাবার্তায় আগ্রহ কোথেকে আনবে ও? কিন্তু সান্দিদা আম্মা তো ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করতে পারবে না। তার কথা বিন্দুপরিমাণও বুঝে আসছিল না ওর। কিন্তু ভান করছিল যেন সব বুঝছে।

দুপুরের খাবার সান্দিদা আম্মার সঙ্গে খায়। তার সামনে ফ্রিজ থেকে কিছু বের করে গরম করার চেষ্টা করেনি। কারণ আবার বিয়ের সুবিধা আর প্রয়োজনের ওপর লেকচার শোনার ইচ্ছে ছিল না। রেস্টুরেন্টে কল করে লাঞ্চ অর্ডার করে। এক ঘন্টায় খাবার এসে পড়ে। খাওয়ার পরও রাশেদ না আসায় তার দুশ্চিন্তা কমাতে বলল ও। 'আমি রেখে আসি আপনকে।'

তিনি রাজি হয়ে গেলেন। 'হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। আমার বাড়িও দেখে এসবো।'

‘আম্মাজি! আমি আপনার বাড়ি দেখেছি।’ গাড়ির চাবি খুঁজতে খুঁজতে স্মরণ করায়।

আধঘন্টায় সেই গলিতে পৌঁছায়, যেখানে সাঈদা আম্মার বাড়ি। গাড়ি একে বেরিয়ে তাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত রেখে আসে। আম্মা ওকে ভেতরে আসতে বললে ধন্যবাদ জানিয়ে না করে দেয়। 'আজকে না, বাসায় অনেক কাজ।' বলে নিজের কথার ওপর পস্তায়।

‘বাচ্চা! এই জন্যই বলি বিয়ে করে নাও। বউ থাকলে বাসার সব কাজ দেখবে। তুমি কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারবে। এটা কেমন জীবন? ছুটির দিনও বাসার কাজ নিয়ে বসে থাকা।’ আফসোসের চোখে ওর দিকে তাকান

‘জি, আপনি ঠিক বলছেন। এখন আমি যাই?’ বেশ আনুগত্য দেখিয়ে মাথা নাড়ল।

‘হ্যাঁ যাও, কিন্তু মনে রেখো বিয়েতে আসতে হবে। ফুরকানকেও আরেকবার বলো, যাতে ওর মনে থাকে। কার্ড দিয়ে দিও।’

সালার বাড়ির ডোরবেল বাজিয়ে খোদা হাফেজ বলে ঘুরে যায়। পেছনে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। সাঈদা আন্মা তার মেয়েকে কিছু বলছিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় ফুরকান কার্ড নেওয়ার সময় বলল। ‘তাহলে প্রোগ্রাম কী? তুমি যাবে?’

‘না, এই উইকেন্ডে করাচি যাচ্ছি। IBE-এর সেমিনারের জন্য। রবিবার ফিরব, এসে ঘুম। Nothing else. তুমি যাও।’

আমি খাম দিয়ে দেবো, আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে এটা দিয়ে দিও।' সালার বলল।

'কত বড় লজ্জার কথা সালার। মহিলা নিজে এসে কার্ড দিয়ে গেছে, ভালবেসে যেতে বলেছে।'

'জানি। কিন্তু ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট করতে পারব না।'

'আমরা কিছুক্ষণ বসে চলে আসব।'

'ফুরকান! আমার ফেরা কনফার্ম না। হতে পারে রবিবার না-ও আসতে পারি বা রাত হয়ে যেতে পারে।'

'একদম বেহুদা মানুষ তুমি। আত্মা ভীষণ রাগ করবেন।'

'কিছু হবে না। আমার অনুপস্থিতিতে তার মেয়ের বিয়ে থেমে থাকবে না। এমনও হতে পারে, আগে থেকে ধরে রেখেছে

আমি আসব না। তাছাড়া ফুরকান! তুমি-আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ মেহমান নই তাদের।' সালার নির্বিকার কণ্ঠে বলল।

'যাইহোক, আমি আর আমার স্ত্রী তো যাব। তাতে আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ মেহমান হলেও।' ফুরকান অসন্তুষ্ট হয়ে বলল।

'আমি কখন থামলাম? অবশ্যই যাও, তোমার যাওয়া উচিত। সাঈদা আম্মার সঙ্গে আমার চেয়ে তোমার বেশি আন্তরিকতা।'

'কিন্তু সাঈদা আম্মা তোমাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করে।' ফুরকান বোঝায়। 'এসব বয়স্ক মানুষের স্বভাব।' ফুরকানের কথা সিরিয়াসলি না নিয়ে বলল সালার।

'কারণ যাইহোক, চিন্তা তো করে। চলো আরকিছু না হোক, ড. সিবতে আলির আত্মীয় ভেবে নাহয় চলো।' ফুরকান অন্য কৌশলে রাজি করানোর চেষ্টা করল।

'ডক্টর সাহেব তো নেই। তিনি নিজেই বিয়েতে থাকতে পারছেন না। থাকলেও তোমার মতো অন্তত এভাবে জবরদস্তি করতেন না।'

'আচ্ছা, আমিও তোমাকে করছি না। যেতে ইচ্ছে না করলে লাগবে না।' ফুরকান বলল।

সালার ল্যাপটপ নিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একটা সবুজ খোলা মাঠে ওরা দু'জন ছিল। প্রশস্ত খোলা মাঠের গাছগুলো খুব একটা লম্বা না। চারদিকে ফুলের ঝোপ, চারপাশজুড়ে নীরবতা। ওরা গাছের ছায়ায় বসার পরিবর্তে একটা ফুলের ঝোপের কাছে হালকা রোদে বসেছিল। ইমামা হাঁটু ভাঁজ করে রাখা আর ও ঘাসের উপর আধশোয়া। ওর চোখ বন্ধ। দুজনের জুতা কিছুটা দূরে পড়ে আছে। ইমামা খুব সুন্দর একটা সাদা চাদর পরা। ওদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।

ইমামা বলতে বলতে দূরের কিছু একটা দেখছে। শুয়ে থাকা অবস্থায় ইমামার চাদরের এক কোণা দিয়ে মুখ ঢেকে নেয় ও। রোদের আলো থেকে চোখ আড়াল করতে। ইমামার চাদর ওকে অদ্ভুত তৃপ্তি আর প্রশান্তি দিচ্ছিল। ইমামা চাদরের কোণা ওর মুখের উপর থেকে সরানোর বা টানার চেষ্টা করেনি। সূর্য ওর শরীর সতেজ করে তুলছে। চোখ বন্ধ করে মুখের উপর থাকা চাদরের স্পর্শ অনুভব করতে করতে তন্দ্রা ওকে কাবু করে নেয়।

সালারের চোখ খুলে যায়। বিছানায় শোয়া। কিছু একটা ওর ঘুম ভেঙে দিয়েছে। চোখ খুলে কিছুক্ষণ অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে চারপাশ দেখল। এটা সেই জায়গা না, যেখানে থাকার কথা। আরেকটা স্বপ্ন... আরও একটা কল্পনা। ও চোখ বন্ধ করে। তখন ফোনের রিংটোন ওর মনোযোগ কাড়ে, যা মাথার কাছে ক্রমাগত বেজে চলেছে। এই কলই স্বপ্ন থেকে বের করে এনেছে। বিরক্ত হয়ে ফোন হাতে তুলে নেয়। অপরপাশে ফুরকান।

'কোথায় ছিলে সালার? কতক্ষণ ধরে ফোন করছি, রিসিভ কেন করছ না।' ফুরকান ওর কণ্ঠ পেয়েই বলল।

'আমি ঘুমাচ্ছিলাম।' সালার উঠে বিছানায় বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে চারটা বাজছে।

'তুমি এখনই সাঙ্গদা আম্মার বাড়িতে আসো।' অপরপাশ থেকে ফুরকান বলল।

'কেন? আমি তোমাকে বলেছি যে...'

ফুরকান ওকে থামিয়ে বলল। 'আমি জানি কী বলেছিলে, কিন্তু এখানে ইর্মাজেন্সি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কেমন ইর্মাজেন্সি?' সালার চিন্তায় পড়ে যায়।

'এলে জানতে পারবে। এক্ষুনি আসো, আমি ফোন রাখছি।' ফুরকান ফোন কেটে দেয়।

সালার খানিক চিন্তিত হয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফুরকানের কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারছিল ওপাশে চিন্তার কিছু আছে। কিন্তু সাঈদা আম্মার ওখানে চিন্তার কী এমন হতে পারে? পনেরো মিনিটে কাপড় বদলে গাড়িতে ওঠে।

ফুরকানের পরবর্তী কল গাড়িতে রিসিভ করল। 'কিছু তো বলো, কী হয়েছে? আমাকেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছ।' ও বলল।

'চিন্তা করার দরকার নেই, তুমি এখানেই আসছ। এলে জানতে পারবে। ফোনে এতকিছু বলা যাবে না।' ফুরকান আবার ফোন কেটে দেয়।

প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে আধঘন্টার রাস্তা পনেরো মিনিটে পাড়ি দিলো ও। ফুরকানকে সাঈদা আম্মার বাড়ির বাইরেই পেয়ে যায়। সালারের আন্দাজ ছিল সাঈদা আম্মার বাড়িতে এই সময় অনেক শোরগোল থাকবে, কিন্তু তা নেই। দূরদূরান্তেও কোনো বরযাত্রীর ছায়া নেই। ফুরকানের সাথে

মূল দরজার বাঁদিকে তৈরি একটা পুরনো ধাঁচের ড্রয়িংরুমে
ডুকল।

'আদতে হয়েছে কী যে, আমাকে এভাবে ডাকতে হলো?'
সালার অস্থির ছিল।

'সাগ্গিদা আম্মার মেয়ের সাথে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।'
ফুরকান সামনের সোফায় বসে বলল।

'কেমন ঝামেলা?'

'যেই ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল,
সেই ছেলে অন্য কোথাও নিজের পছন্দে বিয়ে করে
নিয়েছে।'

'My goodness!' সালারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

'তারা কিছুক্ষণ আগে ফোন করে সবকিছু বলে আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। এখন আর বরযাত্রী আসবে না। আমি নিজেও কিছুক্ষণ আগে তাদের বাড়িতে গেছি, তারা আসলেই লজ্জিত। ছেলের ব্যাপারে কিছুই জানে না, কোথায় আছে এখন। ছেলে শুধু ফোনে খবর জানিয়েছে।' ফুরকান বিস্তারিত বলতে থাকে।

'যদি ছেলের এই বিয়েতে মত না থাকে, তাহলে আগেই বাবা-মাকে পরিস্কার বলে দেওয়া উচিত ছিল। পালিয়ে বিয়ের করার সাহস থাকলে বাবা-মাকে বিয়ে করবে বলার সাহস ছিল না?' সালার বিরক্ত হয়। 'সাগুদা আমাদের ছেলেদের এই মুহূর্তে এখানে থাকা উচিত ছিল। তারা বিষয়টা হ্যান্ডেল করতে পারত।'।

'কিন্তু যেহেতু তারা এখানে নেই, কাউকে না-কাউকে বিষয়টা দেখতে হবে।'

‘সান্দিদা আম্মার আর কোনো কাছের আত্মীয় নেই?’ সালার জিজ্ঞেস করে।

‘না। আমি কিছুক্ষণ আগে ড. সিবতে আলির সঙ্গে কথা বলেছি ফোনো।’

‘ওখান থেকে কী করবেন তিনি? এখানে থাকলে অন্যরকম হতো।’

‘তিনি বলেছেন তোমার সাথে কথা বলিয়ে দিতে।’
ফুরকানের কণ্ঠ ধীর।

‘আমার সাথে কথা? কিন্তু কেন?’ সালার কিছুটা অবাক হয়।

‘তার ধারণা এই মুহূর্তে তুমি সান্দিদা আম্মার সাহায্য করতে পারো।’

'আমি...?' সালার চমকে বলল। 'আমি কীভাবে সাহায্য করব?'

'আমনাকে বিয়ে করে।'

সালার পাথরের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। 'তোমার মাথা ঠিক আছে?' খুব কষ্টে ফুরকানকে বলল।

'হ্যাঁ।'

সালারের চেহারা লাল হয়ে ওঠে। 'তাহলে হয়তো বুঝতে পারছ না কী বলছি।' এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ায়।

ফুরকান বিদ্যুতের গতিতে এসে ওর পথের বাধা হয়।

'কী ভেবে তুমি এমন কথা বললে?' সালার নিজের কণ্ঠ ধীর রাখতে পারল না।

'আমি এটা তোমাকে ড. সাহেবের কথা অনুযায়ী বলেছি।'

সালারের রং বদলে যায়। 'তুমি তাকে আমার নাম কেন বললে?'

'আমি বলিনি। তিনি বলেছেন তোমার কাছে অনুরোধ জানাতে। এই অবস্থায় সাঙ্গদা আম্মার মেয়েকে বিয়ে করে তাকে সাহায্য করতে।'

কেউ সালারের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে নাকি মাথার উপর থেকে আকাশ বুঝতে পারল না। দপ করে সোফায় বসে পড়ল ও। 'আমি বিবাহিত ফুরকান! তুমি তাদেরকে বলেছ?'

'হ্যাঁ, বলেছি। অনেক বছর আগে তুমি এক মেয়েকে বিয়ে করেছ, এরপর আর মেয়েটাকে খুঁজে পাওনি।'

'তারপর?'

‘তারপর... তারপরও তিনি চান তুমি আমনাকে বিয়ে করো।’

‘ফুরকান! আমি...’ ও কিছু বলতে পারল না। ‘আর ইমামা, ওর কী হবে?’

‘তোমার জীবনে ইমামা কোথাও নেই। এত বছরে কে জানে কোথায় আছে, আদতে আছে কি না?’

‘ফুরকান!’ সালার শক্তভাবে বলে। ‘এই কথা বাদ ও আছে কিনা। আমাকে শুধু বলো যদি কাল ইমামা এসে হাজির হয়, তাহলে?’

‘তুমি এটা ডক্টর সাহেবকে বলে দেখো।’ ফুরকান বলল।

‘না। তুমি সাদ্দা আম্মাকে এটা বলো গিয়ে। হতে পারে অন্য কোথাও বিয়ে করা ছেলেকে তারা মেয়ের জামাই হিসেবে মানবে না।’

'সেই পরিবার যদি বরযাত্রী নিয়ে আসত, তাহলে এমন কিছুও হয়ে যেত। কিন্তু সমস্যা হলো ছেলে আমনাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতেও রাজি না।'

'ছেলেটাকে খোঁজা সম্ভব?'

'হ্যাঁ, সম্ভব। কিন্তু এই মুহূর্তে না।'

'ডক্টর সাহেব আমনার জন্য ভুল পছন্দ করছেন। আমি... আমি আমনাকে কী দিতে পারব? আমি তো সেই ছেলের চেয়েও খারাপ, যে ওকে কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে গেছে।' সালার অসহায়ের মতো বলল।

'সালার! এখন তাদের কাউকে প্রয়োজন। আর প্রয়োজনের সময় কেবল সেই মানুষটার কথা সবার আগে মাথায় আসে, যে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। তুমি জীবনে এত মানুষকে সাহায্য করে আসছ, তাহলে ড. সিবতে আলিকে সাহায্য করতে পারবে না?'

'আমি মানুষকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছি ফুরকান। ডক্টর সাহেব আমার কাছে টাকা চাইছে না।'

ফুরকান আর কিছু বলার আগে ফোন বেজে ওঠে। নাম্বার দেখে ফোন সালারের দিকে এগিয়ে দেয়। 'তার কল।'

সালার ফ্যাকাশে চেহায়ায় মোবাইল হাতে নেয়। ওখানে বসে মোবাইল কানে প্রথমবার উপলব্ধি করে, জীবনে সব কথা সবার মুখের উপরে বলা যায় না। যা ফুরকানকে বলেছিল সেসব দূরের কথা, তার সাথে উঁচু আওয়াজেও কথা বলতে পারবে না। তার সামনে না বাহানা দাঁড় করাতে পারবে, না অজুহাত। স্বভাবসুলভ নরম সুরে তিনি ওর কাছে অনুরোধ করলেন।

‘যদি আপনার বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমনাকে বিয়ে করতে পারেন তাহলে করে নিন। ও আমার মেয়ের মতো। মনে করুন আমার মেয়ের জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু আমি বাধ্য।’

‘আপনি যেমন চাইবেন আমি তেমনই করব।’ সালার মধ্যম আওয়াজে বলল। ‘অনুরোধ করতে হবে না। আপনি শুধু আদেশ করুন।’ নিজেকে বলতে শোনে।

ফুরকান প্রায় দশ মিনিট পর ভেতরে আসে। সালার মোবাইল হাতে নিয়ে চুপচাপ মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল।

‘ডক্টর সাহেবের সাথে কথা হয়ে গেছে তোমার?’ ফুরকান একটা চেয়ার উনে ওর সামনে বসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে।

সালার কিছু না বলে মাথা তুলে তাকায়। হাতে থাকা মোবাইল সেন্টার টেবিলে রেখে বলল। ‘আমি এখনই রুখসাতি চাই না, শুধু বিয়ে যথেষ্ট।’ এরপর নিজের হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে রয়। ফুরকানের মায়া লাগে। তবে নিয়তির শিকার হওয়া ব্যক্তি ও একা নয়।

রাস্তায় কোলাহল প্রায় নেই বললেই চলে। রাত খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। গভীর কুয়াশা সবকিছুকে নিজের চাদরে ঢেকে রেখেছে। রাস্তায় জ্বলতে থাকা স্ট্রিট লাইটের আলো কুয়াশাকে ভেদ করে সেই বারান্দার অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করছে, যেখানে রেলিংয়ের কাছে একটা স্টুলের উপর সালার বসে রয়েছে। রেলিংয়ের কোণায় একটা কফির মগ, যা থেকে ওঠা গরম ধোঁয়া কুয়াশার সাথে মিশে অদ্ভুত আকৃতি বানাচ্ছে। আর ও, বুকের উপর দু-হাত ভাঁজ করে নিষ্প্রাণ চোখে নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে যা অদ্ভুত। রাত দশটা বাজে। কিছুক্ষণ আগে বাসায় ফিরেছে। সান্দিদা আম্মার বাড়িতে বিয়ে হওয়ার পর এক মুহূর্তও থাকেনি। সেখানে অজানা আতঙ্ক তাড়া করছিল ওকে। গাড়ি নিয়ে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরেছে। মোবাইল অফ করে রাখা। এই মুহূর্তে বাইরের জগতের সাথে ও কোনো সংযোগ রাখতে চায় না। মোবাইল অন করলে ফুরকান ফোন করবে। অনেক কারণ দেখানোর চেষ্টা করবে। ড. সিবতে আলিও কল করতে পারেন, ধন্যবাদ জানাতে। কিন্তু এর কোনোটা চায় না ও।

সময়টা একান্তে নীরবে কাটাতে চায়। কফি থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে কয়েক ঘন্টা আগের ঘটনা নিয়ে ভাবে। সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। যদি স্বপ্ন হতো...। ওখানে বসে কয়েক মাস আগে হেরেম পাকে চাওয়া দোয়ার কথা ও মনে পড়ে।

'তাহলে কি ওকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে?' যন্ত্রণা নিয়ে ভাবল। 'তাহলে এই যন্ত্রণাও শেষ হওয়ার কথা? আমি এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই চেয়েছিলাম। আমি ওর স্মৃতির কারাগার থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম...' রেলিংয়ের কোণায় রাখা গরম কফির কাপ ঠান্ডা হাতে উঠিয়ে নেয়। 'তো ইমামা হাশিম! অবশেষে তুমি আমার জীবন থেকে চিরতরে চলেই গেলে...' কফির তেতোভাব নিজের ভেতরে ঢেলে নেয়।

'এখন কি আমার পস্তানো উচিত? আমি যদি রাস্তায় সেদিন সাঙ্গিদা আম্মাকে না দেখতাম বা তার সাহায্য না করতাম। যদি আমার বাসায় নিয়ে না আসতাম। না সম্পর্ক বাড়ত, না তিনি

আমাকে বিয়েতে ডাকতেন। নাহলে অন্তত আমি যদি আজকে করাচিতে থেকে যেতাম, এখানে আসতামই না। নাহয় আমি যদি মোবাইল অফ করে ঘুমাতাম। ফোনের রিসিভার রেখে দিতাম। ফুরকানের কল রিসিভ না করতাম। নাহলে এমন হতো যদি যে, ড. সিবতে আলিকে আমি চিনতাম না। তাহলে তার অনুরোধ রাখতে হতো না। অথবা হয়তো... আমার মেনে নেওয়া উচিত ইমামা আমার জন্য না।"

কফির মগ আবার রেলিংয়ের উপর রেখে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় নিজের ওয়ালেট বের করে। ওয়ালেটের ভেতর থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে সেটা খুলল।

প্রিয় সিকান্দার আফ্কেল,

আপনার ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে আমি খুবই দুঃখিত।
আমার জন্য আপনাদেরকে কয়েক বছর অনেক কষ্ট করতে
হয়েছে, আমি এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সালারের কিছু টাকা
ফিরিয়ে দেওয়ার ছিল। তা আমি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।
খোদা হাফেজ।

ইমামা হাশিম।

কাগজের মাঝে ইমামার স্পর্শ টের পায়। ইমামার হাতে লেখা
ওর নাম...। গত নয় মাসে কতবার এই চিরকুটটা পড়েছে,
বলতে পারবে না। এই কাগজে লেখা কয়েকটা বাক্যে ওর
জন্য কোনো আপনত্ব ছিল না। এটাও জানে ওর মারা
যাওয়ার খবর ইমামাকে কষ্ট দেয়নি। এই খবর ইমামার জন্য
আড়াই বছর পর মুক্তির বার্তা হিসেবে পৌঁছায়। সুতরাং কষ্ট
কীসের? তারপরও এই চিরকুট ওর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে
উঠেছে। কাগজের উপরের লাইনে আঙুল বোলায়। শেষে

লেখা ইমামা হাশিম নামটা ছোঁয়। তারপর কাগজ ভাঁজ করে আবার ওয়ালেটে রেখে দেয়। রেলিংয়ে রাখা কফির কাপ ঠান্ডা হয়ে গেছে। তবু অবশিষ্ট ঠান্ডা কফিটুকু এক চুমুকে গিলে ফেলে।

ড. সিবতে আলি এক সপ্তাহর মধ্যে লন্ডন থেকে পাকিস্তান ফিরবেন। এর জন্য অপেক্ষা করছে। ইমামা হাশিমের ব্যাপারে যা কিছু এত বছরে বলতে পারেনি, এখন তা বলতে চায়। নিজের অতীতের ব্যাপারে যা এতদিন বলতে পারনি, সেসব বলতে চায়। এখন আর পরোয়া ছিল না তিনি ওকে কী ভাববেন তা নিয়ে।

রমজানের চতুর্থ দিন ড. সিবতে আলি ফিরলেন। তার ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় সালার তাকে ডিষ্টার্ব করা ঠিক মনে করল না। পরদিন রাতে আগের মতো তার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দুপুরবেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে অফিসে থাকতে ফোন আসে। বিয়ের পর সালারের সঙ্গে এটা

তার তৃতীয় কল। কিছুক্ষণ ওর দিনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তিনি ওকে বললেন।

'সালার! রাতে না, আজ সন্ধ্যায় আসবেন। ইফতার আমার সঙ্গে করবেন।'

'জি, আমি চলে আসব।' সালার হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মিলিয়ে বলল।

আরও কিছুক্ষণ কথা হয়। এরপর ড. সিবতে আলি ফোন রেখে দেন। একটু তাড়াতাড়ি ব্যাংক থেকে চলে আসে। ফ্ল্যাটে এসে কাপড় চেঞ্জ করে বেরিয়ে যায়। যখন ড. সাহেবের বাড়িতে পৌঁছায়, তখন ইফতারের সময় হতে ঘন্টানেক বাকি। কাজের লোক বাইরে বৈঠকখানার বদলে সরাসরি ওকে ভিতরে লাউঞ্জে নিয়ে আসে। সিবতে আলি বেশ উষ্ণভাবে জড়িয়ে ধরার পর পরম মমতায় ওর কপালে চুমু দেন।

'আগে এখানে আপনি একজন বন্ধু হিসেবে আসতেন, কিন্তু আজ পরিবারের সদস্য হয়ে এসেছেন।'

ও জানে তার ইশারা কোনদিকে।

'বসুন।' ডক্টর সাহেব ওকে বসতে ইশারা করে নিজে অন্য সোফায় বসেন। 'অনেক মোরাবক হোক। এখন তো আপনিও সংসারী হয়ে গেলেন।'

সালার নীরব দৃষ্টি ও মেকি হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তিনি হাসছেন।

'আমি অনেক খুশি আপনার বিয়ে আমনার সাথে হয়েছে বলে। ও আমার চতুর্থ মেয়ের মতো। তাই আপনি আমার মেয়ের জামাই!'

সালার চোখ নামিয়ে ফেলল। ওর জীবনে যদি ইমামা হাশিম নামক অধ্যায় না লেখা হতো, তাহলে হয়তো তার মুখে এই

কথা শুনে নিজেকে নিয়ে গর্ব করত। কিন্তু সবকিছুর মাঝে ইমামা হাশিম দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত দূরত্ব ওই একটা মেয়ে তৈরি করছিল, নিজের থাকা না-থাকা জুড়ে।

ড. সিবতে আলি অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন। 'আপনি এত বছর যাবৎ আমার কাছে আসেন, কিন্তু কখনো বলেননি তো আপনি বিবাহিত! এমনকি তখনো না, যখন দুয়েকবার আপনার বিয়ে নিয়ে কথা উঠেছিল।'

সালার মাথা তোলে। 'আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু...' থেমে যায়। সবকিছু এত অদ্ভুত কী বলতাম? মনে মনে বলে।

'কবে বিয়ে করেছিলেন আপনি?' ড. সিবতে আলি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'সাড়ে আট বছর আগে। আমার বয়স প্রায় তখন একুশ।' পরাজিত সৈনিকের মতো বলে সালার। ধীরে ধীরে সবকিছু

বলতে থাকে। ড. সিবতে আলি কোথাও থামায় না। ও সব বলে চুপ হওয়ার পর তিনিও অনেকক্ষণ চুপ থাকেন। এরপর বললেন।

'আমনা খুব ভালো মেয়ে। আর ভাগ্যবতী যে, ও আপনার মতো একজন সালেহ মানুষ পেয়েছে।'

তার কথা সালারকে চাবুকের মতো আঘাত করে। 'সালেহ? আমি মোটেও সালেহ পুরুষ না। ডক্টর সাহেব। আমি তো...আসফালস সাফিলিন। আপনি যদি আমাকে চিনতেন, তবে কখনো আমার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করতেন না। না সেই মেয়ের জন্য আমাকে বেছে নিতেন, যাকে নিজের মেয়ে মনে...'

'আমরা সবাই নিজের জীবনের কোনো না-কোনো একটা সময় জাহেলিয়াতের অন্ধকারের মাঝে অতিক্রম করি। কেউ তা কাটিয়ে ওঠে, কেউ আবার সারা জীবন এর মাঝেই থেকে যায়। যদি আপনি তা কাটিয়ে ওঠেন... আপনার অনুশোচনা

বলছে আপনি তা কাটিয়ে উঠেছেন। আমি না আপনাকে অনুশোচনা করা থেকে আটকাব, না তওবা, না দোয়া থেকে। এটা করা আপনার দায়িত্ব সারা জীবনের জন্য। কিন্তু সাথে এজন্যও শুকরিয়া আদায় করুন আপনি নফসের সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। যদি দুনিয়া আপনাকে আকৃষ্ট না করে, আল্লাহর ভয়ে চোখে পানি আসে, দোজখের পরিণাম ভয় পান, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করেন, যেভাবে করা উচিত, যদি নেকি আপনাকে আকৃষ্ট করে, পাপ করতে গিয়ে থেমে যান তাহলে অবশ্যই আপনি সালেহ। কেউ সালেহ হয়, কেউ-বা নিজেকে সালেহ হিসেবে তৈরি করে। সালেহ হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সালেহ হওয়া দু-পাশ ধরালো তলোয়ারের উপর চলার মতো। এর পেছনে অনেক সময় লাগে, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। আমি এখনো এটাই বলব, আপনি একজন সালেহ। কারণ আপনি সালেহ হয়ে উঠেছেন। আল্লাহ আপনার কাছ থেকে বড় কাজ নেবেন।"

সালারের চোখ ভিজে ওঠে। তিনি একবারো ইমামা হাশিমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেননি, কিছু বলেননি। তাহলে কি এর মানে দাঁড়ায়, ইমামা চিরতরে ওর জীবন থেকে চলে গেছে? তাহলে কি এর মানে দাঁড়ায়, ইমামা ভবিষ্যতে আর কখনো ওর জীবনে ফিরবে না? ওকে নিজের জীবন তবে আমনার সাথেই কাটাতে হবে? ওর মন ভেঙে যায়। ডক্টর সাহেবের মুখ থেকে ইমামাকে নিয়ে কোনো সান্ধ্বনা, কোনো ভরসা, কোনো আশ্বাস চেয়েছিল ও। ডক্টর সাহেব চুপ ছিলেন। ও নিজেও চুপচাপ রইল।

'আপনার ও আমনার জন্য আমি অনেক দোয়া করব। বরং অনেক দোয়া করে এসেছি খানায়ে কাবায়, রসুলের রওজায় দাঁড়িয়ে।' লন্ডন থেকে ফেরার সময় তিনি উমরাহ করে এসেছেন। সালার মাথা নিচু করে ফেলে। দূরে আজানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। খাদেম ইফতারের জন্য টেবিল রেডি বলছে। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ড. সিবতে আলির সঙ্গে ইফতার করে। এরপর ও আর ডক্টর সাহেব নামাজের জন্য

কাছের মসজিদে চলে যায়। ফিরে খাবার সেরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসে।

'কাল আমার সঙ্গে সাঈদা আম্মার বাড়িতে যেতে পারবে?'
ড. সিবতে আলির বাড়ি থেকে ফিরে রাত দশটার দিকে ফুরকানকে কল করে সালার। ফুরকান হসপিটালে নাইট ডিউটিতে করছিল।

'হ্যাঁ, কেন না। কোনো বিশেষ কাজ?'

'আমি আমনার সাথে কথা বলতে চাই।'

ফুরকান কিছুক্ষণ চুপ রইল। সালারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, লুকানোর কোনো প্রয়াস নেই। 'কীসের কথা?'

'চিন্তার কিছু নেই।'

'তারপরও... তুমি আবার ইমামার ব্যাপারে কথা বলবে?'

'আগে বলো যাবে কিনা?' সালার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, যাবা।'

'ঠিক আছে, তাহলে কালই বলব কী কথা আছে আমার।'
ফুরকান কিছু বলার আগেই কল কেটে দেয় ও।

'ইমামার ব্যাপারে কথা বলবে?' গাড়ি ড্রাইভের সময় ফুরকান জিজ্ঞেস করে।

'শুধু ইমামার ব্যাপারে না, আরও অনেক কথা। যা আমি বলতে চাই আমনাকে।'

'আল্লাহর দোহাই সালার! কবর খুঁড়ে লাশ তোলা বন্ধ করো।'
ফুরকান রাগ হয়ে বলল।

'আমার প্রায়োরিটি আর এইম জানা উচিত ওর, যেহেতু বাকি জীবন আমার সঙ্গে কাটাতে হবে।'

'জেনে যাবে সব, বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিছু বলতে হলে বাসায় এনে বলো। ওখানে প্যাণ্ডোরা বক্স খুলে বসো না।'

'বাসায় আনার পর বলে কী লাভ? তখন ফেরার পথ থাকবে না। আমি চাই ও আমার কথা শুনুক, বুঝুক, ভাবুক; তারপর সিদ্ধান্ত নিকা।'

'এখনও কোনো সিদ্ধান্তের অবকাশ নেই। তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

'রুখসাতি হয়নি।'

'তাতে কী আসে-যায়?'

'কেন আসে-যায় না? যদি আমার কথায় আপত্তি থাকে, তাহলে এই সম্পর্কটা নিয়ে আবার ভেবে দেখতে পারে।' সালার গম্ভীর হয়ে বলল।

ফুরকান তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। 'আর এই সম্পর্ক নিয়ে আবার ভেবে দেখার জন্য তুমি ওর সামনে কী কী যুক্তি-দলিল পেশ করবে?'

'আমি শুধু কিছু কথা বলব, যা ওর জন্য জানা দরকার।' সালার নির্বিকার কণ্ঠে বলল। 'তারা ড. সিবতে আলির আত্মীয়। তাদের অনেক সম্মান করি। ডক্টর সাহেব না বললে এই সম্পর্ক কখনো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি...'

ফুরকান কথা শেষ করতে দেয় না। 'ঠিক আছে, যা বলার বলো। কিন্তু ইমামার উল্লেখ একটু কম রেখো। কারণ আমনা যদি কিছুতে হাট হয়, সেটা এই বিষয়ে হবে। অন্যসব বিষয় হয়তো তেমন পরোয়া করবে না। কারণ দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়া বা তকমা পাওয়া সহজ না।'

'আর আমি চাই ও এটা অনুভব করুক, ভাবুক। এখনো কিছু এদিক-সেদিক হয়নি। তুমি বলছ মেয়েটা সুন্দরী, শিক্ষিত, ভালো পরিবারের তাই...'

'বাদ দাও সালার! তোমার যা বলার, যা বোঝানোর; গিয়ে যা ইচ্ছে করো।'

'আমি ওর সাথে একা কথা বলতে চাই।' সালার বলল।

'সান্দীদা আম্মাকে বলে দেবো আমি, একা কথা বলিয়ে দেবেন।'

আধা ঘন্টায় ওরা সেই বাড়িতে পৌঁছায়। দরজা সান্দীদা আম্মাই খোলেন। সালার আর ফুরকানকে দেখে তার অবস্থা খুশিতে বেহাল। ওদেরকে বসার রুমে নিয়ে যায়। 'সান্দীদা আম্মা! সালার আমনার সাথে একা কিছু কথা বলতে চায়।' রুমে ঢুকতেই ফুরকান বলল।

সাগ্গিদা আম্মা কিছুটা দোটানায় পড়লেন। 'কেমন কথা?'
সালারের দিকে তাকান।

ফুরকানের সঙ্গে সালারও না বসে দাঁড়িয়ে ছিল। 'আছে কিছু
কথা। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই।' ফুরকান সান্ত্বনা দেয়।

সাগ্গিদা আম্মা স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল আগের মতো। সালার
চোখ নামিয়ে নেয়। 'আচ্ছা। তাহলে তুমি আমার সাথে আসো
বাবা! আমনা ভেতরে আছে। ওখানে গিয়ে দেখা করো।'

সাগ্গিদা আম্মা দরজা দিয়ে সামনে আগায়। সালার একনজর
ফুরকানের দিকে তাকিয়ে আম্মাকে অনুসরণ করে। মূল
দরজার বাঁদিকে বসার রুম। ডানদিকে উপরে যাওয়ার সিঁড়ি।
কয়েক ধাপ উপরে কাঠের পুরনো শৈলীত একটা বিশাল
দরজা, যা তখন খোলা ছিল। ওটা দিয়ে লাল ইটের তৈরি
চওড়া প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে সাগ্গিদা আম্মা ভেতরে
ঢুকলেন। সালারও কিছুটা দ্বিধা নিয়ে তার পেছন পেছন যায়।

লাল ইটের চওড়া সেই প্রাঙ্গণের দুইপাশের দেয়ালে গাছ, ঝোপালো লতাপাতা লাগানো। লাল ইটের মাঝে সবুজ গাছপালা ও লতাপাতাগুলো সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রাঙ্গণের একপাশে রোদ, যা লাল রংটাকে আরও ফুটিয়ে তুলছিল। আন্তে আন্তে সিঁড়ি বেয়ে সালার প্রাঙ্গণে পা রাখো। আরও সামনে আগানোর পরিবর্তে থেমে যায়। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রাঙ্গণের চারপায়ার সামনে একটা মেয়ে দাঁড়ানো। যে হয়তো এখনই চারপায়া থেকে উঠেছে। পিঠ সালারের দিকে। মেয়েটার পরনে সাদা কুর্তি আর কালো পায়জামা। সম্ভবত গোসল করে বেরিয়েছে। কারণ কোমর থেকে একটু উপরে থাকা কালো চুলগুলো ভেজা অবস্থায় বেঁকিয়ে পিঠজুড়ে ছড়িয়ে আছে। সাদা ওড়নাটা চারপায়ার উপর। মেয়েটা কুর্তির হাতা কনুই অব্দি ফোল্ড করতে করতে ওর দিকে ঘোরে।

সালার শ্বাস নিতে পারল না। ও জীবনে এরচেয়ে সুন্দর মেয়ে কখনো দেখেনি অথবা এই মেয়েটার চেয়ে সুন্দর ওর কাছে কখনো কাউকে মনে হয়নি। এটা নিশ্চয়ই আমনা। এই বাড়িতে আমনা ছাড়া আর কোন মেয়ে থাকবে? সালার

সামনে আগাতে পারেনি। মেয়েটার উপর থেকে চোখ সরাতে পারেনি। হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে নাকি চলছে বলতে পারে না ও। আমনা এবং ওর মাঝে অনেক দূরত্ব। হাতা ফোল্ড করতে থাকা আমনার চোখ প্রথমে সান্দিদা আম্মার ওপর পড়ে।

'সালার এসেছে।' আম্মা অনেক এগিয়ে ছিলেন।

আমনা হালকা ঘাড় বাঁকিয়ে প্রাঙ্গণের দরজার দিকে তাকায়। সালার ওকেও থমকে যেতে দেখে। আমনা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পিঠ আবার সালারের দিকে। নিচু হয়ে তড়িগড়ি করে চারপায়া থেকে ওড়না তুলে মাথা-পিঠ ঢেকে নেয়। এখন আর পিঠজুড়ে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো দেখতে পাচ্ছে না সালার কিন্তু আমনার নিশ্চিত্তভাব ওকে অবাক করে। মেয়েটার মাঝে কোনো আতঙ্ক, তাড়াহুড়ো বা অবাক হওয়া নেই।

আম্মা ঘুরে সালারের দিকে তাকায়। এখনো দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন। 'আরে বাচ্চা! ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভেতরে আসো। এটাও তোমার বাড়ি।'

আমনা ওড়না ঠিক করে ঘুরে দাঁড়ায়। সালার ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। অপলক চোখে, অবাক হয়ে, পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। আমনার ভেতরে দিয়ে কিছু একটা বয়ে যায়। সালার এগিয়ে আসে।

‘ও আমনা, আমার মেয়ে।’ কাছে আসার পর সাঈদা আম্মা পরিচয় করিয়ে দেন।

‘আসসালাসামু আলাইকুম।’

আমনাকে বলতে শোনে সালার। কিন্তু উত্তর দিতে পারল না। আমনা ওর থেকে কয়েক পা দূরে। তবুও তাকাতে কঠিন লাগছে। নার্ভাস বলে হয়তো। সালারের নার্ভাসনেস টের পায় আমনা।

'সালার তোমার সাথে কথা বলতে চায়।' সাঈদা আম্মা আমনাকে বলে।

আবার সালারের দিকে তাকায় আমনা। দু'জনের দৃষ্টি মেলে। একই সময় চোখ নামিয়ে ফেলে ওরা। আমনা দ্রুত সাঈদা আম্মার দিকে তাকায়। আর সালার তাকায় ওর কনুই পর্যন্ত মেহেদি দেওয়া হাতের দিকে। হুট করে মনে হলো এই মেয়েটাকে কিছু বলতে পারবে না।

'সালার! চলো রুমে যাই। ওখানে নিশ্চিন্তে আমনার সাথে কথা বলতে পারবো।' সাঈদা আম্মা বললেন।

আম্মা সামনের বারান্দার দিকে আগায়। আমনাও মাথা নিচু করে তাকে অনুসরণ করে। সালার ওখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেখে। সাঈদা আম্মা রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আমনা দরজার সামনে গিয়ে হালকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। সালার দ্রুত চোখ নামিয়ে ফেলে। আমনা বোধহয় অবাক ছিল ওকে ভেতরে ঢুকতে না

দেখে। সালার মাথা নিচু করে সামনে এগিয়ে আসে। আমনা স্বস্তি নিয়ে রুমে ঢোকে। সালার রুমে ঢুকে দেখল সাঈদা আম্মা ততক্ষণে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছেন। আমনা লাইট অন করছিল। রোদ থেকে ভেতরে এসে ঠান্ডা অনুভব করে ও।

'বসো বাবা।' সাঈদা আম্মা একটা চেয়ারের দিকে ইশারা করে বললেন।

সালার চেয়ারে বসে। আমনা লাইট অন করে একটু দূরে থাকা কাউচে বসল। ও অপেক্ষা করে সাঈদা আম্মা কখন উঠে চলে যাবো। ফুরকান তাকে স্পষ্টভাবে বলেছে, আমনার সাথে একা কথা বলতে চায়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে আন্দাজ হয়ে যায়, এই অপেক্ষা বৃথা। হয়তো তিনি ভুলে গেছেন ও আমনার সাথে একা কথা বলতে চায়। নাহলে তার খেয়াল একা বলতে ফুরকানের অনুপস্থিতি, সালার তাকে এর মাঝে शामिल করেনি। অথবা হয়তো ওকে এখনো এতটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবছে না যে, নিজের মেয়েকে একা রেখে

যাবে। শেষ আন্দাজ সালারের ঠিক মনে হলো। আমনাকে যা কিছু বা যতটুকু বলতে চেয়েছিল, তা সাঙ্গিদা আম্মার সামনে বলা যাবে না। নিজেকে ধাতস্থ করল। কিছু একটা তো বলতেই হবে। কিন্তু বলার মতো কিছুই খুঁজে পায় না। মস্তিষ্ক খালি।

মৃদু অন্ধকারে শীতল রুমটা সম্পূর্ণ নীরব। সালার এক হাতের আঙুল অন্য হাতের সাথে মিলিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। আমনা রুমে ফ্যান্সি লাইট জ্বালিয়েছে। ফার্নিচারে ঘেরা উঁচু সিলিংয়ের এই রুমটা হয়তো একমসময় সিটিংরুম হিসেবে ব্যবহার হতো। এখানে অনেকগুলো দরজা, সব দরজাই বন্ধ। রুমে একটা মাত্র জানালা, যা বারান্দায় খোলো। জানালায় পর্দা ঝুলছে। রুমের মেঝেতে নকশা করা মেরুন রঙের কার্পেট। ফ্যান্সি লাইট রুমটাকে পুরোপুরি আলোকিত করতে ব্যর্থ। অন্তত সালারের কাছে রুমটা অন্ধকার লাগে। হয়তো এটা ওর অনুভূতি বা অন্যকিছু...'

'আজকে গিয়ে চোখের ডাক্তার দেখাতে হবে। কাছের সাথে সাথে হয়তো আমার দূরের দৃষ্টিও দুর্বল হয়ে গেছে।' সালার মনে মনে হতাশ হয়ে ভাবে। সেন্টার টেবিলের অন্য পাশে বসে থাকা আমনাকে এখন দেখতে পাচ্ছে না। তাই চোখ মেঝের দিকে স্থির করে নেয়। আমনা হঠাৎ করে উঠে আরও কিছু লাইট অন করে। রুম টিউব লাইটের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। ফ্যান্সি লাইট অফ করে দেওয়া হয়। সালার ভাবল আমনা আগে কেন টিউব লাইট অন করেনি। হঠাৎ অনুভব করে আমনাও তখন নার্ভাস ছিল। আমনা এবার আর কাউচে বসল না। সাঈদা আম্মার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল। সালার এবার আমনাকে দেখার চেষ্টা করে না। আগের মতোই মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। সাঈদা আম্মার ধৈর্যের সুতা ছিড়ে যায়। তিনি কেশে সালারের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

'বলো বাবা! যা আমনার সাথে বলতে চাও।' সালারকে মনে করিয়ে দিলেন। 'এতক্ষণ ধরে চুপ করে আছো। আমার মন অস্থির হয়ে উঠছে।'

‘বলার কিছু নেই, আমি শুধু তাকে দেখতে চেয়েছিলাম।’
যতটা সম্ভব নিজের কণ্ঠকে স্বাভাবিক রেখে বলল সালার।

সান্দিদা আম্মার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ‘ব্যস, এটুকু কথা?
ফুরকান আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখো,
কেন না? তোমার বউ।’

সালার উঠে দাঁড়ায়। ‘আপনি তাকে বলুন জিনিসপত্র প্যাক
করে নিতে, আমি অপেক্ষা করছি।’ দরজা দিয়ে বের হতে
হতে সান্দিদা আম্মাকে বলল।

আমনা অবাক হয়ে সালারের দিকে তাকায়। সান্দিদা আম্মারও
একই হাল। ‘কিন্তু বাবা! তুমি তো কথা বলতে চেয়েছিলে,
তাহলে রুখসাত্তি? আমি চেয়েছিলাম ঠিকঠাকমতো বিদায়
দেবো। আর...!’

সালার আলতো করে তার কথায় বাধা দেয়। ‘আপনি মনে
করুন আমি হকে ঠিকঠাকমতোই নিয়ে যাচ্ছি।’

সান্দিদা আম্মা ভেবে বললেন। 'ঠিক আছে বাবা! তুমি যদি এমন চাও, তাহলে এটাই হোক। কিন্তু ইফতার পর্যন্ত থাকো, কয়েক ঘন্টাই বাকি। খেয়ে যাবে।'

'না, আমার আর ফুরকানের কিছু কাজ আছে। ফুরকানকে শুধু এক ঘন্টার জন্য নিয়ে এসেছি। বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব না।' দাঁড়িয়ে বলছিল ও।

'কিন্তু আম্মা! আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে অনেক সময় লাগবে।' আমনা এই প্রথম কথার মাঝে যোগ দেয়।

সালার ঘুরে না তাকিয়ে সান্দিদা আম্মাকে বলল। 'আম্মা! আপনি তাকে বলুন আরামসে প্যাকিং করতে। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, যতক্ষণ তার লাগবে।' বলে রুমে থেকে বেরিয়ে আসে।

ফুরকান অবাক হয়ে সালারের দিকে তাকায়। ও বসার ঘরে
ডুকছিল। 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে? আমি ভাবলাম
কতক্ষণ না লাগে।'

সালার কিছু না বলে সোফায় বসল। ফুরকান মনোযোগ দিয়ে
ওর চেহারা দেখে।

'সব ঠিক আছে?'

'হু।'

'আমনাকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'তারপর কী?'

'চলো তাহলে।'

'না।'

'কেন?'

'আমনাকে নিয়ে যাব।'

'কী...?' ফুরকান থ বনে যায়। 'তুমি না শুধু কথা বলতে এলে?'

সালার উত্তরের পরিবর্তে ফুরকানের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায়। 'হট করে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা কোথেকে এলো?'

'ব্যস! ভেবে নিলাম।' সালার বলল।

ফুরকান ওর দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায়।

দুই ঘন্টা পর আমনা যখন সালার ও ফুরকানের সঙ্গে সালারের ফ্ল্যাট আসে, তখন ইফতারের বেশি সময় বাকি ছিল না। ফেরার পথে সালার ইফতারের খাবারদাবার কিনে নেয়। ফুরকান ওদেরকে ইফতারে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সালার তাতে রাজি হয়নি। ফুরকান তার স্ত্রীকে সালারের ফ্ল্যাটে আসতে বলে। ইফতারের জন্য টেবিল ফুরকানের স্ত্রী গোছায়। আমনা সাহায্যের চেষ্টা করলে ফুরকান এবং তার স্ত্রী করতে দেয় না। সালার তাদের মাঝে হস্তক্ষেপ করেনি। মোবাইল হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে যায়। লাউঞ্জে বসে কাঁচের জানালা দিয়ে আমনা ওকে হেঁটে হেঁটে কারো সাথে কথা বলতে দেখে। খুব গম্ভীর লাগছিল সালারকে। সাঈদা আম্মার বাড়ি থেকে ফ্ল্যাটে আসা পর্যন্ত সালার একবারও ওকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেনি। শুধু ফুরকানই ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলেছে। এখানেও সেটাই হচ্ছে। ইফতারের টেবিলেও সালার নীরবতা ভাঙেনি। ফুরকান এবং তার স্ত্রী আমনাকে খাবার এগিয়ে দেয়।

সালারের নীরবতা আর গাঙ্গীর্ঘ হয়তো আমনাকে টের দেওয়ার জন্যই।

ইফতারের পর সালার ফুরকানের সঙ্গে মাগরিবের নামাজের জন্য বের হয়। নামাজের পর ফুরকান হসপিটালে চলে যাবে। মসজিদ থেকে বের হয়ে গাড়ির কাছে আসতে আসতে ফুরকান ওকে বলল।

'তুমি খুব চুপ হয়ে গেছ।'

সালার কিছু না বলে হাঁটতে থাকে।

'তোমার কিছুই বলার নেই?' ফুরকান ক্রমাগত ওর নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করে।

সালার মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকায়। সন্ধ্যা হতেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ফুরকানের দিকে তাকায় ও। 'না, আমার বলার মতো কিছু

নেই।" কিছুক্ষণ একসাথে হাঁটার পর ফুরকান ওকে বিড়বিড় করতে শোনে। 'আমি আজকে কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই।' ফুরকানের মায়া লাগে। সান্ত্বনার জন্য ওর কাঁধে হাত রাখল।

'আমি তোমার অনুভূতি বুঝতে পারছি। কিন্তু জীবনে এমন অনেক কিছু হয়ে যায়। তুমি ইমামার জন্য যতটা পেরেছ, তা করেছ। যতটা অপেক্ষা করা সম্ভব, তা করেছ। আট-নয় বছর তো কম সময় না। যদি তোমার ভাগ্যে এই মেয়েটা লেখা থাকে, তাহলে আর কী করার বলো?'

সালার অভিব্যক্তিহীন চোখে ফুরকানের দিকে তাকায়।

'এই ঘরে আসা ইমামার নিয়তি ছিল না, আমনার নিয়তি ছিল। তাই এসে পড়েছে মেয়েটা। ওর সাথে বিয়ের সাত-আট দিন হয়েছে শুধু, আর আট দিনের মাথায় এখানে ও। ইমামার সাথে বিয়ের নয় বছর হতে চলল কিন্তু ও আজ পর্যন্ত তোমার কাছে আসতে পারেনি। তুমি কি বুঝতে পারছ না ইমামা

তোমার নিয়তিতে নেই?' ফুরকান ওকে সর্বাঙ্গক বোঝানোর চেষ্টা করল। 'আমাদের অনেক ইচ্ছে থাকে। কিছু ইচ্ছে আল্লাহ পূর্ণ করেন, কিছু অপূর্ণ রেখে দেন। হতে পারে ইমামাকে না-পাওয়াই তোমার জন্য ভালো। হয়তো তোমাকে আমনার জন্যই রেখেছিলেন আল্লাহ। হতে পারে আজ থেকে কয়েক বছর পর তুমি এই বিষয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বো।'

ওরা দু'জন পার্কিংয়ে এসে পড়েছে। ফুরকানের গাড়ি সামনের সারিতেই। 'আমনার সঙ্গে একটা সুন্দর জীবন কাটানোর চেষ্টা করো।'

ওরা এখন গাড়ির কাছে। ফুরকান ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলল, কিন্তু বসার আগে সালারের দুই কাঁধে হাত রেখে পর্যায়ক্রমে দুই গালে আলতো করে চুমু দেয়। 'তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি একটা ভালো কাজ করেছে। এই ভালো কাজের প্রতিদান এখানে না পেলেও পরকালে ঠিকই পাবো।' ওর মুখটা দুই হাতে তুলে বলল।

সালার মাথা নেড়ে মৃদু হাসে। ফুরকান একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পুরো দিনের মধ্যে এই প্রথম সালারের মুখে হাসি দেখেছে। ফুরকান নিজেও হেসে ওর পিঠে চাপড় দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে। সালার গাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়। ফুরকান ইগনিশনে চাবি রাখছিল, তখন ওকে আঙুল দিয়ে জানালায় টোকা দিতে দেখে। ফুরকান কাঁচ নিচে নামায়।

'তুমি বলছিলে আজ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখিনি, যার সব ইচ্ছে পূরণ হয়েছে।' সালার জানালায় ঝুঁকে শান্ত গলায় বলছে।

ফুরকান অবোধ্য ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। সালারকে বেশ নিশ্চিন্ত আর সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে।

'তাহলে তুমি আমাকে দেখো, কারণ সেই মানুষটা আমি। যে আজ পর্যন্ত যা চেয়েছি, তা-ই পেয়েছি।'

ফুরকানের মনে হলো হতাশার কারণে ওর মস্তিষ্কে প্রভাব পড়েছে।

'যাকে তুমি আমার ভালো কাজ বলছ, সেটা মূলত আমার পুরস্কার। যা আমাকে পৃথিবীতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আখিরাতের অপেক্ষায় রাখা হয়নি। আমার নিয়তিতে আজও সে, যে ঠিক নয় বছর আগে ছিল।' সালার থেমে থেমে গভীর আওয়াজে বলছে। 'আমাকে সেই নারীই দেওয়া হয়েছে, যাকে আমি চেয়েছি। ইমামা হাশিম এই মুহূর্তে আমার ঘরে। খোদা হাফেজ।'

ফুরকান হতভম্ব হয়ে ওকে যেতে দেখে। কী বলে গেল কিছুই বুঝে আসছিল না। 'হয়তো আমি ঠিকমতো ওর কথা শুনতে পাইনি, নাহলে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অথবা হতে পারে ধৈর্য এসে পড়েছে। ইমামা হাশিম...?'

সালার ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

নয়

লাহোর পৌঁছানোর পর ইমামার পরবর্তী কাজ ছিল কারো সাহায্য নেওয়া। কিন্তু কে সাহায্য করবে? হোস্টেলে গেলে হবে না। জাভেরিয়া বা অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেও লাভ নেই। কারণ পরিবারের মানুষ ওর সব বান্ধবীকে এখন সন্দেহ করবে। তারা কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওকে লাহোর খোঁজা শুরু করে দেবে। বরং যোগাযোগ করা সেই মানুষটার এবং ওর নিজের, উভয়ের জন্য বিপজ্জনক। হতে পারে এতক্ষণে খোঁজা শুরু দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কার কাছে যাবো। তাই সাবিহা একমাত্র বিকল্প ছিল। কিন্তু জানত না সাবিহা পেশোয়ার থেকে ফিরেছে কিনা। গিয়ে দেখে সাবিহাদের বাড়িতে কাজের লোক ছাড়া কেউ নেই। ‘ফিরবে কবে?’ ইমামা কাজের লোককে জিজ্ঞেস করল।

‘ঠিক বলতে পারব না। এসে পড়বো।’ কাজের লোক ইমামাকে চিনত। ‘আপনার কাছে ওখানের নাম্বার আছে?’ হতাশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

‘জি, একটা ফোন নাম্বার আছে আমার কাছে।’ কাজের লোক বলল।

‘আমাকে নাম্বারটা দিন, আমি সাবিহার সাথে ফোনে কথা বলব।’

কিছুটা স্বস্তি পায় অন্তত যোগাযোগ করতে পারবে ভেবে। কাজের লোক ওকে ভেতরে নিয়ে আসে। ড্রয়িংরুমে বসিয়ে নাম্বার এনে দেয়। সাবিহাকে কল করে ও। ফোন পেশোয়ারে বাড়ির অন্য কেউ তোলে। বলা হয় সাবিহা বাইরে গেছে। কল কেটে দিলো ও। ‘সাবিহার সাথে কথা বলতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর আবার কল করব।’ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাজের লোককে বলল। ‘ততক্ষণ আমি এখানে থাকব।’

কাজের লোক মাথা নেড়ে চলে যায়। এক ঘন্টা পর আবার সাবিহাকে ফোন করে। সাবিহা ওর কল পেয়ে অবাক। ও সংক্ষেপে বাড়ি ছেড়ে আসার কথা জানায়। সালারের সাথে হওয়া বিয়ের কথা চাপিয়ে যায়। এর ওপর সাবিহার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে, এই চিন্তায়।

'ইমামা! তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোর্টের সাহায্য নাও। মাজহাব পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী প্রোটেকশন চাও।' সাবিহা সব শুনে বলল।

'আমি এটা করতে চাই না।'

'কেন?'

'এই বিষয়ে আগেই ভেবে দেখেছি। তুমি আমার বাবার পজিশন ও পরিচিতি সম্পর্কে জানো। প্রেস ঝড় তুলবে এটা নিয়ে। আমার পরিবারকে অনেক হয়রানি সহ্য করতে হবে। আমি চাই না আমার জন্য তারা বিব্রত হোক। তাদের জীবনে

বিপদ আসুক। তাছাড়া আজ পর্যন্ত যতগুলো মেয়ে ইসলাম কবুল করে কোর্ট প্রোটেকশন নিয়েছে, তাদের লাভ কী হয়েছে? কোর্ট থেকে দার-উল-আমানে পাঠিয়ে দেয়, যা জেলখানায় পাঠানোর সমান। মামলার রায় কবে বা কয়দিনে আসবে, নিশ্চয়তা থাকে না। পরিবারের মানুষ একের পর এক কেস ফাইল করে। এভাবে কত বছর কেটে যায়, তার হিসাব থাকে না। কোর্ট স্বাধীন থাকার অনুমতি দিলেও চারপাশ থেকে এত ঝামেলা আসে যে, অনেক মেয়ে পরিবারের কাছে ফিরতে বাধ্য হয়। আমি দার-উল-আমানে গিয়ে নিজের জীবন ধ্বংস করতে চাই না। কারো নজরেও আসতে চাই না। নীরবে বাড়ি ছেড়েছি এবং এই নীরবতার সাথেই জীবন কাটাতে চাই।

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি ইমামা! কিন্তু সমস্যা তোমার জন্য এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা তোমাকে খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং তাদের জীবনেও ঝামেলা আসবে, যারা তোমাকে আশ্রয় দেবে। তোমাকে খোঁজা শুরু করলে আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে বেশি সময়

লাগবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আমার আব্বু চাইবে সাহায্য গোপনে করার বদলে প্রকাশ্যে করতে। কোর্ট নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে রায় দেবে। এখন আমার বাড়িতেই থাকো, কাজের লোককে বলে দিচ্ছি। আব্বুর সাথে কথা বলব এবং চেষ্টা করব কালকের মধ্যে লাহোর ফিরে আসার।

ইমামা কাজের লোককে ডেকে ফোন দিয়ে দেয়। সাবিহা কাজের লোককে কিছু বলে ফোন রাখে।

'আমি সাবিহা বিবির রুম খুলে দিচ্ছি, আপনি ওখানে চলে যান।' কাজের লোক ওকে বলল।

সাবিহার রুমে আসে ও। ততক্ষণে দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতা বেড়ে গেছে। সাবিহার দৃষ্টিকোণ বুঝতে কষ্ট হয়নি। নিজেও চায় না সাবিহা বা সাবিহার পরিবারের ওর জন্য কোনো বিপদ হোক। এইক্ষেত্রে সাবিহার আতঙ্ক ঠিক। যদি হাশিম মুবীন জানতে পারে সাবিহার পরিবার ওকে আশ্রয় দিয়েছে,

তাহলে তিনি তাদের জন্য জানি দুশমন হয়ে যাবে। এজন্যই হয়তো সাবিহা ওকে আইনের সাহায্য নিতে বলছে। কিন্তু এই রাস্তা ওর জন্য আরও কঠিন। জামায়াতের এত বড় নেতার মেয়ের এভাবে মাজহাব বদলে ফেলা পুরো জামায়াতের মুখে চড় মারার সমান। জানে এতে পুরো জামায়াত এবং পরিবারের মানে কতটা কালি লাগবে এবং তারা এই অসম্মান থেকে বাঁচার জন্য কতদূর যেতে পারে।

যখন সাবিহার রুমে ঢুকছিল, হঠাৎ ওর মাথায় বিদ্যুতের মতো সাইয়িদা মরিয়ম সিবতে আলির খেয়াল আসে, যে সাবিহার বন্ধু এবং ক্লাসফেলো। ওর সাথে কয়েকবার দেখা হয়েছে তার। একবার সাবিহার বাড়িতেই ওর ইসলাম কবুলের ব্যাপারে মরিয়ম জানতে পারে। সাবিহার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র মরিয়মকেই সাবিহা ওর ব্যাপারে বলেছিল এবং মরিয়ম খুব অবাক হয়। 'তোমার যদি কখনো আমার কোনো সাহায্যের দরকার হয় অবশ্যই জানাবো। বরং বিনা দ্বিধায় সরাসরি আমার কাছে চলে আসবো।' মরিয়ম খুব উষ্ণভাবে হাত মিলিয়ে বলেছিল।

পরবর্তীতে সব সাক্ষাতেও মরিয়ম একই আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলেছে। ইমামা জানে না এই মুহূর্তে মরিয়মের চিন্তা কেন মাথায় এলো বা কতটুকু ওকে সাহায্য করতে পারবে। তবুও মরিয়মের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়। মোবাইল দিয়ে ফোন করতে গিয়ে দেখে চার্জ শেষ হয়ে গেছে। মোবাইল চার্জে দিয়ে ডায়রি থেকে মরিয়মের নাম্বার নিয়ে লাউঞ্জে আসে। টেলিফোনে নাম্বার ডায়াল করে। ফোন ড. সিবতে আলি তোলেন।

'মরিয়মের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তার বন্ধু।' নিজের পরিচয় দেয় ও।

'হ্যাঁ, আমি ডেকে দিচ্ছি।' তিনি ফোন হোল্ড রাখতে বললেন।

কয়েক সেকেন্ড পর ইমামা অপরপাশ থেকে মরিয়মের কণ্ঠ শুনতে পায়। 'হ্যালো!'

'মরিয়ম! আমি ইমামা বলছি।'

'ইমামা... ইমামা হাশিম?' মরিয়ম জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন আমার।' নিজের ব্যাপারে বলতে থাকে।

অপরপাশ সম্পূর্ণ নীরব ছিল। কথা শেষ হলে মরিয়ম ওকে জিজ্ঞেস করে। 'তুমি এখন কোথায়?'

'আমি সাবিহার বাড়িতে, কিন্তু তারা নেই। পেশোয়ার গেছে।' সাবিহার সাথে হওয়া কথাবার্তা মরিয়মকে বলল না।

'তুমি ওখানেই থাকো, আমি ড্রাইভার পাঠাচ্ছি। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসো। ততক্ষণে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলছি।' ফোন রাখতে রাখতে বলল মরিয়ম।

এটা নিছক কাকতালীয় বিষয় যে, ড. সিবতে আলির বাড়িতে কথা বলা সালারের মোবাইল থেকে করেনি ও। নাহলে সিকান্দার উসমান ড. সিবতে আলির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেত

কল ট্রেস আউট করে। ওর মাথায় যদি কাজ করত যে, এই মোবাইলের বিল থেকে ওকে ট্রেস আউট করা যেতে পারে, তাহলে লাহোর এসেই তা ব্যবহার করত না। এটা আরেকটা কাকতালীয় ব্যাপার ছিল ড. সিবত অফিসের গাড়ি আর ড্রাইভার পাঠায় ওকে নিতে। কারণ সাবিহার বাড়ির কাজের লোক মরিয়মের গাড়ি আর ড্রাইভারকে চেনে। মরিয়ম প্রায়ই ওখানে আসা-যাওয়া করে। এতে সাবিহা এবং সবাই জেনে যেত, সাবিহার বাড়ি থেকে ও কোথায় গেছে।

আধঘন্টা পর কাজের লোক গাড়ি আসার খবর দেয়। ইমামা ব্যাগ তুলে নেয়।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সাবিহা বিবি তো বলল আপনি এখানে থাকবেন।'

'না, আমি চলে যাচ্ছি। সাবিহার ফোন এলে বলবেন চলে গেছি।' ইচ্ছে করেই জানাল না মরিয়মের বাড়িতে যাচ্ছে।

এই প্রথম মরিয়মের বাড়িতে এসেছে ইমামা। ওর ধারণা ছিল এখানে আসার পর আরেকবার মরিয়ম এবং মরিয়মের বাবা-মাকে নিজের ব্যাপারে সবকিছু বলতে হবে। মানসিকভাবে নিজেকে সেসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত করে নেয়। কিন্তু তেমন কিছু হলো না।

'আমরা নাস্তা করে ফেলেছি। তুমি নাস্তা করে নাও।' মরিয়ম পোর্ট থেকে ওকে ভেতরে নিয়ে এসে বলল।

লাউঞ্জে বাবা ড. সিবতে আলি এবং মা কুলসুমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারা ভীষণ স্নেহের সাথে পরিচিত হলেন ওর সাথে। ইমামার চেহারা এত বিষন্নতা ছিল যে, ড. সিবতে আলির মায়া লাগে।

‘আমি নাস্তা দিচ্ছি। মরিয়ম তুমি ওকে রুম দেখিয়ে দাও।
যাতে কাপড় বদলে ফ্রেশ হতে পারে।’ সিবতে আলির স্ত্রী
মেয়েকে বললেন।

যখন কাপড় বদলে বাইরে এলো, তখন ওর জন্য টেবিলে
খাবার গুছিয়ে রাখা ছিল। ও নীরবে খাওয়া শেষ করে।

‘ইমামা! আপনি এখন গিয়ে ঘুমান। আমি অফিসে যাচ্ছি।
সন্ধ্যায় ফিরে আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলব।’ ড. সিবতে
আলি ওকে নাস্তা শেষ করতে দেখে বললেন। ‘মরিয়ম! ওকে
রুমে নিয়ে যাও।’ লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মরিয়মের সাথে রুমে চলে আসে ও।

‘ইমামা! ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে
ঠিকমতো ঘুম হয়নি গত কিছুদিন। এই পরিস্থিতিতে যদিও
সহজে ঘুম আসে না। আমি ট্যাবলেট এনে দিচ্ছি। ঘুম এসে
পড়লে ভালো, না এলে ট্যাবলেট খেয়ে ফেলবো।’ মরিয়ম

রুম থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এক গ্লাস পানি আর ট্যাবলেট নিয়ে আসে। ওগুলো বেড সাইড টেবিলে রেখে বলল। 'পুরো রিল্যাক্স হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ভাবো নিজের বাড়িতেই আছো।' রুমের লাইট অফ করে রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

সকাল সাড়ে নয়টা বাজে। কিন্তু তখনো বাইরে কুয়াশা। জানালায় পর্দা থাকায় রুমে অন্ধকার গাঢ় মনে হচ্ছিল। ইমামা যন্ত্রের মতো ট্যাবলেট পানি দিয়ে গিলে ফেলো। এ ছাড়া ঘুম আসার প্রশ্নই আসে না। মস্তিষ্কে এত ধরনের ভাবনা কাজ করছিল যে, বিছানায় শুয়ে ঘুমের অপেক্ষা করা অনর্থক। কয়েক মিনিটে তন্দ্রা ওকে ঘিরে ধরে, যার অর্থ ট্যাবলেট কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ইমামা যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন রুম সম্পূর্ণ অন্ধকার। বিছানা ছেড়ে উঠে দেয়ালের কাছে গিয়ে লাইট অন করে। দেয়াল ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা বাজছে। তাৎক্ষণিকভাবে আন্দাজ করতে পারল না, এত দীর্ঘ ঘুম

ট্যাবলেটের প্রভাব নাকি গত কয়েকদিন ঠিকমতো ঘুমাতে না পারার কারণে। যাইহোক, সকালের চেয়ে ভালো বোধ করছিল। ক্ষুধা লাগছে ওর। কিন্তু বাড়ির কেউ এই সময় জেগে আছে কিনা নিশ্চিত না। খুব আন্তে দরজা খুলে লাউঞ্জে বেরিয়ে আসে। ডক্টর সিবতে আলি লাউঞ্জের সোফায় বসে বই পড়ছিলেন। দরজা খোলার শব্দে মাথা তুলে ওকে দেখে হাসলেন।

'ঠিকমতো ঘুম হয়েছে?'

'জি।' হাসতে চেষ্টা করে ও।

'সামনে কিচেন, ওখানে খাবার রাখা। গরম করে টেবিলে বসে খেয়ে নিন। এরপর দুই কাপ চা বানিয়ে এখানে নিয়ে আসুন।'

কিচেনে আসে ও। ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে গরম করে খায়। খাওয়া শেষ হলে চা বানিয়ে লাউঞ্জে নিয়ে আসে। একটা কাপ ডক্টর সিবতে আলির দিকে এগিয়ে দেয়। হাত

থেকে বই টেবিলের উপর রেখে দেন তিনি। অন্য কাপ নিয়ে তার সামনের সোফায় বসে ও। জানত কথা বলবে।

'চা খুব ভালো হয়েছে!' চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন ড. সিবতে আলি।

এত নার্ভাস ছিল যে, তার প্রশংসায় হাসতে বা ধন্যবাদ জানাতে পারেনি ও। শুধু তাকিয়ে ছিল।

'ইমামা! আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সঠিক, এতে দ্বিতীয় কোনো রায় নেই। তবে সিদ্ধান্ত খুব বড়। এত বড় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেক সাহস প্রয়োজন। বিশেষ করে এমন কম বয়সে। তার ওপর কখনো কখনো সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তত সাহসের দরকার হয় না, যতটা সেই সিদ্ধান্তের ওপর কায়েম থাকার জন্য দরকার। সময়ের সাথে আপনি তা টের পেয়ে যাবেন।' তিনি খুব স্থির সুরে বলছিলেন। 'আমি আপনার কাছে জানতে চাই, মাজহাব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত শুধু ধর্মের খাতিরে নাকি অন্য কোনো কারণও রয়েছে?'

ইমামা চমকে তার দিকে তাকায়।

'আমার মনে হয় আরও স্পষ্টভাবে প্রশ্নটা করা উচিত। এমন তো নয় যে, আপনি কোনো ছেলের জন্য বা তার কথায় বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা মাজহাব পরিবর্তন করেছেন? উত্তর দেওয়ার আগে এটা ভাববেন না যে, এমন কোনো কারণ থাকলে আমি খারাপ ভাববো বা আপনাকে সাহায্য করব না। শুধু এইজন্য জিজ্ঞেস করছি, এমন কিছু হলে আমার সেই ছেলে এবং তার পরিবারের সাথেও দেখা করতে হবো।' তিনি ওকে প্রশ্নাতীত দৃষ্টিতে দেখছিলেন।

সেই মুহূর্তে এত দেরি করে মরিয়মের সাথে যোগাযোগ করায় ওর আফসোস হয়। যদি সালারের পরিবর্তে ডক্টর সিবত জালালের সাথে বা তার পরিবারের সাথে কথা বলত, তাহলে হয়তো...! ভারী মন নিয়ে উত্তরে না-তে মাথা নাড়ে ও। 'এমন কিছু না।'

‘আপনি নিশ্চিত তো এমন কিছু না?’ তিনি আবার শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

‘জি, আমি ইসলাম কোনো ছেলের জন্য কবুল করিনি।’
মিথ্যে বলেছি। ও সত্যিই ইসলাম জালালের জন্য কবুল
করিনি।

‘আপনার আন্দাজ আছে, কী পরিমাণ পেরেশানির মুখোমুখি
হতে হবে?’

‘জি, আছে।’

‘আপনার বাবা হাশিম মুবীন সাহেবকে আমি চিনি।
জামায়াতের খুব মাথা গরম নেতা। আপনার মাজহাব
পরিবর্তন এবং এভাবে বাড়ি ছেড়ে আসা তার জন্য অনেক
বড় ধাক্কা। আপনাকে খুঁজে বের করে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে সে
আকাশ-পাতাল এক করে ফেলবে।’

'আমি কোনো মূল্যেই ফিরব না। অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'ঠিক আছে, বাড়ি আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সামনে কী করবেন?'

ইমামার ভয় হলো তিনি কোটে যাওয়ার পরামর্শ দেবেন।
'আমি কোটে যাবনা। কারো সামনেই যেতে চাই না। আপনি অনুমান করতে পারেন, সামনে মাঘহাবের দরুন আমার জন্য আরও কত সমস্যা তৈরি হতে পারে।'

'তাহলে আপনি কী করতে চান?' তিনি মনোযোগ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন। 'সামনে না আসার মানে হচ্ছে আপনি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবেন না।'

'আমি জানি।' চায়ের কাপ রেখে আফসোসের সুরে বলল ও।
'তাছাড়া আমি মেডিকেলের খরচ এফোর্ট করতে পারব না।'

'আর যদি অন্য কোনো মেডিকেল কলেজে বা অন্য কোনো শহরে আপনার মাইগ্রেশন করে দেওয়া হয়, তাহলে?'

'তারা আমাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। তাদের মাথায় প্রথম খেয়াল আসবে, আমি মাইগ্রেশন করার চেষ্টা করব। আর এত অল্প মেডিকেল কলেজের মাঝে আমাকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে না।'

'তাহলে?'

'আমি B.Sc.-এ কোনো কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চাই, কিন্তু অন্য শহরে। লাহোরের সব কলেজে তল্লাশি চালাবে তারা। নামও বদলে ফেলতে চাই। যদি এই দুই কাজে আপনি সাহায্য করতে পারেন, আমি অনেক কৃতজ্ঞ থাকব।'

ড. সিবতে আলি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। 'ইমামা, এখন কিছুদিন আপনার এখানেই থাকা উচিত। দেখতে হবে

আপনার পরিবার আপনার খোঁজে কী কী পদক্ষেপ নেয়।
কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করে দেখা যাক সামনে কী করতে
হবে। আপনি এই বাড়িতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাই দুশ্চিন্তার
প্রয়োজন নেই। কোটে যেতে না চাইলে আমি জোর করছি
না। এটা নিয়েও আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে, কেউ
এসে আপনাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারবে। আপনার
সঙ্গে কেউ কোনো জোর-জরবদন্তি করতে পারবে না।" ওকে
অনেক সান্ত্বনা দেন।

ড. সিবতে আলির চেহারা দেখে না চাইতেও বাবার চেহারা
মনে পড়ে যায় ইমামার। ভারী মন নিয়ে রুমে চলে আসে।

দ্বিতীয় দিন, ড. সিবতে আলি বিকেল পাঁচটার দিকে অফিস
থেকে ফিরলেন।

'সাহেব আপনাকে তার স্টাডি রুমে ডাকছেন।'

ইমামা তখন মরিয়মের সঙ্গে কিচেনে, যখন কাজের লোক খবর দেয়।

'আসো ইমামা! বসো।' স্টাডি রুমে নক করতে দেখে ডক্টর সিবত বললেন।

তিনি টেবিলের ড্রয়ার থেকে কিছু পেপার'স বের করছিলেন। ইমামা একটা চেয়ারে বসে।

‘আমি কিছু খবর নিয়েছি আপনার ব্যাপারে। আপনার পরিবার আপনার খোঁজে কতদূর যাচ্ছে এবং কী করছে।' ড্রয়ার বন্ধ করতে করতে বললেন। ‘এই সালার সিকান্দার কে?’

তার প্রশ্ন ইমামার হৃৎস্পন্দন কয়েক মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দেয়। ডক্টর সিবত চেয়ারে বসে আছেন। চেহারার ফ্যাকাশে রং বলে দেয়, এই নাম ওর জন্য অপরিচিত না। 'সালার! আমাদের... পাশের বাড়িতে... থাকে।' থেমে থেমে বলল। 'আমাকে অনেক সাহায্য করেছে বাড়ি থেকে বের হতে।

ইসলামাবাদ থেকে লাহোর রেখে গেছে।' থেমে গেল। বিয়ের ব্যাপারেও কি বলা উচিত? দোটানায় ছিল ও।

'আপনার বাবা সেই ছেলের বিরুদ্ধে এফআইয়ার করেছে, আপনাকে অপহরণের অভিযোগে।'

ইমামার চেহারার রং আরও ফ্যাকাশে হয়। আন্দাজ ছিল না সালার এত দ্রুত ধরা পড়ে যাবে। এখন ওর বাড়ির লোক নিশ্চয়ই জালালের কাছে পৌঁছে যাবে। আর সেই বিয়ে? এরপর কি তারা এখানে এসে পড়বে? 'ধরা পড়ে গেছে সালার?' জিজ্ঞেস করল।

'না। যদিও ট্রেস আউট করে ফেলা হয়েছে সেই রাতে এক মেয়েকে নিয়ে লাহোর এসেছিল ও। কিন্তু ছেলেটা জোর দিয়ে বলে সেটা আপনি ছিলেন না, অন্য মেয়ে ছিল। ওর কোনো গার্লফ্রেন্ড। প্রমাণও দিয়েছে।' ডক্টর সিবত ইচ্ছে করেই লুকিয়ে যান মেয়েটা পতিতা ছিল। 'পুলিশ ওর বাবার কারণে ওকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ওর প্রমাণ দেওয়ার

পরও আপনার পরিবারের দাবি আপনার নিখোঁজের পেছনে
ওর হাত। ইমামা! এই সালার সিকান্দার কেমন ছেলে?"
কথার ফাঁকে ডক্টর সিবত জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব খারাপ।' ইমামার মুখ থেকে বের হয়। 'অনেক বেশি
খারাপ।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন ছেলেটা আপনার অনেক সাহায্য
করেছে, তাহলে?'

'সাহায্য করেছে, তবে চরিত্রের দিক থেকে ভালো না। আমি
একবার ওকে ফাস্ট এইড দিয়েছিলাম বলে হয়তো সাহায্য
করেছে, আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আমার ভাই ওর বন্ধু,
সেজন্যও সাহায্য করতে পারে। নাহলে এর বাইরে ছেলে
হিসেবে খুব বাজে। মানসিকভাবে অসুস্থ। না-জানি কেমন
অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। অদ্ভুত আচরণ করে!' ওর মস্তিষ্কে
তখন সালারের সঙ্গে করা ভ্রমণযাত্রার স্মৃতি টাটকা। যেখানে
পুরো রাস্তা বিরক্তির শিকার ছিল।

ডক্টর সিবত মাথা নাড়েন। 'পুলিশ আপনার বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সাবিহাদের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। সাবিহার পরিবার পেশোয়ার থেকে চলে এসেছে। কিন্তু মরিয়ম বলেনি আপনি আমাদের এখানে। আপনি সাবিহার সাথে যোগাযোগ করবেন না, কলও না। পুলিশ ওদের বাড়ি আন্ডার অবজারভেশন রাখবে। কল চেক করা হবে। বরং এখন আপনি কোনো বন্ধুর সাথেই কন্টাক্ট করবেন না। এখান থেকে বের হবেন না।' তিনি ওকে নির্দেশ দিলেন।

"আমার কাছে একটা মোবাইল আছে। সেটা দিয়েও না?"

তিনি চমকে ওঠেন। 'আপনার মোবাইল?'

'না, সেই সালারের।'

'তারা যেহেতু সালার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তবে মোবাইল পর্যন্তও পৌঁছে যাবো।' তিনি কথা বলতে বলতে থেমে যান। 'যেই কল আপনি আমাদের বাড়িতে করেছিলেন, সেটাও কি

ওই মোবাইল থেকে করেছিলেন?' এবার তার কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ ছিল।

'না, ওটা সাবিহাদের বাড়ির ফোন থেকে করেছিলাম।'

'এখন থেকে ওই মোবাইল দিয়ে কল করবেন না। এলেও রিসিভ করবেন না।' কিছুটা নিশ্চিত হয়ে বললেন তিনি।

পরের কিছুদিন ডক্টর সিবতের কাছে ইমামা নিজের খোঁজ নেওয়ার ব্যাপারে আরও কিছু খবর পায়। তার তথ্যের উৎস যাইহোক, তা বেশ নির্ভরযোগ্য ছিল। ওকে সব জায়গায় খোঁজা হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ, হাসপিটাল, ক্লাসফেলো, হোস্টেল, রুমমেট, ফ্রেন্ড সবখানে। হাশিম মুবীন ওকে খুঁজতে নিউজপেপারের আশ্রয় নেয়নি। মিডিয়ার সাহায্য নেওয়ার ফলাফল তার জন্য অপমানজনক। যত পারছিলেন মেয়ের এমন নিখোঁজ হওয়া গোপন রাখছিলেন। কিন্তু পুলিশের সাহায্য নেন। তার জামায়াতও এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করছিল। তারা সাবিহার পর্যন্ত পৌঁছালেও

জানতে পারেনি ইমামা সাবিহার বাড়িতে গিয়েছিল। এটা সাবিহার তখন পেশোয়ার থাকার ফলাফল, যখন ইমামা বাড়ি ছেড়ে আসে। নাহলে সাবিহা এবং সাবিহার পরিবারকেও ঝামেলার মুখোমুখি হতে হতো। মরিয়ম সাবিহাকে জানায়নি ইমামা তাদের বাড়িতে। বরং এমন উপস্থাপন করেছিল ইমামার এমন নিখোঁজ হওয়া বাকি স্টুডেন্টের মতো তার জন্যও আশ্চর্যের।

কয়েক সপ্তাহ যাওয়ার পর ইমামা যখন নিশ্চিত হয় ড. সিবতে আলির কাছে নিরাপদ ও, কেউ ওর কাছে পৌঁছাতে পারবে না; তখন সালারকে ফোন করে বিয়ের পেপার'স নিতে। কিন্তু যখন শোনে সালার তালাকের হুক দেয়নি, নিজেও তালাক দিতে চায় না, তখন পায়ের নিচের মাটি সরে যায়। ড. সিবতে আলির বাড়িতে যাওয়ার পর সেই প্রথম মোবাইল ব্যবহার করেছিল, তাও কাউকে না জানিয়ে। আর সালারের সাথে কথা বলে নিজের বোকামির সীমা বুঝতে

পারে। সালারের মতো মানুষের ওপর এত ভরসা করা উচিত হয়নি। পেপার'স দেখতে কতটুকু সময় লাগত যে, এভাবে না দেখেই সহ করে দিলো? একটা কপি কেন তখনই নিলো না? অন্তত যখন বাড়ি থেকে চলে আসছিল। বুঝতে পারে সালার নামক মানুষটা কত বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর আগামী জন্ম। সবকিছু নিয়ে আফসোস হয়। যদি আন্দাজ থাকত ড. সিবতে আলির মতো মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, তাহলে বিয়ের মতো বোকামি করতই না। আর সালারের মতো মানুষকে তো মোটেই না।

যদি শুরুতে ওর ভরসা থাকত ড. সিবতে আলি যেকোনো পরিস্থিতিতে ওকে সাহায্য করবে, তাহলে বিয়ের কথা লুকাত না। তিনি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বের করতেন। কিন্তু এখন বড় দাবি আর আশ্বাস সাথে তাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, কোনো ছেলের সাথে জড়ানো না ও। তাহলে এই বিয়ে স্বীকার করা...? তাও সেই ছেলের সাথে, যার সব খারাপ দিকের কথা তাকে বলেছে। তিনিও জানেন সেই ছেলের ব্যাপারে ওর বাবা-মা অপহরণের

মামলা দিয়েছে। এখন এই সত্য বলার চেষ্টা করলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? অন্তত এই মুহূর্তে একমাত্র ঠিকানা হারানোর জন্য প্রস্তুত না ও।

পরের কয়েকদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব মরে যায় ওর। ভবিষ্যৎ একদম অন্ধকার হয়ে আসে। আর সালার সিকান্দার... সেই মানুষটার প্রতি এত ঘৃণা লাগে যে, সামনে পেলে গুলি করত। অদ্ভুত-অদ্ভুত ভয়, অজানা আশঙ্কা ওকে ঘিরে রাখে। আগে শুধু পরিবারের ভয় ছিল। এখন সেই ভয়ের সাথে সালার নামক ভয় যোগ হয়। 'যদি সালার আমাকে খুঁজতে শুরু করে?' এসব ভাবতে ভাবতে ওর অবস্থা নাজুক হতে থাকে। ওজন কমতে শুরু করে। আগেও চুপচাপই থাকত, কিন্তু এরপর থেকে ওর চুপ থাকা আরও বেড়ে যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপের ভেতর দিয়ে যেতে থাকে। ওর এই অবস্থা ড. সিবতে আলি এবং তার পরিবারের কাছে গোপন ছিল না। তারা সবাই এক এক করে আকস্মিক এই পরিবর্তনের কারণ জানার চেষ্টা করে। কিন্তু সবাইকে বুঝা দিয়ে রাখে ও।

'তুমি আগেও চিন্তিত থাকতে তবে গত দুই-এক সপ্তাহ ধরে খুব চিন্তিত লাগছে। কিছু হয়েছে ইমামা?' সবার আগে মরিয়ম এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে।

'না, কোনো সমস্যা নেই। আমি বাড়ি মিস করি।' ইমামা নিশ্চিত করার চেষ্টা করল।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। হঠাৎ এত মিস করছ যে, খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছ? মুখ হলুদ হয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি জমেছে। ওজন কমছে। তুমি কি অসুস্থ হতে চাও?'

মরিয়মের বলা কথা উড়িয়ে দিতে পারল না ও। কারণ বাইরের অবস্থা দেখে যে-কেউ ওর ভেতরের মানসিক অবস্থা অনুমান করে ফেলতে পারবে। আর হয়তো এটাও যে দুশ্চিন্তা কোনো নতুন সমস্যার কারণে। কিন্তু এ বিষয়ে অসহায় ও। সালারের সঙ্গে বিয়ে এবং আসন্ন ভয় মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

'পরিবারের কথা এখন আরও বেশি মনে পড়ছে। যত দিন যাচ্ছে, তত বেশি মনে পড়ছে।' ইমামা মধ্যম আওয়াজে বলল। এটা মিথ্যে না। সত্যিই পরিবারকে এখন ওর বেশি মনে পড়ে। আগে কখনো এতদিন তাদের কাছ থেকে দূরে থাকেনি। তাও এভাবে কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়া একদমই না। হোস্টেলে থাকাকালীন মাসে একবার করে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ যেত। এক-দুইবার ওয়াসিম বা হাশিম মুবীন দেখা করতে আসত। ফোনে তো প্রায়ই কথা হতো। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছিল সমুদ্রের কোনো এক নির্জন দ্বীপে এসে পড়েছে। যেখানের দূর-দূরান্তে কেউ নেই। সেই মুখগুলো ও যাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত, এখন তা স্বপ্ন আর কল্পনা ছাড়া কোথাও দেখতে পায় না। মরিয়ম ওর উত্তরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রসঙ্গ বদলে ফেলো। হয়তো ওর মস্তিষ্কে অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টায়।

ড. সিবতে আলির তিন মেয়ে। মরিয়ম তার তৃতীয় মেয়ে। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মরিয়ম মেডিকেল পড়ছিল এখন। ডক্টর সিবত ইমামাকে তার বড় দুই মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন। তারা দুজন অন্য শহরে থাকত। তাই যোগাযোগ ফোনেই বেশি হয়। তবে এটা কাকতালীয় বলা চলে, ইমামা ওখানে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা দুজন এক-এক করে কয়েকদিনের জন্য বাবার বাড়িতে এসেছিল। ইমামার সঙ্গে তাদের আচরণ মরিয়মের চেয়ে আলাদা ছিল না। তাদের আচরণেও ভালোবাসা আর স্নেহ ছিল। তাদের দেখলে সবসময় নিজের বড় বোনদের কথা মনে পড়ে যেত ওর। এরপর একে-একে সব মনে পড়ে যেত... নিজের বাড়ি, বাবা, বড় ভাই, ওয়াসিম, সাদ। সাদের সঙ্গে ওর রক্তের সম্পর্ক ছিল না। ওদের জামায়াতের প্রভাবশালী পরিবার নিজেদের সন্তান থাকার পরও অসহায় এতিম বাচ্চাদের মধ্যে একটা করে বাচ্চা দত্তক নিত। ভবিষ্যতে জামায়াতের অনুসারী বাড়ানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। এসব বাচ্চা সাধারণ মুসলিম পরিবারের এবং সবসময় ছেলে হতো। সেই ধারাবাহিকতায় সাদও খুব অল্প

বয়সে ওদের বাড়ি আসে। তখন স্কুলের শেষ বছরে ইমামা।
বাড়িতে ঘটা এই নতুন ঘটনা ওকে অবাক করেছিল।

'আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার জন্য আমরা সাদকে
দত্তক নিয়েছি। যাতে অন্যদের সাহায্য করতে পারি এবং
নেকির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।' ইমামার মা ওকে
বলেছিলেন। 'তুমি ভেবে নাও এটা তোমার ছোট ভাই।'

তখন বাবা-মাকে নিয়ে ওর অনেক গর্ব হয়েছিল। কত বড়
মনের মানুষ তারা, একটা অসহায় বাচ্চাকে সুন্দর জীবন
দেওয়ার জন্য নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। নিজেদের
নাম দিচ্ছে। আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ভাগাভাগি করছে।
তখন খেয়াল করেনি এমন এক ছেলে ওর বড় চাচা আজমের
বাড়িতেও কেন? এমন এক ছেলে ওর ছোট চাচার বাড়িতেও
কেন? ওর অন্যান্য আত্মীয়ের বাড়িতেও-বা কেন? ওর জন্য
এটা যথেষ্ট ছিল যে, তারা ভালো কাজ করছে। ওদের
জামায়াত ভালো কাজে উৎসাহ দিচ্ছে। অনেক পরে
জেনেছে এই ভালো কাজের সত্যতা আসলে কী।

সাদ ওর সাথে লেগে থাকত। বেশি সময় কাটাত। প্রথম কয়েক বছর ইমামার রুমে, এক বিছানাই ঘুমিয়েছিল। ইসলাম কবুল করার পর মেডিকেল কলেজ থেকে ইসলামাবাদ এলে সাদকে হজরত মুহাম্মাদ সা.-র ব্যাপারে বলত ও। কিন্তু সাদ এত ছোট ছিল যে, ওকে যৌক্তিকভাবে বোঝানোর উপায় ছিল না। তাই ইমামা শুধু একটা কথাই বলত, 'আল্লাহ যেমন এক; তেমনই আমাদের শেষ নবীও একজন। তাঁর মতো অন্য কেউ হতে পারে না।' সাদকে সতর্ক করে দিত ওদের এই কথাবার্তা অন্য কাউকে না বলতে। কিন্তু ইমামা জানত ওর এই চেষ্টা বৃথা। কারণ সাদকে ছোট থেকেই জামায়াতের সমাবেশে নিয়ে যাওয়া হতো এবং বাচ্চাটা তাতে প্রভাবিত হচ্ছিল। আগে ভাবত মেডিকেলে পড়াশোনা শেষ করে সাদকে নিয়ে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। জানত এই কাজ কঠিন। বাড়ি থেকে পালানোর সময় সাদকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসার কথা ভেবেছিল, কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। সাদকে আনতে গিয়ে নিজে ধরা পড়ে যেত। তাই রেখে আসে। কিন্তু এখন ডক্টর সিবতে আলির কাছে আসার পর সাদকে বারবার মনে

পড়ে। যদি কোনোভাবে নিয়ে আসতে পারত, তাহলে সাদও সেই চোরাবালি থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু সমস্ত ভাবনা-চিন্তার পরও পরিবারের প্রতি ওর ভালোবাসা কমেনি। জালালের প্রতিও অনুভূতি আগের মতোই ছিল। তাদের কারো কথা মনে পড়লে সারা রাত কেঁদে কাটায়।

প্রথমদিকে আলাদা রুমে থাকত ও। তাই শুরুর দিকে কেউ এ ব্যাপারে জানতে পারেনি। কিন্তু একরাতে হঠাৎ মরিয়ম কিছু বই নিতে ওই রুমে আসে। ভাবেনি রাতের এই প্রহরে ইমামা জেগে আছে, তাই ডাক দেয়নি। কিন্তু ইমামা শুধু জেগেছিল না, বরং কাঁদছিল। রুমের লাইট অফ করে বিছানায় কম্বলে মুড়িয়ে। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে মুখ কম্বল দিয়ে ঢেকে নেয়। জানে না মরিয়ম কীভাবে ওর জেগে থাকা টের পেয়ে যায়।

'ইমামা! জেগে আছো?' মরিয়ম ডাক দেয়।

ইমামা নড়ে না। তবুও মরিয়ম কাছে এসে কন্মল সরিয়ে ফেলে। 'আমার আল্লাহ! তুমি কাঁদছ, তাও এই সময়ে?' বিছানায় ওর পাশে দৃশ্চিন্তা নিয়ে বসল। ইমামার চোখ বাজেভাবে ফুলে আছে, চেহারা কান্নায় ভেজা। কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় আফসোস ছিল ধরা পড়ে যাওয়া।

'এজন্য রাতে তোমার ঘুম আসে না, কারণ তুমি কাঁদতে থাকো। সকালে বলো রাতে ঘুমাতে একটু সমস্যা হয়েছে, তাই চোখ ফোলা। ব্যস, আজ থেকে তুমি আর এখানে ঘুমাবে না। চলো আমার রুমে।' মরিয়ম ওকে বিছানা থেকে টেনে তোলে। ইমামা কিছু বলতে পারল না। ভীষণ লজ্জায় পড়ে যায়। এরপর থেকে মরিয়মের রুমেই ঘুমাত। রাতভর কাঁদার সেই ধারাবাহিকতা শেষ হলেও ঘুমের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ঘুম খুব দেরি করে চোখে ধরা দিত। মরিয়ম না থাকলে তার রুমের মেডিকেলের বইয়ের দিকে তাকিয়ে ওর মন বিষাদে ভরে উঠত। সবকিছু অনেক পেছনে রয়ে গেছে। সকালে মরিয়ম আর ডক্টর সিবত চলে গেলে সারা দিন আন্টির সঙ্গে কাটাত ও বা তার আশেপাশেই থাকার চেষ্টা

করত। তিনিও ওকে একা থাকতে দিতেন না। কিন্তু তার সাথে থেকেও -জানি কোন কোন চিন্তায় ডুবে থাকত ও। সালারের সঙ্গে আর যোগাযোগের চেষ্টা করেনি। জানত এতে কোনো ফায়দা নেই। বরং যোগাযোগের ফলাফল নিজের মানসিক যন্ত্রণা বাড়ানো ছাড়া কিছু আসবে না।

ড. সিবতে আলির বাড়িতে আসার তিন মাস হয়ে যায় ইমামার। এক রাতে তিনি ওকে ডেকে পাঠান।

‘আপনার বাড়ি ছাড়ার কিছুদিন পেরিয়ে গেলেও আপনার পরিবার এখনো খোঁজ বন্ধ করেনি। তবে কয়েক মাস আগের গতি কমে এসেছে। তাই আমি জানতে চাই, এখন আপনি পরবর্তীতে কী করতে চান?’

‘আপনাকে বলেছিলাম আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাই।’

তিনি ওর কথায় কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। ‘ইমামা! বিয়ে নিয়ে কিছু ভেবেছেন?’

ইমামা তার কাছে এই প্রশ্ন আশা করেনি। 'বিয়ে? মানে...?'
ও তোতলায়।

'আপনি যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এমন অবস্থায় সবচেয়ে ভালো পথ হলো, বিয়ে করে নেওয়া। ভালো একটা পরিবারে বিয়ে হয়ে গেলে এখন যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, তা আর থাকবে না। আমি কিছু ভালো ছেলে এবং ফ্যামিলিকে চিনি, আমি চাই তাদের কাউকে আপনি বিয়ে করুন।'

ও ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে ছিল। এখানে আসার আগে নিজের জন্য এই পথই বেছে নিয়েছিল। এই সমাধানের কথা ভেবে সালারকে বিয়ে করার বোকামি করেছে। তখন যদি বিয়ে না করত, তাহলে এখন বিনা দ্বিধায় ড. সিবতে আলির কথা মেনে নিত। জানে এই পরিস্থিতিতে একটা ভালো পরিবারে বিয়ে ওকে কত এবং কী পরিমাণ ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পারবে। আজ পর্যন্ত কখনো স্বনির্ভর জীবন কাটায়নি ও। সবকিছুর জন্য পরিবারের ওপর নির্ভর ছিল। এটা

ভাবতেও ভয় পায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে হবে। তার ওপর সালারের সঙ্গে বিয়ে ওর গলার এমন কাঁটা ছিল, যা ফেলতেও পারছিল না; গিলতেও পারছিল না। 'না, আমি বিয়ে করতে চাই না।'

'কেন?'

উত্তর ছিল, কিন্তু বলার সাহস না। এটা জানলে হয়তো ড. সিবতে আলি ওকে মিথ্যুক ভাববে। যে এতদিন ধোঁকা দিয়ে তার বাড়িতে থাকছে। নাহলে ভাববে সালারকে বিয়ে করার জন্যই বাড়ি ছেড়েছে ও। বাকি সব মিথ্যে। যদি সত্য জানার পর তিনি সাহায্য করতে অস্বীকার জানায় বা বাড়িতে ফিরে যেতে বলে? ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, তখন? তিন মাস ধরে তার কাছে আছে। তিনি কত ভালো জানে। কিন্তু ও এত ভীত আর সতর্ক ছিল যে, কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না।

'আমি লেখাপড়া শেষ করতে চাই, যাতে কারো বোঝা না হই। কারো ওপরই না। বিয়ের পর যদি আমাকে কোনো ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়, তখন আমি কী করব? তখন লেখাপড়া করাও সম্ভব হবে না।' অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলল ও।

'ইমামা! আমি সবমসয় আপনার সাহায্যের জন্য আছি। বিয়ে হওয়া মানে এই না, আমার বাড়ি থেকে আপনার সম্পর্ক শেষ অথবা আমি আপনার দায় থেকে রেহাই চাইছি। আপনি আমার জন্য আমার চতুর্থ মেয়ে।'

ইমামার চোখে পানি চলে আসে।

'আমি আপনাকে চাপ দিচ্ছি না। যা আপনি চাইবেন, সেটাই হবে। এটা শুধু আমার পরামর্শ ছিল।' ড. সিবতে আলি বললেন।

'কয়েক বছর যেতে দিন, এরপর বিয়ে করে নেব। যেখানে আপনি বলবেন।' ইমামা বলল। 'কিন্তু এখনই না।' আগে আমাকে সালার সিকান্দারের কাছ থেকে মুক্ত হতে হবে, তালাক নেওয়ার কোনো পথ খুঁজতে হবে। তার সাথে কথা বলতে বলতে ভাবে ও।

'কোন শহরে পড়তে চান আপনি?' ডক্টর সিবত আর চাপ দিলেন না। 'যেকোনো শহরে, আমার কোনো পছন্দ নেই।' ও বলে।

ইমামা বাড়ি থেকে আসার সময় নিজের সব ডকুমেন্ট, কাছে থাকা গয়না এবং কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল। সেদিনের কথোপকথনের কয়েকদিন পর ডক্টর সিবতে আলি ডেকে মূলতানে অ্যাডমিশনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ডকুমেন্ট চায়। ব্যাগ নিয়ে তার কাছে আসে ও। ডকুমেন্টের একটা খাম বের করে তাকে দেয়। এরপর গয়নার আরেকটা খাম বের করে টেবিলের উপর রাখে।

‘আমি এই গয়নাগুলো বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। খুব বেশি না, তবে এগুলো বিক্রি করে কিছুদিন সহজে লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারব।’

‘গয়না বিক্রির প্রয়োজন নেই। এগুলো আপনার বিয়েতে কাজে আসবে। যতদূর লেখাপড়ার খরচের কথা রইল, তাহলে আপনার জানা উচিত আপনি এখন আমার দায়িত্ব। এই বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।’ তিনি কথা বলতে বলতে চমকে গেলেন। তার চোখ টেবিলের উপর রাখা খোলা ব্যাগের দিকে। ইমামা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে। ব্যাগে থাকা ছোট পিস্তলের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ও কিছুটা লজ্জা পেয়ে ওটা বের করে টেবিলের উপর রাখে।

‘এটা আমার পিস্তল। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। আপনাকে বলেছিলাম সালারের সাহায্য নিতে হয়েছে আর ও ভালো ছেলে না।’

ড. সিবতে আলি পিস্তলটা তুলে দেখতে লাগলেন। 'চালাতে পারেন আপনি?'

ইমামা করুণ হাসি দিয়ে হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়ে। 'কলেজে এনসিসি ট্রেনিং হয়েছিল একবার। আমার ভাই ওয়াসিম রাইফেল শুটিং ক্লাবে যেত, আমাকেও মাঝেমধ্যে নিত। বাবার কাছে জেদ ধরে কিনিয়ে ছিলাম। এটা গোল্ড প্লেটেড।'

'আপনার কাছে এর লাইসেন্স আছে?'

'আছে, তবে সঙ্গে নিয়ে আসিনি।'

'তাহলে এটা এখানে থাকুক, মূলতান নেওয়ার দরকার নেই। গয়না লকারে রাখিয়ে দিচ্ছি।'

ইমামা মাথা নেড়ে সাই জানায়।

কয়েক মাস পর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইমামাকে মুলতান যেতে হয়। এক শহর থেকে দ্বিতীয় শহর, দ্বিতীয় শহর থেকে তৃতীয় শহর। এমন এক শহর, যেখানের ব্যাপারে কখনো কল্পনায়ও ভাবেনি। কিন্তু কল্পনায় তো আরও অনেক কিছুই ভাবেনি। কখনো কি ভেবেছিল বিশ বছর বয়সে আবার বি.এসসিতে ভর্তি হবে? যেই বয়সে মেয়েরা বি.এসসি শেষ করে ফেলো। কখনো কি ভেবেছিল স্নেচ্ছায় মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেবে? কখনো কি ভেবেছিল বাবা-মায়ের এত আঘাত ও লজ্জার কারণ হবে? কখনো কি ভেবেছিল আসজাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে ভালোবাসবে? তাকে বিয়ের জন্য পাগলের মতো চেষ্টা করবে? কখনো কি ভেবেছিল সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার ফলে সালার সিকান্দারের মতো ছেলেকে স্নেচ্ছায় বিয়ে করবে? কখনো কি এটাই-বা ভাবতে পেরেছিল যে, নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে ড. সিবতে আলির পরিবারের মতো একটা পরিবার পাবে?

বাইরের জগতে চলাফেরায় অভ্যস্ত ছিল না ও। বাইরের জগতে চলতেও হয়নি ওকে। নিজের বাড়ি থেকে বের

হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে নিজের নিরাপত্তা চেয়েছিল।
দোয়া করেছিল যেন পথে-পথে ঘুরতে না হয়। ও এত বোল্ড
ছিল না যে, পুরুষদের সাথে টেক্কা দিয়ে সবখানে চলবে-
ফিরবে। ভয় পেত যখন ছোট ছোট কাজে নিজের ঘুরতে
হবে, সব ধরনের পুরুষ এবং মানুষের মাঝে কীভাবে তা
করবে? তাও এমন অবস্থায়, যখন পেছনে ফ্যামিলি
ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে কিছু থাকবে না।

ফ্যামিলির ছায়াতলে লাহোর এসে মেডিকেল কলেজে পড়া
এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বাহিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা অন্য কথা
ছিল। তখন ওর জন্য আর্থিক সমস্যা ছিল না। হাশিম মুবীনের
এত সম্পদ ও প্রভাব ছিল যে, শুধু তার নামই ওর সাথে
কারো আচরণকে সতর্ক এবং নমনীয় করে তোলার জন্য
যথেষ্ট ছিল।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় যে পরিস্থিতির মুখোমুখি
হওয়ার ভয় পেয়েছিল, সেসবের মুখোমুখি হতে হয়নি ওর।
প্রথমে সালার নিরাপদে লাহোর রেখে যায়। এরপর ড.

সিঁবতে আলির কাছে আশ্রয়। নিজের ছোট-বড় কোনো কাজের জন্যই ঝুঁকি পোহাতে হয়নি। ডকুমেন্টে নাম পরিবর্তন, মূলতানে অ্যাডমিশন, হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা, লেখাপড়ার খরচের দায়িত্ব। সমস্ত নেয়ামতের জন্য আল্লাহর যত শুকরিয়া আদায় করুক, তা কম হয়ে যায়। অন্তত প্রতিকূল কোনো পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেতে হয়নি।

ইমামা মুলতান চলে আসে। এটা ওর জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ছিল। একটা কঠিন ও কষ্টের অধ্যায়। হোস্টেলে থাকত, যা এক অদ্ভুত জীবন। কখনো কখনো ইসলামাবাদে নিজের বাড়ি আর পরিবারের কথা এত মনে পড়ত যে, ওর ইচ্ছে করত ছুটে চলে যেতে। মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই কাঁদত। ইচ্ছে করত জালালের সঙ্গে যোগাযোগ করার। বি.এসসি করছিল। ওর সাথে সেসব মেয়েরা পড়ছিল, যারা এফ.এসসিতে মেরিট লিষ্টে আসতে পারেনি। বি.এসসি করার পর আবারও মেডিকেল কলেজে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

মেডিকেল কলেজ, ডাক্তার হওয়া... অনেকদিন যাবৎ এই শব্দ দুটো ওর হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। অবাক হয়ে হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে থাকত। কী লেখা আছে তাতে, যা সবকিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে? প্রায়ই জাভেরিয়ার সঙ্গে বলা পুরনো কথা মনে পড়ে যেত। 'আমি ডাক্তার হতে না পারলে বাঁচতে পারব না। মরে যাব।' অবাক হয়, ও মরেনি। বেঁচে আছে... তবে এভাবে। 'পাকিস্তানের সবচেয়ে বিখ্যাত আই স্পেশালিষ্ট।' সবকিছু একটা স্বপ্ন রয়ে গেছে। যা কাছে ছিল, সব দূরে চলে গেছে। ওর কাছে বাড়ি নেই। ওর কাছে পরিবার নেই। ওর কাছে আসজাদ নেই। মেডিকেলের লেখাপড়া নেই। জালালও ছিল না। জীবনের সব আরাম থেকে এক ঝটকায় ছিটকে পড়েছে। তারপরও বেঁচে আছে। কখনো ভাবেনি এই পরিমাণ সাহসী হতে পারবে, কিন্তু হয়ে গেছে। সময় যাওয়ার সাথে সাথে ওর ব্যথা কমতে থাকে। ওর মাঝে সবার আসে। আল্লাহর পরে পৃথিবীতে একমাত্র হয়তো ড. সিবতে আলি ছিল, যার জন্য ধীরে ধীরে নিজেকে সামলাতে শুরু করে ও।

মাসের এক উইকেন্ডে লাহোর আসত। ড. সিবতে আলি ওকে হোষ্টেলে ফোন করত। কিছু, না-কিছু ওর জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তার স্ত্রী এবং মেয়েরাও অনেক খেয়াল রাখত। তাদের কাছে পরিবারের একজন সদস্য হয়ে উঠেছিল ও। 'যদি এই মানুষগুলো না থাকত, তাহলে আমার কী হতো?' বহুবার শুধু এই একটা কথাই ভাবত।

মুলতান থাকাকালীনও সালারকে মাথা থেকে বের করতে পারেনি ইমামা। লেখাপড়া ধারাবাহিকভাবে শুরু করার পর আরেকবার সালারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল। এরপরও যদি সালার তালুক দিতে না চায়, তাহলে পুরো বিষয়টা ড. সিবতে আলিকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বি.এসসি পরীক্ষা শেষ করে লাহোর ফেরার আগে ফোন করে। সালারের দেওয়া ফোন আগেই ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছিল। দুই বছর পর সালার এখনো সেই পুরনো নাম্বার ব্যবহার করে, নাকি ওকে ফোন দেওয়ার পর যে নতুন নাম্বার নিয়েছিল, সেটা ব্যবহার করে জানে না। তাই পিসিও থেকে আগে সালারের নতুন নাম্বার ডায়াল করল। নাম্বার বন্ধ। এরপর

ওর কাছে থাকা মোবাইলের নাম্বার ডায়াল করে, সেটাও অব্যবহৃত। এর অর্থ দাঁড়ায়, সালার নতুন নাম্বার নিয়েছে। যে নাম্বার ওর কাছে নেই। তাই শেষে বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করে। কিছুক্ষণ রিং বাজার পর ফোন হয়।

'হ্যালো!' একজন মহিলা অন্যপাশ থেকে বলল।

'হ্যালো! আমি সালার সিকান্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' ও বলে।

'সালার সাহেবের সাথে? আপনি কে বলছেন?'

ইমামা টের পায় মহিলার কণ্ঠে কৌতূহল। কণ্ঠটাও কিছুটা পরিচিত। ও কিছু বলার আগেই মহিলা ভীষণ জোশ নিয়ে বলল। 'ইমামা বিবি! আপনি ইমামা বিবি না?' কারেন্ট খেয়ে ফোন রেখে দেয় ও। 'উনি কে? যে শুধু কণ্ঠ শুনেই চিনে ফেলেছে ওকে, এত বছর পর, এত দ্রুত? তা-ও সালারের বাড়িতে?' কিছুক্ষণ ওর হাত কাঁপে। পিসিওর ভেতরে

রিসিভার হাতে থম মেরে বসে রইল। 'যাইহোক, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি ইসলামাবাদ থেকে এত দূর যে, কেউ আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।' পিসিওর মালিককে আবার কল করতে বলে। এবার প্রথম রিংয়েই কল তোলা হয়। কিন্তু এবার কথা বলছিল একজন পুরুষ। ওটা সালার না, গলা শুনে বোঝে ও। 'আমি সালার সিকান্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আপনি ইমামা হাশিম?' লোকটা কর্কশ কণ্ঠে বলল।

এবার ইমামা চমকায় না। 'জি।'

অন্যপাশে নীরবতা নেমে আসে।

'আপনি তার সঙ্গে আমাকে কথা বলিয়ে দিন।'

'এটা সম্ভব না।' অন্যপাশ থেকে বলা হয়।

'কেন?'

'সালার বেঁচে নেই।'

'কী...? ও মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে?'

'আপনার সঙ্গে তার শেষ কথা কবে হয়েছে?' লোকটা উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কয়েক বছর আগে। প্রায় আড়াই বছর আগে।'

‘এক বছর আগে ও মারা গেছে। আপনি...’

ইমামা আর কিছু শোনার আগে ফোন রেখে দেয়। কিছু বলা বা শোনার দরকার নেই। ও মুক্ত হয়ে গেছে। জানে একজন মানুষ হিসেবে কারো মারা যাওয়ার খবরে আফসোস করা উচিত, কিন্তু ওর আফসোস হচ্ছিল না। যদি সালার ওকে তখন ওভাবে তালাক দিতে অস্বীকার না করত, তাহলে অবশ্যই এই খবরে কষ্ট পেত ও। কিন্তু এই মুহূর্তে, আড়াই বছর পর... অবশেষে হালকা আর স্বস্তি অনুভব করে। ওর মাথার ওপর ঝুলতে থাকা তলোয়ার সরে গেছে। ড. সিবতে আলিকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতা হয়ে গেছে। হোস্টেলে ওর শেষ দিন ছিল ওটা। সেই রাতে নামাজ পড়ে সালারের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে। মারা যাওয়ার কারণে সবকিছু মাফ করে দেয়। সেইসাথে নিজের জন্য আনন্দিত ছিল।

ইমামার সঙ্গে যে কথা বলেছে, সে সালারের বাড়ির কাজের মহিলা। ইমামার কণ্ঠ শুনেই চিনে ফেলেছিল। ইমামা ফোন কেটে দেওয়ার পর নাসেরা অস্থির হয়ে সিকান্দার উসমানের

কাছে আসে। এটা কাকতালীয় যে, সেইদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি বাড়িতেই ছিলেন।

'কিছুক্ষণ আগে একটা মেয়ে ফোন করেছে, সালার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।'

'কথা বলিয়ে দিতো।' সিকান্দার উসমান উদাসীন ভঙ্গিতে বললেন।

এটা আরেকটা কাকতালীয় বিষয় সালারও তখন পাকিস্তানে, নিজের বাড়িতেই ছিল। কাজের মহিলা কিছুটা কুণ্ঠাবোধ করে।

'সাহেব জি! ওটা ইমামা বিবি।'

সিকান্দার উসমানের হাত থেকে চায়ের কাপ পড়তে পড়তে বাঁচে। স্তব্ধ হয়ে বলে ওঠেন। 'ইমামা হাশিম? হাশিমের মেয়ে?'

কাজের মহিলা মাথা নাড়ে।

সিকান্দার উসমানের মাথা ঘুরতে লাগল। সালার সবাইকে বোকা বানাচ্ছে? এখনো ইমামার সাথে যোগাযোগে আছে, জানে মেয়েটা কোথায়? তাহলে নিশ্চয়ই দেখাও করে? তিনি ভাবলেন। 'ও তোমাকে নাম বলেছে?' চায়ের কাপ একপাশে রেখে বললেন।

'না. আমি কণ্ঠ চিনে ফেলেছি। যখন নাম বলেছি, তখন ফোন রেখে দিয়েছে।' কাজের মহিলা বলল। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস ওটা তার কণ্ঠ, আমার ভুল হচ্ছে না।'

আর কিছু বলার আগে ফোন আবার বেজে উঠল। এবার সিকান্দার উসমান ড্রয়িংরুমের ফোন এক্সটেনশনের দিকে এগিয়ে রিসিভার তোলেন। অপরপাশে থাকা মেয়েটা আবারও সালারের কথা জিজ্ঞেস করছে। তার জিজ্ঞাসায় স্বীকার করে নেয়, ও ইমামা হাশিম। জানেন না কিন্তু কেন তার মনে হলো সালার মরে গেছে বলে দিতে। যাতে ইমামা

আর কখনো ফোন না করে। কথা বলতে গিয়ে বুঝে যায় অনেকদিন ধরে সালারের সাথে ইমামার যোগাযোগ নেই। সুতরাং এ কথার সত্যতা প্রমাণের কোনো উপায় নেই। এই যোগাযোগ আর কখনো বহাল না হলে তাদের প্রাণ বেঁচে যাবে। তিনি এখনো সেই বছরটা মাথা থেকে বের করতে পারেননি, যখন ইমামার নিখোঁজ হওয়ার পরপর হাশিম মুবীন সালারকে সন্দেহ করে তার জন্য সব ধরনের ঝামেলা দাঁড় করিয়েছিল। অনেক সরকারি অফিসে আগে যেখানে তার ফাইল খুব সহজে বের হয়ে যেত, তা মাসের পর মাস আটকে যায়। তার কাছে, বাড়িতে, হুমকির কল আর চিঠি আসে। হাশিম মুবীনের মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে অনেকেই তাকে পরোক্ষভাবে চাপ দেয়। একটা লম্বা সময় নজরদারিতে রাখা হয় সালারকে। এই প্রক্রিয়া শুধু পাকিস্তানে না, বাইরেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু কোনোভাবে ওদের যোগাযোগের প্রমাণ বা আলামত না পাওয়ার কারণে ধীরে ধীরে এই উত্তাপ কমে আসে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও হাশিম মুবীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক হয়নি। তবে নিরাপত্তাহীনতার ভয় কেটে যায়।

আড়াই বছর পর ইমামা এখন আবার সালারের সঙ্গে যোগযোগ করতে চাইছে। তিনি কোনোভাবে সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি না নিজে হতে চান, না ছেলেকে করতে চান। তিনিও হাশিম মুবীনের টক্করের মানুষ না হলে এতদিনে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেত। বিশেষ করে বিগত এক বছরে, বিশেষ করে শুরুর কয়েক মাসে। ইমামাকে তালাকনামার একটা কপিও পাঠাতে চেয়েছিলেন, যা সালারের হয়ে তৈরি করে রেখেছিলেন। এটা জায়েজ কিনা, তার মাথাব্যথা ছিল না। শুধু ইমামাকে এটুকু বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, সালার বা সালারের পরিবারের সঙ্গে কখনো ওর কোনো সম্পর্ক হওয়া সম্ভব না, হবেও না। কিছু থেকে থাকলেও তা সালারের মরে যাওয়া এবং তৈরি করে রাখা তালাকনামার সাথেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা আরেকটা অদ্ভুত বিষয় ছিল ইমামা তার পুরো কথা না শুনেই কল কেটে দিয়েছিল। ফোন ট্রেস আউট করলে জানা প্রায় তা মূলতানের এক পিসিওর। সালার এক সপ্তাহ পর আমেরিকা ফিরে যাবে। সেই এক সপ্তাহ তিনি ওর উপর কড়া নজর রাখেন। বাড়ির সব কাজের লোককে বলে রাখে, যেকোনো ধরনের ফোন আসুক: কোনোভাবে

সালারকে যাতে না দেওয়া হয়। ফোন পুরুষের হোক বা নারীর। যতক্ষণ অব্দি তিনি নিশ্চিত না হন, ফোন কে করেছে। নাসেরাকে শক্তভাবে না করে দেয় ইমামার কলের ব্যাপারে সালারকে জানাতে। এক সপ্তাহ পর সালার আমেরিকায় চলে গেলে স্বস্তির শ্বাস ফেলে। মাথার ওপর আসা বিপদ আবার কেটে গেছে।

সালার চলে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর তার কাছে একটা খাম আসে। ইমামা লাহোর পৌঁছানোর পর সালারের দেওয়া মোবাইল বিক্রি করে দেয়। ওটা ফেরত পাঠানো সম্ভব না। সালার মারা যাওয়ায় এমন কোনো সম্ভবনাও বাকি থাকেনি কখনো সামনাসামনি দেখা হলে ফিরিয়ে দেবে। মোবাইল বিক্রির টাকার সঙ্গে নিজের কিছু টাকা যোগ করে। সেই পরিমাণ টাকা, যা আড়াই-তিন বছর আগে সালার মোবাইল বিল দিয়েছিল ওর। আরও কিছু খরচ, যা বাড়িতে বন্দি থাকা অবস্থায় এবং লাহোর আসা পর্যন্ত সালার ওর পেছনে খরচ করেছিল। সিকান্দার উসমানের নামে একটা সংক্ষিপ্ত নোট এবং ট্রাভেলস চেক পাঠিয়ে দেয়। ওর মাথা থেকে ঋণের

বোঝা হালকা হয়ে যায়। টাকা আর সাথে থাকা নোট পেয়ে সিকান্দার উসমানও নিশ্চিত হয়ে যায়, ইমামা আর যোগযোগ করবে না এবং তার কথা সত্যিই বিশ্বাস করেছে।

মূলতান থেকে বি.এসসি করার পর লাহোর চলে আসে ইমামা। বাড়ি ছাড়ার তিন বছর পেরিয়ে গেছে। ওর ধারণা ছিল এখন আর ওকে তেমনভাবে খোঁজা হবে না, যেমন শুরুর দিকে হয়েছিল। এখন খুঁজলেও শুধু মেডিকেল কলেজের ওপর নজর রাখা হবে। ওর আন্দাজ সঠিক প্রমাণিত হয়। তাই পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রিতে এমএসসির জন্য অ্যাডমিশন নেয়। এত সময় কেটে যাওয়ার পরও ভীষণ সতর্ক থাকত। এটা লাহোর, এখানে যেকোনো সময় যেকোনো ওকে চিনে ফেলতে পারে। মূলতানে শুধু চাদর জড়িয়ে কলেজে গেলেও লাহোর এসে নেকাব পরা শুরু করে দেয়।

লাহোর ফিরে ইমামা ড. সিবতে আলির পরিবর্তে সাঈদা আম্মার সঙ্গে থাকতে শুরু করে। মূলতান যাওয়ার আগে ড. সিবত আলি সাঈদা আম্মার সঙ্গে ওকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আম্মার অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকাকালীন যেকোনো প্রয়োজন বা জরুরি পরিস্থিতিতে ইমামা তাদের সাহায্য নিতে পারে।

সাঈদা আম্মা পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর বয়সী অনেক কথা বলা একজন অ্যাক্টিভ মহিলা। লাহোরে একটা পুরনো বাড়িতে একা থাকেন। তার স্বামী মারা গেছে। দুই ছেলে পড়াশোনা শেষ করে বাহিরেই সেটেন্ড হয়েছে। দু'জনই বিবাহিত। তাদের বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আম্মা দেশের বাহিরে যেতে রাজি না। ছেলেরা প্রতিবছর কিছু সময় পাকিস্তান ছুটি কাটানোর জন্য আসে। ড. সিবতে আলি তার নিকটাত্মীয়, চাচাতো ভাই হয়।

ড. সিবতে আলি আগেই সাঈদা আম্মাকে ইমামার ব্যাপারে জানিয়ে রেখেছিলেন। তাই যখন ড. সিবতে আলির সঙ্গে

তার বাড়িতে যায় ও, আন্মা খুব উষ্ণতা নিয়ে পরিচিত হন।
মুলতানে থাকা তার সব আত্মীয়স্বজনের বিবরণ ওর মাথায়
টুকিয়ে দেন। তবুও সেসব যথেষ্ট মনে না করে নিজে গিয়ে
হোস্টেল ছেড়ে আসার প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু ড. সিবতে আলি
বিনয়ের সাথে মানা করে দেয়।

'না আপা! আপনার কষ্ট হবে।' তার বহু পীড়াপীড়ির পরও
মানেনি ড. সিবতে আলি।

'ভালো হতো যদি ওকে আমার ভাইদের কারো বাড়িতে
রাখতেন। বাচ্চাটা বাড়ির মতো আরাম আর পরিবেশে
থাকত।' হঠাৎ করে হোস্টেল নিয়ে তার আপত্তি জাগে।
হোস্টেল জীবনের বুট-ঝামেলার কথা বলতে শুরু করে।
কিন্তু ড. সিবতে আলি বা ও কারো বাড়িতে থাকার পক্ষে
ছিল না। হোস্টেলই ভালো অপশন।

সাইদা আন্মার সঙ্গে ইমামার পরবর্তী সাক্ষাৎ হয় মুলতান
যাওয়ার কয়েক মাস পর। একদিন হঠাৎ করে খবর আসে

একজন মহিলা ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ও। এখানে, এভাবে হট করে কে দেখা করতে আসবে, তাও একজন মহিলা? সাঈদা আম্মাকে দেখে আরও অবাক হয়। তিনি ওর সাথে আগের মতো উষ্ণতা নিয়েই দেখা করেন, যেভাবে লাহোর করেছিলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ মুলতান থাকলেন। এই দুই সপ্তাহ দফায় দফায় দেখা করতে আসেন। একবার হোস্টেল থেকে তার ভাইয়ের বাড়িও নিয়ে যায় ওকে। তারপর থেকে এটা রুটিনে পরিণত হয়। ওর সঙ্গে দেখার করার জন্য তিনি কয়েক মাস পরপর মুলতান আসতেন। ইমামাও যখন লাহোর যেত, তখন তার সাথে দেখা করত। ছুটি লম্বা হলে তার বাড়িতে রাখার জন্যও পীড়াপীড়ি করতেন। যার ফলে কয়েকবার তার বাড়িতে থাকা হয়।

লাল ইটের তৈরি পুরনো বাড়িটা ওর ভালো লাগতে থাকে। অথবা হতে পারে একাকিত্বের অনুভূতি তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পেরেছিল। তিনিও একা ছিলেন। যদিও তার একাকিত্ব মানুষের সাথে মেলামেশার কারণে কম ছিল।

তারপরও তার অনুভূতি বুঝতে পারত ও। লাহোর শিফট হওয়ার আগে যখন জানতে পারে এমএসসি লাহোর থেকে করবে, তখন ওকে নিজের সঙ্গে রাখতে জোরাজুরি শুরু করে দেন। সেই সময় ড. সিবতে আলির বড় মেয়েও বাচ্চাসহ কিছুদিনের জন্য থাকতে আসে। তার স্বামী পিএইচডির জন্য বাইরে যাচ্ছিল। বড় মেয়ের জামাই ড. সিবতে আলির ভাতিজা ছিল। তাই যাওয়ার আগে স্ত্রী-সন্তানকে এই বাড়িতে রেখে যায়।

ড. সিবতে আলির বাড়িতে জায়গার কমতি ছিল না। কিন্তু ইমামা সেই বাড়িতে আর থাকতে চাইছিল না। যত দ্রুত সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল। তার অনুগ্রহের বোঝা আগে থেকেই ভারী হয়ে আছে। বাকি পড়াশোনাটা তার কাছে থেকে শেষ করতে চায়নি। কারণ এতে চাকরির পরেও তিনি কোথাও যেতে দিবেন না ওকে। কিন্তু এর আগেই আলাদা থাকার ইচ্ছে জানালে মানানো সহজ হবে। সাঙ্গিদা আন্নার বাড়িটা থাকার জন্য ওর কাছে উপযুক্ত মনে হয়।

চাকরি হয়ে গেলে তাকে জোর করে হলেও কিছু দিতে পারবে। ড. সিবতে আলির ক্ষেত্রে যা কখনো সম্ভব না।

ইমামার সিদ্ধান্ত ড. সিবতে আলির জন্য ধাক্কা ছিল। 'কেন আমনা? আমার বাড়িতে কেন থাকবেন না?' তিনি নারাজ হয়ে জিজ্ঞেস করেন। 'সান্দা আপার সঙ্গে কেন থাকতে চাইছেন?'

'তিনি খুব জোরাজুরি করছেন।'

'আমি তাকে বুঝিয়ে বলব।'

'আমি নিজেও তার সঙ্গে থাকতে চাই। তার একাকিত্ব দূর হবে।'

'এটা কোনো কারণ না। আপনি তার কাছে যেতে পারেন, কিন্তু থাকার জন্য না।'

'প্লিজ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি ওখানে বেশি ভালো থাকব। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই ধীরে ধীরে।'

ড. সিবতে আলি অবাক হয়ে তাকালেন। 'নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানে?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল ও। 'আমি সারা জীবনের জন্য আপনার বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। অনেক বছর ধরে নির্ভর হয়ে বসে আছি। কিন্তু সারা জীবন তো এভাবে কাটানো যায় না।' থেমে যায়। বুঝল শেষ বাক্য ড. সিবতে আলিকে আঘাত করেছে। অনুতপ্ত হয়।

'আমি কখনো আপনাকে বোঝা ভাবিনি আমনা! কখনো না। মেয়েরা বাবার জন্য বোঝা হয় না। আপনি আমার কাছে মেয়ের মতো। তাহলে এই কথা... আমি কষ্ট পেলাম।'

'জানি আব্বু! কিন্তু নিজের অনুভূতির কথা বলছি। অন্যের উপর নির্ভর থাকা অনেক কষ্টের বিষয়। সাঙ্গদা আমাদের সঙ্গে

থাকলে আমি মানসিকভাবে নিশ্চিত হব। তাকে টাকা দেবো। আপনাকে দিতে চাওয়া... অসম্ভব! আমি যদি আরও দশ জীবন পাই, তবুও আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু এখন আর না। জীবন যাপনের পথ শিখতে হবে, আমাকে শিখতে দিন।"

ড. সিবতে আলি এরপর আর ওকে নিজের বাড়িতে থাকতে জোর করেননি। ইমামা তার এই আচরণেও কৃতজ্ঞ ছিল। সাঈদা আম্মার সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতা হোস্টেল বা ড. সিবতে আলির কাছে থাকার বিপরীত ছিল। তার কাছে থাকতে এসে আলাদা খুশি ও স্বাধীনতা অনুভব করে। আম্মা একা থাকতেন। শুধু একজন কাজের মহিলা ছিল, যে দিনের বেলায় কাজ করে সন্ধ্যায় চলে যেত। আম্মা বেশ সোশ্যাল লাইফ কাটাতে। মহল্লায় তার আনাগোনা প্রচুর। শুধু মহল্লা না, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে থাকেন।

মহল্লায় শুরুতে ইমামাকে ভাইঝি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কয়েক বছরে সেই পরিচয় মেয়েতে পরিণত হয়। পুরনো মানুষরা আগের পরিচয় জানলেও নতুনরা ওকে তার মেয়েই জানত। তার ছেলেরাও ইমামার সাথে পরিচিত ছিল। সাঈদা আম্মার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় ওর খোঁজখবর নিত। তাদের স্ত্রী এবং বাচ্চারাও কথা বলত। আম্মার ছেলেরা প্রতিবছর পাকিস্তান এলে তাদের থাকাকালীনও কখনো অনুভব করেনি, এই পরিবারের অংশ না ও। মঝেমধ্যে ওর সত্যিই মনে হতো, সাঈদা আম্মার মেয়ে এবং তার ছেলেদের বোন ও। তাদের দু'জনের বাচ্চারা ওকে ফুপু ডাকত।

পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসসি শেষ করার পর ড. সিবতে আলির মাধ্যমে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে। চাকরি দুর্দান্ত ছিল এবং প্রথমবার আর্থিকভাবে নিজেকে স্বাধীন করতে পারে। এটা তেমন জীবন ছিল না, যা বাবা-মায়ের বাড়িতে কাটিয়ে এসেছে বা তেমন জীবনও না, যার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু

তেমনটাও ছিল না, যেমনটা ভেবে বাড়ি ছাড়ার সময় ভয়ে কাবু ছিল। অন্য কারো ব্যাপারে বলা যায় কিনা জানে না, তবে ওর জীবন মোজেশার অপর নাম ছিল। সালার সিকান্দারের মতো ছেলের সাহায্য পাওয়া... ড. সিবতে আলির কাছে পৌঁছানো... সাঈদা আম্মার পরিবার... পড়াশোনা শেষ করতে পারা... এখন আবার চাকরি। শুধু জালাল আনসারের অভাব কষ্ট দিত। যদি তাকে পেয়ে যেত, তাহলে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ মনে করত।

আট বছরে ওর মাঝে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ই জানত পৃথিবীতে এখন আর ওর আহ্লাদ ওঠানোর কেউ নেই। কারো কাছ থেকে কোনো আশা রাখা যাবে না, যাতে সেই আশা পূরণ না হলে কষ্ট পেতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটিও কমে আসে। বিশ বছর বয়সে ছোট-ছোট বিষয়ে ভয় পাওয়া, চিন্তা করা ইমামা হাশিম ধীরে ধীরে নিজের পুরনো সত্তা হারিয়ে ফেলে। সদ্য আবির্ভূত ইমামা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও শক্তিশালী স্নায়ুর অধিকারী এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক স্বভাবের ছিল।

সবকিছুর ক্ষেত্রে, নিজের কথাবার্তার থেকে চলাফেরা। ড. সিবতে আলি এবং সাঈদা আম্মার পরিবার ওকে অনেক ভালোবাসা এবং ছাড় দিয়েছিল। তবুও ও সবসময় চেষ্টা করত এমন কোনো কাজ বা আচরণ না করার, যাতে তাদের আপত্তি থাকতে পারে বা অপছন্দ করতে পারে। বাবার বাড়িতে ওকে এমনভাবে চলতে হয়নি। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এই সব শিখতে হয়েছিল।

সাঈদা আম্মা নিখোঁজ হওয়ার সময় ও অফিসে ছিল। বিকেল চারটার দিকে বাড়ি ফিরে দরজায় তালা দেখে। একটা চাবি ওর কাছেও ছিল। কারণ সাঈদা আম্মা এভাবে এখানে-সেখানে চলে যায়। তাই দুশ্চিন্তা করেনি। কিন্তু যখন মাগরিবের আজান দেয়, তখন চিন্তায় পড়ে। কারণ তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথাও থাকেন না। পাশের বাসায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, তাদের ছেলে আম্মাকে সকালবেলা বেলালদের বাড়িতে রেখে এসেছিল। আম্মা ওখানে আসা-যাওয়া করতেন। ও তাদেরকে চেনে। ওখানে ফোন করে জানতে পারে, আম্মা দুপুরবেলাই সেখান থেকে চলে গেছে।

সত্যিই দুশ্চিন্তায় পড়ে। পালাক্রমে সেসব জায়গায় খোঁজ নেয়, যেখানে তিনি যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু কোথাও ছিল না। সবশেষে ড. সিবতে আলিকে জানায়। ততক্ষণে ওর অবস্থা খারাপ। সাঈদা আম্মার চলাফেরা নিজের মহল্লা পর্যন্তই। শহর তার জন্য অপরিচিত। কোথাও যাওয়ার হলে পাশের বাসার ছেলে বা ইমামার সঙ্গে যেত। এটা ভেবেই চিন্তা করছিল।

অন্যদিকে সালার অভ্যন্তরীণ শহর বাদে পুরো লাহোর চিনত। অভ্যন্তরীণ শহর সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকলেও সাঈদা আম্মার জোড়াতালি দেওয়া ঠিকানা ছাড়াই কোনো না কোনোভাবে বাড়ি পৌঁছে দিত তাকে। ড. সিবতে আলি রাতে তার একজন পরিচিতর কাছে সাঈদা আম্মা আছে বলে খবর জানায়। ওর শরীরে প্রাণ ফেরে। আরও এক ঘন্টা যাওয়ার পর দরজার কলিংবেল বেজে উঠল। প্রায় দৌঁড়ে দরজা খোলে ও। দরজার ফাঁক দিয়ে আম্মার পেছনে একজন সুদর্শন পুরুষ দাঁড়ানো দেখল। যে দরজা খোলার শব্দে সালাম জানিয়ে খোদা হাফেজ বলে অপর সেই লম্বা

মানুষটার সাথে হাঁটতে থাকে, যে অন্যদিকে ঘোরা।
মনোযোগ দিলো না ও। একলাফে সাঈদা আম্মাকে পেয়ে
জড়িয়ে ধরল।

সাঈদা আম্মা পরবর্তী কয়েকদিন সেই দুইজনের নাম জপতে
থাকে, সালার আর ফুরকান। কিন্তু ওর মনে হয়নি এই সালার
সেই সালার হতে পারে। মৃত মানুষ ফিরে আসে না। মারা
যাওয়ার কথা ছাড়াও সালার সিকান্দারের মতো মানুষ ড.
সিবতে আলির পরিচিত বা সেসব গুণের অধিকারী হতে পারে
না, যার স্মৃতিচারণ সাঈদা আম্মা সময়ে-অসময়ে করে।
কিছুদিন পর যে ব্যক্তিকে সেইদিন আম্মার সঙ্গে সিঁড়িতে
দেখেছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়। ফুরকান তার স্ত্রীকে নিয়ে
ওখানে আসে। ইমামার তাদেরকে পছন্দ হয়। এরপর আরও
কয়েকবার এসেছিল। তাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় বাড়তে
থাকে।

ইমামার চাকরির দুই বছর গেছে। জীবন হয়তো এভাবেই কেটে যেত। যদি সেদিন এক রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হসপিটালের বোর্ডে জালালের নাম লেখা না দেখত। জালাল আনসারের নাম ওর পা খামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিছুক্ষণ নামটার দিকে তাকিয়ে থেকে সিদ্ধান্ত নেয়, এই রাস্তা দিয়ে আর কখনো আসবে না। জালাল বিবাহিত। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সালারের কাছে জেনেছিল। তার জীবনে ফেরা যাবে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বেশিদিন স্থায়ী হলো না।

দুই সপ্তাহ পর ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অফিসে রাবেয়ার সঙ্গে দেখা রাবেয়াকে নিজের সামনে দেখে বুঝতে পারল না, কেমন প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়ে যায় ওর। রাবেয়া কোনো কাজে এসেছিল। কয়েক মহূর্তের জন্য রাবেয়া এই জটিলতা সহজ করে দেয়। খুব উষ্ণভাবে জড়িয়ে ধরে। ‘হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলে? কলেজ আর হোস্টেলে অনেকদিন পর্যন্ত ঝড় বয়ে গেছে।’ রাবেয়া ওকে ছেড়ে বলল।

ইমামা হাসতে চেষ্টা করল। 'ব্যস, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি। কেন গেছি কারণ তোমার জানা।' ও সংক্ষেপে বলল।

'হ্যাঁ, আন্দাজ তো ছিল। কিন্তু আমি কারো সাথে কিছু বলিনি। আমাদেরও কিছু অসুবিধা হয়। আমার, জাভেরিয়া, জয়নব সবার। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আমরা তো নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কিছু জানতাম না। কলেজ আর হোস্টেলে তোমাকে নিয়ে অনেক কথা ছড়িয়ে পড়ে।' রাবেয়া ওর সামনে চেয়ার টেনে বসে ক্রমাগত বলতে থাকে। 'তুমি একাই গেছ?' কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' ইমামা চায়ের জন্য ইন্টারকমের সুইচ চাপল।

'কিন্তু কোথায় ছিলে?'

'কোথাও না, লাহোরই ছিলাম। নিজের কথা বলো। তুমি, জাভেরিয়া কী করছ? বাকি সবাই?' ইমামা প্রসঙ্গ বদলাতে বলল।



'আমি প্র্যাকটিস করছি লাহোরে। জাভেরিয়া ইসলামাবাদে আছে। বিয়ে হয়েছে এক ডাক্তারের সঙ্গে। আমারও বিয়ে হয়ে গেছে ফারুকের সঙ্গে। তোমার তো মনে থাকার কথা, ক্লাসফেলো ছিল।'

ইমামা হাসল। 'আর জয়নব?' ওর হৃদয় অনিয়ন্ত্রিতভাবে স্পন্দিত হয়।

'জয়নব ইংল্যান্ডে, স্বামীর সঙ্গে রেসিডেন্সি করছে। ওর ভাইয়ের হসপিটালে ফারুক প্র্যাকটিস করে।'

'জালাল আনসারের হসপিটালে?' ইমামা নিজেকে আটকাতে পারল না জিজ্ঞেস করা থেকে।

'হ্যাঁ। কয়েক বছর আগে স্পেশালাইজেশন করে ফিরেছে দেশে। কিন্তু বেচারার সঙ্গে বড় ট্র্যাজেডি হয়েছে। কয়েক মাস আগে তালাক হলো। যদিও ভালো মানুষ, তারপরও...'

ইমামা চোখ সরাতে পারল না রাবেয়ার ওপর থেকে।
'তালাক! কেন?'

'জানি না। ফারুক জিজ্ঞেস করেছিল, বলেছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং
হচ্ছিল না। স্ত্রী-ও খুব ভালো ছিল, সে-ও ডাক্তার। কিন্তু জানি
না কেন এই তালাক। আমাদের ভালো আসা-যাওয়া ছিল
তাদের বাড়িতে। কখনো টের পাইনি দুজনের মাঝে সমস্যা।
তিন বছরের একটা ছেলেও আছে। এখন জালালের সাথেই
থাকে। স্ত্রী আবার আমেরিকায় চলে গেছে।' রাবেয়া এক শ্বাসে
প্রায় সব বলে ফেলল। 'তুমি নিজের কথা তো বললে না?
নিজের ব্যাপারে বলো। এটা বুঝে গেছি এখানে চাকরি করছ।
কিন্তু পড়াশোনা কি শেষ করেছিলে?'

'এমএসসি করেছি ক্যামেস্ট্রিতে।

'বিয়েশাদি?'

'এখনো না।'

'বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া শেষ হয়েছে?'

'না।' ইমামা মৃদু কণ্ঠে বলল।

রাবেয়া আরও কিছুক্ষণ বসে চলে যায়। ইমামা বাকিটা সময় অফিসে ডিষ্টার্ব থাকে। জালাল আনসারকে কখনো ভুলতে পারেনি ও। ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শুধু জীবন থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন বুঝল যে, এটাও ভুল বা নিজের সাথে ছলনা ছাড়া কিছু না। জালাল আনসারকে জীবন থেকেও আলাদা করতে পারেনি। শুধু তার জীবনে প্রবেশ করে কষ্ট দিতে বা তার বিবাহিত জীবন নষ্ট করতে চায়নি। কিন্তু তার বিবাহিত জীবন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, আবার সে একা; এটা জানার পর মনে পড়ে যায় আট বছর আগে কীভাবে এই লোকটাকে পাওয়ার জন্য বাচ্চাদের মতো সংগ্রাম করেছিল। তখন তাকে পায়নি। কারণ অনেক দেয়াল, অনেক বাধা ছিল। যা টপকাতে পারেনি ও, জালালও সামনে বাড়ায়নি। কিন্তু এখন অনেক সময় পেরিয়ে গেছে।

সেসব বাধার কিছুই ওদের মাঝে নেই। ওর এতে কিছু যায়-
আসে না জালাল আগে বিয়ে করেছে বা একটা ছেলে আছে।

'আমার তার কাছে যাওয়া উচিত। হয়তো সে এখনো
আমাকে ভাবে। হতে পারে এখন নিজের ভুল উপলব্ধি
করছে।' ভাবে ও। শেষবার ফোনে কথা বলার সময় জালাল
যা বলেছিল, সব ক্ষমা করে দেয়। 'জালালের জায়গায় যে-ই
থাকত, সে একই কথা বলত। একটা মেয়ের জন্য কেউ এত
ঝুঁকি কেন দেবে? তার ওপর জালালের ক্যারিয়ার, যা সে
গড়তে চেয়েছে। তার বাবা-মায়েরও স্বপ্ন ছিল, যা ভাঙতে
পারেনি। 'আমার মতো সে-ও বাধ্য ছিল।' অনেক বছর আগে
বলা কথার সেই প্রতিধ্বনি ওকে নতুন সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে
পারল না। 'আমার তার কাছে যাওয়া উচিত। হতে পারে এই
সুযোগ আল্লাহ দিচ্ছে। হতে পারে আমার দোয়া এখন কবুল
হয়েছে। হতে পারে এখন আমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ
এসেছে।' ও বারবার ভাবছিল। 'নাহলে হঠাৎ রাবেয়া কেন
আমার সামনে আসবে? আমি কেন জানব সে তার স্ত্রীর কাছ
থেকে আলাদা হয়ে গেছে? হয়তো এখন আমি তার সামনে

গেলে...' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে জালালের মুখোমুখি আবার হওয়ার।

'আমি ডা. জালাল আনসারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' ইমামা রিসেপশনিস্টকে বলল।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আপনার কাছে?' রিসেপশনিষ্ট জিজ্ঞেস করল। 'না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।'

'তাহলে দেখা করা সম্ভব না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কোনো পেশেন্ট দেখা হয় না।' রিসেপশনিষ্ট প্রফেশনাল ভঙ্গিতে বলল।

'আমি পেশেন্ট না, তার ফ্রেন্ড।' কাউন্টারে হাত রেখে ইমামা মৃদু কণ্ঠে বলল।

'ডা. সাহেব জানেন আপনি এই সময় তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন?'

'না।' কিছুক্ষন চুপ থাকার পর ইমামা বলল।

'দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞেস করে দেখছি।' রিসেপশনিষ্ট রিসিভার তুলল। 'আপনার নাম?'

ইমামা রিসেপশনিষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আপনার নাম কী?' আবার জিজ্ঞেস করে রিসেপশনিষ্ট।

'ইমামা হাশিম।' জানে না কত বছর পর নিজের নাম নিচ্ছিল ও।

'স্যার। একজন মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বলছে আপনার ফ্রেন্ড, ইমামা হাশিম নাম।' রিসেপশনিষ্ট কথা শেষ করে বলল। 'আপনি ভেতরে চলে যান।' মুচকি হেসে রিসিভার রাখল সে।

ইমামা মাথা নেড়ে দরজা খুলে ভেতরে চলে আসে। জালাল আনসারের কেবিন থেকে একজন রোগী বের হচ্ছিল। জালাল টেবিলের পেছনে দাঁড়ানো। তার চোখে বিস্ময়। নিজের হৃদয়ের স্পন্দনের শব্দ বাইরে থেকে শুনতে পায় ইমামা। আট বছর কয় মাস পর তাকে দেখছে তা মনে করার চেষ্টা করে, কিন্তু মনে পড়ল না।

'ইমামা! What a pleasant surprise!' জালাল এগিয়ে এসে বলল। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কেমন আছো?'

'আমি ঠিক আছি, আপনি?' ইমামা তার ওপর থেকে চোখ সরায় না। বিগত আট বছর ধরে এই চেহারা, এই কণ্ঠ ওর সাথেই ছিল।

'আমিও একদম ঠিক আছি, বসো।' টেবিলের সামনের চেয়ারের দিকে ইশারা করে জালাল। অপরপাশে থাকা চেয়ারে নিজে গিয়ে বসে।

সবসময়ই জানত জালালকে দেখলে হৃদয় এমন বেকাবু হয়ে যাবে। কিন্তু এত সুখ নিজের শিরায় শিরায় অনুভব করবে, তা কল্পনা করেনি।

'কী নেবে? চা, কফি, সফট ড্রিংক'স?' জালাল বলল।

'আপনার ইচ্ছে।'

'ওকে, কফি আনাচ্ছি। তুমি পছন্দ করতো।'

জালাল ইন্টারকম তুলে কফি পাঠাতে বলে। ইমামা তাকে দেখছিল। তার মুখে এখন দাড়ি নেই। হেয়ার স্টাইলও বদলে গেছে। ওজন আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে।

'এখন কী করছ?' ইন্টারকম রেখে জালাল জিজ্ঞেস করল।

'একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি করছি।'

'এমবিবিএস তো ছেড়ে দিয়েছিলে, তারপর?'

'এম.এসসি করেছি ক্যামিস্ট্রিতে।'

'চাকরি কোন কোম্পানিতে?'

ইমামা নাম বলল।

‘ওটা তো খুব ভালো কোম্পানি।’ জালাল কিছুক্ষণ সেই কোম্পানির প্রশংসা করে। ইমামা চুপচাপ তাকে দেখছিল।
'আমি স্পেশালাইজেশন করে এসেছি।' নিজের ব্যাপারে বলতে শুরু করে এবার।

ইমামা একদৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল। কিছু মানুষকে শুধু দেখতে পাওয়াই নিজের জন্য কত যথেষ্ট হয়! মনে মনে ভাবে ও।

'এক বছর হয়ে গেছে এই হসপিটাল শুরু করার। খুব ভালো প্র্যাকটিস চলছে আমার।' জালাল বলছিল। কফি চলে আসে এর মাঝে। 'তুমি আমার ঠিকানা কীভাবে জানলে?' কফির কাপ তুলে নেয় সে।

'হসপিটালের বোর্ডে আপনার নাম দেখেছিলাম। তারপর রাবেয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আপনি চেনেন হয়তো, জয়নব তো চিনত।'

'রাবেয়া ফারুকের কথা বলছ? খুব ভালো করে চিনি। তার স্বামী ডা. ফারুক আমার সঙ্গে কাজ করে।' কফিতে চুমুক দিয়ে বলে জালাল।

'হ্যাঁ, ও বলল আপনার কথা। তারপর আমি এখানে চলে এলাম।'

ইমামা কফিতে চুমুক দেয়নি। কফি খুব গরম। খুব গরম কিছু খাওয়ার অভ্যাস নেই ওর। কোনো একসময় টেবিলের

অন্যপাশে থাকা লোকটাকে আইডিয়ালাইজ করেছিল। ওর বিশ্বাস ছিল এই মানুষটার মাঝে সেইসব গুণ রয়েছে, যা একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষের মাঝে থাকা উচিত। প্রতিটা সেই গুণ, যা নিজের স্বামীর মাঝে দেখার ইচ্ছে ওর। মাঝে সাড়ে আট বছর কেটে গেছে। কিন্তু ওর বিশ্বাস জালাল আনসার এখনো একই আছে। মুখ থেকে দাড়ি সরে যাওয়ার মানে এটা হতে পারে না, সে এখন আর হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে ভালোবাসে না। হাসপিটালের সাফ্যলের গল্প শোনাচ্ছে জালাল ওকে। তা শুনছিল ও। এই কণ্ঠস্বর একসময় ওর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তকে সহজ করে দিয়েছিল। জালালের সফলতা আর খ্যাতির গল্প শুনে খুশি হয়। আট বছর আগে এইসব অর্জনের জন্য ওকে ছেড়েছিল লোকটা। খুশি ও। আজ সবকিছু তার হাতের মুঠোয়। অন্তত আজ ওর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া জালালের জন্য দুষ্কর না।

'বিয়ে করে ফেলেছ?' জালাল জিজ্ঞেস করে।

'না।' ইমামা মৃদু কণ্ঠে বলল।

'তাহলে কোথায় থাকো? বাবা-মায়ের কাছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'একা থাকি। বাবা-মায়ের কাছে কীভাবে যাব?' ইমামা মধ্যম আওয়াজে বলল। 'আপনি বিয়ে করে ফেলেছেন?'

জালাল কফিতে চুমুক দেয়। 'হ্যাঁ, বিয়ে করেছি: আলাদাও হয়ে গেছি। তিন বছরের একটা ছেলে আছে। আমার সঙ্গেই থাকে।' অভিব্যক্তিহীন সুরে বলে।

'শুনে খারাপ লাগল।' ইমামা সমবেদনা জানায়।

'না, তেমন কিছু না। ভালো হয়েছে এই বিয়ে শেষ হয়ে গেছে। এটা বিয়ে না, একটা গন্ডগোল ছিল।' জালাল কফির কাপ টেবিলে রেখে বলে।

কিছুক্ষণ রুমে নীরবতা বিরাজ করে। সেই নীরবতা ইমামা ভাঙে। 'অনেক বছর আগে আমি আপনাকে প্রপোজ করেছিলাম জালাল!'

জালাল ওর দিকে স্থির চোখে তাকায়।

'এরপর বিয়ের জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলাম। তখন আপনি আমাকে বিয়ে করতে পারেননি। আমি কি সেই রিকোয়েস্ট আবার করতে পারি?'

জালালের চেহারার রং বদল দেখে ইমামা। 'এখন তো পরিস্থিতি বদলে গেছে। আপনি কারো ওপর ডিপেন্ডেন্ট নন। আমার বাবা-মাকে নিয়েও ভয় নেই। আপনার বাবা-মায়েরও আপত্তি থাকার কথা না। এখন তো আপনি আমাকে বিয়ে করতে পারেন।'

জালাল একদম চুপ। তার চুপ থাকা ওর স্নায়ুতে চাপ তৈরি করে। ভাবে হয়তো প্রথম বিয়ে বা ছেলেকে নিয়ে চিন্তা

করছে। তাকে বলা উচিত তার প্রথম বিয়ে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তার ছেলে আছে বলেও কোনো আপত্তি নেই। 'জালাল! আপনার প্রথম বিয়ে নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

জালাল ওকে থামিয়ে বলে। 'ইমামা! এটা সম্ভব না।'

'কেন সম্ভব না? আপনি আমাকে ভালোবাসেন না?'

"ভালোবাসার বিষয় না ইমামা! এখন অনেক সময় চলে গেছে। তাছাড়া একটা বিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পরপর আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাই না। নিজের ক্যারিয়ারে ফোকাস করতে চাই।"

'জালাল! আমাকে নিয়ে তো আপনার ভয় থাকার কথা না। আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে ব্যর্থ হতে পারে না।'

‘তারপরও... আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না।’

‘আমি অপেক্ষা করতে পারি।’

‘এতে লাভ নেই ইমামা!’ জালাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। ‘আমি তোমাকে বিয়ে করার পজিশনে নেই।’

ইমাম করুণ চোখে তাকায়।

‘প্রথম বিয়ে নিজের ইচ্ছেতে করেছিলাম। দ্বিতীয়বার নিজের ইচ্ছে চালাতে চাই না, বাবা-মায়ের ইচ্ছেতে করতে চাই।’

‘আপনার বাবা-মাকে আমার ব্যাপারে বলে দেখুন, হয়তো তারা অনুমতি দিয়ে দিবেন।’ ইমামা ডুবতে থাকা মন নিয়ে বলল।

‘পারব না। দেখো ইমামা! কিছু বাস্তবতার সামনে আমাদেরকে বিবেকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়। তোমার অনুভূতির কদর করি আমি। এতে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো একসময় আমিও তোমার সাথে জড়িয়ে ছিলাম বা

বলতে পারো প্রেমে পড়েছিলাম। তোমার জন্য আমার হৃদয়ে আজও বিশেষ জায়গা আছে, সবসময় থাকবে। কিন্তু জীবন শুধু আবেগ দিয়ে চলে না।" জালাল থামে।

ইমামা কফি থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে জালালকে দেখছিল।

'সাত-আট বছর আগে যখন বাড়ি ছাড়ছিলে, আমি তোমাকে বুঝিয়েছি এমন না করতে। কিন্তু তুমি নিজের ইচ্ছেমতো বিষয়টা হ্যান্ডেল করেছ। নিজের বাবা-মাকে বোঝানোর বদলে আমাকে চাপ দিয়েছ গোপনে বিয়ে করতে। আমি তা পারিনি। তা ঠিকও হতো না। ধর্মের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু সমাজ বলেও একটা বিষয় আছে। যেখানে আমরা বসবাস করি, তার পরোয়া করা উচিত আমাদের।'

ইমামার বিশ্বাস হচ্ছিল না। এসব সেই মানুষটার মুখ থেকে শুনছিল যে...

'তুমি তো চলে গেছ, কিন্তু তোমার এভাবে নিখোঁজ হওয়া কত বড় স্ক্যান্ডালে পরিণত হয়েছে, তোমার কোনো আন্দাজ নেই। তোমার বাবা-মা প্রেসে এই খবর আসতে দেয়নি। কিন্তু পুরো মেডিকেল কলেজে তোমার এভাবে নাই হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তোমার সব ফ্রেন্ড আর ক্লাসফেলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জয়নবও शामिल ছিল এর মাঝে। ভাগ্যক্রমে আমরা বেঁচে গেছি।' জালাল উঠে দাঁড়ায়। 'আমি এত বছর ধরে কষ্ট করে নিজের অবস্থান তৈরি করেছি। এত সাহস আমার মাঝে নেই যে, তোমাকে বিয়ে করে সবার টার্গেট হব। আমার চলাফেরা ডাক্তারদের কমিউনিটিতে। ইমামা হাশিম স্ত্রী হলে আমাকেও তার সাথে স্ক্যান্ডালাইজ করে দেবে। তোমাকে বিয়ে করে আমি মানুষের সামনে চোখ নামিয়ে চলতে চাই না। তুমি এত বছর কোথায় ছিলে, কীভাবে ছিলে এসব খুব সাধারণ প্রশ্ন। আমার বাবা-মা তোমার কথায় বিশ্বাস করবেন না। মানুষের মাঝে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে হবে আমার। তুমি খুব ভালো, কিন্তু মানুষ তোমাকে ভালো মেয়ে মনে করে না। আর আমি কোনো স্ক্যান্ডালাইজ মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না। মানতে পারব না, কেউ

আমার স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে কথা বলবো। আমি আশা করি তুমি আমার পজিশন বুঝতে পারছ।"

কফির কাপ থেকে ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু জালাল আনসারের চেহারাও কোনো ধোঁয়ার পেছনে আড়াল মনে হচ্ছিল ওর কাছে। হয়তো চোখে নেমে আসা আর্দ্রতা জালালের চেহারা অস্পষ্ট করে দিয়েছিল। চেয়ারের দুই হাতলের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।' ইমামা নিজেকে বলতে শোনে। 'খোদা হাফেজ।'

'আ'ম সরি ইমামা!' জালাল মাফ চায়।

ইমামা ফিরে তাকায় না। বাইরে বেরিয়ে আসে। সন্ধ্যা সাতটা বাজছিল। চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। স্ট্রিট লাইট আর নিয়ন সাইনবোর্ডের আলোতে রাস্তা আলোকিত। প্রচুর যানজট চারপাশে। রাস্তার দুইপাশে ডাক্তারদের ক্লিনিক। ওর মনে আছে, একসময় ইচ্ছে ছিল এমন একটা ক্লিনিক ওর হবে। নিজের নামের পাশে এই ধরনের কোয়ালিফিকেশনের

একটা লম্বা লিষ্ট দেখার শখ ছিল। ঠিক তেমন, যা এখন জালাল আনসারের নামের পাশে। ঠিক তেমন, যা এই রোডে থাকা অন্যান্য ডাক্তারের নামের পাশে। সব সম্ভব ছিল। ওর হাতের মুঠোয় ছিল। শুধু যদি অনেক বছর আগে নিজের বাড়ি ছেড়ে না আসত।

অনেকক্ষণ জালালের হসপিটালের বাইরে ফাঁকা মস্তিষ্ক নিয়ে রাস্তার যানজট দেখতে থাকে। বুঝতে পারছিল না, এখান থেকে কোথায় যাবে। মাথা ঘুরিয়ে হসপিটালের উপরের ঝামকালো ইলেকট্রিক বোর্ডে ডা. জালাল আনসার নামটা দেখে। 'তুমি ভালো মেয়ে, কিন্তু মানুষ তোমাকে ভালো মনে করে না।' কানে তার কথা বাজতে থাকে। ওখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে, সারা জীবন একতরফা ভালোবাসায় কাটিয়েছে ও। জালালের কখনো ওর প্রতি কোনো ভালোবাসা ছিলই না। না সাড়ে আট বছর আগে, না এখন। ওকে প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল ওর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সবকিছু। একটা লম্বা-চওড়া ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড। সোসাইটিতে ওর ফ্যামিলির নাম-মর্যাদা এবং সেই ফ্যামিলির

কন্টাক্ট। ফ্যামিলির সম্পদ। যাতে পা দিয়ে জালাল আনসার রাতারাতি আপার ক্লাসে পৌঁছে যেত। অথচ এতকাল ও এই ভাবনায় ডুবে ছিল, জালাল ওকে ভালোবাসে। অন্তত ভাবেনি ওর চরিত্র নিয়ে কিছু বলতে পারে সে। কমপক্ষে এটুকু বিশ্বাস রাখবে, ভুল পথে চলতে পারে না জালাল। কিন্তু ও ভুল ছিল। জালাল আনসারের চোখে ইমামা হাশিম একটা স্ক্যান্ডলাইজড মেয়ে। যার হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ফ্যামিলি বা অন্য কাউকে বলার হতো কোনো শব্দ তার কাছে নেই।

সাড়ে আট বছর আগে যখন বাড়ি ছাড়ছিল তখনই জানত, মানুষ অনেক কিছু বলবে। নিজের জন্য কাঁটায়ুক্ত পথ, বিষাক্ত কথাবার্তা ও বাঁকা চাহনি বেছে নিয়েছিল। কিন্তু কখনো ভাবেনি এর মাঝে জালাল আনসার যুক্ত হবে। বিষাক্ত কথাবার্তা বলা একটা মানুষ সে হবে। জালালকে অন্তত নিজের ভালো হওয়ার কোনো যুক্তি-প্রমাণ দিতে প্রস্তুত ছিল না ও। যদিও দেওয়ার সুযোগই বা কই ছিল? জালালের কথাবার্তা সাড়ে আট বছর পর বাস্তবতার মরুভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছিল ওকে। সমাজের জন্য

একজন আউটকাষ্ট হয়ে গেছে। তো ইমামা হাশিমা এই হচ্ছে তোমার অবস্থান? একটা স্ক্যান্ডলাইজ, মানে কলঙ্কিত মেয়ে! অথচ তুমি নিজেকে কী ভেবে বসে আছো...?' ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, প্রতিটা সাইনবোর্ড, প্রতিটা পোষ্টার পড়তে পড়তে ভাবো ওখানে থাকা অনেক ডাক্তারদের নামই ওর জানাশোনা। কিছু ওর ক্লাসফেলো, কিছু জুনিয়র, কিছু সিনিয়র। আর ও কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? কোথাও না। 'দেখবে ইমামা! জীবনে কীভাবে অপমানিত হও। তুমি কিছু পাবে না, কিছু না।' কানে হাশিম মুবীনের কথা বাজে। গালে গড়িয়ে বেয়ে পড়া চোখের পানি টের পায়। আশেপাশের আলোয় চোখ জ্বলছিল ওর।

জালাল আনসার খারাপ মানুষ না। শুধু সে তা নয়, যা ভেবে ও তার দিকে পা বাড়িয়েছিল। কী এক ধোঁকা! যা ও খেয়ে বসেছে জেনেবুঝে, খোলা চোখে। ও নিজেও বাস্তববাদী, সম্পূর্ণ বাস্তববাদী। কিন্তু জালাল তা নয়, সে মূলত বাস্তববাদী, সম্পূর্ণ বাস্তববাদী। শুধু তার এই রূপ প্রথমবার দেখেছিল বলে ওর জন্য বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সে খারাপ না। ব্যস,

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনযাপন করে। তবে আজ... ইমামা হাশিমকেও নিজের সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আট বছরের মধ্যে এই প্রথম এমন উপহাস আর অপমানের শিকার হয়েছে ইমামা। তাও সেই ব্যক্তির কাছে, যাকে নিজের আদর্শ মানুষ ভাবে। আর সেই আদর্শ মানুষটার চোখে ও কী? 'বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া একটা স্ক্যান্ডালাইজ মেয়ে!' চোখ থেকে পানি ঢেউয়ের মতো উপচে পড়ে। যার সাথে সবকিছু ধুয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ নির্দয়ভাবে চোখ ঘষে। চাদরে ভেজা মুখ মোছে একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ল।

দরজা সাঁদা আন্মা খোলে। ইমামা মাথা নিচু করে এমনভাবে ভেতরে ঢুকল, যাতে ওর চেহারায় তার নজর না পড়ে।

'কোথায় ছিলে ইমামা? রাত হয়ে গেছে। আমার হৃদয় কাঁপছিল। এখনই পাশের বাসায় যেতাম, যাতে কেউ গিয়ে তোমার অফিস থেকে খবর নিয়ে আসে।' তিনি দরজা বন্ধ করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওর পেছন পেছন আসেন।

'কোথাও না আন্মা! অফিসে একটু কাজ ছিল, তাই দেরি হয়ে গেছে।' সামনে হাঁটতে হাঁটতে তার দিকে না তাকিয়ে বলল ও।

'আগে তো কখনো দেরি হয়নি। তাহলে আজ কেন এত রাত হলো, এতক্ষণ রাখল তারা?' তিনি শান্ত হলেন না।

'আমি কীভাবে বলব আন্মা? আর কখনো দেরি হবে না।' নিজের রুমের দিকে যেতে যেতে বলল ও।

'খাবার এখন গরম করব নাকি একটু পর খাবে?' আন্মা ওর পেছন পেছন এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি খাব না, আন্মা! মাথাব্যথা করছে আমার। ঘুমাব কিছুক্ষণ।' রুমে ঢুকে বলে ও।

'মাথাব্যথা কেন করছে? ওষুধ দেবো নাকি চা বানাব?' সাঈদা আন্মার চিন্তা বাড়ে।

'আম্মা প্লিজ! আমাকে ঘুমাতে দিন। কিছু লাগবে না, লাগলে বলব আমি।'

ইমামার মাথা সত্যিই ব্যথা করছিল। সাঈদা আম্মা হয়তো বুঝলেন তার উদ্বিগ্নতা ওকে বিরক্ত করেছে।

'ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও।' বলে তিনি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে দেন।

রুমের লাইট অন না করে অন্ধকারে দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। কম্বল টেনে চোখের উপর হাত রাখল। এই মুহূর্তে শুধু ঘুমাতে চায়। কিছু মনে করতে চায় না। জালাল আনসারের সঙ্গে হওয়া কিছুক্ষণ আগের কথাবার্তা বা অন্যকিছুই না। কাঁদতেও চায় না। আগামীতে কী হবে, তা নিয়ে ভাবতে চায় না। ওর ইচ্ছে কবুল হয়। কখন বা কীভাবে ঘুম এলো তা জানে না। কিন্তু খুব দ্রুত গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

দশ

মানুষটা ওর থেকে তিন কদম সামনে দাঁড়ানো। এত কাছে যে, হাত বাড়ালে তার কাঁধ ছুঁয়ে দিতে পারবে। ওখানে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। মানুষটার কাঁধের পেছন থেকে খানায়ে কাবার খোলা দরজার দিকে তাকায় ও। নুরের সেই স্রোত দেখে, যা ওখানের সবকিছু নিজের দখলে নিচ্ছে। কাবার প্রচ্ছদে লেখা আয়াতগুলো খুব সহজে পড়া যাবে এত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আকাশের তারা আগের চেয়ে বেশি আলোকিত হয়ে উঠতে অনুভব করে ও। সামনে থাকা মানুষটা তালবিয়া পড়ছে। ওখানে একমাত্র সেই মানুষটার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। মনোরম সেই কণ্ঠস্বর। তার সাথে একই বাক্য পুনরাবৃত্তি করতে থাকে ও। যেভাবে মানুষটা পড়ছিল। তবে মৃদু কণ্ঠে। তার কণ্ঠের সাথে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে, তার মতো করে। কিন্তু বিড়বিড়িয়ে। নিজের কণ্ঠকে উঁচু করার চেষ্টা করে বুঝতে পারে, সেই মানুষটার কণ্ঠের সামনে পারবে না। চেষ্টা ছেড়ে দেয় ও। তার কণ্ঠের

সাথে নিজের সুর মেলাতে থাকে। খানায়ে কাবার দরজা খুলে
গেল। মানুষটাকে সামনে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াতে
দেখে। আকাশের দিকে হাত তুলে দোয়া করছে সে। তাকে
শুধু দেখতে থাকে ও। মানুষটা হাত নামিয়ে ফেলল। এখন
নিচে বসে সেজদা করছে কাবার দরজায়। ওর চাহনি তার
দিকে স্থির। সে দাঁড়াচ্ছে, এই তো ঘুরবে এখনই...তার মুখ
দেখবে। কণ্ঠটা চেনা ওর, কিন্তু মুখ না দেখে...? মানুষটা
এখন ঘুরছিল।

ইমামা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। রুম অন্ধকার। কয়েক মুহূর্তের
জন্য মনে হলো ওখানেই আছে, খানায়ে কাবার সামনে।
কিন্তু বাস্তবে ফিরতে হয়। উঠে রুমের লাইট অন করে
বিছানায় এসে বসল। স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্য বিশদভাবে মনে
আছে, যেন কোনো স্থিরচিত্র। কিন্তু মানুষটার মুখ দেখতে
পারেনি। সে ঘোরার আগেই ওর চোখ খুলে গেছে। সুমধুর
কণ্ঠ। 'জালাল আনসার ছাড়া কার আওয়াজ হতে পারে আর?'
ভাবে ও।

মানুষটা লম্বা উচ্চতার। জালাল আনসার খাটো এবং শ্যামলা বর্ণের। কিন্তু সেই মানুষটার ইহরাম থেকে বের হওয়া কাঁধ এবং হাতের রং ফর্সা ছিল, তার কণ্ঠটা পরিচিত। তবু চিনতে পারছে না, ওটা জালাল আনসারের কণ্ঠ নাকি অন্য কারো। স্বপ্ন খুব অদ্ভুত ছিল। কিন্তু ওর মাথাব্যথা নেই। বিস্ময়ের মধ্যে থাকলেও নিশ্চিত লাগছিল নিজেকে। ঘড়িতে রাত একটা বাজে।

মনে পড়ে, রাতে এশার নামাজ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাপড়ও বদলায়নি। ঘুমানোর আগে অজু করেও শোয়নি। কাপড় বদলে রুম থেকে বের হয়। সাঈদা আন্নার রুমের লাইট অফ করা, তিনি ঘুমাচ্ছেন। পুরো বাড়িজুড়ে গভীর নীরবতার রাজত্ব। প্রাঙ্গণে লাইট জ্বলছে। লাইটের আলোতে হালকা কুয়াশার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। প্রাঙ্গণের দেয়ালজুড়ে বেয়ে ওঠা সবুজ লতাপাতাগুলো লাল ইটের সঙ্গে চুপ করে লেপ্টে আছে। অজু করার জন্য প্রাঙ্গণের অপরপাশে থাকা বাথরুম যেতে হবে। কিন্তু বাথরুমে না গিয়ে বারান্দার চারপায়ার উপর বসে পড়ল ও। সোয়েটারের হাতা

তুলে জামার হাতা ভাঁজ করে রাখে। কয়েক সেকেন্ডর জন্য
হালকা কেঁপে উঠল ওর শরীর। সামনের লতাগুলোর দিকে
তাকিয়ে সন্ধ্যায় জালাল আনসারের সঙ্গে হওয়া সেই
সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এবার তার কথার
প্রতিধ্বনি ওকে কষ্ট দিতে পারছিল না।

'দান্তগিরি মেরি তানহাই কি তুনে হি তো কি
ম্যায় তো মার যাতা আগার সাথ না হোতা তেরা
তেহ-বা-তেহ তিরগিয়া জেহেন পে যাব টুট্টি হ্যায়
নুর হো যাতা হ্যায় কুছ অর হোভেদা তেরা
কুছ নেহি মাঙ্গতা শাহো ছে ইয়ে শেয়দা তেরা
ইসকি দৌলত হ্যায় ফাকাত নাকশে কাফ-এ-পা তেরা।'

ইমামার ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। গত সাড়ে আট বছর
ধরে এই আওয়াজ, এই বাক্যগুলো ওর মস্তিষ্ক থেকে কখনো
মলিন হয়নি। এরপর কিছুক্ষণ আগে স্বপ্নে দেখা সেই অন্য
কণ্ঠের কথা মনে করে।

**'লাববাইক আল্লাহুস্মা লাববাইক
লাববাইক লা শারিকা লাকা লাববাইক
ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা
লাকা ওয়ালমুলক লা শারি-কা লাকা
লাববাইক'**

কণ্ঠটা চেনা, পরিচিত। কিন্তু জালাল আনসারের কণ্ঠ ছাড়া কার এমন কণ্ঠর সঙ্গে পরিচিত ও? চোখ বন্ধ করে স্বপ্নে দেখা দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করল। মাকামে মূলতাজিম, খানায়ে কাবার খোলা দরজা, কাবার গিলাফের সেই উজ্জ্বল আয়াত। শান্ত, শীতল, সুগন্ধি রাত। খানায়ে কাবার দরজা থেকে ঝলকানো নূরানি আলো। সেজদারত, তালবিয়া পাঠ করা সেই পুরুষ। চোখ খুলে ফেলো। কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণে ঘেরা কুয়াশার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে মানুষটাকে নিয়ে ভাবো। সেই মানুষটার খালি কাঁধে হালকা হালকা পশমের মাঝে ক্ষতের বিবর্ণ দাগ ছিল। অবাক হয়। স্বপ্নের এমন খুঁটিনাটি আগে কখনো মনে থাকেনি। স্বপ্নে খানায়ে কাবাও এই প্রথম দেখেছে। সেখানে বসে ওর ইচ্ছে করছিল মসজিদে নববি,

রওজায়ে রসূল সা.-র সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। মসজিদে নববিও এমন খালি থাকুক, সেখানে শুধু ও থাকুক। জানে না কতক্ষণ ওভাবে বসেছিল। হুঁশ তখন ফেরে, যখন সাঈদা আম্মা তাহাজ্জুদের অজু করার জন্য প্রাঙ্গণে আসে। ইমামাকে এভাবে, এই সময় বসে থাকতে দেখে তিনি অবাক হন।

'তোমার মাথাব্যথার কী অবস্থা?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'এখন ব্যথা নেই।' ইমামা মাথা তুলে তার দিকে তাকায়।

'রাতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লে।' ওর পাশে বারান্দার শীতল কার্পেটে বসলেন তিনি।

ও চুপ থাকে। সাঈদা আম্মা গরম উলের শাল জড়িয়ে রেখেছেন। তার কাঁধে মাথা এলিয়ে দেয়। তার গরম শাল ওকে অদ্ভুত স্বস্তি দিচ্ছিল।

'এখন তুমি বিয়ে করে নাও আমনা।' সাঈদা আম্মা বললেন।

তার শালের মধ্যে ওর মুখ লুকানো। সাঈদা আম্মা এই কথা প্রথম বলছেন না। প্রতিবার এই কথার উপর চুপ থাকে ও। কেন? কারণ অজানা। তবে আজ চুপ রইল না। 'সত্যি বলছেন?'

সাঈদা আম্মা চমকান। 'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

ইমামা তার কাঁধ থেকে মাথা তোলে।

'তুমি কাউকে পছন্দ করো?' সাঈদা আম্মা জিজ্ঞেস করলেন।

ও মাথা নিচু করে বারান্দার মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।
আমার পছন্দ?

‘না, আমি কাউকে পছন্দ করি না।’

সান্দিদা আম্মার কাছে ওর কণ্ঠ ভরাট মনে হলো। তিনি কিছু বলার আগে আবার তার শালে মুখ লুকিয়ে নেয় ও।

'তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমি ইংল্যান্ড চলে যাব।' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন আম্মা। ওর মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে তিনি টের পেলেন তার শালে মুখ লুকিয়ে হেঁচকি তুলে কাঁদছে ও। 'আমনা! আমনা আমার বাচ্চা কী হয়েছে?' অস্থির হয়ে ওর মুখ উপরে তোলার চেষ্টা করে। চেষ্টা সফল হয় না। ও তার সাথে লেপ্টে কাঁদতে থাকে। 'আল্লাহর দোহাই লাগে! কিছু তো বলো। কেন কাঁদছ?' তার মন ঘাবড়ে ওঠে।

'কিছু না ব্যস! এমনিতেই... মাথাব্যথা করছে।'

তিনি জোর করে ওর ভেজা মুখ উপরে তোলেন। মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ায় ও। আম্মার চোখে চোখ রাখে না। ওর বিয়ের কথা বলা মানুষ সান্দিদা আম্মা একা না। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর ড. সিবতে আলিও বিয়ের কথা বলেছিলেন। ওর জানা নেই, তখন কেন মানা করেছিল। এটা জানা সত্ত্বেও

যে, এখন ও মুক্ত। 'আমাকে কিছুদিন চাকরি করতে দিন, তারপর আমি বিয়ে করব।' ড. সিবতে আলিকে বলেছিল।

হয়তো এটা বিগত কয়েক বছর ধরে আর্থিকভাবে তার ওপর বোঝা হয়ে থাকার অনুভূতি ছিল, যা থেকে রেহাই পেতে চাইত ও। বা হয়তো এই ভয় পেয়েছিল যে, ওর বিয়েতে ড. সিবতে আলিকে আবার খরচ করতে হবে। এই খরচ নিজে জোগাড় করতে চেয়েছিল। যদিও ড. সিবতে আলিকে তা বলেনি। শুধু তার কাছ থেকে চাকরির অনুমতি নেয়। হয়তো আরও কিছু বছর চাকরি করত। কিন্তু জালাল আনসারের সঙ্গে হওয়া সাক্ষাৎ ওকে মানসিকভাবে ধাক্কা দিয়েছে। যার ফলে সাঈদা আন্নার এককথায় আত্মসমর্পণ করে নেয়।

ইমামা জানে না সাঈদা আন্না ড. সিবতে আলির সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন কিনা। আন্না সম্মতি পেয়ে ওর সম্বন্ধের তালাশ শুরু করে দেন। সেই প্রচেষ্টার ফল ফাহাদের রূপে সামনে আসে। ফাহাদ একটা কোম্পানিতে ভালো পোস্টে চাকরি করছিল এবং ভালো সুনামও আছে।

ফাহাদের বাবা-মা প্রথম দেখায় ওকে পছন্দ করে ফেলো। এরপর সাঈদা আম্মা ড. সিবতে আলির সঙ্গে এই সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন।

ড. সিবতে আলির কিছুটা আপত্তি ছিল। তিনি ইমামার বিয়ে তার পরিচিতদের মধ্যে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাঈদা আম্মার মুখ থেকে ফাহাদ এবং ফাহাদের পরিবারের প্রচুর প্রশংসা শোনার পর এ ব্যাপারে আর কোনো আপত্তি তুললেন না। নিজেও ফাহাদের ব্যাপারে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে যান। ফাহাদের পরিবার বিয়ের জন্য এক বছর অপেক্ষা করবে বলেছিল। কিন্তু হঠাৎ তারা কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। এটা কাকতালীয় যে, ড. সিবতে আলি তখন ব্যস্ততার কারণে ইংল্যান্ড ছিলেন; যখন ফাহাদের পরিবারের জোরাজুরিতে বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়। সাঈদা আম্মা ফোনে তার সঙ্গে আলোচনা করলে ড. সিবতে আলি তার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। তখনই ফিরে আসার সুযোগ

ছিল না তার হাতে। কিন্তু তারা মানেনি। যার কারণে তিনি স্ত্রী কুলসুমকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেন।

ইমামার বিয়ের প্রস্তুতি কুলসুম আন্টি আর মরিয়ম করে। মরিয়ম শ্বশুরবাড়ি রাওয়ালপিন্ডি থেকে কয়েক সপ্তাহের জন্য লাহোর আসে। বিয়ের তারিখ ঠিক হওয়ার পর ড. সিবতে আলি ওর সঙ্গে লম্বা সময় ফোনে কথা বলেন। তার তিন মেয়ের বিয়েই বংশের মধ্যে হয়েছিল। কারো শ্বশুরবাড়ির মানুষ কিছু নেয়নি। কিন্তু ড. সাহেব তিন মেয়ের জন্য জমিয়ে রাখা টাকা উপহার হিসেবে বিয়েতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

'সাড়ে আট বছর আগে যখন আপনি আমার বাড়িতে আসেন এবং আপনাকে নিজের মেয়ে বলি, তখন আপনার জন্যও কিছু টাকা আলাদা করে রাখি আমি। ওগুলো আপনার আমানত। আপনি তা এমনিতেও নিতে পারেন। নাহলে কুলসুম বা মরিয়মকে বলে দেই ওগুলো বিয়ের আয়োজনে খরচ করতে। সাঙ্গিদা আপনার ইচ্ছে বিয়ে তার বাড়িতে হবে।

যদিও আমার ইচ্ছে ছিল বিয়ে আমার বাড়িতে হোক।" তিনি ইমামাকে বলছিলেন। 'দুঃখিত যে, আমার চতুর্থ মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারছি না আমি। তবে এর মাঝেই ভালো কিছু রয়েছে হয়তো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করব পৌঁছানোর।'

ইমামা তার কথার মাঝে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। কিছু বলেনি। জোর করেনি বিয়েতে নিজের টাকা খরচ করার। তার টাকা না নেওয়ার। সেদিন ওর মন বলছিল তার তরফ থেকে আরেকটু অনুগ্রহ নিতে। তিনি ওর উপর এত অনুগ্রহ করেছিলেন যে, তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শুধু ফাহাদের পরিবার বিয়ে সাদামাটা হওয়ার ওপর জোর দেয়। এতে কারো আপত্তি ছিল না। ইমামা নিজেই সাদামাটা একটা বিয়ে চাইত। কিন্তু কেউ এটা জানত না যে, ফাহাদের পরিবারের এই সাদামাটা বিয়ের পেছনে আসল কারণ কী। বিয়ে মেহেদির সন্ধ্যায় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফাহাদের পরিবার সন্ধ্যায় জানায় বিয়ে পরের দিন, অর্থাৎ বিয়ের দিনই হবে। তখন পর্যন্ত ইমামা বা সাঈদা আন্মা কেউ আন্দাজ করতে

পারেনি, ফাহাদের বাড়িতে কোনো সমস্যা চলছে। মেহেদির আয়োজন এমনিতেও লম্বা-চওড়া কিছু ছিল না। শুধু সাঈদা আম্মার কাছের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা। বিয়ের জন্য করা খাবারের আয়োজন মেহেদিতে আসা মেহমানদেরকে খাইয়ে দেওয়া হয়। পরদিন বিয়ের আয়োজনও বাড়িতে সাদামাটাভাবে করা হলো। চারটা বাজে পাত্রপক্ষ আসার কথা। ছয়টার কাছাকাছি রুখসাতি। কিন্তু পাত্রপক্ষ আসার এক ঘন্টা আগে ফাহাদের পরিবার সাঈদা আম্মাকে ফোন করে ফাহাদের নিখোঁজ হওয়ার খবর জানিয়ে এই সম্পর্কের ব্যাপারে ক্ষমা চায়।

চারটা পর্যন্ত এই পুরো ঘটনার কিছুই জানতে পারেনি ইমামা। ফাহাদের বাড়ি থেকে বিয়ের কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন কাপড় পরে প্রায় তৈরি ও, যখন মরিয়ম রুমে এসে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে কাপড় বদলে ফেলতে বলল ওকে। তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে চায়নি ফাহাদের পরিবার না করে দিয়েছে। শুধু বলে তাদের কোনো আত্মীয় মারা যাওয়ার কারণে ফাহাদের পরিবার বিয়ে ক্যান্সেল করেছে। এটা বলেই

তাড়াহুড়ো করে রুম থেকে বেরিয়ে যায়। ইমামা কাপড় বদলে ফেলে। কিন্তু ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদের সংকেত দিচ্ছিল। মরিয়মের কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না। নিজের রুম থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে থাকা লোকজনের প্রতিক্রিয়া ওর সন্দেহকে নিশ্চিত করে দেয়। সাঈদা আম্মার রুমে গেল। ওখানে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে আছে। কুলসুম আন্টি, মাইমুনা, নুর-উল-আইন আপা। প্রতিবেশী কিছু মহিলা। মরিয়ম, সাঈদা আম্মা। মরিয়ম সাঈদা আম্মাকে পানি দিচ্ছে। তাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য ওর হৃৎস্পন্দন থেমে যায়।

'আম্মার কী হয়েছে?' ভেতরে ঢুকতেই সবার দৃষ্টি ওর উপর এসে পড়ে।

মায়মুনা আপা দ্রুত ওর দিকে আসে। 'আমনা! তুমি বাইরে যাও।' সে ওকে বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করে।

'আম্মার কী হয়েছে?' কথা না শুনে সাঈদা আম্মার দিকে আগায় ও।

কুলসুম আন্টি রুমে থাকা সবাইকে বাইরে বের করে দেন। ও
আম্মার পাশে এসে বসে। 'কী হয়েছে?' অস্থির হয়ে
মরিয়মকে জিজ্ঞেস করে।

মরিয়ম উত্তর দেয় না। সাঈদা আম্মার মুখ কান্নায় ভেজা।
তিনি ইমামাকে দেখছেন। কিন্তু ওর মনে হলো তিনি ওকে
দেখতে পাচ্ছেন না। হাত থেকে গ্লাস সরিয়ে ওকে জড়িয়ে
ধরে কাঁদতে শুরু করেন আম্মা। রুম খালি। শুধু ড. সিবতে
আলির পরিবার ছিল ওখানে।

‘কী হয়েছে আম্মা? আমাকে বলুন।’ ইমামা আলতো করে
তাকে নিজের কাছ থেকে ছাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে।

‘ফাহাদ ওর পরিবারকে না জানিয়ে অন্য কোথাও বিয়ে করে
ফেলেছে।’ মরিয়ম নিচু আওয়াজে বলল। ‘তারা কিছুক্ষণ
আগে মাফ চাইতে এসেছিল এবং সম্পর্ক শেষ করে গেছে।’

কয়েক মিনিটের জন্য ঝুন্ধ হয়ে রইল ইমামা। ওর রক্ত সঞ্চালন, হৃৎস্পন্দন, ওঠানামা শ্বাস.... কয়েক সেকেন্ডের জন্য সব থেমে যায়। আমার সঙ্গে কি এটাও হওয়ার বাকি ছিল? অসহায় হয়ে ভাবো। 'কোনো ব্যাপার না আম্মা! আপনি কেন কাঁদছেন?' খুব যত্ন করে সাঙ্গিদা আম্মার চোখের পানি মুছে দেয়। সবকিছু ফিরে এলো, শুধু ওর চেহারার রং ছাড়া। যা তখনো ফ্যাকাসে ছিল। 'আপনার চিন্তা করার কিছু নেই।'

ওর কথায় সাঙ্গিদা আম্মা আবার কাঁদতে থাকেন। 'এসব আমার জন্য হয়েছে। আমি...'

ইমামা তাকে কথা শেষ করতে দেয় না। 'আম্মা! বাদ দিন। কোনো ব্যাপার না, আপনি পেরেশান হবেন না। শুয়ে থাকুন, কিছুক্ষণ আরাম করুন।' তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে ও।

'আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তোমার কষ্ট অনুভব করতে পারছি। আমনা! আমার বাচ্চা! আমাকে মাফ

করে দিয়ো। এসব আমার জন্য হয়েছে।' তিনি শান্ত হতে পারছিলেন না।

'আমার কোনো দুঃখ নেই আম্মা! কোনো কষ্ট হচ্ছে না। আমি একদম ঠিক আছি।' হালকা হেসে সাঈদা আম্মাকে বলল ও।

সাঈদা আম্মা কাঁদতে কাঁদতে উঠে বাইরে যায়। ইমামা কারো সাথে কিছু না বলে নিজের রুমে চলে আসে। এর বিছানাজুড়ে জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। জামাগুলো গোছানো শুরু করে। অন্য কোনো মেয়ে হলে এখন বসে বসে কাঁদত। কিন্তু ও অদ্ভুতরকম শান্ত ছিল। 'যদি আমি জালালকে না পেয়ে সবর করতে পারি, তাহলে এটা তো এমন একজন যার সাথে আমার কোনো অনুভূতি জড়ায়নি।' বিয়ের কাপড় ভাঁজ করতে করতে ভাবে ও। 'খুব বেশি কী হবে...? এখানেও মানুষের কাছ থেকে চোখ লুকিয়ে, মাথা নিচু করে চলতে হবে। কিছু কথাবার্তা, অপমান সহ্য করতে হবে, আর কী? এসব আমার জন্য নতুন কোথায়...?'

মরিয়ম রুমে এসে ওর সঙ্গে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে।
'আব্বুকে ফোন করেছি।' ইমামাকে বলল।

এই প্রথম কিছুটা বিচলিত হয় ও। 'অযথা কেন বিরক্ত করতে
গেলে? তাকে অন্তত নিশ্চিত থাকতে দাও।'

'এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আর তুমি...!'

মরিয়মকে থামিয়ে বলল ও। 'মরিয়ম! আমার জীবনে
এরচেয়ে বড় দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এটা আর কী? ভোগান্তি সহ্য
করার অভ্যাস আছে আমার। তুমি সাঈদা আম্মাকে সাব্বনা
দাও। আমার কিছু হয়নি, একদম ঠিক আছি। আব্বুকেও
অযথা বিরক্ত করো না। তিনি ওখানে দুশ্চিন্তা করবেন।'

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে মরিয়মের কাছে ওকে
অস্বাভাবিক মনে হলো। আর কিছু বলার আগে কুলসুম আন্টি
সাঈদা আম্মার সঙ্গে হুট করে ভেতরে এলেন। ইমামার কাছে
তাদের দুজনের চেহারা অদ্ভুত লাগে। কিছুক্ষণ আগের

তুলনায় এখন দুজনকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে। কোনো প্রশ্ন করার আগেই কুলসুম আন্টি ওকে সালারের ব্যাপারে বলতে শুরু করলেন। বোবার মতো তা শুনল ও।

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে ওর সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিতে চাই।' আন্টি বললেন। 'সবতে আলি ছেলেটাকে চেনে। খুব ভালো একটা ছেলে।' আন্টি ওকে বোঝাচ্ছিলেন।

'যদি আব্বু তাকে চেনে, তাহলে ঠিক আছে। আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনাদের যেটা ভালো মনে হয়।' ইমামা বলল।

'ওর বন্ধু তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়।' কুলসুম আন্টি বললেন।

এমন অদ্ভুত চাওয়ায় অবাক হয়েছিল ইমামা। কিন্তু ফুরকান বলে কথা বলতে আপত্তি জানায়নি।

‘আমার বন্ধু আট-নয় বছর আগে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল, নিজের পছন্দে।’

ইমামা চুপচাপ ফুরকানের কথা শুনছিল।

‘ও আপনাকে বিয়ে করবে, কিন্তু সেই মেয়েটাকে তালাক দিতে চায় না। কিছু কারণে মেয়েটা ওর সঙ্গে থাকতে পারেনি, কিন্তু ও এখনো মেয়েটাকে নিজের জীবনে রাখতে চায়। আমাকে বলে দিয়েছে আপনাকে সব বলতে। যাতে আপনার আপত্তি থাকলে বিষয়টা এখানেই শেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাই, হয়তো সেই মেয়ে কখনো ওর জীবনে ফিরবে না। আট-নয় বছর ধরে মেয়েটার সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই। এক অলীক আশা নিয়ে সেই মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছে ও। ড. সিবতে আলি সাহেব আপনাকে মেয়ে মনে করেন এবং সেই হিসেবে আপনি আমার বোনের মতো। এই মুহূর্তে, এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার জন্য এটাই ভালো যদি ওর সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়। সেই মেয়েকে কখনো খুঁজে পাবে না আমার বন্ধু।’

কারণ মেয়েটা ওকে পছন্দ করত না। আজ পর্যন্ত কখনো ওর সঙ্গে যোগাযোগের পর্যন্ত চেষ্টা করেনি। অথচ এত লম্বা সময় কেটে গেছে।

ইমামা নীরবে তাকিয়ে ছিল। 'দ্বিতীয় স্ত্রী!' তো ইমামা হাশিম... এই হচ্ছে তোমার সেই নিয়তি...যা এতদিন তোমার কাছ থেকে গোপন ছিল।' ভাবে ও। যদি ড. সিবতে আলি মানুষটার ব্যাপারে এসব জানার পরও তাকে আমার জন্য বেছে নিয়েছে, তাহলে হয়তো আমার জন্য এটাই ভালো। আমি তো জালালের দ্বিতীয় স্ত্রী হতেও প্রস্তুত ছিলাম, তাকে ভালোবাসার পরেও। আর যাকে ভালোবাসি না, তার দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ায় আমার আপত্তি কীসের? আবার জালালকে মনে পড়ে যায়। 'আমার কোনো আপত্তি নেই। তার স্ত্রী যখনই আসুক, সে রাখতে পারবে। তাকে এই অনুমতি দিতে পেরে আমি খুশি।' নিচু আওয়াজে কোনো অভিযোগ ছাড়া ফুরকানকে বলে।

পনেরো মিনিট পরের কথা, ওর জন্য প্রথম ধাক্কা ছিল যখন কাজি সাহেব সালার সিকান্দারের নাম বলে। 'পাত্র সালার সিকান্দার...পিতা সিকান্দার উসমান' কাজির মুখ থেকে বের হওয়া শব্দগুলো ওর শরীরে কারেন্টের মতো লাগে। এই নাম এমন না, যে-কারো থাকতে পারে। 'সালার সিকান্দার... উসমান সিকান্দার... তার মানে এই মানুষটা বেঁচে আছে?' মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে। মুখের সামনে ঘোমটা না থাকলে ওর চেহারা সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিত। কাজি সাহেব তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করলেন। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে আসে ওর, মন ডুবতে থাকে। 'যদি এই মানুষটা বেঁচে থাকে, এর মানে আমি এখনো ওর বিয়ের হকে আছি... আমার আল্লাহ! এসব কী হচ্ছে? ড. সিবতে আলি কীভাবে চেনেন ওকে?' মস্তিষ্কে প্রশ্নের চাপ তৈরি হচ্ছিল।

'বাচ্চা! হ্যাঁ বলো।' সাদ্দা আম্মা ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন।

'হ্যাঁ বলব সালার সিকান্দারের মতো মানুষের জন্য?' কেউ ওর হৃদয়ের উপর যেন পা রাখল। হ্যাঁ-এর বাইরে তখন বলার

মতো কিছু ছিলও না। ভয় আর স্তব্ধতার মাঝে কাগজে সাইন করে দেয় ও। 'কোনো মোজেনা হয়ে যাক, এটা সেই সালার সিকান্দার না হোক, সব কাকতালীয় কিছু হোক।' আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে ও। সবাই রুম থেকে বেরিয়ে গেলে মরিয়ম মুখের ঘোমটা সরায়। ওর চেহারা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল।

'কী হয়েছে?' মরিয়মের দুশ্চিন্তা বাড়ে।

ইমামা শোনেনি মরিয়ম কী জিজ্ঞেস করছে। ওর মস্তিষ্ক তখন অন্য কোথাও। 'মরিয়ম! Just do me a favour.' মরিয়মের হাত শক্ত করে ধরে বলল। 'আমি বিয়ে করে নিয়েছি, কিন্তু আজকেই যেতে চাই না। তুমি সাঙ্গদা আম্মাকে বলো, তিনি যেন আজই আমার রুখসাতি না করে। প্লিজ!'

মরিয়ম ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'কেন?'

'আমাকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করো না, কিছু না... সাঙ্গদা আম্মাকে বলো আমি এখন রুখসাতি চাই না।'

ওর সুরে এমন কিছু ছিল, যা মরিয়মকে উঠে বাইরে যেতে বাধ্য করে। তবে খুব দ্রুতই আবার ফিরে আসে। 'আমনা! রুখসাতি হচ্ছে না, সালার ভাইও রুখসাতি চায় না।'

ইমামার হাতের কাঁপুনি কিছুটা কমে।

'আব্বুর ফোন আসবে, তোমার জন্য। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

মরিয়ম বলল।

ইমামা ফোনের জন্য অন্য রুমে আসে। ড. সিবতে আলি কিছুক্ষণ পর ফোন করেন। শুভেচ্ছা জানান। ওর মন কেঁদে ওঠে।

'সালার খুব ভালো মানুষ।' তিনি বলছিলেন। 'আমার ইচ্ছে ছিল আপনার বিয়ে ওর সঙ্গেই হোক। কিন্তু আপনি যেহেতু

সান্দিদা আপার সাথে থাকতেন, তাই আমি তার পছন্দ ও ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়েছি।

ইমামা শ্বাস নেওয়ার অবস্থায় ছিল না।

'আমি জানতাম না সালার এর আগে বিয়ে করেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ফুরকান আমাকে এ বিষয়ে বলল। সেটা শুধু প্রয়োজনের খাতিরে করা বিয়ে। যদিও বিস্তারিত বলেনি। আমার মনে হয় এর প্রয়োজনও নেই। আমার জানাশোনায়ে সালারের চেয়ে ভালো কেউ থাকলে ওর বিয়ের ব্যাপারে জানার পর আমি আপনার বিয়ে সেখানে দিতাম। কিন্তু আমার মাথায় সালার ছাড়া অন্য কেউ আসেনি। আমনা! চুপ কেন আপনি?' কথা বলতে বলতে খেয়াল করলেন তিনি।

'আব্বু! আপনি কবে ফিরছেন?'

'আমি এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরছি।'

'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, অনেক কিছু বলার আছে।'

'আপনি খুশি না?' ড. সিবতে আলিকে ওর কথার ধরন চিন্তায় ফেলল।

'আপনি পাকিস্তান আসুন, তারপর আমি কথা বলব।' ও চূড়ান্ত সুরে বলে।

রাতে ঘুমানোর আগে যথারীতি অজু করতে বাথরুমে যায় ইমামা। অজু করে ফিরে রুমে যাওয়ার পরিবর্তে প্রাঙ্গণের সিঁড়িতে বসে ও। বাড়িতে কোনো মেহমান নেই। সাঈদা আন্মা আর ও সবসময়ের মতো একা। আন্মা ক্লান্তির কারণে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাজের মহিলাকে সাথে নিয়ে ঘরের কাজ গোছায় ও। সাড়ে দশটার দিকে কাজের মহিলাও কাজ শেষ করে ঘুমানোর জন্য চলে যায়। বিয়ের আয়োজনের কারণে এই কয়েকদিন যাবৎ এখানেই থাকছিল সে। ইমামা নিজের রুম আর কিচেনের ছোটখাটো কিছু কাজ

শেষ করে। সেসব শেষ করতে করতে রাত সাড়ে বারোট্টা বেজে যায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমানোর আগে অজু করে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আসার সময় ওর মন রুমে যেতে চাইল না। বারান্দায় এসে বসে পড়ল। প্রাঙ্গণে জ্বলতে থাকা আলোতে হাতের মেহেদির দিকে তাকায়। মেহেদির রং খুব গাঢ় হয়েছে। কনুই পর্যন্ত নকশায় ভরা। কাল অনেক বছর পর এই প্রথম খুব শখ করে মেহেদি দিয়েছে। মেহেদি দেওয়া ওর পছন্দের বিষয় ছিল। উৎসব ছাড়াও প্রায়ই হাতে মেহেদি দিয়ে রাখত ও। কিন্তু সাড়ে আট বছর আগে নিজের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর কখনো মেহেদি দেয়নি। নিজের অজান্তেই এসব থেকে আগ্রহ হারিয়ে গিয়েছিল। তবে সাড়ে আট বছর পর কাল প্রথম খুব শখ করে হাতে নকশা করিয়েছে, শুধু হাতে না পায়েও। পায়ের দিকেও তাকাল। শাল টেনে হাত আর কনুই ঢেকে নেয়।

'আসজাদ থেকে জালাল, জালাল থেকে ফাহাদ আর ফাহাদ থেকে সালার। একজনকে আমি প্রত্যাখান করেছি, দুজন

আমাকে করেছে আর চতুর্থজন... যে আমার জীবনে এসেছে, সে সবচেয়ে খারাপ... সালার সিকান্দার।" ও কল্পনায় চলে যায়। সালার নিজস্ব বেশভূষায় ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। খোলা কলার, গলায় ঝুলতে থাকা চেইন, হেয়ার ব্যান্ডে বাঁধা চুলের পনিটেল, তীক্ষ্ণ বাঁকা দৃষ্টি, ডান গালে মজা নেওয়া হাসির টোল, হাতে ব্যান্ড আর ব্রেসলেট, মহিলাদের গ্রাফিক, আঁটসাঁট জিন্স। ওর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নের সবচেয়ে খারাপ ব্যাখ্যা এটা। সালার সিকান্দারের জন্য ওর মনে বিন্দুপরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ নেই। 'আমি জীবনে অনেক ভুল করেছি, কিন্তু আমি এত খারাপ না যে তোমার মতো খারাপ পুরুষ আমার জীবনে আসবে।' অনেক বছর আগে ফোনে বলেছিল ও।

'সম্ভবত এই কারণেই জালাল তোমাকে বিয়ে করেনি। কারণ নেক পুরুষের জন্য নেক নারী, তোমার মতো নারী না।' সালার উত্তর দিয়েছিল।

ইমামা ঠোঁট চেপে ধরে। 'যাইহোক না কেন সালার! আমি তোমার সঙ্গে থাকব না। তুমি আসলেই মরে গেলে ভালো হতো।' বিড়বিড় করে ও। সেই মুহূর্তে একবারের জন্যও ইমামা হাশিমের মনে পড়ল না, সালার সিকান্দার কোনো একসময় তার অনেক বড় উপকার করেছিল।

ড. সিবতে আলি যে রাতে পাকিস্তান ফিরলেন, ইমামা তার বাড়িতে ছিল। কিন্তু রাতে সালারের ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলল না। মরিয়ম তখন লাহোরে, তাই বাড়ির সবাই খোশগল্পে ব্যস্ত ছিল। পরদিন সকালও অনেকটা একভাবে কাটে। ডক্টর সাহেব ইমামাকে সেই উপহারের কথা বলছিলেন, যা ইংল্যান্ড থেকে ওর আর সালারের জন্য এনেছেন। ও চুপচাপ শুনতে থাকে।

'সালার ভাইকে আজ ইফতারের দাওয়াত দেওয়া উচিত।' এটা মরিয়মের পরামর্শ ছিল। ড. সিবতে আলি মরিয়মের কথার উপর সালারকে ফোন করেন। ইমামা চুপ থাকে। তিনি

দুপুরে নামাজ পড়ার জন্য বের হচ্ছিলেন, তখন তার সঙ্গে পোর্চে আসে ও।

'আব্বু! আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।' ধীরে বলে।

'এখনই?' ড. সিবতে আলি অবাক হলেন।

'না, নামাজ পড়ে ফিরে আসার পর।'

তিনি কিছুক্ষণ ওর দিকে অবোধ্য ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন।
এরপর কিছু না বলে বেরিয়ে যান।

'আমি সালারের কাছ থেকে তালাক নিতে চাই।'

ড. সিবতে আলি মসজিদ থেকে ফিরে ইমামাকে নিয়ে স্টাডি
রুমে আসেন। ও কোনো প্রস্তাবনা ছাড়া নিজের দাবি
উপস্থাপন করে।

'আমনা!' তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারব না।' ইমামা মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে।

'আমনা! এটা সত্য আপনার সাথে এটা ওর দ্বিতীয় বিয়ে। কিন্তু ওর প্রথম স্ত্রীর কোনো হৃদিস নেই। ফুরকান বলছিল প্রায় নয় বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। বিয়েও না, শুধু চুক্তি ছিল।' ড. সিবতে আলি ইমামার প্রত্যাখানের কারণ প্রথম বিয়ে মনে করলেন। 'কে জানে মেয়েটা কোথায় আছে বা আছে কিনা? নয় বছর একটা দীর্ঘ সময়।'

'আমি ওর প্রথম স্ত্রীকে চিনি।' ইমামা মাথা নিচু করে বলল।

'আপনি?' ড. সিবতে আলির বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'সেটা আমি।' এইবার মাথা তুলে তাকায়।

ডক্টর সাহেব বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

'আপনার মনে আছে, নয় বছর আগে আমি একটা ছেলের সঙ্গে ইসলামাবাদ থেকে লাহোর এসেছিলাম? যার ব্যাপারে আপনি আমাকে পরে জানিয়ে ছিলেন আমার পরিবার ওর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে।'

'সালার সিকান্দার...?' ড. সিবতে আলি ওর কথার মাঝে বললেন। 'এটা সেই সালার সিকান্দার?'

ও মাথা নেড়ে সাই জানায়। তিনি বাকরুদ্ধ। সালার সিকান্দারের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ফুরকানের মাধ্যমে ইমামা বাড়ি ছেড়ে আসার চার বছর পর। তার মাথায় কখনো আসেনি এই সালারের সঙ্গে ইমামার কোনো পরিচয় থাকতে পারে। চার বছর আগে শোনা একটা নামকে কীভাবে তিনি চার বছর পর দেখা হওয়া অন্য একটা মানুষের সঙ্গে মেলাবেন? হয়তো পারতেন, যদি চার বছর আগের সালারের সঙ্গে তার দেখা হতো। কিন্তু যে সালারের সঙ্গে তার দেখা

হয়েছিল, সে একজন কুরআনের হাফেজ ছিল। এই মানুষটার আচরণ, ব্যবহার বা চলাফেরার কোথাও সেই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল না, যার বর্ণনা ইমামা তাকে বহুবার দিয়েছে। এক্ষেত্রে তার দ্বিধায় পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অথবা হয়তো এসব এভাবেই লেখা হয়েছিল উপর থেকে।

'আর আপনি নয় বছর আগে ওকে বিয়ে করেছিলেন?'

'শুধু বিয়ে।' ইমামা নিচু আওয়াজে বলে। এরপর তাকে সব খুলে বলল।

ড. সিবতে আলি অনেকক্ষণ চুপ থাকেন। তারপর তিনি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন। 'আমার উপর ভরসা করা উচিত ছিল আমনা! আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

ইমামার চোখে পানি চলে আসে। 'ঠিক বলছেন আপনার উপর ভরসা করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু তখন এটা অনেক কঠিন ছিল। আপনি ভাবতে পারবেন না, আমি তখন কী ধরনের মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। অথবা হয়তো

আমার ভাগ্যে এই পরীক্ষাও লেখা ছিল, যা আসতেই হতো।
ও কথা বলতে বলতে থামে। ভেজা চোখ তুলে ড. সিবতে
আলির দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে। 'কিন্তু এখন সব
ঠিক হতে পারে। এখন আপনি তালাক নেওয়ায় আমাকে
সাহায্য করতে পারেন।'

'না. আমি এই তালাকের ব্যাপারে আপনাকে কোনো সাহায্য
করতে পারব না আমনা! আমি আপনাকে ওর সঙ্গে বিয়ে
দিয়েছি।' ওকে মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

'তাই তো আপনাকে বলছি, আমাকে ওর কাছ থেকে তালাক
নিয়ে দিন।'

'কিন্তু কেন? আমি ওর কাছ থেকে আপনাকে তালাক নিয়ে
কেন দেবো?'

'কারণ... কারণ ও ভালো মানুষ না। আমি সালারের মতো
মানুষের সঙ্গে জীবন কাটানোর কথা ভাবতেও পারি না।

আমরা দুজন আলাদা জগতের মানুষ।" অস্থির হয়ে ওঠে ইমামা। 'আমি কখনো আল্লাহর কাছে অভিযোগ করিনি। কিন্তু এবার আল্লাহর কাছে আমার অনেক অভিযোগ।' অসহায় কণ্ঠে বলল ও। 'আমি এত ভালোবাসি আল্লাহকে আর দেখুন আল্লাহ আমার সাথে কী করলেন? আমার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষকে বাছাই করেছেন?' ও কাঁদছিল। 'মেয়েরা কত কিছু চায়। আমি তো কিছু চাইনি, শুধু একজন সালেহ মানুষ চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তাও দেননি। আল্লাহ কি আমাকে কোনো সালেহ ব্যক্তির যোগ্য মনে করেননি?' বাচ্চাদের মতো কাঁদছিল ও।

'ইমামা! ও একজন সালেহ মানুষ।'

'আপনি কেন ওকে সালেহ বলেন? ও সালেহ না। আমি ওকে চিনি।'

'আমিও ওকে খুব ভালো করে চিনি।'

'আপনি ওকে ততটা চেনেন না, যতটা আমি চিনি। ও মদ খায়। মানসিক রোগী। বহুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। শার্টের বোতাম খুলে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েদের দিকে চোখ নামিয়ে কথা বলতে জানে না। আর আপনি বলছেন ও সালেহ?'

'ইমামা! আমি ওর অতীত জানি না, বর্তমান জানি। ও সেসবের কিছু করে না, যা আপনি বলছেন।'

'আপনি কীভাবে জানেন ও এসব করে না? ও মিথ্যেবাদী, প্রতারক।'

'আমি জানি, ও এমন না।'

'আব্বু! ও এমনই।'

'হতে পারে সত্যিই ও আপনাকে ভালোবাসে। আপনার জন্য বদলে গেছে।'

'আমার এমন ভালোবাসার দরকার নেই। ওর তাকানো দেখলে আমার ঘৃণা লাগে। ওর খোলা শাটের কলার দেখলে আমার ঘৃণা লাগে। আমি এমন মানুষের ভালোবাসা চাই না। ও বদলাতে পারে না। এসব মানুষ কখনো বদলায় না। শুধু নিজেকে লুকিয়ে রাখে। আব্বু! আমি সালারের মতো মানুষের সঙ্গে নিজের জীবন কাটানোর কথা ভাবতেও পারি না। ও সবকিছু নিয়ে মজা করে। ধর্ম নিয়ে, জীবন নিয়ে, মেয়েদের নিয়ে। কী এমন নেই, যা ও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে না? যার কাছে আমার মাজহাব পরিবর্তন করা একটা বোকামি, যার কাছে ধর্ম নিয়ে কথা মানে সময় অপচয়, যে শুধু হোয়াট ইজ নেক্সট টু এক্সটেন্সিভ মানে জানার জন্য আত্মহত্যা করে, যার কাছে জীবনের উদ্দেশ্য শুধু বিলাসিতা, সে আমাকে ভালোবাসলেও শুধু এর উপর নির্ভর করে আমি তার সঙ্গে জীবন কাটাব? না, আমি তা পারব না।'

'সাড়ে আট বছর ধরে ও আপনার সাথে হওয়া দুর্ঘটনাজনিত সম্পর্কটা ধরে রেখেছে। ওর প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আর মনোভাব জানা থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষা করছে। এই আশায় যে আপনার সাথে ও জীবন কাটাবে। এই ইচ্ছের সাথে ও কি নিজের মাঝে কোনো পরিবর্তন আনেনি?'

'আমি ওর সঙ্গে জীবন কাটাব না। আমি ওর সাথে থাকব না।' ইমামা এখনো নিজের কথায় অনড়। 'আমার অধিকার আছে এই মানুষটার সঙ্গে না থাকার।'

'কিন্তু আল্লাহ এমন কেন করছেন? বারবার সেই মানুষটাকে আপনার সামনে আনছেন? দুইবার আপনার বিয়ে হয়েছে এবং দুইবারই এই মানুষটার সঙ্গে!'

এই কথায় ড. সিবতে আলির দিকে তাকিয়ে রইল ও। 'আমি জীবনে নিশ্চয়ই কোনো পাপ করেছি, তাই আমার সঙ্গে এমন হচ্ছে।' অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলে ইমামা।

'আমনা! আপনি কখনো জেদ করেননি, তাহলে আজ কী হয়েছে আপনার?' ড. সিবতে আলি অবাক ছিলেন।

'জোর করলে আমি আপনার কথা মেনে নেব। কারণ আমার ওপর আপনার এত অনুগ্রহ যে, আপনার কোনো কথা ফেলা সম্ভব না। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, নিজের ইচ্ছে আর খুশিতে ওর সাথে জীবন কাটাতে তবে আমি তা কখনো পারব না। আমার কোনো আগ্রহ নেই ও কতখানি শিক্ষিত, কত ভালো পদে চাকরি করছে বা আমাকে কত কী দিতে পারবে। আপনি একজন অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গেও যদি বিয়ে দিতেন, কিন্তু সে ভালো মানুষ হতো; আমার কোনো অভিযোগ থাকত না। কিন্তু সালার...ও আমার চোখে দেখা এমন বিষ, যা আমি নিজের খুশিতে গিলতে পারব না। আপনি সালারের ব্যাপারে তা জানেন, যা শুনেছেন। আমি ওর ব্যাপারে যা জানি, তা দেখেছি। আমরা পনেরো বছর একে-অন্যের প্রতিবেশী। আপনি তো শুধু কয়েক বছর ধরে চেনেন।'

'আমনা! আমি আপনাকে জোর করব না। এই সম্পর্কটা আপনি নিজের খুশিতে রাখতে চাইলে ভালো। শুধু আমার কথায় রাখতে হলে প্রয়োজন নেই। একবার সালারের সঙ্গে দেখা করুন। এরপরও আপনার মত এটা থাকলে আমি তা মেনে নেব।' ড. সিবতে আলি খুব গম্ভীর ছিলেন। এমন সময় কাজের লোক সালার আসার খবর দেয়। তিনি ঘড়িতে একনজর চোখ বুলিয়ে কাজের লোককে বললেন। 'তাকে ভেতরে নিয়ে আসো।'

কাজের লোক আশ্চর্য হয়। 'এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে।' ড. সিবতে আলি বললেন।

ইমামা উঠে দাঁড়ায়। 'আমি ওর সাথে এভাবে কথা বলতে চাই না।' ওর ইশারা নিজের ফোলা চোখ-মুখের দিকে।

'আপনি এখনো ওকে দেখেননি, আমি চাই আপনি ওকে একবার দেখুন।'

ডক্টর সিবত মৃদুস্বরে বলেন।

'এখানে না, আমি ভেতরের রুমে থেকে দেখছি।'

ইমামা উঠে রুমে চলে যায়। রুমের দরজা কিছুটা খোলা রাখে। রুম অন্ধকার ছিল। আধখোলা দরজা দিয়ে লাউঞ্জ থেকে আসা আলোয় রুমের ভেতর দেখা যায় না। বিছানায় বসে চোখ মুছে নিলো। ও যেখানে বসেছে, সেখান থেকে লাউঞ্জ খুব স্পষ্ট দেখা যায়। নয় বছর পর আধখোলা দরজা দিয়ে সেই মানুষটাকে লাউঞ্জে ঢুকতে দেখল, যাকে একটা লম্বা সময় মৃত ভেবেছিল ও। যার প্রতি ওর এত ঘৃণা আর বিরক্তি, যা আজ অর্ধি অন্য কারো প্রতি অনুভব করেনি। যাকে সবচেয়ে খারাপ মানুষ মনে হয় ওর কাছে। এমনকি যার বিয়ের হকে গত নয় বছর ধরে রয়েছে ও। নিয়তি কি এর বাইরে অন্য কিছুকে বলে? আঙুলের ডগা দিয়ে ভিজ়ে আসা চোখ মুছে নেয়।

সালারকে জড়িয়ে ধরলেন ড. সিবতে আলি। ওর পিঠ ইমামার দিকে। কোলাকুলি করার আগে হাতে থাকা একটা ফুলের তোড়া আর প্যাকেট সেন্টার টেবিলের উপর রাখে। কোলাকুলি করে সোফায় বসে ও। তখন প্রথম ইমামা ওর চেহারা দেখতে পায়। খোলা কলার, গলায় ঝুলতে থাকা চেইন, হাতে ঝোলানো ব্যান্ড, রাবার ব্যান্ডে বাঁধা চুলের পনিটেল... এগুলো কিছু নেই। ক্রিম কালারের পাঞ্জাবির উপরে একটা ভেষ্ট পরা শুধু। 'হ্যাঁ, বাহ্যিকভাবে অনেক বদলে গেছে।' ইমামা ভাবে। এখন দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না কখনো... ওর ভাবনায় ছেদ পড়ে।

ড. সিবতে আলির সঙ্গে কথা বলছে সালার। তিনি বিয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ইমামা রুমে বসে তাদের কথাবার্তা সহজেই শুনতে পাচ্ছে। ড. সিবতে আলির জিজ্ঞাসায় তাকে ইমামার সঙ্গে হওয়া বিয়ের কথা বলে। নিজের অনুশোচনা প্রকাশ করে। বলে কীভাবে জালালের বিয়ের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিল, কীভাবে তালাকের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিল।

'ওকে নিয়ে ভাবতে গেলে আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। এত কষ্ট যে, বলে বোঝানো যাবে না। মেয়েটা কখনো আমার মস্তিষ্ক থেকে বের হয় না।' সালার মৃদু আওয়াজে বলছিল। 'অনেক বছর আগে একসময় আমি অ্যাবনর্মাল ছিলাম। ও আমার কাছে রসুল এর উসিলায় সাহায্য চেয়েছিল। এটা বলে আমি একজন মুসলমান, খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাসী। ধোঁকা দেবো না। অথচ আমার অধঃপতনের সীমা দেখুন আমি ধোঁকা দিয়েছি ওকে... এটা জেনেও যে, নবি সা.-কে কত ভালোবাসে মেয়েটা। তাঁর জন্য সবকিছু ছেড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আর আমি ওকে নিয়ে হেসেছি, পাগল ভেবেছি। যে রাতে ওকে লাহোর ছাড়তে এসেছিলাম, আমাকে রাস্তায় বলেছিল ও। একদিন আমি সব বুঝব, নিজের অবস্থান চিনে যাব।' সালার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে। 'ও ঠিক বলেছিল। আমি সত্যিই এখন সব বুঝে গেছি। এতগুলো বছর ধরে আমি আল্লাহর কাছে এত দোয়া আর তাওবা করেছি...' বলতে বলতে থামে।

ইমামা ওকে সেন্টার টেবিলের কোণায় আঙুল নাড়াতে দেখে। সালার চোখের পানি আটকে রাখার চেষ্টা করছে।

'মারোমধ্যে মনে হয়েছিল আমার দোয়া-তাওবা কবুল হয়ে গেছে।' সালার থামে। 'কিন্তু সেদিন... যখন আমনার সঙ্গে বিয়ের পেপারে সাইন করছিলাম, তখন আমি নিজের অবস্থান চিনে গেছি। আমার দোয়া-তাওবা কিছুই কবুল হয়নি। যদি হতো, তাহলে আমি ইমামাকে পেতাম... আমনাকে না। দোয়ার বদৌলতে তো আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সেসবও দিয়ে দেন, যা মোজেযা ছাড়া কিছু না। আমার দোয়া দেখুন আমি আল্লাহর কাছে কী চেয়েছি...? এমন মেয়েকে, যে অন্য একজনকে ভালোবাসে। যে আমাকে আসফালুস সাফিলিন মনে করে। যাকে আমি নয় বছর ধরে খুঁজছি, কিন্তু তার ছায়াও পাইনি। অথচ আমি ইচ্ছে নিয়ে ঘুরছি... মেয়েটার সাথে জীবন কাটানোর। যেন পেয়ে গেলেই ও আমার সঙ্গে থাকতে রাজি হয়ে যাবে। যেন জালালকে ভুলে যাবে। ওলিদের মতো দোয়া-ইবাদত করলে হয়তো আল্লাহ আমার জন্য এই মোজেযা করে দিতেন। কিন্তু

আমার মতো মানুষের জন্য...? আমার দুঃসাহস এত যেই খানায়ে কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষ মাফ চায়, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ওকে চেয়েছি। হয়তো আল্লাহর এখানেই খারাপ লেগেছে।

ইমামার শরীরে কারেন্ট বয়ে যায়। বিদ্যুৎ চমকানোর মতো সেই রাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। 'আমার আল্লাহ!' ঠোঁটের উপর হাত রেখে আওয়াজ আটকায়। এরপর অবিশ্বাস্য চোখ নিয়ে সালারের দিকে তাকিয়ে রইল। স্বপ্নে মানুষটার মুখ দেখতে পারেনি ও। 'তার মানে সেই মানুষটা এ ছিল? যে আমার সামনে বসে আছে? এই মানুষটা...?' স্বপ্নের মানুষটাকে জালাল ভেবেছিল ও। কিন্তু ওর মনে পড়ে জালাল লম্বা না, কিন্তু সেই মানুষটা লম্বা ছিল। সালার সিকান্দার লম্বা। হাত কাঁপে ওর। জালালের গায়ের রং শ্যামলা। সেই মানুষটার গায়ের রং ফরসা ছিল। সালার সিকান্দারের গায়ের রং ফর্সা। স্বপ্নে দেখা মানুষটার কাঁধে তৃতীয় একটা কিছুও দেখেছিল। সেই তৃতীয় কিছু... ইমামা কাঁপতে থাকা হাতে পুরো চেহারা ঢেকে নেয়।

সালার মোজেযা না হওয়ার কথা বলছে। ড. সিবতে আলি চুপ করে তা শুনছেন। তবে কেন এই চুপ থাকা, সেটা শুধু তিনি আর ও জানে, সালার না। ইমামা চোখ মুছে চেহারা থেকে হাত সরায়। ছলছল চোখে সেই মানুষটাকে দেখতে থাকে, যে না ওলি ছিল, না দরবেশ। শুধু সত্য মন থেকে তওবা করা একটা মানুষ ছিল। সালারের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম বুঝতে পারে, জালাল আর ওর মাঝে কী সবসময় বাধা হয়ে দাঁড়াত। কোন বিষয়টা এত বছর ধরে জালালের জন্য করা ওর একটা দোয়াও কবুল হতে দেয়নি। কী শেষ মুহূর্তে ফাহাদের জায়গায় ঠিক এই মানুষটাকে নিয়ে এসেছিল। 'মানুষটার মাঝে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যার কারণে তার দোয়া কবুল হয়েছে; আমার না। বরং প্রতিবার আমাকে তার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে।' ভেজা চোখ নিয়ে সালারের দিকে তাকিয়ে ভাবে ও।

ড. সিবতে আলি সালেহ বলছিলেন সালারকে। ইমামা জানে এই শব্দ কেন বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে। ওকে শোনানোর জন্য বলা হচ্ছিল। তিনি এ সালারকে সালেহ তকমা না

দিলেও এখন সালারকে সালেহ মানতে বাধ্য ও। সালারের কাছে যে সাক্ষ্য ছিল, তা পৃথিবীর যেকোনো সাক্ষ্যের চেয়ে বড়। ওর কাছে যে প্রমাণ ছিল, এরপর আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন বা অবকাশ ছিল না। সালার কি জানে ইমামাকে কী বলে দেওয়া হয়েছে, কী বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে? না... এটা শুধু ইমামা জানে; শুধু ওরই জানার কথা।

ইফতারের পর সালার আর ড. সিবতে আলি নামাজ পড়তে চলে যায়। ইমামা হাত-মুখ ধুয়ে কিচেনে আসে। তারা ফেরার আগে কাজের লোকের সাথে খাবার গোছাতে সাহায্য করে। সালার রাতের খাবার খেয়ে চলে যায়। ড. সিবতে আলি সালারকে বিদায় দিয়ে কিচেনে আসেন। ইমামা তখন কিচেন টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছিল। ওর চোখ এখনো ফোলা, কিন্তু চেহারা শান্ত।

'আমি সালারকে আপনার কথা বলিনি। কিন্তু আমি চাই যতদ্রুত সম্ভব আপনি ওর সঙ্গে দেখা করে কথা বলুন।' তিনি বললেন।

'আমি কথা বলতে চাই না।' ইমামা খাওয়া থামিয়ে বলে।
'ওকে আল্লাহ আমার জন্য বাছাই করেছেন। আর আমার
মাঝে আল্লাহর নির্বাচনকে প্রত্যাখান করার সাহস নেই। ও
বলেছে তওবা করেছে। যদি না-ও করত, আগের মতো
থাকত, তবু আমি ওর কাছে চলে যেতাম; যদি জানতাম
আল্লাহ ওকে আমার জন্য নির্বাচন করেছেন।' আবার খেতে
লাগল। 'আপনি ওকে বলুন আমাকে নিয়ে যেতে।'

সালার মাগরিবের নামাজ পড়ে ফিরল। ততক্ষণে ফুরকানের
স্ত্রীর সাথে খাবারের টেবিল গুছিয়ে ফেলেছে ইমামা। ফুরকান
আর সালারের অনুপস্থিতিতে ও জোর করে নওশিনের কাজে
সাহায্য করেছে। সালার ফিরলে নওশিন নিজেদের ফ্ল্যাটে
যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সালার আর ইমামা তাকে
আটকানোর চেষ্টা করে।

'না, বাচ্চাদের সাথে খেতে হবে। ওরা বেচারা অপেক্ষা করছে।'

'আপনি ওদেরকে এখানে ডেকে আনুন।' সালার বলল।

'না ভাই! আমি এই ধরনের অহেতুক কাজ করতে পারব না। তারপর তো তুমি জানোই ইমামা... এখান থেকে যাওয়ার নামই নেবে না।' নওশিন তার মেয়ের কথা বলল। 'সালার ইমামাকে খুব আদর করে।' ফুরকানের স্ত্রী ইমামাকে বলল।

এক মুহূর্তের জন্য সালার আর ইমামা দৃষ্টি মেলে। সালার বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে টেবিলের উপর থাকা জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে লাগল। নওশিন অবাক হয়ে ইমামার লাল হয়ে ওঠা চেহারার দিকে তাকায়। কিন্তু বুঝল কিছু। 'তোমরা খাও। সেহরি কাজের মহিলাকে দিয়ে পাঠাব আমি, তোমাদের কিছু করতে হবে না।'

নওশিন চলে গেলে সালার দরজা বন্ধ করে টেবিলে আসে। ইমামাকে না ডেকেই চেয়ার টেনে বসে। কিন্তু খাওয়া শুরু করে না। ইমামা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেও একটা চেয়ার টেনে বসল। ও বসার পর সালার সামনে থাকা প্লেটে ভাত তোলো। কয়েক চামচ ভাত নিয়ে ডান হাতে এক চামচ ভাত তুলে মুখে দেয়। ইমামার চোখ সালারের ডান হাত থেকে ওর চেহায়ায় যায়। সালার ওর দিকে তাকায় না। কিন্তু জানে ইমামা কী দেখছে। খাবার খুব নীরবে খাওয়া হচ্ছিল।

সালারের নীরবতা ইমামাকে ভীষণ অস্থির করে তোলে। 'আদতে এই মানুষটা কেন কথা বলছে না? আমাকে দেখে এত ধাক্কা লেগেছে নাকি?' ইমামা অনুভব করে ওর ক্ষুধা শেষ হয়ে গেছে। প্লেটে থাকা খাবার শেষ করতে কষ্ট হচ্ছিল।

অন্যদিকে সালার খুব তৃপ্তি করে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খাচ্ছে। যখন ওর খাওয়া শেষ হয়, তখন বাইরে এশার আজান দিচ্ছে। ইমামার খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করে উঠে

বেডরুমে চলে যায়। ইমামা নিজের প্লেটটা পেছনে ঠেলে টেবিলের সবকিছু গোছানো শুরু করে। সালার কাপড় পাল্টে বের হয়। এবারও ইমামাকে কিছু না বলে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায় ও। অবশিষ্ট খাবার ফ্রিজে রেখে দেয় ইমামা। প্লেট-গ্লাস সিন্কে রেখে টেবিল পরিষ্কার করে নিজেও নামাজ পড়তে চলে যায়।

সালার এশার নামাজ শেষ করে যখন ফিরল, ইমামা তখন কিচেনে প্লেট-গ্লাস ধোয়ায় ব্যস্ত ছিল। নিজের কাছে থাকা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকে ও। লাউঞ্জ পেরিয়ে ভেতরে যেতে চাইলেও থেমে যায়। কিচেনের দরজায় ইমামার পিঠ আর ও সিন্কের সামনে। ওড়নাটা লাউঞ্জের সোফায় পড়ে আছে। প্রথমবার মেয়েটাকে সান্দীদা আন্নার বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা আগে ওড়না ছাড়া দেখেছিল। আর এখন আরেকবার দেখছে।

নয় বছর আগে অজু করার সময় প্রথমবার ইমামাকে চাদর ছাড়া দেখার ইচ্ছে জেগেছিল ওর। নয় বছর পর... আজ সেই

ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। নয় বছরে বহুবার মেয়েটাকে নিজের ঘরে অনুভব করেছে। কিন্তু আজ যখন সামনে দেখেছিল, বিশ্বাস করতে পারছিল না। ইমামার কালো চুল টিলেটোলা হাত-খোঁপায় বাঁধা, যা সাদা সোয়েটারের উপর ফুটে রয়েছে।

নিকাহনামায় আমনা মুবীন, পিতা হাশিম মুবীন আহমেদকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার সময় এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা জাগেনি। হাশিম মুবীন নামও অবাক করেনি। ও সাঈদা আম্মার মেয়েকে বিয়ে করছিল। যার নাম ইমামা হাশিম হলেও কল্পনা করতে পারত না এটা সেই ইমামা, অন্য কেউ না। কিন্তু যখন সাঈদা আম্মার প্রাঙ্গণে পেছন থেকে মেয়েটাকে দাঁড়ানো দেখেছিল, তখন এক মুহূর্তও লাগেনি এটা বুঝতে যে, কাকে বিয়ে করেছে।

‘তুমি জানো ইমামা! নয় বছরে কত দিন, কত ঘন্টা, কত মিনিট হয়...?’

নীরবতা ভেঙে গেছে। সালারের কণ্ঠের শীতলতা শরীরকে জমিয়ে দেওয়ার মতো। ইমামা ঠোঁট চেপে পানির কল বন্ধ করে দেয়। সালার ওর পেছনে। এতটা কাছে যে, ঘুরতে চেষ্টা করলে ওর কাঁধ সালারের বুকে লাগবে। ও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেনি। ঘাড়ের উপর সালারের নিশ্বাসের মৃদু আওয়াজ টের পাচ্ছিল। সালার উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু ইমামার কাছে উত্তর নেই। সিন্ধের কিনারে হাত রেখে কল থেকে ঝরে পড়া শেষ পানির ফোঁটার দিকে তাকিয়ে ছিল ও।

'এতগুলো বছরে একবারও... তুমি আমার কথা ভেবেছ? সালারের কথা?' প্রশ্ন কঠিন থেকে কঠিন হচ্ছে। ইমামা চুপ থাকে। 'What is next to ecstasy?' উত্তরের অপেক্ষা না করে বলতে থাকে সালার। 'তুমি বলেছিলে, Pain. তুমি ঠিক ছিলে। It was pain.' একটু থামে। 'আমি এখানে, এই ঘরে তোমাকে এতবার দেখেছি যে, এখন তুমি আমার সামনে তা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ইমামা সিন্ধের কোণা আরও শক্ত করে ধরে। হাতের কাঁপুনি থামানোর মতো আর কিছু নেই ওর কাছে।

'মনে হচ্ছে, আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি। চোখ খুললে...'

ইমামা চোখ বন্ধ করে নেয়।

'তখন সব থাকবে, শুধু তুমি থাকবে না। আবার চোখ বন্ধ করলেও...'

ইমামা চোখ খুলে ফেলল। ওর গাল ভিজে যাচ্ছে চোখের পানি পড়ে।

'সেই স্বপ্নে ফিরে যেতে পারব না। তুমি আর থাকবে না এখানে। তোমাকে ছুঁতে আমার ভয় করছে। হাত বাড়ালে যদি সব নষ্ট হয়ে যায়, পানিতে ভেসে ওঠা একটা প্রতিবিশ্বের মতো।' সালার এত কাছে যে, একটু ঝুঁকলে ইমামার চুল ওর ঠোঁট ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু তা করতে চায় না ও। 'আর তুমি কে

ইমামা? না আমনা? আমার মোহ নাকি কোনো মোজেয়া?
আচ্ছা, আমি কি তোমাকে বলে দেবো আমি... তোমাকে
কতটা...' বলতে বলতে থেমে যায়।

ইমামার চোখের পানি ওর চেহারা ভিজিয়ে চিবুক বেয়ে
পড়ছিল। সালার কেন থেমেছে জানে না ও। কিন্তু এর আগে
কখনো জীবনে নীরবতাকে এত বাজে লাগেনি, যা এই মুহূর্তে
লাগছিল ওর। সালার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। এতক্ষণ
যে, ইমামা ঘুরতে বাধ্য হয়। ফিরে বোঝে সালার কেন চুপ।
সালারের চেহারাও ভেজা। ওরা দু'জন জীবনে এই প্রথম
একে অপরকে এত কাছ থেকে দেখছিল। এত কাছ থেকে
যে, একে অন্যের চোখের মাঝে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে
পাচ্ছিল। সালার দৃষ্টি লুকানোর চেষ্টায় হাত দিয়ে চেহারা
মুছতে থাকে।

'তুমি আমার কাছ থেকে বা আমি তোমার কাছ থেকে কী
আর লুকাব সালার? সবকিছুই তো আমরা জানি একে অন্যের
ব্যাপারে।' ইমামা মৃদু আওয়াজে বলল।

সালার হাত থামিয়ে মাথা তোলে। 'আমি কিছু লুকাচ্ছি না। চোখের পানি পরিস্কার করে নিচ্ছি যাতে তোমাকে ভালোভাবে দেখতে পারি। যেন কোনো ধোয়াশায় মোড়ানো না মনে হও তুমি।' ইমামার কানের লতিতে থাকা মুক্তাগুলোর দিকে তাকায় ও। যা বহু বছর আগে একবার দেখেছিল। তফাত শুধু, আজ ওরা খুব কাছাকাছি। একবার এই মুক্তাদানা ওকে অনেক কাঁদিয়েছিল প্রতিটি বাঁকের সাথে। অথচ আজ তা মোহ থেকে কল্পনা... কল্পনা থেকে বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে।

ইমামা কানের লতিতে সালারের স্পর্শ টের পায়। 'আমি কখনো ভাবিনি তোমার এত কাছে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।' সালার ভেজা চোখে হাসে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর ডান গালে আবির্ভূত টোল দেখতে পায় ইমামা। হাসলে একগালে টোল পড়ে মানুষটার, ডান গালে। নয় বছর আগে এই টোল নিয়ে ইমামার বড় জ্বালা ছিল। কিন্তু এখন... নয় বছর পর... আজ এই টোল অদ্ভুতভাবে সালারের দিকে টানছে ওকে।

'আমি কখনো ভাবিনি তোমার কানের দুলগুলো এভাবে স্পর্শ করতে পারব। আর তুমি...' সালার ডান কানের মুক্তাটি আঙুলের ডগায় ধরে রেখে বলল। 'আর তুমি... তুমি আমাকে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মারবে না?'

ইমামা অবিশ্বাস্য চোখে তাকায়। সালারের মুখে হাসি নেই। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ভেজা চেহারায়ে হেসে উঠল। খুশিতে যেন চেহারা লাল হয়ে গেছে। 'তোমার এখনো সেই থাপ্পড় মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল ইমামা।

'Reflex action, আর কিছু না।' সালার বলল।

ইমামা হাতের পিঠ দিয়ে ভেজা গাল মোছে। সালারের চোখেমুখে হাসি। টোলের ঝলক আবার দর্শন হয়। খুব আলতো করে ইমামার দুই হাত নিজের হাতে নেয় সালার।

'তুমি জানতে চাও না এত বছর আমি কই ছিলাম? কী করেছি? আমার ব্যাপারে সবকিছু?'

সালার না-বোধক মাথা নেড়ে ইমামার হাত দুটো বুকের উপর রাখে। 'আমি কিছু জানতে চাই না, কিছু না। তোমার জন্য আমার কাছে কোনো প্রশ্ন নেই। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো... আমার এত কাছে তুমি। আমার মতো মানুষ কাউকে কী জিজ্ঞাসাবাদ করবে?'

ইমামার হাত সালারের বুকের উপর ওর হাতের নিচে। পানি ইমামার হাত ঠান্ডা করে দিয়েছিল। জানে সালার কেন ওর হাত এভাবে বুকের সাথে ধরে রেখেছে। নিজের অজান্তেই ওর হাতের ঠান্ডাভাব দূর করার চেষ্টা করছিল। ঠিক যেমন একজন বড় মানুষ একটা বাচ্চাকে উষ্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করে। বুকের উপরে থাকা হাতের কারণে সোয়েটারের নিচে সালারের হৃৎস্পন্দন টের পারছিল ইমামা। যা এলোমেলো... দ্রুত... উচ্ছ্বসিত... কিছু বলার চেষ্টা করছিল। তা পড়তে পারে ও। বুঝতে পারে এই মানুষটা ওকে ভালোবাসে। কিন্তু কেন? এর উত্তর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাও হয়তো দিতে পারবে না। মানুষটাকে এই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখিও

করল না। সালারের চোখ শান্তভাবে বন্ধ করে রাখা। খোলা থাকলেও এখন আর এই চোখগুলোর দিকে তাকাতে বিরক্ত লাগে না। এই চোখে নয় বছর আগে যা ছিল, তা এখন নেই। যা এখন আছে, তা নয় বছর আগে ছিল না...।

'আমরা কী, আমাদের ভালোবাসা কী, আমরা কী চাই, আর কী পাই?' ইমামার চোখ আবার ভিজে ওঠে। জালাল আনসার আর সালার সিকান্দার... স্বপ্ন থেকে বাস্তবতা... বাস্তবতা থেকে স্বপ্ন। জীবন কি এর বাইরে অন্যকিছুকে বলে...?

ইমামা আঙুল করে হাত সরিয়ে নেয়। টের পেয়ে সালার চোখ খুলে ফেলে। ওর চোখে এক মুহূর্তে জন্য ঝলকানো সেই অনুভূতি পড়তে পারে ইমামা। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়ের মিশ্রণ। এবার ঠিকঠাক মতো মানুষটার দিকে তাকায় ও। পরনের কালো সোয়েটারের উপরে বের হওয়া সাদা কলার দেখা যাচ্ছে। কিছু না বলে খুব আলতো করে কাঁধের দিকে হাত বাড়িয়ে মানুষটার বুকে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে নিলো ও। সালারের ব্যবহৃত কোলোনের মৃদু গন্ধ নাকে

পৌঁছায়। নয় বছর আগে এই মানুষটা খুব কড়া পারফিউম ব্যবহার করত। কিন্তু নয় বছরে সব একদম শান্ত হয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে পারছিল না যেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সালারও খুব আলতো করে হাত বাড়িয়ে ইমামাকে জড়িয়ে ধরে।

'I am honoured!' (এটা আমার জন্য সম্মানের।) ইমামা ওকে মৃদু আওয়াজে বলতে শোনে। ওর বন্ধ চোখে আলতো করে চুমু দিচ্ছে মানুষটা।

সালারের সঙ্গে খানায় কাবার প্রাঙ্গণে বসে আছে ইমামা। সালার ওর ডানপাশে। আজকে ওদের শেষ রাত। গত পনেরো দিন ধরে এখানেই ছিল। কিছুক্ষণ আগে তাহাজ্জুদ আদায় করেছে। তাহাজ্জুদ পড়ে সাধারণত এখান থেকে চলে যায় ওরা, কিন্তু আজ বসে রইল। ওদের এবং কাবার দরজার মাঝে অনেক মানুষ, অনেক দূরত্ব। তবু ওরা যেখানে

বসেছিল, সেখান থেকে কাবার দরজা খুব সহজে দেখা যাচ্ছে। ওখানে বসার সময় দুজনের মস্তিষ্কেই একটা স্বপ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। স্বপ্নের সেই রাতটা এখন যেন নিজেদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

হেরেম শরিফের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে সালার সুরা আর-রাহমান তেলাওয়াত শুরু করে। ইমামা ইচ্ছে করেই ওর পাশে বসার পরিবর্তে বাঁ-দিকের পেছনে বসল। তেলাওয়াতের ফাঁকে সালার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। ইমামার হাত ধরে ইশারায় ওর পাশাপাশি বসতে বলে। ইমামা উঠে বরাবর এসে বসল। সালার হাত ছেড়ে দেয়। খানায়ে কাবার দরজার দিকে স্থির চোখে তাকানো যে যার ধ্যানে ব্যস্ত। কাবার দিকে তাকিয়ে ইমামা সেই মনোরম কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনছে, যা ওর স্বামীর কণ্ঠ।

'ফাবিআয়্যি আ-লা-ইরাবিবকুমা- তুকাজ্জিবা-না'

(তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?)

'যা বলছ এর উপর তোমাকে অনেক পস্তাতে হবে ইমামা! দেখবে তোমার হাতে কিছু থাকবে না।' নয় বছর আগে হাশিম মুবীন ওর গালে থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন। 'সারা পৃথিবীর অপমান, লাঞ্ছনা, বদনাম আর ক্ষুধা তোমার নিয়তি হয়ে দাঁড়াবে।' ওর গালে আরেকটা থাপ্পড় মেরেছিলেন তিনি। 'তোমার মতো মেয়েদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করেন। কাউকে মুখ দেখানোর অবস্থায় রাখেন না।' ইমামার চোখ ভিজে উঠল। 'একটা সময় আসবে, যখন তুমি আমাদের কাছে ফিরতে চাইবে, মিনতি করবে। কিন্তু আমরা তোমাকে তাড়িয়ে দেবো। তুমি চিৎকার করে নিজের গুনাহের ক্ষমা চাইবে। বলবে, তুমি ভুল ছিলে।' চোখে পানি নিয়ে হাসে ও।

'আমার ইচ্ছে বাবা... জীবনে একবার আপনার সামনে যাব এবং গিয়ে বলব- দেখুন আমার চেহারায কোনো কলঙ্কের দাগ নেই। আল্লাহ ও নবি সা. আমার হেফাজত করেছেন। আমাকে পৃথিবীর জন্য হাসির খোরাক বানাননি। ইহকাল বা পরকাল কোথাও আমাকে অপমানের মুখোমুখি করবেন না। আজ যদি আমি এখানে থেকে থাকি, তাহলে এর কারণ আমি

সঠিক পথে ছিলাম। এখানে বসে আবারও স্বীকার করছি হজরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর শেষ রসুল এবং তাঁর পরে কোনো পয়গম্বর আসেনি, আসবেও না। আমি স্বীকার করছি তিনিই পীর-এ-কামিল। স্বীকার করছি তাঁর মতো নিখুত দ্বিতীয় কেউ নেই। তাঁর প্রজন্মের মাঝেও তাঁর সমক্ষক কেউ আসেনি এবং আসবে না। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন কখনো তাঁর সঙ্গে আমাকে শিরক না করায়। না কাউকে শেষ পয়গম্বর সা. এর সমক্ষক ভাবার সাহস দেয়। দোয়া করি, আমাকে জীবনভর যেন সঠিক পথে রাখে। আমি তাঁর কোনো অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে পারব না।"

সুরা আর-রাহমানের তেলাওয়াত শেষ করে সেজদায় চলে যায় সালার। সেজদা থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে থামল। ইমামা চোখ বন্ধ করে দুই হাত তুলে দোয়া করছে। ওর দোয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইল। ইমামাকে মোনাজাত শেষ করতে দেখে উঠতে চায় সালার। কিন্তু উঠতে পারল না। ইমামা আলতো করে ওর ডানহাত ধরে রেখেছে। সালার অবাক হয়। 'এই যে যারা বলে না, যাকে ভালোবেসেছি

তাকে পাইনি, এমন কেন হয় জানো?' রাতের শেষ প্রহরে সালারের হাত আলতো করে ধরে ভেজা চোখ ও হাসিমাখা মুখ নিয়ে ইমামা বলছিল। 'ভালোবাসায় সততা না থাকলে তা পূর্ণতা পায় না। নয় বছর আগে যখন আমি জালালকে ভালোবেসেছিলাম, তখন পুরো সৎ হৃদয় নিয়ে বেসেছি। দোয়া, অজিফা, মান্নত কী আছে...যা করা আমি বাকি রেখেছি? কিন্তু তবুও আমি তাকে পাইনি।' ইমামা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে ছিল। সালারের হাত ওর নরম হাতের মুঠোয় হাঁটুর উপর। 'কারণ কী জানো? কারণ তখন তুমিও আমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলে। তোমার ভালোবাসা আমার চেয়ে বেশি সৎ ছিল।'

সালার হাতের দিকে তাকায়। ইমামার চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের পানি ওর হাতের উপর পড়ছে। মুখ তুলে আবার ইমামার দিকে তাকায়। 'আমার মনে হয় আল্লাহ আমাকে খুব যত্ন করে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে এমন কোনো ব্যক্তির হাতে সঁপে দিতে চাননি যে আমাকে অবহেলা করবে, অযত্নে রাখবে আমাকে। কিন্তু জালাল আমার সাথে

এগুলোই করত। সে আমাকে কখনো মূল্য দিত না। গত নয় বছরে আল্লাহ আমাকে সব বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপ চিনিয়েছেন। অতঃপর তিনি আমাকে সালার সিকান্দারের হাতে তুলে দিলেন। কারণ তিনি জানেন তুমি সেই মানুষটা, যার ভালোবাসায় সততা আছে। তুমি ছাড়া আর কে আমাকে এখানে নিয়ে আসত? তোমার কথা সত্য, তুমি আমাকে পবিত্রভাবে ভালোবেসেছ।"

সালার অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল। ইমামা আলতো করে ওর হাতে চুমু দিয়ে তা পর্যায়ক্রমে দু-চোখে স্পর্শ করে। 'তোমাকে কতটা ভালোবাসতে পারব, আমি তা জানি না। কারণ হৃদয়ের উপর কারো কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু যতটুকু জীবন তোমার সঙ্গে কাটাতে পারব, তোমার বিশ্বস্ত ও বাধ্য হয়ে থাকব কথা দিচ্ছি। এখানে আমার কর্তৃত্ব আছে। জীবনের প্রতিটি কঠিন মোড়, প্রতিটি পরীক্ষায় তোমাকে সঙ্গ দিয়ে যাব। সুসময়ে আমি তোমার জীবনে এসেছি। কিন্তু দুঃসময় এলেও আমি তোমাকে একা ছেড়ে যাব না।' ইমামা যতখানি

আলতোভাবে ওর হাতটা ধরেছিল, ঠিক ততখানি আলতোভাবেই ছেড়ে দেয়। মাথা নিচু করে দুই হাতে নিজের চেহারা পরীক্ষার করে নিলো।

সালার কিছু না বলে উঠে দাঁড়ায়। খানায়ে কাবার দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। নিঃসন্দেহে ওকে পৃথিবীতে নাজিলকৃত সালেহ ও নেক নারীদের মধ্যে একজনকে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য ও নয় বছর ধরে সব জায়গায়, সর্বদা দোয়া করেছিল। সালার সিকান্দারের জন্য কি এরপরও অনুগ্রহের কোনো সীমা বাকি রয়ে গেছে? এখন সেই নারীকে পাশে পেয়ে বুঝতে পারছিল, নিজের জন্য কত বড় দায়িত্ব নিয়ে বসেছে। ওকে সেই নারীর রক্ষাকারী বানানো হয়েছে, যে নেকি আর পবিত্রতায় ওর চেয়ে অনেক আগানো। ইমামাও উঠে দাঁড়াল। সালার ওর হাত ধরে যাওয়ার জন্য সামনে পা বাড়ায়। ওকে এখন সেই নারীর হেফাজতের দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়েছে, যে নিজের জীবন বিলাসিতা ও নোংরামিতে ডুবতে দেয়নি। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা সত্ত্বেও নিজের আত্মা এবং দেহকে ওর মতো

নফসের কাছে উৎসর্গ করেনি। ইমামার হাত ধরে সামনে পা বাড়ানোর সময় ওর বুকে আসে তাকওয়া ও পরহেজগারির অর্থ কী। ইমামা ওর চেয়ে কয়েক পা পেছনে। ওরা হেরেম শরিফে বসা এবং চলাচলরত মানুষের সারির মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সালার নিজের পুরো জীবনটা যেন সিনেমার পর্দায় দেখতে পাচ্ছিল। প্রচুর ভয় হয় ওর। গুনাহের একটা লম্বা তালিকা সত্বেও শুধু আল্লাহর অনুগ্রহই পাচ্ছে। তবু তখন ওর চেয়ে বেশি আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে কেউ ভীত ছিল না হয়তো। সেই মানুষটা। যার আইকিউ লেভেল ১৫০+, যার রয়েছে ফটোগ্রাফিক মেমোরি; সে এই নয় বছরে জেনে গেছে এসব থাকার পরও একজন মানুষ জীবনের বহু পর্যায়ে অন্ধের মতো হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে। ও পড়েছে, বহুবার... বহু পর্যায়ে হোঁচট খেয়েছে। তখন ওর আইকিউ কাজে আসেনি, ফটোগ্রাফিক মেমোরি উপকার করেনি। কিন্তু পাশে চলা মেয়েটার মাঝে এই দুয়ের কোনোটা ছিল না। ছিল শুধু হাতের তালুতে হেদায়তের ছোট্ট এক অগ্নিপুঞ্জ, যা থেকে

নিঃসৃত আলোর সাহায্যে জীবনের গভীর অন্ধকার থেকেও
মেয়েটা কোনোরকম হেঁচট না খেয়ে পথ অতিক্রম করে
যাচ্ছিল।

সমাপ্ত

To join our telegram group click here



Whispers of Stories

